ভাবক, শিক্ষক—সকলেরই এ বিষয়ে চিন্তা করিবার এবং কিছু বলিবার অধিকার আছে।

প্রথমতঃ বয়সের প্রশ্ন ধরা যাক। ১৪ বৎসরের ছাত্র কোথায় ক-জন ডিগ্রি কলেজে ভরতি হইতেছে, তাহা আমাদের জানা নাই। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমরা যতদূর জানি ১৪ বৎসর বয়সে ছাত্র জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে। ৮ম শ্রেণীর পরে সে হয় সাধারণ পড়া শেষ করিয়া শিল্প-বিদ্যালয়ে যাইবে; নতুবা বহুমুখী (৯ম-১১শ শ্রেণীর) বিদ্যালয়ে ভরতি হইবে। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭ বৎসর বয়স ডিগ্রি কোর্সের ১ম বর্ষে ভরতি হওয়ার পক্ষে এমন কিছু কম বয়স নয়।

আমাদের মনে হয়, এই জ্ঞানোন্মুখ বয়সে ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যাহত করা সমীচীন নয়। অব্যাহতভাবে ডিগ্রি কোর্স অথবা শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জাতীয় সেবার স্থচীতে ছাত্রদের যোগদান করা উচিত। যদি জীবিকার্জনের তাগিদে তাহা সম্ভব না হয়, তবে ঐ-সকল শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ঐ তিন চার বৎসরের মধ্যেই প্রতি সপ্তাহে দুদিন (যেমন পূর্বে U. T. C.তে ছিল) সামরিক শৃঙ্খলা শেখানো চলিতে পারে এবং বার্ষিক অবকাশ-সময়ে জাতীয় সেবার কর্মস্থচী অনুযায়ী কাজ করানো যাইতে পারে।

পরিশেষে এ সম্বন্ধে বক্তব্য উচ্চ শিক্ষার পর কেন, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেই বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলা শিক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেবা কখনও বাধ্যতামূলক হয় না, যথার্থ সেবা স্বেচ্ছামূলক; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই এমন আবহাওয়া ও আদর্শ থাকিবে, যাহা দেখিয়া ছাত্রেরা শিখিবে জীবনের প্রতিটি কাজই দেশের সেবা, মানুষের সেবা। বিনা পারিশ্রমিকে মাটি কাটা বা গ্রামে গ্রামে শিক্ষাদানই সেবা নয়। প্রয়োজন হইলে তাহা অবশ্যই কর্তব্য, এই প্রকারে সেবার মনোভাব সৃষ্টি করাই এরূপ পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। প্রবন্ধ বা বক্তৃতা অপেক্ষা তার জন্য প্রয়োজন জলন্ত জীবন্ত আদর্শ—সেবায় সমর্পিত শিক্ষক ও নেতাদের জীবন।

পরিতাপের বিষয়

ধর্ম লইয়া উন্মত্ততা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তাহার বিষময় ফল—দেশবিভাগের বিয়োগান্ত নাটক আমরা দেখিয়াছি; তার পর শুরু হইয়াছে ভাষা লইয়া উন্মত্ততা এবং তজ্জনিত ভ্রাতৃ-বিরোধের পালা। অল্পসংখ্যক দুর্বৃত্ত কিভাবে শান্ত জনসাধারণের জীবন বিপন্ন করিতে পারে, তাহার বহু বিচিত্র দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি ভারতের পশ্চিমে, দক্ষিণে, এখন এই বিপদ ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। ভাষা একটু পৃথক হইলে কর্তব্যরত রাষ্ট্রসেবকেরও জীবন বিপন্ন, স্ত্রী-পুত্রকন্যা লইয়া মানুষকে জনপদ ছাড়িয়া জঙ্গলে সর্পব্যাঘ্রের নিকট আশ্রয় লইতে হইতেছে! ভ্রান্ত রাজনীতিক অধিকার-বোধ মানুষকে আজ কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে!

র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব অস্বীকার করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। সেই দুইটি বিষবৃক্ষেরই ফল আজ আমরা ভোগ করিতেছি। জানি না এই আত্মঘাতী ভাবের পরিণাম কি, এর পরিসমাপ্তি কোথায়?

চলার পথে

'যাত্রী'

হিমালয়ের পাদদেশে ছোট্ট একটুখানি রাজত্ব। তাকে ঘিরেই সবার আজ 'সাজ সাজ' রব। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, আতুর-অভ্যাগত, বালক-বৃদ্ধ—যে যেখানে আছে সকলের মনেই সেই অপূর্ব মানবকে দেখার আশা উঁকি মারছে। সকলেই ভাবছেন, কখন আসবেন তিনি, কখন দেখব তাঁকে? প্রতীক্ষার উত্তাল ঢেউ তখন সকলের মনের তটেই বিচিত্র লীলায় সমুদ্বেলিত। যাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে তারা, অনেক দিন, অনেক রাত ধরে, সেই তিনি আসছেন। বহুদিন পরে তাদের এই মিলন-প্রতীক্ষা সার্থক হবে, মনের আকাঙ্ক্ষাও মিটবে।

যিনি আসছেন তিনি কিন্তু রাজা নন; রাজত্ব কেড়ে নিতেও তাঁর আগ্রহ নেই। নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হ'য়ে ভিখারীর ভিক্ষাপাত্র নিয়েই তিনি ফিরছেন দেশে দেশে। কিছু নেই, তবু কি এক মহা ঐশ্বর্যে তিনি ধনবান। দানের শ্রেষ্ঠ মহিমায় চিরস্মরণীয়! একদিন এক ছোট্ট ছাগশিশুর জীবন বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণটাকেই অকুণ্ঠিত চিত্তে তুলে ধরতে তাঁর বাধল না! সেই রাজার রাজা আজ বহুদিন পরে নিজের জন্মস্থানে ফিরছেন।

আনন্দ ও বেদনার, অশ্রু ও পুলকের অভাবিত মিশ্রণ বহন ক'রে আজকের এই ক্ষুদ্র রাজধানী কপিলাবস্তু তাই তাঁর অভিনন্দনে মেতেছে। তাঁকে দেখবার জন্য জরাগ্রস্ত পেয়েছে যৌবনের শক্তি; খঞ্জ পেয়েছে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার মনোবল; অন্ধ পেয়েছে দিব্যদৃষ্টি; ভগ্নদেহ পেয়েছে স্বাস্থ্যের অরুণিমা। কেমন এক যাদু মন্ত্রবলে সবকিছুই যেন আজ আনন্দায়িত হ'য়ে উঠেছে—শুধু মানুষ নয়, পশু-পক্ষীও। বৃক্ষ-বাতাস সবকিছুই এই মহাপ্রতীক্ষায় বিভোর! সকলের চোখেই দেখার আগ্রহ পড়ছে ঝরে! প্রাণ-পুতুলি সন্ন্যাসী-পুত্রকে বহুদিন পরে দেখার আকুলিত আগ্রহে পিতা শুদ্ধোদনের প্রাণে নবজীবনের বান ডেকেছে। এক তীব্র আগ্রহ বৃদ্ধকে আজ স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এই আনন্দের মাঝেও কিন্তু বৃদ্ধের বুকে একটা পুরাতন ব্যথা রিনিয়ে উঠছে—সেই সঙ্গে একটু ভয়ও। বৃদ্ধ ভাবছেন, এই ত্যাগি-সম্রাটের সবছাড়া-নেশার টানে পড়ে বংশের একমাত্র দুলাল, উত্তরাধিকারের একমাত্র প্রদীপ রাহুল,—সে আবার রাজত্ব ছেড়ে ভিখারী হ'য়ে যাবে না তো? কি জানি তাই যদি হয়! তাই শুদ্ধোদন ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন: রাহুলকে কেউ যেন তার পিতৃ-পরিচয় না দেয়, দিলে হবে তার কঠোর শাস্তি। এই কঠিন বিধানের বাঁধ দিয়ে শুদ্ধোদন ঐ ত্যাগের মহাপ্লাবন থেকে রাহুলকে বাঁচাবেন, ঠিক ক'রে রেখেছেন। মানুষের সীমায়িত ক্ষমতার এই অক্ষম আস্ফালন দেখে সে দিন বিধাতাপুরুষ বোধ হয় অলক্ষ্যে একটু হেসেছিলেন!

বুদ্ধ এসেছেন রাজধানীতে। আজ সকলে একসঙ্গে নয়, এককভাবে—পিতা, মাতা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ গৃহে সিদ্ধার্থকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনিও প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তাই আজ বহুদিন পরে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি যশোধরারও গৃহের দরজায়। তাঁর দিগন্তবিস্তৃত কান্নার সমুদ্রে তাই আজ অবিরাম কলোচ্ছ্বাস!

মহাবুদ্ধের উজ্জ্বল কান্তিতে ভাসছে এক আকর্ষণ! তাঁর দেহ-মন ঘিরে কেমন এক যাতু ঘনিয়ে আছে। সাত আট বছরের পুত্র রাহুলও সেই অনন্য আকর্ষণে কাছে এসে দাঁড়াল। এই অভাবনীয় পরিবেশে বুদ্ধের দেহের ছায়া পড়ল তার গায়ে। এই দুর্লভ ঘটনায় ঐ বালকের সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল। বিস্মিত কণ্ঠে রাহুল তার মাতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, 'মা, উনি কে? ওঁকে আমার বড্ড ভাল লাগছে যে! উনি আমার কেউ হন নাকি?' যশোধরা পুত্রের এই কৌতুহলী প্রশ্নে প্রমাদ গণলেন। তাঁর স্মৃতির সমুদ্রে আজ চিন্তার তরঙ্গ উত্তাল হ'য়ে উঠল। ক্ষণিক বিমনা হ'য়ে আবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন। একবার ভাবেন, পুত্রকে জানিয়ে দিই— ঐ মানব-সূর্য তোমার পিতা। আবার পরক্ষণেই অবুঝ দুশ্চিন্তার পীড়নে অশান্ত হ'য়ে ভাবেন, এর ফল যে ভীষণ হবে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাহুলকে তাঁর ঐ পিতৃত্বের দীপ্ত পরিচয় না জানিয়ে তিনি পারলেন না। পারলেন না তাঁর মৌনবুকে আটকে রাখতে, ঐ শিশুর কাছে—নিজ স্বামীকে স্বামী ব'লে জানাবার দুরন্ত আগ্রহকে। তাই যশোধরার অশ্রুসিক্ত ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরণন উঠল, 'রাহুল, ঐ পুরুষসিংহ—ঐ ভিক্ষুই তোমার পিতা।' এক নিমেষে কি যেন কি হ'য়ে গেল! যশোধরা বলেছেন, তাই শুদ্ধোদনও আর শান্তির খড়্গ তুলে ধরতে পারলেন না। এধারে রাহুলের সুলক্ষণযুক্ত মনটি বৈরাগ্যের ভাবে ভরপুর হ'য়ে গেল। তার শিশুমন কৃতনিশ্চয় হ'ল—গৃহ ছেড়ে পিতার মতই ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সন্ন্যাসী হবে সে। বুদ্ধও সায় দিলেন তাতে। নিকটেই দণ্ডায়মান সারিপুত্রকে বললেন—রাহুলকে সঙ্ঘভুক্ত করতে। বিহ্বল মুগ্ধতায় সারিপুত্র রাহুলের ডানহাত ও শিষ্যশ্রেষ্ঠ মোদ্‌গলায়ন তার বাঁ হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন, দিলেন ত্যাগের সজ্জা, দেখালেন ত্যাগের শয্যা। বুদ্ধের নির্দেশে ঐ একান্ত-সমর্পিত-প্রাণ বালক তখন আবৃত্তি করতে লাগল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। অদ্ভুত পিতার অদ্ভুত পুত্র আজ নির্বাণ-সাধনায় সঞ্জীবিত। দুই আত্মা আজ জ্যোতি-সমুদ্রের মহাপ্লাবনে একাকার হ'য়ে গেল মিশে। এখানে তখন মাতা নেই, পিতা নেই, বন্ধু নেই, ইচ্ছা নেই, আকার নেই; এক তন্ময়তায় সবকিছু ভরপুর।

চল পথিক, আমরাও আমাদের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে এই মন-রাহুলকে উদ্বোধিত ক'রে বৃহত্তর আনন্দের চির শাশ্বত অগ্রগতির দিকে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পা বাড়াই। নিগূঢ় প্রেমের ঐ অখণ্ড সত্তার মাঝে নিজেকে দিই বিলিয়ে। চল অমৃত-সমুদ্রের মৃত্যুহীন মহাসম্ভাবনার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ি। চল, চল আর দেরি নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

ভ্রম-সংশোধন

গত মাসের (আষাঢ় সংখ্যার) উদ্বোধনে ৩২৩ পৃষ্ঠায় 'পরশুরাম: রাজশেখর বসু' প্রবন্ধের

(১) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় পঙ্‌ক্তি—'চলন্তিকা'র স্থলে পড়িবেন 'চলচ্চিন্তা'।

(২) দ্বিতীয় স্তম্ভের পঞ্চম পঙ্‌ক্তি—'চমককুমারী'র স্থলে পড়িবেন 'চমৎকুমারী'। [উঃ সঃ]

সজল মেঘোৎসবে

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সন্ধ্যার যুঁথী-সৌরভমাখা স্মরণ-মধুর রাতি ;
কে জপিছে বসে মন্ত্র নীরবে পরাণের মালা গাঁথি ?
দিবসের খেলা হ'য়ে গেছে সমাপন।
নিমেষে নিমেষে চমকে দামিনী,
কোথায় জীবন-সাথী ?
পঙ্কিল পিচ্ছিল—
পথ ঘাট আর গুণ্ঠিত বাতায়ন।
ঘুমে-ঢাকা মঞ্জিল,
তারি মাঝে ধরা বর্ষা-ধারায় কার করে আরাধন !

বহু জনমের আবছায়া স্মৃতি তরু মর্মরে দোলে,
আকাশ-কুসুম স্বপ্ন-মদির গীতি-গুঞ্জন তোলে
নিশুতি নিশায় নিষ্ফল আশা লয়ে।
ছায়াতরী চলে সুদূরের পানে তটিনীর কল্লোলে,
আকাশের বুকে
মেঘের মিছিল চলেছে ঝঞ্ঝা বয়ে।
একা বসে আছি দুখে,
বিরহ-বিধুর কান্তারে শুনি কে কি কথা যায় ক'য়ে।

সীমাহীন জলধারা,
মেঘে মেঘে বুঝি ঢেকে গেছে সব
নীল আকাশের তারা।
এই পারে মঠ, ওপারে দেউল জাগে ;
সবুজ আশার স্বপন বিছায়ে নিশীথিনী চাঁদহারা
চমকে বিজলী নভে ;
বর্ষণ-ক্ষণে অদূরে দাদুরী ডাকে।
সজল মেঘোৎসবে
বাজে মেঠো বাঁশী অচেনা সুরেতে
দূরের প্রান্ত ভাগে।

এ রাতে আমি যে ক্ষীণ শিখা সম
জ্বলি ক্ষণিকের ঘরে,
আঁখি-কিনারায় স্খলিত অশ্রু ব্যথা জাগে অন্তরে।
যায় দিনগুলি ভেঙে-পড়া অবসাদে।
এ দেহ আমার ফেলে যেতে হবে সংসার-বালুচরে
জীর্ণ বসন সম,
সেই কথা ভাবি নিদ্রা-নীরব রাতে
পূরিল না সাধ মম ;
কামনার নীড়ে প্রাণের বিহগ
কেন অবিরত কাঁদে !

প্রেম, ভক্তি ও শরণাগতি*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

'কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার ?
হ'য়ে পূর্ণকাম ব'লব হরি-নাম,
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার ॥
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ মন,
কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
সংসার বন্ধন হইবে মোচন,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার ॥
কবে পরশমণি করি' পরশন,
লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দরশন,
লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার ॥'

প্রেম হ'ল এই, যা এই গানে শুনলে। ঠিক এই ভাবটি। এ প্রেম—ভগবানের শ্রীচরণে প্রেম। প্রেমই শেষ কথা। শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি, ভাব! ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম। একবার ভগবানের শ্রীচরণে হাজির হ'য়ে সব শেষ।

প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ; প্রেমিক প্রেমাস্পদকে প্রেম দিয়ে বাঁধে। প্রেম যেন রজ্জু। গোপীরা এই প্রেমরজ্জু দিয়ে প্রেমাস্পদকে বেঁধেছিল। এটি হওয়া ভগবানের কৃপা।

একটা বিশ্বাস নিয়ে এগোতে হয়। ঈশ্বর আছেন—এই বিশ্বাস নিয়ে উপাসনা করতে হয়। সাধুমুখে শুনে নিয়ে চলতে হয়। কেউ কেউ বলে, 'এ-সব অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ বিশ্বাস কেন করতে যাবে?' বেশ তো নিজেদের জীবনটাই দেখ। মা চিনিয়ে দিলেন, 'ঐ তোর বাবা।' আমরাও জানলুম আমাদের বাবা কে। জটিলের মা জটিলকে বলেছেন, 'তোর মধুসূদন দাদা জঙ্গলে থাকে। ভয় পেলে তাকে ডাকবি।' মা বলেছেন, বালক বিশ্বাস করলে। আর এই সরলতা ও বিশ্বাস ছিল বলেই দাদা হ'য়ে শ্রীমধুসূদন জঙ্গলের পথে বালক জটিলের সহায় হলেন।

আরো দেখ। পাচক রান্না করলে, খেলুম এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়নি। নাপিত এল, নির্ভয়ে গলা বাড়িয়ে দিলুম এই বিশ্বাস নিয়ে যে, সে গলা কাটবে না। এ রকম নিত্য নিয়ত কত ঘটনা!

বিশ্বাস—চাই। বিশ্বাস যত অন্ধ হবে, আলো তত বেশী পাবে, পথ তত স্পষ্ট হবে। ধর্মরাজ্যের এই প্রথম সোপান। এই বিশ্বাস থেকেই জ্ঞান ভক্তি। যুগে যুগে অবতার পুরুষগণ আসেন এই বিশ্বাসকে পাকা করবার জন্যে।

বৈধীভক্তি আনে রাগভক্তি। শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ, তাঁর নাম ও গুণকীর্তন এবং তাঁকে স্মরণ—এই করতে করতে তাঁর প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাবে। ভালবাসার আস্বাদন পাবে। এই আস্বাদনে একটু নেশা অনুভব করবে—তাঁর জন্য যেন প্রীতি-ভালবাসার একটা টান, তখনই হ'ল রাগাত্মিকা ভক্তি।

নেশাটুকু দরকার। ঠাকুর এটাকে বলতেন 'গোলাপী নেশা'। অশ্বিনীবাবুকে বলেছিলেন, 'সংসারে থাকবে একটু গোলাপী নেশা ক'রে। একজনকে দিলেও সবাইকার জন্য এ উপদেশ। 'কথামৃতে'র সব উপদেশগুলিই তাই। বিষয়ের নেশা এমনি সাধারণ নেশা। প্রেম হ'লে সব ভুল হ'য়ে যাবে। তখন সংসারের

* রাঁচিতে ১০-৯-৫৭ তারিখে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীশচীন্দ্র নাথ শীল কর্তৃক অনুলিখিত।

নেশা আলুনী বোধ হবে। তাঁর প্রতি অনুরাগ এলে, রাগাত্মিকা ভক্তি এলে নেশায় ভরপুর ; সব একাকার। এটি দেখতে পাওয়া যায় রাস-মণ্ডলে, সেখানে 'বেদান্ত-সিদ্ধান্তো নৃত্যতি'।

একি একবারে হয়—ধাপে ধাপে এগোতে হবে। লক্ষ্য ঠিক রেখে এগোতে হয়। মীরার সব গানে একই কথা—'দুসরা না কোই।' ভজন পূজন যা কিছু, সব সেই তার প্রেমাস্পদ গিরিধারী—গানে, প্রাণে ও ধ্যানে।

তাই বলি তাঁকে ভালবাসতে চেষ্টা কর। ভাবো, 'দুসরা না কোই'। চঞ্চল মনকে ঠিক রাখার জন্য সময় সময় সাধু-সঙ্গ করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, মন-ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয় সাধু-সঙ্গ ক'রে। মনের স্লো-ফাস্ট বিবেক মিলিয়ে দেবে। এমনি ক'রে ভালবাসা যেমন জমাট বাঁধবে, কর্মও এক-একটি ক'রে ত্যাগ হ'য়ে যাবে।

ফল-ভারে গাছ নীচু হ'য়ে যায়। সাধন ভজন করলে মানুষও নত হ'য়ে যায়। ঠিক ভক্তি-ভাব এলে উপদেশও ঠিক ঠিক ধারণা হয়। এ যেন ফটোর কাঁচ। নির্দিষ্ট কালি (Silver Nitrate) না মাখানো থাকলে ছবি ধরে না। ভক্তি-মসলা মনে মাখানো না থাকলে যা শুনবে তা ধারণা হবে না।

ভালবাসা ও অনুরাগ যখন আসবে, তখন সাধনভজন সোজা হ'য়ে যাবে। বিধি-নিষেধের বেড়া আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে। মাঠে যখন ধান থাকে, তখন ওপারে যেতে হয় আল দিয়ে ঘুরে ঘুরে। সেই ধান কাটা হ'লে সোজা যাওয়া যায়। রাগাত্মিকা ভক্তি এলে বৈধী ভক্তি চলে যায়, দরকার হয় না বলে। তখন ভগবান ভক্তকে আকর্ষণ করেন। বৈধী ভক্তি দিয়ে ছুঁচের কাদা ধুয়ে যাওয়ায় ভগবান চুম্বক হ'য়ে আকর্ষণ ক'রে টেনে নেন। ভক্ত যেন ছুঁচ। ভক্ত ভগবানকে লাভ ক'রে আত্মজ্ঞানী হয়। এ বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবস্থা। ঐ সময় সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হ'য়ে রজ ও তম গুণকে আবরণ ক'রে রাখে। 'স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ'—এ অবস্থায় শুধু শান্তি বা প্রশান্তি, মন একেবারে পরমা প্রশান্তিতে ভরে যায়। সবই মনে, মন মুক্ত করে, আবার মনই বদ্ধ করে। মনটাকে সোনা ক'রে নাও। প্রেম লাভ কর—প্রেমিক হও। ভেতরেই যমুনা দেখতে পাবে। তার কূলে কূলে কৃষ্ণলীলা লীলায়িত দেখবে।

আবার বলি—বিশ্বাস ক'রে এগোও। বিশ্বাসই সব, বিশ্বাসই আসল জিনিস। ঠাকুর কত বলেছেন এ-সম্বন্ধে! তাঁর কী বিশ্বাস ছিল শোন। দক্ষিণেশ্বরে ছোট খাটটিতে একদিন বসে আছেন; বসে বসে এই গানটি গাইছেন :

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী॥

এই বিশ্বাস নিয়ে ভেতরে যখন তাঁতে ডুবে যাবে, তখন দেখবে এক অবিরাম আনন্দ-রসের ক্ষরণ হচ্ছে, আর তোমার মন তৃপ্তির সঙ্গে তা সর্বদা পান করছে।

তাই বলি, জেনে নিয়ে বসে পড়। মাছ ধরতে যদি চাও, যে মাছ ধরতে জানে তার কাছে যাও। কেমন ক'রে চার ফেলতে হয়, কখন কি করতে হয়, তা জেনে তবে বসতে হয়। সাধন-ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। গুরুই পথ দেখিয়ে দেন। গুরু-বাক্যে বিশ্বাস রেখে এগোতে হয়। ঠাকুর বলতেন, হৃদয় ডঙ্কা মারা স্থান। হৃদয়ে প্রেমময়কে বসাও। হৃদয়ে তাঁকে স্মরণ কর। তাঁর দিকে মনকে নিয়ে যাও। তাঁর চিন্তায় মগ্ন হও। তাঁর বিষয় চিন্তাই সজাতীয়

চিন্তা, আর বাকী সব বিজাতীয় চিন্তা। মন উভয়বাহী। সজাতীয় চিন্তা ও বিজাতীয় চিন্তা নদীর জোয়ার-ভাটার মত দুই প্রবাহ। একটি প্রবাহ তুললে অপরটি যায় থেমে। সজাতীয় চিন্তা করতে এমন অবস্থা আসে, যখন আর বিজাতীয় চিন্তা মনে স্থান পায় না। চিন্তা তখন একমুখী—জোয়ারের পর প্লাবন আসে। এই সময় নদীকে আর এঁকে বেঁকে চলতে হয় না। স্রোত সোজা হয়ে যায়। শুদ্ধা ভক্তি, নিষ্কাম ভক্তি এলে প্রেমের প্লাবন বয়; যেমন গোপীদের হয়েছিল। আবার উর্জিতা ভক্তি এলে সাধক সব প্রেমময় দেখে। বন দেখে মনে হয় বৃন্দাবন, সমুদ্র দেখে মনে হয় যমুনা। আর বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে—যমুনার কূলে কূলে কৃষ্ণলীলা। তখন শুধু ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—প্রেমাস্পদের শ্রীচরণে সব ভালবাসা উজাড় ক'রে দেওয়া।

আবার প্রহ্লাদকে দেখ, কী তার ভক্তি! শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে যখন বালক প্রহ্লাদকে বাৎসল্যভাবে বর দিতে চাহিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিলেন, 'হে নাথ! কি আর চাইব? সব যে ভরিয়ে রেখেছ তুমি। অবিবেকী মানুষ বিষয়ের প্রতি যে প্রীতি ও ভালবাসা দেয়—সেই প্রীতি, সেই ভালবাসা যেন তোমার প্রতি আমার হয়—এই টানটুকু যেন চির অটুট থাকে।' নেওয়া নয়, শুধু দেওয়া—এই হ'ল প্রেম, অহৈতুকী প্রেম।

'আমি তোমার, তুমি আমার'—এই অবস্থায় হয় আত্মসমর্পণ। তখনই তিনি কৃপা করেন। এক পা এগোলে তিনি একশ' পা এগিয়ে আসেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন—একজন গুরু, একজন শিষ্য। গুরু শিষ্যের সদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগ সম্বন্ধে সমস্ত উপদেশ দিলেন প্রথমে। তারপর যোগ্য ও প্রিয় শিষ্যকে তার মঙ্গলের জন্য গুহ্য বিষয় অযাচিত ভাবে বলছেন:

হে অর্জুন ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য—সব কিছু ত্যাগ কর, আর আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। ঠাকুরের কথায়, 'ব-কলমা দাও'। শ্রীকৃষ্ণ আরো বলছেন: এই সকল ত্যাগ করার জন্য দুঃখ পেয়ো না; আমার শরণাগতকে আমি সব পাপ থেকে মুক্ত ক'রব। যা কিছু ময়লা, সব ধুয়ে মুছে সাফ করে নেবো। ঠিক যেন শিশু ও মা। মা ছাড়া শিশু কিছু জানে না, নির্ভরশীল; তাই সব সাফ ক'রে শিশুকে মা কোলে তুলে নেন। মায়ার ঠুলি চোখে পরাতেও তিনি, খুলতেও তিনি। তাই রামপ্রসাদ মাকে বলছেন:

'খুলে দে মা চোখের ঠুলি
হেরি গো তোর অভয়-পদ।'

তিনি খুলে না দিলে, তিনি কৃপা না করলে কিছু হবে না। পূর্ণ নির্ভরতা করলে তিনি কৃপা করবেনই। এ কথা তিনি বার বার বলেছেন। গীতামুখে তিনি প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত ক'রে গেছেন, 'মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'। শরণাগতির কথা যুগে যুগে তিনি বলেছেন, দু-হাজার বছর আগে প্রভু যীশু ব'লে গেছেন, 'আমার কাছে এস, ভারাক্রান্ত যারা; আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো'। ঠাকুরের কথাও তাই। তিনি বলতেন—ঝড়ের এঁটো পাতার মতো থাকবে। যখন যেখানে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন সেখানে থাকবে। বেড়াল ছানার মতো থাকবে। কী সুন্দর দৃষ্টান্তগুলি! আত্ম-সমর্পণের কি উপমা!

তাই বলি, নিজের সত্তাকে আর আলাদা ক'রে রেখো না। ঠাকুরের কথায়, 'কাঁচা আমি'কে শেষ কর। আম্মোক্তারনামা দাও তাঁকে। আত্ম-নিবেদন কর। তাঁর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে প্রেমিক হও, প্রেমাভক্তি দিয়ে প্রেমময়কে লাভ কর॥

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[বনগমন ও ভরতমিলন]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

বাল্মীকি রামের বনগমনের দুইটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। একটি চিত্রে রাম লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিয়া বনে যাইতেছেন—এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। তাঁহার উদ্বেগশূন্য কিশোর-হৃদয়ে অদম্য কৌতূহল, অসীম উৎসাহ—আনন্দ। বিশ্বামিত্রের কার্যোদ্ধার সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নাই। তিনি অমিতপরাক্রমশালী, রাক্ষস-নিধন তাঁহার নিকট কঠিন নহে। দ্বিতীয় চিত্রে বন-গমনের পটভূমিকা অন্যরূপ। পিতৃসত্য রক্ষার্থে দীর্ঘকালের জন্য রাম বনে যাইতেছেন। সঙ্গে চলিয়াছেন লক্ষ্মণ ব্যতীত রঘুকুলবধূ সীতা,—আবাল্য যিনি রাজৈশ্বর্যে প্রতিপালিতা। শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতা ও জননীর করুণ আর্তনাদে সমগ্র অযোধ্যাবাসীর আকুল ক্রন্দনে রামচন্দ্রের কোমল চিত্ত ব্যথিত।

প্রজাবর্গের অনেকেই রামচন্দ্রের রথের দ্রুত অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাহাদের ব্যাকুলতা দর্শনে অবশেষে রাম রথ হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলেই তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হইলে বনবাসের প্রথম রজনী সেই নির্জন নদীতীরে যাপিত হইল। অর্ধরাত্রে ক্লান্ত প্রজাবর্গ যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন সেই অবকাশে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা সহ রথে আরোহণ করিয়া তমসা উত্তীর্ণ হইলেন। রাত্রিকালেই বহুপথ অতিক্রান্ত হইল। রামের বনগমন-বার্তা অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, কারণ পরদিবস কোশলপ্রদেশ অতিক্রম-কালে দশরথ ও কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে বহু কঠোর সমালোচনা ও মন্তব্য তাঁহারা শ্রবণ করিলেন। পথিমধ্যে প্রথমে তাঁহারা শ্রীমতী ও পরে বেদশ্রুতি নামক রম্যাবর্তশালিনী মহানদী উত্তীর্ণ হইলেন। অগস্ত্য-সেবিত দক্ষিণ দিক তাঁহাদের যাত্রার লক্ষ্যস্থল—

'ততো বেদশ্রুতিংনাম শিবাবর্তাং মহানদীম্।
উত্তীর্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতম্ দিশম্॥'

'অগস্ত্যাধ্যুষিতম্' কথাটি প্রমাণ করে অগস্ত্য পূর্বেই দক্ষিণ দেশে বসবাস করেন। তিনিই তথায় আর্য সভ্যতার প্রথম প্রচারক। ক্রমে তাঁহারা গোমতী ও সর্পিকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন। শীতাবসানে নদীগুলি অগভীর, সুতরাং রথে করিয়াই পার হইয়া সায়াহ্নে তাঁহারা বিশাল শৃঙ্গবেরপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্মুখে তরঙ্গসঙ্কুল ভাগীরথী। নদীতীরে ইঙ্গুদী-বৃক্ষতলে রাত্রির বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। রামের আগমন-বার্তা জানিতে পারিয়া নিষাদরাজ গুহ রাজোচিত উপহার লইয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিলেন। গুহের সহিত পূর্ব হইতেই রামচন্দ্রের সখ্যতা। তিনি মধুর সম্ভাষণে গুহকে তুষ্ট করিলেন, কিন্তু গুহ-প্রদত্ত কোন সৎকার গ্রহণ করিলেন না, কারণ তিনি বনবাসী। পরদিন সারথি সুমন্ত্র ও গুহকে বিদায় দিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা নৌকায় আরোহণ করিলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সুমন্ত্র ও গুহ চিত্রার্পিতের ন্যায় নদীতীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিয়া তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ রাত্রে এক বট-বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে দশরথ ও কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে অভিমান প্রকাশ-পূর্বক বহু বিলাপ করিলেন। সাধারণ মানবের ন্যায় রামের ঐ সকল বিলাপোক্তি প্রকৃতই

বিস্ময়কর। একমাত্র তিনিই এ পর্যন্ত দশরথ অথবা কৈকেয়ীর উদ্দেশ্যে কোন অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মহৎ ধৈর্যশীল চরিত্রে এই সকল উক্তি অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং রামায়ণের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত কিনা বিচার্য। অথবা সেই গভীর রাত্রে অরণ্য-মধ্যে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষণকালের জন্য কি তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন? বিশেষতঃ রাজনন্দিনী রাজবধূ সীতার এ ভাবে রাত্রি যাপন—নিশ্চিত তাঁহার নিকট বিশেষ ক্লেশকর হইয়াছিল। গুহ ও সুমন্ত্রের নিকট বিদায় লইয়া ভাগীরথীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হইয়া অরণ্যাভিমুখে যাত্রাকালে রাম বলিয়াছিলেন :

অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু।
পৃষ্ঠতোঽহং গমিষ্যামি ত্বাঞ্চ সীতাঞ্চ পালয়ন্॥
অদ্য দুঃখন্তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি।
সিংহব্যাঘ্রবরাহাণাং নিনাদং প্রসহিষ্যতি॥

—হে সৌমিত্রে, তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন। আমি তোমাকে ও সীতাকে রক্ষা করিয়া সর্বপশ্চাৎ গমন করিব। বনবাসের দুঃখ বৈদেহী অদ্যই উপলব্ধি করিবেন; সিংহ ব্যাঘ্র ও বরাহের ভীষণ ধ্বনিও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে ঐদিন হইতেই তাঁহাদের বনবাসের আরম্ভ। আকস্মিক ভাগ্য-বিপর্যয় স্মরণে সাময়িকভাবে অভিভূত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে নিজেকে সংবরণ করিয়া রামচন্দ্র বলেন, শোকহেতু তিনি ধৈর্যচ্যুত হইয়াছিলেন। অন্যান্য অবতারের জীবনেও ঐরূপ সাময়িক শোকবিহ্বলতা দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ দিবসে তাঁহারা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থল প্রয়াগে উপনীত হইলেন। স্থানটি বিশাল, নির্জন, রমণীয় ও তপস্বিগণ-সেবিত। অদূরে ভরদ্বাজের আশ্রম। ভরদ্বাজ রামের বনাগমন-বার্তা পূর্বেই জানিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাম তাঁহাদের সহিত ঐ তপোবনে বাস করেন। রামের অভিপ্রায়, অযোধ্যা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিবেন। ভরদ্বাজ তখন দশক্রোশ দূরে অবস্থিত চিত্রকূট পর্বতের সন্ধান দিলেন। ভরদ্বাজ-আশ্রমে ঋষিগণের সহিত ঐ রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন বেলায় যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর ষষ্ঠ দিবসে তাঁহারা মন্দাকিনী-তীরে বিচিত্র পাদপ-শোভিত রম্যকাননবিশিষ্ট চিত্রকূট পর্বতে উপনীত হইলেন।

তখন শীতাবসানে বসন্ত-সমাগমে চিত্রকূট পর্বতের শোভা অতি রমণীয়। পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ বিহঙ্গম-শব্দ-মুখরিত, লতাবিতান-সমাচ্ছাদিত শিলাতল, নিভৃত গিরিকন্দর, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি, ইতস্ততঃ বিচরণশীল মৃগকুল, হংস-সারস-সেবিত মন্দাকিনী—সমস্তই মনোমুগ্ধকর। মন্দাকিনীতীরে দুইটি পর্ণকুটির নির্মিত হইল। রাজ্য পরিত্যাগের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষোভ না রাখিয়া, সেই রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম মহানন্দে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

*　　*　　*

অযোধ্যাকাণ্ডের শেষ চিত্র রামের সহিত ভরতের মিলন। উদারচরিত্র ভরত রামের চির অনুগত। তাঁহার প্রীতি-সাধন আকাঙ্ক্ষায় কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহার মর্মবিদ্ধ করিয়াছিল। অযোধ্যায় আসিয়া জননীর মুখে দশরথের মৃত্যু ও রামের বনগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখে শোকে অভিভূত হইয়া তিনি জননীকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া অভিশাপ

প্রদান করিয়াছিলেন। সংকল্প স্থির করিতেও তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। নৃপতির মৃতদেহের সংকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে সভাসমক্ষে মন্ত্রিগণ কর্তৃক রাজ্যভার গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়া ভরত দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, 'যন্মে মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদভিরোচয়ে'—আমার জননীর পাপকার্য আমার অভিমত নহে। জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী। অন্যায়-পূর্বক তাঁহাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া আমি কি রাজ্যাপহারক হইব? তাঁহার সংকল্প—রাজ্যাভিষেকের সমগ্র আয়োজন সঙ্গে লইয়া, তিনি বনে গমন করিয়া সেখানেই রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন এবং রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়া তিনি স্বয়ং বনবাসী হইবেন।

অমাত্যবর্গ ও সৈন্যবাহিনী সহ ভরতের গমনোপযোগী পথ প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অগ্রে প্রেরিত হইলেন: যাহারা ভূমির বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন সেই ভূমিপ্রদেশজ্ঞগণ, সূত্রকর্মবিশারদ অর্থাৎ মার্গরক্ষণাদি কর্মে রত পৌরগণ, সুরঙ্গাদি-খননে নিপুণ ব্যক্তিগণ, পথিমধ্যে নদনদী উত্তীর্ণ হইবার আবশ্যক হইলে যাহারা তৎক্ষণাৎ নৌকাদি নির্মাণ করিতে পারে সেই যন্ত্রকগণ, শিল্পিগণ, মার্গবিৎ পুরুষগণ, যে সকল ব্যক্তি পথ সমতল করিতে সমর্থ তাহারা, সভাগৃহ নির্মাণ-কারকগণ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যে পারদর্শী ব্যক্তিগণ। পথ প্রস্তুতের আয়োজন দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায়, তদানীন্তন ব্যবস্থা কতদূর উন্নত ছিল।

শীঘ্রই অযোধ্যা হইতে জাহ্নবীতীর পর্যন্ত প্রস্তুত বিস্তৃত পথ ধ্বজাপতাকা ও কলসদ্বারা সুশোভিত হইলে ভরত ও শত্রুঘ্ন, মাতৃগণ, অমাত্যগণ ও সৈন্যসমভিব্যাহারে রামের অনু-সন্ধানে যাত্রা করিলেন। রামচন্দ্র যে পথে উপনীত হইয়াছিলেন, ভরত ঠিক সেই পথেই ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইয়া গুহের সাহায্যে নদী উত্তীর্ণ হন; পরে প্রয়াগে ভরদ্বাজের নিকট পথের সন্ধান লাভ করিয়া চিত্রকূটে উপনীত হইলেন।

দূর হইতে সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণে রাম উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে উহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলে লক্ষ্মণ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া পতাকা প্রভৃতি দর্শনে বুঝিলেন, উহা ভরতের সৈন্যবাহিনী। ভরতের জন্য রামচন্দ্র রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সেজন্য পূর্ব হইতেই লক্ষ্মণের চিত্ত ভরতের প্রতি বিমুখ ছিল, সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি রামের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন:

সপত্নো রাজ্যকামোঽয়ং ব্যক্তং রাজ্যেঽভিষেচিতে।
আবাং হন্তুমিহাভ্যেতি ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ॥

—নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু রাজ্যাভিলাষী কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার নিমিত্ত আমাদের হত্যা করিতে আসিয়াছে।

ভাগীরথীতীরে সুসজ্জিত সৈন্যসহ ভরতকে দেখিয়া নিষদরাজ গুহ অনুরূপভাবেই ভরতের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ ঋষি ভরদ্বাজও সৈন্যসহ ভরতের আগমন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। রামচন্দ্র কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও ভরতের প্রতি স্নেহশূন্য অথবা সন্দিগ্ধচিত্ত হন নাই।

লক্ষ্মণের ক্রোধপূর্ণ উক্তির উত্তরে তিনি বিচলিত না হইয়া প্রশান্ত স্বরে বলিলেন:

যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচঃ প্রভাষসে।
বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্॥
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তত্ত্বতঃ।
রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢ়মিত্যেব বক্ষ্যতি॥

—যদি তুমি রাজ্যের নিমিত্ত এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক, তবে ভরতকে দেখিবা-মাত্র আমি বলিব, লক্ষ্মণকে রাজ্য প্রদান কর। আর লক্ষ্মণ! আমি জানি, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভরত তৎক্ষণাৎ আমার আদেশ পালন করিবে। রামের উত্তরে লজ্জিত লক্ষ্মণ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

শীঘ্রই ভরত পর্ণশালায় সমাসীন, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্, কৃষ্ণাজিন ও জটাবল্কলধারী সেই রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন—

'তন্তু কৃষ্ণাজিনধরং জটিলং চীরবাসসম্।
দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোজ্জ্বলম্ ॥'

রাম ও ভরতের মিলন ও সংলাপ অপূর্ব। ভরতকে সাদরে গ্রহণ করিয়া রাম প্রথমেই তাঁহার কুশল-প্রশ্ন করিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে ভরত রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন,

প্রোষিতে ময়ি যন্মাত্রা পাপং মৎকারণাৎ কৃতম্।
ক্ষুদ্রয়া ন তদিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম ॥

—আমার প্রবাসে থাকাকালে আমারই নিমিত্ত আমার ক্ষুদ্রহৃদয়া জননীকৃত যে পাপানুষ্ঠান, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীরামচন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভরত স্বয়ং বনবাসে অভিলাষী। সত্যভ্রষ্ট হইয়া রাজ্য-ভার গ্রহণে রামচন্দ্র একান্ত অসম্মত। সত্য-সঙ্কল্প রামচন্দ্র যেমন অনায়াসে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার পুনর্গ্রহণে অপারগ, ভরতও তেমনই এই ভাবে লব্ধ রাজ্যভার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে দৃঢ়সংকল্প। উভয় চরিত্রই মহৎ ও বিস্ময়কর!—পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। রাজ্য ও ঐশ্বর্যলাভের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের শেষ নাই। নিষ্ঠুর হত্যা ও প্রতারণার কলঙ্কে ইতিহাসের কত পৃষ্ঠাই না কলঙ্কিত! এই ভারতবর্ষেই কৌরব-বংশ ধ্বংস হওয়ার মূলে ছিল রাজ্যলোলুপতা। রাজ্য লাভের জন্য বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী ও ভ্রাতৃগণকে নিহত করিবার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। যেখানে রাজ্য বা সম্পদ লাভই জীবনের চরম প্রাপ্তি, সেখানে নীতিবোধ ও মানবতার স্থান নাই; হৃদয়বৃত্তি উপেক্ষিত। কৈকেয়ীও তো সেই রাজ্য-লোভেই দশরথের নিকট এমন বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি চির-নিন্দিতা। কিন্তু এই ভারতবর্ষই আবার শিক্ষা দিয়াছে রাজৈশ্বর্যকে তুচ্ছ করিতে। পরম সত্যকে স্থান দিয়েছে সকলের ঊর্ধ্বে। ভরতের বারংবার অনুরোধে রামচন্দ্র বলিলেন:

রাজবৃত্তং কিল লোকঃ কৃৎস্নঃ সমনুবর্ততে।
যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তা সন্তি মানবাঃ ॥

—সমগ্র প্রজাবর্গ রাজার চরিত্রের অনুবর্তন করে, প্রজাগণ রাজার আচরণই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং রাজ্যগ্রহণ করিয়া তিনি কিরূপে সত্যভ্রষ্ট হইবেন? সত্য এবং সর্বভূতে অনুকম্পাই রাজধর্ম। রাজ্য সত্যের উপরেই, প্রতিষ্ঠিত। 'সত্যমূলানি সর্বাণি, সত্যান্নাস্ত্যপরং তপঃ'—সমস্তই সত্যমূলক; সত্য ভিন্ন অপর তপস্যা নাই। সত্যই প্রত্যক্ষ ধর্ম। সত্যধর্মই শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। রামাবতারে সত্য-ধর্মের বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

রাজ্যগ্রহণে কোনপ্রকারে রামকে সম্মত করিতে না পারিয়া ভরত অবশেষে রামের সমক্ষে প্রত্যুপবেশন করিলেন। প্রত্যুপবেশনের অর্থ—কাহাকেও কোন কার্যে বাধ্য করিবার জন্য তাহার গৃহদ্বার-সমীপে কার্যসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অনশন-ব্রতের

সহিত আমরা পরিচিত। কেহ কেহ ঐ সংকল্প করিয়া শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও বরণ করিয়াছেন। দেশের চরম সঙ্কটকালে যাহা মহৎ উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহার অপপ্রয়োগ পরবর্তীকালে বহুবার ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। উদ্দেশ্য অভিসন্ধিমূলক প্রতিপন্ন হইলে মহৎ উপায়ও হীনতা প্রাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র ভরতের প্রত্যুপবেশন অনুমোদন করিলেন না, কারণ ক্ষত্রিয়ের উহাতে অধিকার নাই। তাঁহাকে কোনরূপে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া রামচন্দ্র অবশেষে বলিলেন, 'ন চ ত্বাম-ভিভাষেয়ং যদ্যযোধ্যাং ন গচ্ছসি'—আমি দিব্য করিতেছি, তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরিয়া না যাও, তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব না। তখন ভরত অশ্রু সংবরণ করিয়া করযোড়ে বলিলেন :

অলং শপ্তেন যাস্যামি যদ্যেবং পরিতপ্যসে।
অহং হি জীবিতেনাপি প্রিয়ং কুর্যাং তব প্রভো॥

—দিব্য দিবার প্রয়োজন নাই। যদি আপনি এইরূপ পরিতাপ অনুভব করেন, তবে আমি চলিয়া যাইব। হে প্রভো, জীবন দান করিয়াও আমি আপনার প্রিয় কার্য সাধন করিতে প্রস্তুত।

ভরতের নিকট রামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন, চতুর্দশ বৎসরান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।

ভরত যখন সৈন্যসামন্তসহ প্রস্থানোদ্যত, তখন শরভঙ্গ নামক ঋষির শিষ্যগণ রামচন্দ্রের জন্য উপহারস্বরূপ কুশপাদুকাদ্বয় লইয়া আগমন করিলেন। বশিষ্ঠের নির্দেশে ভরত সেই পাদুকা-দ্বয় রামচন্দ্রকে পরিধান করাইয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাম-বিরহিত অযোধ্যায় বাস তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অযোধ্যা প্রবেশের পথে নন্দি-গ্রামে রাজধানী স্থাপনপূর্বক সিংহাসনে রামের পাদুকাদ্বয় অভিষিক্ত করিয়া ভরত নিজেই তাহার উপর রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন। এই ভাবেই সেই মহাত্মা ভরত রামের প্রত্যাগমন পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

বিজন-সাথী

'অনিরুদ্ধ'

সকল আলো নিভিয়া যদি যায়
প্রদীপ তার জলিয়া উঠে ধীরে,
সকল ছবি বিলোপ যবে পায়
মূরতি তার ভাসে নয়ন-নীরে।

সকল ডাক যখন আসে থামি
মনের রহে নীরব অবসর,
আড়াল হতে তখনি সে তো নামি
দাঁড়ায় হাসি হৃদয়-গুহাচর।

সকল চাওয়া ভুলিতে যদি পারি
চকিতে পাই তাহারে অযাচিত,
বিভব যার দৈন্য-গ্লানিহারী
অন্তহীন সকল সীমাতীত।

সকল ভয় নিমেষে যায় টুটি
ঝলকে তার অভয় রূপ যবে,
পরম প্রেম কমল হ'য়ে ফুটি
ঘুচায়ে দেয় বাঁধন যত ভবে।

মুছিয়া যায় যতেক ব্যথা মোহ
নিবিড় প্রাণ মিলনে রয় মাতি,
নাহিরে প্রিয় এমন আর কেহ
জীবনে চির জাগে বিজন-সাথী।

রবীন্দ্র-মন ও মানব-ধর্ম

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল নাথ

॥ এক ॥

রবীন্দ্র-মনের এক বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে 'মানুষের ধর্ম' উপলব্ধিতে। মানবজীবন-জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্র-মনের ব্যাপ্তি কত উদার, তারও বিশিষ্ট পরিচয় তাঁর এই মানব-ধর্মবোধ। কবির বোধির (intuition) সঙ্গে মনীষীর বোধের (intellect) এক অপরূপ সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের এই ধর্মানুভূতি। এই প্রসারিত ধর্মচেতনা রবীন্দ্র-মনকে উধ্বর্মুখী করেছিল তাঁর সীমাবদ্ধ জীবন-বৃত্ত হ'তে ব্যাপক বিশ্ববোধের ক্ষেত্রে। সেই সীমাতিক্রান্ত মনের স্বাক্ষর তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও কর্মপ্রচেষ্টা।

সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সেই সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্দির থেকে সেই বিশিষ্ট ধর্মাদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি বহুসংখ্যক ভাষণে। আর জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র অক্সফোর্ডে ব্যাখ্যা করলেন তিনি 'মানুষের ধর্ম' বা Religion of Man. সে ১৯৩০ খৃঃ কথা। কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা ও জীবনবোধের ফসল অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে প্রদত্ত এই 'হিবার্ট বক্তৃতামালা'। অহং-বাদী উগ্র স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ পাশ্চাত্য দেশবাসীর কানে এবং মনে তিনি উদার মানবতাবোধের মন্ত্র দিলেন এই বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে। মহা উৎসাহে অভ্যর্থিত হ'ল সে মানবমাহাত্ম্য-বোধের উদার অনুভূতি-নির্ভর বাণী জড়-সভ্যতাধর্মী পাশ্চাত্য দেশে। হিবার্ট বক্তৃতামালা শেষ হ'ল; কিন্তু রবীন্দ্রমনে এই ধর্মবোধ যে গভীর সুরের অনুরণন তুলেছিল, তা যেন সুযোগ খুঁজতে লাগল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবার জন্য। সুযোগও জুটে গেল মাত্র তিন বৎসর পরে, যখন ১৯৩৩ খৃঃ জানুআরি মাসে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হলেন 'কমলা বক্তৃতামালা' দেবার জন্যে। এই বক্তৃতায় তিন পর্যায়ে তিনি স্বদেশবাসীকেও শোনালেন 'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁর উদার উপলব্ধির কথা। হিবার্ট লেকচারস্ ও কমলা লেকচারস্ পরস্পরের পরিপূরক; এই উভয় বক্তৃতায় অনুস্যূত হ'য়ে আছে 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পরিণত ধর্মবোধ।

মানবধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কি, সে সম্পর্কে আলোচনা আগে প্রয়োজন। 'Religion of Man' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ 'ধর্মের' অর্থ সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে বিশেষ মতবাদ বা ক্রিয়াকাণ্ড; এ ছাড়া ইহলোক, পরলোক, আত্মা, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি বহু বিষয় জড়িত থাকায় ধর্ম-বস্তুটি যুগে যুগে সকল দেশের মানুষের কাছে একটি জটিল ব্যাপার ব'লে মনে হয়েছে। ধর্ম কি কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের ধর্মশাস্ত্র মাত্র? তাই যদি হ'ত, তাহলে ধর্মের কোন সর্বজনীন আবেদন থাকত না। আসলে ধর্মের অর্থ বিচিত্র। 'ধর্মশাস্ত্রে'র প্রকৃত অর্থ হ'ল 'Code of laws or conduct'—যে সমস্ত নিয়ম ও সদাচার মানব সমাজকে ধারণ ক'রে আছে তাই হ'ল ধর্ম। এ ছাড়া ধর্মের একটা সাধারণ অর্থ আছে, যে অর্থে বুঝায় বস্তুর গুণ—যেমন জল বা অগ্নির ধর্ম শীতলতা বা উষ্ণতা। এ ছাড়া

'বিশেষ' ধর্মও আছে—যেমন রাজার ধর্ম, প্রজার ধর্ম, সর্পের ধর্ম, ব্যাঘ্রের ধর্ম। কিন্তু নির্বিশেষ নৈর্ব্যক্তিক মানুষের কোন সাধারণ ধর্ম আছে কিনা, 'Religion of Man' গ্রন্থে তাই হ'ল কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসার বিষয়।

ব্যক্তি- সম্প্রদায়- বা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ ব্যষ্টি-মানবের ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ সম্পর্কে নিজের মননজাত অভিজ্ঞতা ও স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'Religion of Man' ও 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থদ্বয়ে। এই উভয় গ্রন্থের বক্তব্য প্রায় এক ব'লে মানবধর্ম বিশ্লেষণে আমাদের আলোচনার ভিত্তি হ'ল 'মানুষের ধর্ম' নামক গ্রন্থখানি।

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় মানব-মনের দুটি সুস্পষ্ট প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ: এক প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ শুধু নিজের সংকীর্ণ বিষয়বুদ্ধি, নিজের স্বার্থবোধ নিয়েই বাঁচতে চায়। মানুষের এই প্রবৃত্তিকে বলা চলে জীবভাব। কিন্তু এই মানুষের জীবনেই আর একটা দিক আছে—'যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবন-যাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি, তাই লাভ; যাকে বলি মৃত্যু, সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন, সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।'

বর্তমান জীবনের সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনবোধকে অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের বিশ্বমানবের আদর্শ-লাভের অভিমুখিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বিশ্বভাব। জীবভাবকে অতিক্রমণের মধ্য দিয়েই মানব-অন্তরে বিশ্বভাবের সূচনা। এই বিশ্বভাবের সাধনাই মনুষ্যত্বের সাধনা। এ তপস্যা কঠোরের তপস্যা। এই তপস্যার সিদ্ধিতে যে দুর্লভ ধর্মলাভ হয়, তাকে বলা চলে 'মানবধর্ম'।

মানুষের অন্তরে এই জীবভাব ও বিশ্বভাব দুই-ই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। তপস্যার দ্বারা জীবভাবকে অবদমিত ক'রে জীবন ও মনে বিশ্বভাবকে বিমূর্ত ক'রে তোলাতেই মানুষত্বের প্রকৃত পরিচয়। এই সাধনাই সাধারণ মানুষকে ক্রমশঃ এনে দেয় 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানবে'র সান্নিধ্যে। —'তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, ভাবে, কর্মে, সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে এই উত্তরণ-প্রক্রিয়া সহজসাধ্য নয়, এই প্রক্রিয়া অনুশীলন-সাপেক্ষ। বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগেও এই বিশ্বমানবের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ, তাই 'মানুষ আজও মানুষ হয়নি'। তা হলেও আশার কথা এই যে, এই অসম্পূর্ণ মানুষও বিশ্বভাবের ও বিশ্বমনের আকর্ষণ নিত্য নিয়ত অনুভব করছে। এই জন্যই 'আত্মপ্রকাশের প্রত্যাশায় ও প্রয়াসে মানুষ কোথাও সীমাকে স্বীকার করছে না। সেই পূর্ণ মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাকেই বলেছে—এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছে:

স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

'সেই মানব সেই দেবতা,···যিনি এক'—তাঁর পরিচয়কে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ·মানবধর্ম-আলোচনায়। এখন রবীন্দ্র-মনের এই উদার উপলব্ধির বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

॥ দুই ॥

অভিব্যক্তি-ধারায় চতুষ্পদ প্রাণী যতদিন দ্বিপদ মানুষে পরিণত হয়নি, ততদিন তার প্রয়োজন-বোধ ছিল দেহের সীমায় আবদ্ধ। মনের বিকাশ তখনও হয়নি, জৈবিক প্রয়োজনের বাইরে তার গতিবিধি ছিল না। মনের বিকাশ হ'ল তখন, যখন চতুষ্পদ প্রাণী দ্বিপদ মানুষে পরিণত হ'ল। তার প্রয়োজনের সীমাও তখন প্রসারিত হ'ল। শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সে তৃপ্ত থাকতে পারল না, মনের তৃপ্তির জন্য সে চাইল আরও কিছু। পশুর মধ্যে দেখা যেত সাধারণতঃ খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রবল প্রতিযোগিতা, আর মনের অধিকারী মানুষের মধ্যে দেখা গেল একের সঙ্গে অপরের সহযোগিতা।—'মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ।'

ব্যক্তিমন এভাবে বিশ্বমনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ক্রমশঃ ব্যাকুল হ'ল। সে বুঝতে পারল 'জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয়, ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।' সকলের সঙ্গে এই যোগযুক্ত মনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সর্বজনীন মন'।—'এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ ক'রে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ।' এই অভিব্যক্তির ফলেই মানুষ নিজের পরিবেশের সংকীর্ণ সীমানা অস্বীকার করেছে, আর নিযুক্ত করেছে নিজেকে 'বৃহৎ মানুষে'র সাধনায়। 'এই বৃহৎ মানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।'

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই নির্বিশেষ মানবের ঐক্য-উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রকৃত সত্য-উপলব্ধি। এই সত্যকে বলা চলে মানব-সত্য। মানবসত্যের শ্রেষ্ঠ তাৎপর্য হ'ল—সংকীর্ণ ব্যক্তিসত্তা, প্রত্যক্ষ বর্তমান ও দেশসীমাকে অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের সর্বদেশের মানবমনের সঙ্গে সহজ আনন্দের যোগ স্থাপন। মানুষ 'যে পরিমাণে...এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে,—মানবসত্য থেকে সেই পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই পরিমাণে সে বর্বর।'

আত্মগত আত্মসম্পূর্ণ জীবন-প্রচেষ্টায় মানুষ পশুধর্মী; আর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির ঔৎসুক্যের মধ্য দিয়ে তার মানব ধর্মের উন্মেষ। এই পশুধর্মের আত্মমগ্নতার সঙ্গে মানবধর্মের উন্মুক্ত প্রসারের ভেদরেখা চিহ্নিত করেছেন 'মননধর্মী কবি ও কবিধর্মী মনীষী'[১] রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে, প্রাণী-জগৎকে তুলনা করেছেন একটি চলমান রেলগাড়ীর কামরার দুই শ্রেণীর যাত্রীর সঙ্গে। এক কামরার যাত্রী জন্তু, আর এক কামরার যাত্রী মানুষ।—'এ গাড়ী সংকীর্ণ লক্ষ্যপথে বাঁধা রাস্তায় চলে। জন্তুর মাথাটা গাড়ীর নিম্নতলের সমরেখায়। গাড়ীর সীমানার মধ্যে তার আহার-বিহারের সন্ধান চলছে নীচের দিকে ঝুঁকে। ঐটুকুর মধ্যে বাধা বিপত্তি, যথেষ্ট, তাই নিয়ে দিন কাটে। মানুষের মতো সে মাথা তুলে উঠে দাঁড়াতে পারে না। উপরের জানালা পর্যন্ত পৌঁছয় না তার দৃষ্টি, তার মনের গতি নেই প্রাণধারণের বাইরে।'

কিন্তু একই গাড়ীর আর এক কামরায় মানুষ-যাত্রীর অবস্থা আলাদা। সে কামরায় 'মানুষ খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনে পেয়েছে জানালা। জানতে পেরেছে গাড়ীর মধ্যেই সব কিছু বদ্ধ নয়। তার বাইরে দিগন্তের পর দিগন্ত। জীবনের আশু লক্ষ্যপথ উত্তীর্ণ

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রজীবনী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩।

হয়েও যা বাকী আছে, তার আভাস পাওয়া যায়, সীমা দেখা যায় না।'

এই দুর্নিরীক্ষ্য সীমাহীন বাইরের দিকেই মানুষের আকর্ষণ সহজাত। 'সুদূরের পিয়াসী' স্বভাবচঞ্চল মানুষ অনুভব ক'রল: 'তাকে ছাড়া পেতে হবে সেইখানেই, যেখানে তার প্রয়োজন নেই, যার পরিচয় তার কাছে আজও অসম্পূর্ণ। প্রাণশক্তির অতি নির্দিষ্ট সাম্রাজ্য-প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সে জয় করতে বেরল আপন স্বরাজ। এই জয়যাত্রার পথে তার সহজ প্রবৃত্তি তার পক্ষ নেয় না, এই পথে তার আরাম নেই, তার বিশ্রাম নেই; শত শত যাত্রী প্রাণ দিয়ে এই পথকে কেবলই প্রশস্ত করছে, উন্মুক্ত করছে।'

দেহের দিক থেকেও চতুষ্পদী পশুর সঙ্গে দ্বিপদী মানুষের পার্থক্য বিস্তর। চার পায়ের উপর ভর ক'রে চলার সময় দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা যত সহজ, শুধুমাত্র দুই পায়ের উপর ভর ক'রে চলা তত সহজ নয়। 'ধাক্কা খেয়ে মানুষের অঙ্গহানি বা গাম্ভীর্যহানির যে আশঙ্কা, জন্তুদের সেটা নেই। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় মানুষ উত্তত ভঙ্গী নিয়েছে বলে তার আদিম অবতত দেহের অনেক যন্ত্রকে রোগদুঃখ ভোগ করতে হয়। তবু মানুষ স্পর্ধা ক'রে উঠে দাঁড়াল।'

দুই পায়ের উপর ভর ক'রে দাঁড়াবার ফলে মানুষের চলার প্রয়াস কষ্টসাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে সে যা পেল, তা মানুষকে দান ক'রল মনুষ্যত্বের গৌরব। 'নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ।··· দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায়, সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের।' কিন্তু 'উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলো দৃশ্যকে, অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে। একে বলা যায় মুক্তদৃষ্টি।'

এই মুক্তদৃষ্টি মানুষকে আকর্ষণ করেছে অজ্ঞাত অভাবনীয়ের দিকে। এই মুক্তদৃষ্টির সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হ'ল মানুষের কল্পনাদৃষ্টি। এই দৃষ্টির সাহায্যে 'সে লাগল অভাবিতের পরীক্ষায়, অচিন্ত্যপূর্বের রচনায়···। মানুষের ঋজু মুক্ত দেহ মাটির নিকটস্থ টান ছাড়িয়ে যেতেই তার মন এমন একটা বিরাট রাজ্যের পরিচয় পেলে যা অন্নব্রহ্মের নয়, যাকে বলা যায় বিজ্ঞানব্রহ্মের- -আনন্দব্রহ্মের রাজ্য।'

এই জ্ঞানের জগতে বিচরণ ক'রে মানুষ আনন্দ পেল। ক্রমানুশীলনের ফলে উপলব্ধি ক'রল সে এই বিরাট বস্তুবিশ্ব একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জালে ঘেরা। এই রহস্য আবিষ্কার ক'রল সে নিজের অন্তরের ভিতরও। শুরু হ'ল তখন মানবমনের রহস্য-উদ্ঘাটনের পালা। সে প্রয়াস মানুষের এখনও সমাপ্ত হয়নি। যতই সে এই রহস্যের গ্রন্থি মোচন করতে যায়, ততই সে নতুনতর জটিল জালে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই মানুষের পূর্ণ রূপ এখনও মানুষের কাছে অনুদ্ঘাটিত।

মননশীল কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন: 'পূর্ণ পুরুষের অধিকাংশ এখনও আছে অব্যক্ত। ব্যক্ত করবার প্রত্যাশা নিয়ত চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক। তাঁর রথ ধাবমান, কিন্তু তিনি এখনও এসে পৌছন-নি।'

অনিশ্চিত অভাবনীয়ের দিকে মানুষের যে এই যাত্রাপথ, সে পথ বিঘ্নসংকুল, পদে পদে তার বাধা। তথাপি পূর্ণের অভিলাষী মানুষ কোন বাধা মানেনি, দুঃসহ দুঃখকে সে স্বীকার করেছে লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে। বাস্তবিকই পূর্ণের প্রকৃত প্রকাশ 'দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে'। স্বেচ্ছায় এই দুঃখ ও মৃত্যুকে বরণ

ক'রে নেবার অভীপ্সার মধ্যে মানুষ পরিচয় দিয়েছে যে মহৎ প্রবৃত্তির, তাকে বলা চলে 'মানবধর্ম'। নিজের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবন-পরিবেশের ক্ষেত্রে বৃহৎ ভাব ও কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের মন যদি মুক্তি-প্রার্থী হ'ত তাহলে 'পরমাণুতত্ত্বের চেয়ে পাক-প্রণালী মানুষের কাছে অধিক আদর পেত।' সীমাকে মানুষ স্বীকার করে, স্বীকার না ক'রে উপায় নেই, কিন্তু চরম বলে মানে না। 'যদি মানত তাহলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ ক'রত।' মানুষের মনে এই অনন্ত অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা আছে বলেই তথ্য হ'তে সত্যের আদর তার নিকট বেশী। 'তথ্য মানুষের সম্বল, কিন্তু সত্য তার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যের চরম লক্ষ্য অভাব দূর করা নয়, মহিমা উপলব্ধি করানো।' পৃথিবীতে মহামানব তাঁরা, যাঁরা উপলব্ধি করেছেন সত্যের ঐশ্বর্য, তাই অল্পসুখের মোহ তাঁদের মনকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন ভূমার সুখ, প্রকাশ করেছিলেন বৃহতের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। বৃহতের এই ঐশ্বর্য-উপলব্ধির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের ধর্ম।

মানুষের অন্তর্নিহিত পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে হয় মানবধর্মের বিকাশ। মানুষের ভিতর যে আদিম পশুপ্রবৃত্তি আছে, সে প্রবৃত্তি মানুষকে প্ররোচিত করে ভোগের পথে; আবার তার অন্তরে যে আদর্শবাদী মহৎ প্রবৃত্তি আছে, সে প্রবৃত্তি আকর্ষণ করছে মানুষকে দুঃখ-বরণের পথে, ত্যাগের পথে, কঠোর তপস্যার পথে। মানুষ যে পরিমাণে সহজ ভোগপ্রবৃত্তির বশীভূত, সে পরিমাণে মনুষ্যধর্মবিচ্যুত; আর যে পরিমাণে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত, সে পরিমাণে মানব-ধর্মবোধে উন্নীত।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'—অর্থাৎ রহস্য-ময়তার প্রচ্ছায়ে নিহিত আছে ধর্মের সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্ব। চিন্তাশীল রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছেন, মানবধর্মের তত্ত্বও অত্যন্ত জটিল। তার ভিত্তি শুধু মানুষের ধ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, মানুষের মননের উপরও স্থাপিত। এই মহৎ ধর্মোপলব্ধির জন্যে প্রয়োজন অন্তরে ধ্যান ও বাইরে কর্ম। অন্তরের ধ্যান দিয়ে মানুষ পায় শ্রেয়কে, বাইরের কর্মের সাহায্যে মানুষ লাভ করে প্রেয়কে। এই শ্রেয় ও প্রেয়-র দ্বন্দ্ব মানুষেরই দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানব-ধর্ম ধীরে ধীরে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।

এই শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু লাভের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। প্রেয় বস্তু ঐহিক, শ্রেয় আত্মিক। প্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এসে মানুষ অনুভব করে সে কিছু পেয়েছে—যেমন জাগতিক ধন, মান, ঐশ্বর্য, যশঃ। কিন্তু শ্রেয় বস্তুর সান্নিধ্যে এলে মানুষ অনুভব করে সে কিছু হয়েছে। সেজন্য শ্রেয় ও প্রেয়-র দ্বন্দ্ব 'হওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্ব'। জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান পেলে মানুষ হয় নির্মোহ, জাগতিক ধনৈশ্বর্যকে সে অত্যন্ত সহজেই উপেক্ষা করতে পারে—যেমন পেরেছিলেন মহামানব বুদ্ধদেব। মানব-ধর্মের প্রকৃত উদ্বোধন এই শ্রেয়োবোধের জাগরণে।

এই শ্রেয়োবোধেরও স্তরবিভাগ আছে। ব্যক্তির মুক্তিকামনার মধ্যে যে শ্রেয়োবোধের প্রকাশ সে শ্রেয়োবোধ খণ্ডিত, আর সমষ্টির মুক্তি-কামনায় যে শ্রেয়োবোধের বিকাশ মানবধর্ম সেখানে সহস্রদল পদ্মের মতো বিকশিত। এই সর্বমানবের মুক্তি-কামনার মধ্য দিয়ে মানবধর্মের পরিচয় হয় সার্থক। মানুষের ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উদার উপলব্ধি তাঁর জাগ্রত মনকে মিলিত করেছে বুদ্ধ, চৈতন্য,

শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবদের বিশ্বচৈতন্যযুক্ত মনের সঙ্গে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার দুই রূপ : এক রূপ অহং, আর এক রূপ আত্মা। অহং-এর প্রভাবে মানুষের মনের হয় সঙ্কোচ, আর আত্মার বিকাশে মনে আসে উদার বিস্তৃতি। ব্যক্তিগত 'আমি' লোভী, আর নৈর্ব্যক্তিক 'আত্মা' সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই আত্মিক সাধনাতেই মানুষের মনে জলে ওঠে আলো,—'তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহঙ্কার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে—বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা।'

এই দুই ভাবের প্রচণ্ড বেগ লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ বর্তমান মানুষের মধ্যে : 'একদিকে ব্যক্তিগত 'আমি'র টানে ধনসম্পদ ও প্রভুত্বের আয়োজন পুঞ্জিত হ'য়ে উঠেছে, আর একদিকে অতিমানবের প্রেরণায় পরস্পরের সঙ্গে তার কর্মের যোগ, আনন্দের যোগ, পরস্পরের উদ্দেশ্যে ত্যাগ।'

এই ভোগ ও ত্যাগ, হিংসা ও ক্ষমার দ্বন্দ্বে মানবধর্ম আজ আন্দোলিত। একদিকে অহং-এর প্রসারে আত্মার অবক্ষয়, আর একদিকে আত্মার মহিমায় অহং-বোধের পরাজয়। 'মানুষের অন্তরে একদিকে পরম-মানব, আর একদিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীব-মানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্য-চেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।'

কিন্তু এই সামঞ্জস্য-সাধনায় মানবধর্মের বিকাশ সম্ভব নয়; রবীন্দ্রনাথের মতে মানবধর্মের প্রকৃত বিকাশ হবে আত্মার উন্মেষে। মননধর্মী কবি বলেন :

অহং সীমার মধ্যে যে সুখ-দুঃখ, আত্মার সীমায় তা রূপান্তর ঘটে। যে মানুষ সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখেছে, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অর্থ তার কাছে উল্‌টো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখের স্বীকার ক'রে দুঃখকে অতিক্রম করে।

আত্মার সংস্পর্শে আগত এই রূপান্তরিত মানুষের সকল প্রয়াস নিযুক্ত হয়েছে সর্বযুগে 'মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সেই সত্য, যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথামত-বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই।' সেই সত্য উপলব্ধিতেই মানবধর্মের প্রকৃত পরিচয়।

॥ তিন ॥

মানবধর্ম ও মানবসত্যের মহত্তম স্বরূপ উপলব্ধির জন্য রবীন্দ্র-মন একদিকে যেমন অবগাহন করেছে হিন্দুর সনাতন ধর্মগ্রন্থ বেদ ও উপনিষদের জগতে এবং মহামানবদের জীবন ও বাণীর মধ্যে, তেমনি সহজপন্থী বাউলদের স্বতঃ উৎসারিত মর্মসঙ্গীতের মধ্যেও সে ভাবগ্রাহী মন শুনতে পেয়েছিল মানবধর্মের সত্যবাণী। উপনিষদের ঋষির মতো ব্রাত্য বাউলও দেবতাকে অন্বেষণ করে নিজের মধ্যে, আর তাকে বলে 'মনের মানুষ'। দেবতার এই আন্তর উপলব্ধির দ্বারা বাউল আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে। বাউলদের মতো 'বৃহদারণ্যক'ও বাহ্যিকতাকে হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, 'যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক্ ক'রে বাইরে স্থাপন করি, তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।'

দেবতাকে স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি-প্রয়াসের মধ্যে 'অহং'-ই প্রাধান্য পায় ব'লে প্রথমে ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাউলের 'সোঽহং' তত্ত্বে 'অহং'-এর স্থান গৌণ। নিজের মন বা আত্মার মধ্যে নিখিলের যোগ বা

বিশ্বানুভূতিই বাউলের আন্তর সাধনার প্রধান কথা। এই সাধনা কঠিন এবং দুঃসাধ্যব্রতী মানুষেরই উপযুক্ত। বৃহতের উপলব্ধি 'বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ; কিন্তু আপনার চিন্তায় কর্মে পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।' মানুষের রিপু যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে তখন মানুষ পরমাত্মা থেকে নিজেকে বিযুক্ত ক'রে অহং-বোধের প্রভাবে অহংকৃত হ'য়ে ওঠে। তখনই মানুষ হয় মানবধর্ম হ'তে ভ্রষ্ট। সেজন্য তত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথ বলেন:

যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে আমাদের সমাজে অনুভূত হচ্ছে, সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি।

অভিব্যক্তি-ধারায় মানুষের মন অন্তর্মুখী হয়েছে, অনুভব করেছে স্বীয় মনের ভিতর বিশ্ব-চৈতন্যকে। 'জলে উঠল যখন ধীশক্তি, তখন চৈতন্যের রশ্মি চলল সংকীর্ণ জীবনের সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বভৌমিকতার দিকে।' মধ্যযুগের সাধক রজ্জবের বাণীর ভিতর তত্ত্বান্বেষী রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন মানবধর্মের সত্য বাণী, 'সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝুঁট', অর্থাৎ সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে।

স্বীয় অন্তরে এই বিশ্বচৈতন্যের জাগরণের ফলেই ব্রাহ্মণ রামানন্দ একদিন আলিঙ্গন করতে পেরেছিলেন নাভা চণ্ডালকে, জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। ব্রাহ্মণেরা সংস্কারবশে সেদিন তাঁর এই সামাজিক কাজকে ধিক্কৃত করেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন অবিচল। অনুরূপ উপলব্ধির ফলে যীশুখৃষ্টও বলেছিলেন, 'আমি আর আমার পরমপিতা একই'। কেন না তাঁর যে প্রীতি, যে কল্যাণবুদ্ধি সকল মানুষের প্রতি সমান প্রসারিত সেই প্রীতির আলোকেই আপন অহং-সীমা ছাড়িয়ে পরমমানবের সঙ্গে নিজেকে অভেদ দেখেছিলেন। বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন ব্রহ্মবিহার, তারও অর্থ হ'ল—অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। অন্তরালোকে এই বিশ্বচৈতন্যের অনুভবই মানুষকে জাগ্রত করেছে মানবধর্ম-বোধে।

প্রাণী-জগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু অমেয় প্রাণশক্তিতে নয়,—তাকে ঘিরে মানবমহিমার যে অম্লান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে জ্যোতিই দিয়েছে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব। এই মহিমাই তাকে সবল করেছে 'সোঽহম্' তত্ত্ব প্রচারে—মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটেছে যে তত্ত্বে। এই 'সোঽহম্' অবশ্য ব্যক্তিগত মুক্তিই ঘোষণা করেনি—সমষ্টিগত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র ঘোষিত হয়েছে এই তত্ত্বের মধ্যে। মানবধর্ম উপলব্ধিতে যাঁদের জীবন সার্থক হয়েছে, তাঁরা শুধু নিজের মুক্তিচিন্তা নিয়েই তৃপ্ত থাকেননি। তাঁদের জীবনের রথ অগ্রসর হয়েছে বিশ্বজনের কল্যাণকামনায় বিচিত্র কর্মের পথে। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতের 'সোঽহম্' তত্ত্ব উপলব্ধি ধ্যানস্তব্ধ নয়, কর্মনির্ভর।—'কেন না যাঁরা মহাত্মা, তাঁরা বিশ্বকর্মা'।

মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন আশাবাদী, অহং-সীমায় আবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে মহামানবের আবির্ভাব দেখে তিনি মনে করেন, ধীর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জীব-মানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।' আমরা যারা ক্ষুদ্র

মানুষ, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমরা বর্তমান মানুষের অহংবোধ ও মানবধর্মচ্যুতি দেখে ক্ষুব্ধ হই, দুঃখবোধ করি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সীমাহীন অতীত থেকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে অমিতবীর্য মানুষের অক্লান্ত জয়যাত্রা দেখে মানবধর্মের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হয়েছেন আশান্বিত। তাঁর এই আশাবাদ শুধু কবির ভাবাবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই আশাবাদের ভিত্তিভূমি সমাজ-তাত্ত্বিকের বস্তুদৃষ্টি ও তত্ত্বান্বেষীর ভাবদৃষ্টি। স্বীয় অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তিনি বলেছেন :

জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণ-কণায়, তারপর জন্তুতে, তারপর মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল, তখনই যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা 'সর্বমেবাবিশন্তি'—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।...আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকীরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে। সেই প্রসারণের দিকে দেখি তার মহৎকে তার মহামানবকে...দুঃখ আসে তো আসুক, মৃত্যু হয় তো হোক, ক্ষতি ঘটে তো ঘটুক—মানুষ আপন মহিমা থেকে বঞ্চিত না হোক, সমস্ত দেশকালকে ধ্বনিত ক'রে বলতে পারুক 'সোঽহম্'।*

'মানুষের ধর্ম' উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি মননশীল কবিকে উত্তীর্ণ করেছে সর্বযুগের মানবহিতব্রতীদের সমপর্যায়ে।

* এই প্রবন্ধে সকল উদ্ধৃতিই রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' থেকে।

অমৃত সাধনা

শ্রীশান্তশীল দাশ

মরণের তীরে বসে অমৃত সাধনা ক'রে যাই :
একদিন এ জীবন অমৃত পরশ পেয়ে জেগে
উঠবে; সেদিন কবে আসবে কিছু তো জানা নাই;
সাধনা সফল হবে একদিন তার ছোঁয়া লেগে,
এ প্রত্যয় মনে মনে আজো জাগে; বেদনা-বন্ধুর
পথে চলি হাসিমুখে; মাঝে মাঝে কত না নিরাশা
পথ ঢেকে দিয়ে যায়; তবু চলি সে পথে সুদূর
অমৃত-মন্ত্রটি সাথে; সে পথের সকল কুয়াসা
দূরে সরে যায় সব; আলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতিধারা
নেমে আসে সারা অঙ্গে; মন ভরে ওঠে সুনিবিড়
কী আশ্বাসে! আকাশের অগণিত চন্দ্র সূর্য তারা
চলে মোর সাথী হ'য়ে; দিকে দিকে বাজে সুগম্ভীর
কী উদাত্ত শঙ্খধ্বনি! মনে হয় তীর্থযাত্রী আমি—
চলেছি সে তীর্থপথে, যেখানে সে শাশ্বত সুন্দর
রয়েছে অমৃত-ভাণ্ড সাথে নিয়ে সদা দিনযামী
জাগ্রত; আসবে কবে সে ভক্ত পিপাসু—নিতে বর।

জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী

মানবসমাজে জীবন, জীবিকা ও শিক্ষার মধ্যে যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিবিশেষের বেলায় এমন হ'তে পারে যে তিনি জীবিকার্জনের কোন ধার ধারেন না, কিন্তু জীবনটি উচ্চতম আদর্শে খুব সুন্দরভাবে গড়ে তুলেছেন। অল্পে সন্তুষ্ট থাকার এক আদর্শ আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। অর্থাৎ নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য বেশী চেষ্টা না ক'রে ভগবানের উপর নির্ভরতা রেখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা—এখানে প্রশংসিত। এই ভাব কায়মনোবাক্যে যিনি বজায় রাখতে পারেন, তাঁর কথা আলাদা, তিনি সমাজে থাকলেও সমাজের বহু উর্ধ্বে। এরূপ ব্যক্তি দশলাখে একজন মেলে কি না সন্দেহ। জনসাধারণ এই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সর্ব চেষ্টা পরিত্যাগ করলে কোন সমাজ যে টিকতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। অল্পকালের মধ্যেই সেই সমাজের নির্বাণ অবশ্যম্ভাবী।

জীবনধারণের জন্য পরিশ্রম অত্যাবশ্যক

জনসাধারণের বেলায় আমরা এটাই দেখতে পাই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম না করলে অন্ন জুটে না। সুদূর অতীতে হয়তো এমন যুগ ছিল, যখন প্রকৃতির অবারিত দানরূপে খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যেত। কিন্তু তখনও ফলমূল কিংবা খাদ্যশস্য কুড়িয়ে আনতে হ'ত, জলের মাছ কিংবা বনের পশুপক্ষী শিকার ক'রে আনতে হ'ত, একেবারে বিনাশ্রমে কিছুই মুখে এসে হাজির হ'ত না। আর মানুষের দেহযন্ত্রের গঠন এমনই যে বিনা পরিশ্রমে খিদেও তেমন পায় না, হজমও ভাল হয় না। যাই হোক, সেই স্বর্ণযুগের প্রকৃতিদত্ত প্রাচুর্যের কথা ভেবে লাভ নেই। বর্তমান যুগে—এটা কঠোর হলেও নিরেট সত্য যে, আমাদিগকে জীবিকা 'অর্জন' করতে হয়। অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অবশ্য এমন আছেন, যাঁরা বসে বসে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত বিত্ত, কিংবা নিজেদের হঠাৎ-পাওয়া বিত্ত শুধু ভাঙিয়ে খাচ্ছেন, কোন পরিশ্রমের বালাই নেই। কিন্তু এঁদের উপর এখন জনসাধারণের বিষ নজর। রাজা জমিদার শ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত,—আর নির্ভাবনায় নিছক সুদের টাকায় কিংবা শেয়ারের মুনাফায় জীবিকানির্বাহের দিনও বিগতপ্রায়।

জীবিকা ও জীবন—যেন ভিত্তি ও ইমারত

জীবিকা না হ'লে জীবন টিকে না। আর মানবসমাজ যে অবস্থায় পৌছেছে তাতে কায়িক পরিশ্রম না ক'রে জীবিকার সংস্থান হয় না। জীবিকা শুধু যে দেহরক্ষার জন্যেই প্রয়োজন তা নয়; জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থান ব্যতীত উচ্চতর জীবনবিকাশেরও দারুণ ব্যাঘাত ঘটে। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট,' 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—ইত্যাদি প্রবাদবাক্যের মূল ঐখানে। জীবন ও জীবিকার সম্পর্ককে—ইমারত ও ভিত্তির সম্পর্কের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। ভিত্তি ছাড়া ইমারত দাঁড়াতে পারে না; আর উপরে যদি ইমারত না গড়ে ওঠে, তবে ভিত্তির কোনই সার্থকতা নেই। ইতর প্রাণীর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই জীবন; কিন্তু মানবের পক্ষে তা নয়। প্রকৃত মানবজীবন বলতে

বুঝায় উচ্চতর জীবন—দৈহিক জীবনকে অতিক্রম ক'রে মননের ও আত্মবিকাশের অবিরত চেষ্টাই জীবন।

ধর্ম ও অর্থ—মানবেতিহাসের প্রধান দু'টি নিয়ামক। ধর্মের প্রভাব সাময়িকভাবে অধিক বলশালী ; কিন্তু অর্থের প্রভাব ব্যাপক ও চিরন্তন।

আর এক দিক থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হচ্ছেন আলফ্রেড মার্শাল। তাঁর দু-একটি সিদ্ধান্ত এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলছেন যে, শুধু এক ধর্মের প্রভাব বাদ দিলে কোন ব্যক্তি কি উপায়ে জীবিকার্জন করে এবং কি পরিমাণ রোজগার করে, তা দ্বারাই তার চরিত্র প্রধানতঃ গঠিত হয়।

মানবেতিহাসে চিরকাল দু'টি শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার ক'রে আসছে—একটি 'ধর্ম', অপরটি 'অর্থ' (=পার্থিব অভাব-মোচনের সর্ববিধ প্রয়াস)। ধর্মের প্রভাব খুবই বলশালী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক-একবার কোন সমাজে, দেশে কিংবা মহাদেশে এমন এক-এক ধর্মান্দোলন অথবা ধর্মের উন্মাদনা ঘটে গিয়েছে যে তখনকার মতো মনে হয়েছে বুঝি তার বন্যার মুখে সব কিছু ভেসে যাবে। কিন্তু ইতিহাসে বারংবার দেখা গিয়েছে, অতি বড় আধ্যাত্মিক শক্তির কিংবা অতি উৎকট ধর্মোন্মাদনার (Fanaticism) বেগও কালক্রমে মন্দীভূত কিংবা তিরোহিত হ'য়ে যায়।

রোজগারের প্রণালী ও পরিমাণ, জীবনের উপর উভয়ের প্রভাব

পক্ষান্তরে, মানুষের আর্থিক কার্যকলাপের প্রভাব চির-বিদ্যমান। ওতে জোয়ারভাটা থাকলেও গতির কোন বিরাম নেই। এই হিসাবে ধর্মের চেয়েও আর্থিক প্রচেষ্টার প্রভাব অনেক বেশী ব্যাপক এবং গভীর। যে কাজের দ্বারা কোন ব্যক্তি তার জীবিকার্জন করে, সেই কাজের চিন্তা দিবসের বেশীর ভাগ সময় তার মনবুদ্ধিকে ব্যাপৃত রাখে, আর সেই সময়টাতেই মনবুদ্ধি থাকে সব চেয়ে বেশী সজাগ এবং সক্রিয়। ঐ সময়ে সে যে যে বিষয় চিন্তা করে, যেভাবে হাত পা ও মস্তিষ্ককে খাটায়, যেভাবে সহকর্মীদের এবং উর্ধ্বতন ও অধস্তন ব্যক্তিদের—অথবা মক্কেল ও খরিদ্দারদের—সহিত ব্যবহার করে, তা দ্বারাই বহুলাংশে তার স্বভাব গঠিত হয়। অর্থাৎ কি উপায়ে, কি কাজের দ্বারা, কি রকম পরিবেশে ও সংসর্গে কোন ব্যক্তি জীবিকার্জন করে—জীবনের উপর তার প্রভাব অনেকখানি। আবার আয়ের প্রভাবও যথেষ্ট। মাসিক আয় যদি ২৫০ টাকা হয়, তবে হয় তো কোন রকমে সংসার চলে যায়। কিন্তু যদি তার চেয়ে কম হয়, তবে খুব সম্ভবতঃ অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটে, অসুখবিসুখে চিকিৎসা অসাধ্য হয়, ছেলেমেয়েদের সাধারণ লেখাপড়াও শেখানো চলে না—ইত্যাদি। সমস্ত জীবনটাই তখন অত্যন্ত নীচু পর্যায়ে নেমে যায়। সুতরাং জীবন, জীবিকা ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

যে শিক্ষায় জীবিকার্জনের সামর্থ্য না জন্মায়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

আলফ্রেড মার্শাল তাই বলেছেন যে, পার্থিব অভাবমোচনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াসকে অবহেলা ক'রে মানবসমাজ ও মানবজীবনকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এই যুক্তি যদি আমরা মেনে নিই—আর না মানবার কোন হেতু দেখা যায় না—তবে অনিবার্যরূপে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীর জীবিকাসংস্থানের উপায় হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর জীবনবিকাশের আগ্রহ জন্মে।

জীবিকার্জন ও শিক্ষা, প্রাণিজগতের দৃষ্টান্ত

জীবজগতের প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, অত্যন্ত নিম্নবর্গের প্রাণীর মধ্যে জীবিকার্জনের জন্য শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। একমাত্র সহজাত সংস্কারের সাহায্যেই তারা আহার্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় ও সমর্থ হয়; পিতামাতার নিকট হ'তে কোন শিক্ষালাভের অথবা সাহায্যের দরকার হয় না। আর পিতামাতাও এ বিষয়ে সন্তানের প্রতি কোন দায়িত্ব স্বীকার করে না। মক্ষিকা ডিম পেড়েই খালাস; ডিম আপনা হ'তে ফুটে, তা থেকে বাচ্চা বেরোয়, এবং বাচ্চা তার নিজের পথ নিজেই দেখে। ক্রমশঃ যত উচ্চবর্গের প্রাণীর দিকে যাওয়া যায়, ততই লালন-পালন ও শিক্ষার জন্য পিতামাতার উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় চোখে পড়ে। পক্ষী-মাতা এবং ধাড়ী-বেরাল নিজ নিজ শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ তো করেই, উপরন্তু কেমন ক'রে শিকার ধরতে হয় ও আহার্য সংগ্রহ করতে হয়—তাও পরিপাটিরূপে শেখায়।

মানবসমাজের বৃত্তিশিক্ষাই চিরকাল ছিল সাধারণ্যে প্রচলিত শিক্ষা; লেখাপড়ার চর্চা খুব ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল।

মানব-পর্যায়ে এলে দেখতে পাই যে মানবশিশুর দীর্ঘকাল লালন-পালনের আবশ্যক হয় এবং তার পর জীবিকার্জন শেখাবার জন্যও অনেক যত্ন ও সময় ব্যয়িত হয়। কৃষকের ছেলে, তাঁতির ছেলে, জেলের ছেলে—সবাইকে বৃত্তিশিক্ষার জন্যে শিক্ষানবীশী করতে হয়। যে বৃত্তি যত কঠিন, তার শিক্ষানবীশীর কাল তত দীর্ঘ। প্রাচীন যুগে প্রায় সকল সভ্য-সমাজেই বৃত্তি ছিল বংশগত, এবং বৃত্তির সংখ্যা ছিল অল্প। কৃষকের ছেলে স্বভাবতই চাষবাসে লেগে যেত, তাঁতির ছেলে তাঁত বোনায়—ইত্যাদি। ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে এই বৃত্তিভেদ কালক্রমে জাতিভেদের আকার ধারণ করে—ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য দেশে ও সমাজে এরূপ জাতিভেদের উদ্ভব না হলেও বৃত্তিভেদ সর্বত্রই ছিল, এবং বৃত্তি মোটের উপর ছিল বংশগত। 'শিক্ষা' বলতে বৃত্তিশিক্ষা অর্থাৎ শিক্ষানবীশীই (apprenticeship) বোঝাত; লেখাপড়ার চর্চার দিকে লোকের ঝোঁক ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই লেখাপড়া শিখত, এবং তারও এক অতি ক্ষুদ্র অংশ সারাজীবন লেখাপড়া নিয়ে কাল কাটাত।*

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ও জীবনযাত্রার গভীর পরিবর্তন

ব্যাপকভাবে ইওরোপে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দরুণ অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম এই বিপ্লব শুরু হয়। এতকাল যে সমস্ত শিল্পকাজ গৃহস্থেরা নিজেদের ঘরে ব'সে, কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

* প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—তিন বর্ণের ছেলেদের জন্যই 'উপনয়নে'র বা গুরুগৃহে প্রেরণের ব্যবস্থা স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শুধু ব্রাহ্মণের ছেলেরাই ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় গুরুগৃহে কাটাত। সবাই যে যেত, তা বলা যায় না; কতক ব্রাহ্মণকুমার যে যেত না, তার প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই সুস্পষ্ট। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারীরা কেবল যে বেদপাঠেই নিমগ্ন থাকত, এমন নয়;—দিবাভাগের অধিকাংশ সময় তাদিগকে কৃষি, গোপালন, কাষ্ঠাহরণ প্রভৃতি কাজে এবং আশ্রমপরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতে হ'ত। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দায়িত্ব থেকে বিদ্যাভ্যাস মোটেই বিযুক্ত ছিল না। প্রায় সবাই বেদবিদ্যার নিজ নিজ শাখা আয়ত্ত ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমের, অর্থাৎ সংসার-ধর্ম পালনের যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরত। আর এক ভাবে বলতে গেলে সমাজে ব্রাহ্মণদের যে কর্তব্য ও বৃত্তি ছিল,—ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল তারই শিক্ষানবীশী।

সংস্থার সাহায্যে ক'রে আসছিল, সেগুলো এখন বাষ্পচালিত বৃহৎ কারখানায় স্থানান্তরিত হ'ল। হাতে-চালানো চরকা ও তাঁতের জায়গায় এল যন্ত্র-চালিত চরকা ও তাঁত। কাঁচা রাস্তার বদলে হলো ম্যাকাডাম প্রণালীর (ম্যাকাডাম সাহেবের উদ্ভাবিত) পাকা সড়ক,—তৈরী হ'ল রেলপথ এবং চালু হ'ল রেলগাড়ী। পণ্যদ্রব্যের চলাফেরা এবং মালপত্র আনা-নেওয়ার ব্যবস্থার ঘ'টল আমূল পরিবর্তন। ধনোৎপাদন-প্রণালীই গেল সম্পূর্ণ বদলে। তার ফলে সমাজের স্তরবিন্যাস ও বৃত্তি-বিন্যাস আগে যেমন ছিল, তেমন আর রইল না। রোজগারের জন্যে দলে দলে লোক কয়লার খনিতে এবং কলকারখানার দিকে ধাবিত হ'ল; স্ত্রীলোক ও শিশুরাও সেখানে মজুরীতে লেগে গেল। ফল যে সবদিক্ দিয়ে হিতকর হয়েছিল, তা কথনই নয়। নূতন ধনোৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে থাকার ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং নৈতিক আবহাওয়া মোটেই ভাল ছিল না। কিন্তু কলকারখানার প্রতিযোগিতায় পুরাতন বৃত্তিসমূহের অনেকগুলিই ধ্বংসোন্মুখ হওয়াতে কারখানায় ভর্তি হওয়া ব্যতীত লোকের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং নানা অসুবিধা ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও মেয়েপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ সকলেই কারখানার কাজে লেগে গিয়েছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী গত হবার পর শ্রমজীবীদের হিতকল্পে সর্বপ্রথম ফ্যাক্টরী-আইন প্রবর্তিত হয়। জনমত, সরকারী চেষ্টা এবং শ্রমজীবীদের সঙ্ঘবদ্ধতা—এই তিনের মিলনে শ্রমজীবীদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেছে। আর এখন তে. রাষ্ট্রে ও সমাজে নানা বৃহৎ ব্যাপারে শ্রমিকদেরই প্রাধান্য।

শিল্পায়নের ফলে ইংলণ্ডে 'শিক্ষানবীশী' লুপ্ত হয়নি, শুধু নূতন রূপ নিয়েছে—
শিক্ষা বয়সে এখনও শিক্ষানবীশীরই প্রাধান্য।

ইংলণ্ডের আর্থিক (economic) ইতিহাসের কয়েকটি বিষয় খুবই অনুধাবনযোগ্য, তা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। আমরা ইদানীং শিল্পায়নের (Industrialisation অর্থাৎ কলকারখানার সাহায্যে ধনোৎপাদনের) জন্য উঠে পড়ে লেগেছি। কোথায় তার বাধাবিঘ্ন, কোথায় এ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি, তার অনেক ইঙ্গিত এই ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় এই যে শিক্ষানবীশী-ব্যবস্থা ইংলণ্ডে কখনও লুপ্ত হয়নি, শুধু তার রকম ও প্রণালীটাই কতক বদলেছে। আগে বৃত্তি ছিল মোটের উপর বংশগত, এবং জন্মস্থান ছেড়ে বেশী দূরে বড় কেউ যেত না। শিক্ষানবীশী শুরু হ'ত পিতার নিকট, কোন প্রতিবেশীর নিকট অথবা কোন শিল্প-পঞ্চায়েতের (guild) অধীনে। এখন আর বৃত্তি ততটা বংশগত নয়, দূর-নিকটের পার্থক্য অনেকটা ঘুচে গিয়েছে এবং শিক্ষানবীশী করতে হয় প্রধানতঃ কারখানায়। মোটামুটি ব্যবস্থা এই যে—কৈশোর অতিক্রান্ত না হতেই প্রায় সবাইকে নিজ নিজ বৃত্তি বেছে নিয়ে—কৃষিক্ষেত্রে হ'ক, কলকারখানায় হ'ক, কোন পেশাতে হ'ক, ব্যবসা-বাণিজ্যে হ'ক—যেখানেই হাতে-কলমে কাজ শেখবার সুবিধা আছে, এমন জায়গায় শিক্ষানবীশীতে ভর্তি হওয়া চাই।

আগেকার দিনে শিক্ষানবীশী শুরু হ'ত অল্প বয়সে, এখন শুরু হয় কতকটা দেরীতে। দু'কারণে শিক্ষানবীশী শুরু হবার বয়স ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। প্রথমতঃ ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে যতই কাজে লাগানো হচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিকরা সাধারণ লেখাপড়া না জানলে তাদের পক্ষে কাজ শেখা কঠিন হয় এবং তারা খুব উঁচুদরের কারিগর হতে পারে না। সুতরাং কর্মকুশলতার জন্যে খানিকটা লেখাপড়া জানা নিতান্ত দরকার। একটা ন্যূনকল্প লেখাপড়া

আগে শেষ ক'রে তার পর শিক্ষানবীশীতে গেলে ফল হয় ভাল। দ্বিতীয়তঃ কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির ফলে দেশ যত সমৃদ্ধ হয়, সমাজের পক্ষে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের কাজে খাটাবার প্রয়োজন ততই কমে যায়। তখন সমস্ত বালকবালিকাদের লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করা—এবং অবশেষে অবৈতনিকভাবে লেখাপড়া শেখা বাধ্যতামূলক করা সম্ভবপর হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এই দুই কারণেই বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ লেখাপড়া শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে, এবং এই শিক্ষার মান ও স্থিতিকাল ক্রমশঃ বাড়ছে। তারই গতিকে শিক্ষানবীশীতে ভর্তি হবার বয়স ক্রমশঃ উপরে উঠেছে এবং উঠছে।

কলকারখানা ও শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, ধনসম্পদের বৃদ্ধি, বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, উক্ত শিক্ষার স্থিতিকাল ও মান, বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী শুরু হওয়ার বয়স—এই সবগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মূলতঃ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে জনসাধারণের পক্ষে জীবিকার্জনের উদ্দেশ্যে বৃত্তিশিক্ষাই আসল শিক্ষা বলে পরিগণিত। গৃহস্থ-ঘরের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পক্ষে কোন একটা বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন ক'রে জীবিকার্জনে প্রবৃত্ত হওয়াটাই লক্ষ্য; লেখাপড়া শেখা এবং শিক্ষানবিশী করা হ'ল তারই উপায়। ইংলণ্ডের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা এই মূলনীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি : (১) জীবিকার্জনের সহিত বিচ্ছেদ (২) শিক্ষানবীশীর উচ্ছেদ

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তা প্রধানতঃ পোষাকী এবং পুঁথিগত। জীবিকা-সংস্থানের ব্যাপারে শুধু কেরানীগিরি, ওকালতী, মাস্টারি, ডাক্তারি প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র 'ভদ্রোচিত' কাজের সঙ্গে এর সম্পর্ক। দেশের বৃহত্তর আর্থিক জীবনের সঙ্গে, ধনোৎপাদনমূলক নানাবিধ বৃত্তিতে প্রবেশলাভের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বরং শিক্ষালাভান্তে কৃষিশিল্প প্রভৃতি হাতের কাজে কেউ যাতে না যায়, স্কুল কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার প্রেরণা এবং ঝোঁক সেই দিকেই। কৃষক, কামার, কুমোর, ছুঁতোর, দর্জী—এদের ছেলেরাও স্কুলের চৌকাঠ একবার মাড়ালে আর হাতের কাজে যেতে চায় না, 'বাবু' হ'তে চায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এই যে মারাত্মক ত্রুটি—তা দেশের মনীষী, দরদী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে: 'সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি, ওকালতী, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, মুনসেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোন স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোন শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপর নাই, তাহা পরগাছার মত, পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে।' জীবিকার সহিত শিক্ষার বিচ্ছেদই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সব চেয়ে বড় ত্রুটি। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বরাজ-লাভের পর এই ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা বেসামালভাবে বেড়েই চলেছে। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর স্মৃতি

[পূর্বানুবৃত্তি]

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডাক্তার নন্দী

স্বামীজী একদিন আমাকে বলিলেন, 'তুই এলাহাবাদে থাকিস, ডাক্তার নন্দীকে জানিস?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ'। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আমি যখন ঘুঁসিতে ছিলাম, কথন কথন ডাক্তার নন্দীর বাড়ীতে ভিক্ষা ক'রে আসতাম। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল।' ডাঃ নন্দী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি ঠাকুরের নিকট যাইতেন। তাঁহার সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিলাম—ঠাকুরের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাস গঙ্গার অপর পারে—যেস্থানে সাধুসন্ন্যাসীরা থাকেন—সেইস্থানে ছিলেন। সেই সময়টা ছিল দারুণ গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা খালি-পায়ে আধখানা ভোটকম্বল কোমরে জড়ানো আর আধখানা গায়ে দিয়া ডাঃ নন্দীর বাড়ী পাঁচ ছয় মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতেন এবং ভিক্ষা গ্রহণের পর হাঁটিয়া ফিরিতেন। এইরূপ তিতিক্ষা উত্তর পশ্চিমের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বামীজীর কঠোরতা তাঁহাদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

স্বামীজীর মাতৃদেবীকে দর্শন

প্রায়ই কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে যাইতাম। যুবা ও প্রৌঢ় বহু ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শন পাইবার আশায় মঠে যাইতেন। কিন্তু সদা সর্বদা তাঁহার 'দর্শন' হইত না। অধিকাংশ সময় স্বামীজী নিজ কক্ষে থাকিতেন; সে সময় তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি ছিল না। তিনি নিজেই যখন বাহিরে আসিতেন, সর্বসাধারণ তখনই তাঁহার কাছে আসিতে পারিত। স্বামীজীর গুরুভ্রাতারাও যখন তখন তাঁহার কাছে যাইতেন না। সাধারণতঃ স্বামীজী ঘরের বাহিরে থাকিলে তাঁহাদের সহিত স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাস—সবই হইত!

একদিন সকালে স্বামীজীর মাতাঠাকুরানী মঠে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমারও মনে তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। তাঁহার শরীরের গঠন ছিল বলিষ্ঠ, চক্ষু দুইটি বৃহৎ এবং আয়ত—চলিত ভাষায় যাহাকে বলে 'পটল-চেরা চোখ'। তাঁহার মধ্যে সবল দৃঢ় চিত্ত ও তেজস্বিতার ভাব যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইত। দেখিয়া মনে হইল, এমন মাতারই স্বামীজীর মতো পুত্র হওয়া সম্ভব। মঠের দ্বিতলে উঠিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—'বিলু-উ-উ'। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অল্পক্ষণেই দেখি, স্বামীজী মায়ের সহিত সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিতেছেন। বাহিরের বাগানে উভয়ে বেড়াইতে লাগিলেন, এবং মাতা ও পুত্রে নিম্নস্বরে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ী মাঝে মাঝে যাইতেন। সেখানে গেলে মায়ের কাছে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতেন। যখন মঠে থাকিতেন, তখনও মাঝে মাঝে কলিকাতায় গিয়া মাকে দেখা দিয়া আসিতেন। কদাচিৎ অনেকদিন না দেখিলে তাঁহার মা

নিজে মঠে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। তবে মঠে তিনি খুব কম আসিতেন। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে মঠে দেখিতে পাইলাম। আরও দেখিলাম মাতার কাছে সেই জগদ্‌বিখ্যাত স্বামীজী যেন একটি ছোট শিশু।

জাপানের রাজদূত

জাপানের কনসাল একদিন প্রায় বেলা চার ঘটিকার সময় মঠে আসিয়া স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী হইলেন। মঠের উঠানের পাশের বারান্দায় যে বেঞ্চিগুলি পাতা থাকিত, তিনি এবং তাঁহার দোভাষী সেখানেই বসিলেন। স্বামীজীকে খবর দেওয়া হইল। এরূপ করা সাধারণ নিয়ম না হইলেও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিলে তাঁহাকে খবর দেওয়া হইত। কিন্তু সকল সময়ে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিতেন না। দেখা করা বা না করা সম্পূর্ণ তাঁহার তাৎকালিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কখনও তিনি অল্পক্ষণেই নামিয়া আসিতেন আবার কখন বা দেখাই হইত না। সেদিন তাঁহাকে খবর দেওয়া হইলে আমরা ভাবিলাম, তিনি এখনি আসিবেন; কিন্তু তাহা হইল না। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল এবং জাপানের রাজদূত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামীজী আসিলেন এবং শিষ্টাচার সম্ভাষণ শেষ হইলে দোভাষী মারফৎ রাজদূত বলিলেন, 'আমাদের মিকাডো আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনি জাপানে চলুন। ইহা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। হিন্দুধর্ম সেখানে প্রচার করবেন এবং তাতে জাপানের মঙ্গল হবে। আপনি সম্মত হলেই সেখানে রাজোচিত সম্বর্ধনার জন্য মিকাডো ব্যবস্থা করবেন।'

স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'শরীর আমার অসুস্থ। এখন জাপান যাওয়া সম্ভব হবে না।' রাজদূত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি সুস্থ হ'লে যাবেন, এই কথা কি মিকাডোকে জানাতে পারি?' তাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'এ শরীর জাপানে যাবার মতো আবার হবে, তা আমার মনে হয় না।'

স্বামীজী ডায়াবিটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন এবং তাঁহার দেহ কৃশ হইয়াছিল, মুখের চেহারাও খারাপ হইয়া গিয়াছিল। রাজদূত তখন ফিরিয়া গেলেন এবং স্বামীজী পুনরায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাধারণতঃ এই সময় তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হইতেন। কিন্তু সেদিন আর গেলেন না।

রাখাল মহারাজ

ইহার পর অল্পদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ ফিরিয়া আসিলাম। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তখন আমি থাকিতাম। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের ক্লাবে আসিয়া থাকিতেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা তখন মঠ হইতে বাহির হইত। ঐ নামটি আমাদের মনে ধরিয়াছিল এবং তদনুসারে ক্লাবের নামকরণ হইয়াছিল। ছুটী পাইলেই কলিকাতা ও বেলুড় যাইতাম। কিন্তু সব সময় স্বামীজীর দেখা পাইতাম না। একবার এইরূপ বেলুড় গিয়া শুনিলাম, তিনি অন্যত্র গিয়াছেন। পূঃ রাখাল মহারাজ মঠে ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার কাছে বহুবার গিয়াছি। তাঁহাকে দেখিতাম, কথা খুব কম বলিতেন এবং অনেক সময় ভাবস্থ হইয়া থাকিতেন। শুনিয়াছিলাম তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা খুব উচ্চ। ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে মানসপুত্র বলিয়াছেন; কিন্তু একথার গভীরতা বুঝিবার সাধ্য আমার ছিলনা। তিনি অন্তর্যামী, একথা শুনিতাম এবং বিশ্বাসও করিতাম। এই সময় আমার মনে কয়েকটি সংশয় ছিল।

আমি না বলিলেও তিনি তাহা বুঝিয়া আমার সংশয় নিবৃত্তি করিয়া দিবেন—এই আশা লইয়া আমি তাঁহার নিকটে চুপচাপ বসিয়া রহিলাম। তিনিও কোন কথা না বলিয়া আপনার ভাবে বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, 'মন্মথ! এস একটু বেড়িয়ে আসি।' তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মঠ হইতে গেট পর্যন্ত রাস্তা। গঙ্গাতীরে তখনও কোন মন্দিরাদি হয় নাই। অধিকাংশ স্থান ফাঁকা। দক্ষিণে জাহাজ ঘাটের দিকের গেট পর্যন্ত আমরা বারকয়েক হাঁটিয়া গেলাম আবার ফিরিলাম। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার সব প্রশ্নেরই সুমীমাংসা করিয়া দিলেন।

তাহার পর মঠের সামনে ঘাটের উপর একটি রানার উপর নিজে বসিলেন এবং আমাকেও পাশে বসিতে ইসারা করিলেন। আমি একটি সিঁড়ি নীচে তাঁহার পায়ের কাছে বসিলাম। 'স্বামীজী' বলিলে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বুঝায়, সেইরূপ 'মহারাজ' বলিলে রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই বুঝাইত। মহারাজের প্রতি আমার তখন অতিশয় শ্রদ্ধা হইয়াছে। আমিও ভাবিলাম ইঁহার নিকট দীক্ষা পাইলেই আমার জীবন সার্থক হইবে। আমি তাঁহাকে কাতর ভাবে বলিলাম, 'ঠাকুরের পূজা জপ ধ্যান করি, কিন্তু মনে হয় দীক্ষা হইলে ভাল হয়। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।'

রাখাল মহারাজ অল্পক্ষণ অন্তর্মুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'তোর গুরু আমি নই। তোর গুরু স্বামীজী।'

একথা শুনিয়া আমি হতাশ হইলাম। মনে হইল তাহা হইলে দীক্ষা আর হইল না। বামন হইয়া চাঁদ ধরাও যেমন, স্বামীজীর শিষ্য হওয়াও আমার পক্ষে তেমন। মন্ত্র-শিষ্য তাঁহার খুব কম ছিল। আমার আর কি সুকৃতি, যে তিনি মন্ত্র-দীক্ষা দিবেন। মনটা খুবই দমিয়া গেল এবং অল্পদিনে এলাহাবাদ ফিরিলাম।

স্বামীজীর মহাবীর-ভাব

ইহার পর যে সময় বেলুড় মঠে গেলাম, দেখিলাম স্বামীজী মঠেই আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্যেরও একটু উন্নতি হইয়াছে—মনে হইল। আর এক দিন সকালে আসিয়া দেখি, স্বামীজী মঠের পুরাতন ঠাকুর ঘরের সামনে পায়চারী করিতেছেন। বারে বারে এই শ্লোকটি অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিতেছেন :

গর্জন্তং রামরামেতি, ব্রুবন্তং রামরামেতি।
গর্জন্তং রামরামেতি, ব্রুবন্তং রামরামেতি॥

শ্রীরাম-জানকীর দেউড়ি পাহারা দিতেছেন স্বামীজী,—স্বয়ংই যেন তিনি মহাবীর হইয়া গিয়াছেন। মহাবীরের হুঙ্কারে একমাত্র 'রাম রাম' ধ্বনি শুনা যাইত। তাঁহার প্রতিবাক্যেই 'রাম রাম' এই কথাটিই প্রতিধ্বনিত হইত।

মহাবীরজীকে স্বামীজী মহাশক্তিমান্ বলিতেন। স্বামীজীকে সেদিন দেখিয়া মনে হইল তিনি মহাবীরের মতই বিরাট শক্তিশালী। তাঁহার প্রতি হাবভাব ও পদক্ষেপে সেই শক্তিরই প্রকাশ হইতেছিল। মুখ তাঁহার ভাবে থম থম করিতেছে, হাত দুইটি বুকের কাছে, —শিকাগোতে লেকচার দেওয়ার যে ছবি দেখা যায়—সেইরূপ। ঈষৎ মাতোয়ারা হইলে পা যেরূপ পড়ে—সেইরূপ। অথচ গতি ক্ষিপ্র এবং তির্যক। কখনও হাত দুইটি পাশে দোলাইয়া চলিতেছেন, কিন্তু সেই একই ভাবে ক্রমান্বয়ে পরিক্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ তিনি বাহিরের দরজার কাছে আসিয়া থামিলেন। তাহার পর

বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া দুই বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহা পরাক্রমে বলিয়া উঠিলেন, 'আমি সূর্য চন্দ্রের গতি রোধ করতে পারি।'

অপূর্ব সেই দৃশ্য! একদা লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সময় মহাবীর সূর্যকে কুক্ষিগত করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যের জন্য স্বামী বিবেকানন্দও পুনর্বার তাহা করিতে প্রস্তুত। হেন অসাধ্য কর্ম নাই, যাহা তিনি করিতে পারেন না। সূর্য বা চন্দ্রের গতি রোধ করিবেন, ইহা আর আশ্চর্য কি?

একটি যুবককে স্বর্ণঘড়ি দান

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দশ বারো জন যুবক আসিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে উপরের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী ঘর হইতে বাহিরে আসিলে তাহারা তাঁহাকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। স্বামীজীও সহজভাবে সকলের সহিত কথা বলিতেছিলেন। কখন কাহারও কাঁধে হাত দিয়া, কখন কাহারও পিঠে চাপড় মারিয়া এমনভাবে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, যেন তিনি তাহাদেরই একজন। তাঁহার গলায় ছিল একটি সোনার ঘড়ির চেন। সেকালে সোনার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন ব্যবহার করার প্রথা ছিল, কিন্তু স্বামীজীকে কখনও এই ঘড়ি ও চেন ব্যবহার করিতে দেখি নাই। তাঁহার সুন্দর রঙে এই সোনার চেনটি দিব্য মানাইয়াছিল। একটি যুবক ঐ চেনে হাত দিয়া বলিল, 'এ চেনটি তো ভারী সুন্দর!' স্বামীজী তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন; পরক্ষণে ঘড়ি ও চেনটি খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'নে, এটা তোকে দিলুম। তোর খুব পছন্দ হয়েছে—তা তুইই এটা রাখ।' ছেলেটি বিস্ময়ে হতবাক্। ঘড়ি ও ঘড়ির চেন লইয়া সে কি করিবে বা কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না। পরক্ষণে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'এটা তোকে দিলুম; কিন্তু দেখিস—বিক্রী করিস নে যেন। নিজের কাছেই রাখিস।'

শুনিয়াছি বিলাতে থাকাকালে কোন বিশিষ্ট মহিলা স্বামীজীকে ঘড়িটি উপহার দিয়াছিলেন। এমন মহামূল্য বস্তুটি স্বচ্ছন্দে এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন কেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইলাম না। তবে তাঁহার ত্যাগ দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল, সন্দেহ নাই। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রাপ্ত বস্তুর ত্যাগই ত্যাগ। যার সব আছে—অথচ উদাসীন, তারই ঠিক ত্যাগ। যে নিজেই ভিখিরী—তার আবার ত্যাগ?'

কিন্তু আমরা ত্যাগ বলিতে যে ধারণা করি, স্বামীজী তাহার বহু উর্ধ্বে ছিলেন। তাঁহার মনটি ছিল অতি সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী যন্ত্রের মতো; তাঁহার কোন বস্তুর প্রতি অপরের মনের ছায়াপাত হইলেও তাহা তিনি কাছে রাখা কষ্টকর মনে করিতেন। যুবকটির মনে যে লুক্কায়িত ভাবটি ছিল, তাহা লোভ হইতে পারে অথবা সন্ন্যাসীর নিকট স্বর্ণ আছে বলিয়া বিরূপতাও হইতে পারে। তাহার ভাব বুঝিয়া স্বামীজী সহজেই তাহাকে ঘড়িটি দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কে জানে স্বামীজীর এই স্বর্ণ ঘড়ি দেওয়ার সহিত মনোজগতে সেই যুবককে আর কি সম্পদ দিয়াছিলেন?

অধ্যাপকদিগের মধ্যে

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বামীজীকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা হইত; এজন্য বড়দিনের ছুটিতে দূর হইতেও তাঁহারা আসিতেন। আগ্রা হইতে কয়েকজন বাঙালী

ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন অধ্যাপক ছিলেন। মঠের উঠানে কয়েকটি সাধারণ বেঞ্চির উপর তাঁহারা বসিলেন এবং অদূরে একটি চেয়ারে স্বামীজী ছিলেন। অধ্যাপকবৃন্দ নানা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং স্বামীজীও হাসিতে হাসিতে যথাযথ উত্তর দিতেছিলেন। দার্শনিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি—কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে আগন্তুকগণ উঠিলেন। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া মনে হইল তাঁহাদের চিত্তে প্রসাদ আসিয়াছে।

এই সময় একটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। একই সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে প্রশ্ন বর্ষণ করিতেছিলেন, স্বামীজী সে সকলের এমন একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন, যাহার সূত্র ধরিয়া সব কিছুর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সকলেই স্বামীজীর কথায় পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিশ্চিতই ছিল, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি এমন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তাহা সিদ্ধান্তরূপে মানিয়া লইতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অসুবিধা হইত না।

সাধু অমূল্য

একবার স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এলাহাবাদে সাধু অমূল্য থাকে—তাকে চিনিস্?' আমি বলিলাম, 'হাঁ।' 'তার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? সে কেমন আছে? তার কথা আমায় বল্।' সংক্ষেপে তাঁহার সব কথা জানাইলাম। অমূল্য সাধু এক কালে প্লেগ ও কলেরা রোগীর খুব সেবা করিয়াছিলেন। তখন তিনি গেরুয়া পরিতেন না। লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পরে তিনি একদল গঞ্জিকা-সেবীর 'গুরুজী' হইয়া পড়িলেন, তখন গেরুয়া পরিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অধঃপতনের শেষ সীমানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অঘোর-সম্প্রদায়ীদের মতো কতকটা তাঁহার আচরণ ছিল। বস্ত্র ত্যাগ করিয়া তিনি নাগাদিগের মতো থাকিতে আরম্ভ করিলেন। নিজেকে সোঽহং-সম্প্রদায়ের বলিতেন।

একবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সাধু অমূল্যকেও দেখিলাম। কিন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার ভক্তদিগের অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। এক সময় তাঁহার সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, পরে তাঁহার চূড়ান্ত পতন দেখিয়া তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলাম।

স্বামীজী এ-সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, 'Ah! a great soul! a great soul" (আহা, একটি মহান্ আত্মা)।

এমন অধঃপতনের পরও স্বামীজী সাধু অমূল্যের নির্ভীক হৃদয় ও সেবাগত প্রাণটাই দেখিলেন। তাঁহার দোষের কথা একবারও মনে করিলেন না। আমাকে বলিলেন, 'তার এ জন্মটা নষ্ট হ'ল। যাক্, পরজন্মে মুক্ত হ'য়ে যাবে।' প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেন: অমূল্য তাঁহার সহিত একই কলেজে পড়িত। সে ছাত্র জীবনে ভাল ছেলে ছিল—মেধাবী ও বুদ্ধিমান্। তখনই তাহার হৃদয় উদার ও জ্ঞান-মার্গের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। সে গুরু-করণে বিশ্বাসী ছিল না। তাহার সাধনার জীবনে পুস্তক ও নিজের সংস্কারই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল।

কলেজ-জীবনে অমূল্য নরেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন, মনে হয়। শেষ

দিকে অঘোর ও নাগা সম্প্রদায়ের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব। তবে তাঁহার ভক্ত ও স্তাবকবৃন্দ বিশেষ মার্জিতরুচি ছিল না। এজন্য বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের সহিত নিম্নস্তরের সাধনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।

যাহা হউক, স্বামীজীকে তাঁহার জন্য বিশেষ বিচলিত হইতে দেখিয়া আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্বামীজী বলিলেন, 'মন্মথ! তুই এলাহাবাদে গিয়ে একবার অমূল্যর সঙ্গে দেখা করিস। আর তাকে বলিস, তোকে আমিই পাঠিয়েছি। তাকে জিগ্যেস করবি, তার কি চাই। সে যা বলবে, তা তুই তাকে এনে দিস।'

এলাহাবাদে ফিরিয়াই 'গুরুজী'র কাছে অনেক কাল পরে গেলাম। গিয়াই বলিলাম, 'মশাই! আপনার কাছে এসেছি স্বামীজী পাঠিয়েছেন ব'লে; তা না হ'লে আসতাম না। আপনার কি কি চাই আমাকে বলুন; তা আমি এনে দেব। স্বামীজী আমাকে এই রকম আদেশ করেছেন।'

অমূল্য আমার কথায় শ্লেষের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'অ্যা, স্বামীজী তোকে পাঠিয়েছে? স্বামীজী! তা সে কি বললে আমার কথা?' আমি যথাযথ সবিস্তারে জানাইলে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন এবং তাঁহার দুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হইল। কিছুটা ভাবাবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, 'তুই আমাকে চার পাঁচ সের গাওয়া ঘী এনে দিস, আর কিছু ফল এনে দিস্।' কয়েক দিনেই এক ভাঁড় গব্যঘৃত সংগ্রহ করিলাম। পশ্চিমে গাওয়া ঘী দুষ্প্রাপ্য বস্তু, ভয়সা ঘী প্রচুর পাওয়া যায়। কোন ক্রমে গব্যঘৃত কয়েক সের এবং কিছু ফল লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলাম। জিনিসগুলি সামান্যই। কিন্তু অমূল্য সাধু সেগুলি পাইয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। ইহাই আমার তাঁহার কাছে শেষবার যাওয়া। কিছুদিন তাঁহার কোন খোঁজ রাখি নাই। পরে শুনিলাম, তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে।

সাধু অমূল্য স্বামীজীর কথাগুলি শুনিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন। কৈশোরে যে বেদান্তদর্শন তাঁহার লক্ষ্যবস্তু ছিল, তাহার আভাস স্বামীজীর কৃপাবলে তাঁহার লাভ হইয়া থাকিবে। বন্ধুভাবে স্মরণ করিলেও স্বামীজী তাঁহাকে গুরুকৃপা করিয়াছিলেন মনে হয়। শেষের দিকে অমূল্য প্রায়োপবেশনের সংকল্প লইয়া জাহ্নবীতটে মাতা ভাগীরথীর কোলে তাঁহার পাপপুণ্যের সংস্কার ফেলিয়া দিয়া সাধনার জগতে প্রবেশ করিলেন। কে জানে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলাভের জন্য আবার কোথায় তপস্যা করিতেছেন!

স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'সাধু অমূল্য গুরু করেনি, তাই এ-রকম হ'ল। সাধকের পতনের উপক্রম হ'লে তার গুরুই তাকে unbalanced (বে-সামাল) হ'তে দেন না। গুরুই তাকে রক্ষা করেন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মশায়, আমার যদি পতন হয়, তাহলে কি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন?'

স্বামীজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'নিশ্চয় ক'রব। তোর সাধ্য কি তোর পতন হয়! আর যদি তুই নরকেও যাস্, তোর টিকি ধরে তোকে তুলে আনব।

(ক্রমশঃ)

'মানব-জমিন'

ডক্টর শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ

সবই কি ছায়াবাজী ?

কয়েকদিন আগে ট্রেনে ক'রে চলেছি। দু-পাশে কত ক্ষেত, কত নদী, কত বন, কত জঙ্গল ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে আমার মনেও ঐ রকম ভাবেই কত দৃশ্য, কত ঘটনা উঠছে, থাকছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। সবই ছায়াবাজী। ভাবছি জীবনও কি এই রকম? —ক্ষণস্থায়ী, অর্থহীন, স্থায়িত্ব নেই, উদ্দেশ্য নেই? তাই যদি হবে, তবে জীবনটাকে এত গুরুতর ব্যাপার মনে করি কেন? জীবনের ভার দুর্বহ মনে হয় কেন? কোথায় আটকাচ্ছে? কোথায় ভুল হচ্ছে?

পতিত মানব-জমিন

এমন সময় রামপ্রসাদের গানটি মনে উঠল :

মনরে, তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত—
আবাদ করলে ফ'লত সোনা।

ঠিক সেই সময়ে একটা জঙ্গল চোখে পড়েছে। আগাছায় লতায়-পাতায় সব মিশে একটি ঘন বন তৈরি হয়েছে। জমি যে আছে, তা দেখাই যাচ্ছে না। স্বতঃস্ফূর্ত আলোক, সর্বগ বাতাস, এ-সব প্রবেশের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ। তখন মনে উঠল, ঠিক তাই তো। কামনা বাসনা আসক্তিতে আমার মন যে একেবারে পরিপূর্ণ; এতে জ্ঞানের প্রকাশ, ভূমার উপলব্ধি যে একেবারেই অসম্ভব।

আবাদ আরম্ভ

কিন্তু ক্ষেত্রের আবাদ করতে হবে। তার আগে আগাছা কাটতে হবে। ক্ষেত্রজ্ঞ এলেন। এসে প্রথমেই বড় বড় গাছের বড় বড় ডালপালা কাটলেন, তাতে জড়ানো লতাপাতাগুলি কাটলেন। তাতে খানিকটা জমিতে সূর্যালোক ও বায়ুর প্রবেশ সম্ভব হ'ল। কিন্তু যেখানে যেখানে গাছের গুঁড়ি ছিল, সেগুলি সেখানে রয়েই গেল। সেখানটা সাফ হ'ল না। শ্রীগুরু এসে কিছু কিছু কামনা-বাসনার বিনাশ করেন বটে, শিষ্যের তখন মনে হয়, সে বড় সাধু হয়েছে, আসক্তি জয় করেছে। এ কথা সে হয়ত মুখে বলে না। কিন্তু তার মনে জাগে যে অপর সকলে আসক্তির দাস, আমি অনাসক্ত। আসক্তির প্রকোপ একটু কমেছে, শ্রীভগবানের আভাস কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অহঙ্কারের মূলগুলি এখনও যায়নি। এই অহঙ্কারের মূলগুলি উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত আবাদ সম্ভব নয়।

অহঙ্কারের মূল

মূলগুলি কাটবার কথা বলিনি। ওগুলি উৎপাটিত করার কথা বলছি। এইজন্য বলছি যে মূলই তো সর্বনাশ করে। মূলের দুটি কাজ: এক—অন্য স্থান থেকে রস আকর্ষণ ক'রে গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখা, দ্বিতীয়তঃ—গাছটিকে জমিতে দৃঢ়সংলগ্ন ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা। কিন্তু এই দুটি কাজই অলক্ষ্যে মাটির তলাতে হয়, চোখেই পড়ে না যে কখন কি হচ্ছে। শ্রীগুরুর কাছে আসবার আগে আমরাও বুঝতে পারি না, আমাদের মনে কিভাবে অহঙ্কার সূক্ষ্মভাবে সঞ্জীবিত হচ্ছে, কি ক'রে অহঙ্কার সুদৃঢ় হচ্ছে। হায়, এতদিন তো ভেবেছিলাম,—ভদ্রতা, শিষ্টাচার—যেগুলিকে সংসারে ভালো বলে, সেই রকম কাজকর্ম, আচার-ব্যবহার, কথাবার্তাই যথেষ্ট। শ্রীগুরু এসে বুঝিয়ে দেন, এর ভেতরে ফাঁকি কোথায়। ভদ্র ব্যবহার করি, অন্যে আমার সঙ্গে ভদ্র আচরণ

করবে ব'লে, অপরের কাছে বিনয় দেখাই, অপরের কাছে মান পাব ব'লে—শিষ্টাচার করি, সমাজের শাসনে, রাষ্ট্রের শাসনে—এগুলি যে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। শ্রীভগবানের পথে এগুলির যে কোনও মূল্য নাই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হ'তে হবে। তবে সেই নিরপেক্ষ সত্তার সন্ধানে বেরুতে এ পথের এই একমাত্র পাথেয়।

জমির সমতা থাকে না

মূল উৎপাটিত করাতে জমি বিপর্যস্ত হ'ল। জমির সমতা রইল না; বিষম হ'ল। আবাদের সময় এ 'বিষম' সমুপস্থিত হবেই। এই 'বিষম' না এলে ক্ষেত্র বুঝতেই পারে না যে ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে। অর্জুন জানতেন—তিনি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনই তাঁর কর্তব্য। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখলেন বিষম ব্যাপার। আত্মীয়বধ, স্বজনবধ, গুরুজনবধ—এ সব না ক'রে ক্ষাত্রধর্ম পালন করা যায় না। তখন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের কাছে ক্ষেত্রের ধর্ম বুঝতে চাইলেন। এবং তার পরেই ক্ষেত্রজ্ঞের আবির্ভাব বুঝতে পারলেন। যিনি শুধু সখা বা স্বজনমাত্র ছিলেন, তিনি যে কি হলেন সে কথা দূরে থেকে স্মরণ করেও সঞ্জয়ের পুনঃ পুনঃ রোমহর্ষণ হ'তে লাগল। তাই বলছিলাম, ক্ষেত্র বিষম না হ'লে ক্ষেত্রজ্ঞ আসেন না, তাঁর মহিমা বোঝা যায় না, আবাদ হয় না।

সর্বত্র হলচালনা

ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রের কোন অংশই বাদ দেন না। যেখানে মূল গভীরভাবে প্রোথিত আছে সেখানেও হলচালনা করেন। ক্ষেত্রের বুক বিদীর্ণ হয়। তখন সে অনুভব করে, বাসনা-কামনা কি নিবিড় ভাবেই তাকে ছেয়ে রেখেছিল। যাদের আদর ক'রে সে একদিন বুকে তুলেছিল, এখন তাদের সরাতে হচ্ছে—এতে ব্যথা আছে বই কি! ত্যাগে কষ্ট আছে বই কি! কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ শুধু হল চালনা করছেন না, তিনি যে তাঁর শ্রীচরণের স্পর্শ দিচ্ছেন ক্ষেত্রের সর্বত্র। আহা, সে স্পর্শ যে ক্ষেত্র পেয়েছে সে তো বলবেই, 'প্রভুজী, চরণকী পাশ বুলাও। অঙ্গসে অঙ্গ লাগাও।'

আগাছার রূপান্তর

তখন বিষম থেকে সমে এসেছি। জমিটা আর বন্ধুর নেই, সমতল হয়েছে। কিন্তু তবু কি ক্ষেত্রের খেদ যাচ্ছে? ভাবছে, 'প্রভু, কই তুমি আমার কামনা-বাসনাগুলিকে দূর করলে না তো, সেগুলিকে চাপা দিলে মাত্র। আমার বাসনা সব রয়েই গেল যে। একি হ'ল ঠাকুর!' ক্ষেত্রজ্ঞ হাসেন বলেন, 'থাম্, থাম্, তুই ক্ষেত্রজ্ঞ—না, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ? তুই ক্ষেত্রের কি বুঝিস্ বল্‌তো? ছাখ না যা করেছি, তার ফল কি হয়! তোর জমিটা যে পালটে দিয়েছি। আগে জমিতে কেবল কাঁটা-জঙ্গল ছিল, মনেতে ছিল কেবল কামনা-বাসনা। এখন যে তাতে আলো-কের, বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিস। আর ঐ যে ঘাস-গুলি ফেলে দিইনি, তার কারণ ওগুলিতেই জমির উর্বরা শক্তি বাড়বে। যে কামক্রোধ-গুলি আগে তোকে কত কষ্ট দিয়েছে, এখন সে গুলিই কত উপকারে আসবে। মনটা যে পালটে দিয়েছি। এখন ঠাকুরকেই কামনা করবি। তাঁকে না পাবার জন্য ক্রোধ হবে। তিনি যে লোভের জিনিস, এটা ঠিক বুঝবি। তুই যে সামান্য নয়, তিনি যে তোর আপনার—এই মদ বা গর্ব আসবে। 'সে রূপ একবার হেরে কলুষ হরে, কিবা করুণাভরা আঁখিরে'—এতে তো মোহ হবেই। অপর ভক্তদের কেমন সুন্দর হচ্ছে, তোর কিছু হচ্ছে না,—এ মাৎসর্য হবে বই কি! তুই কি ক্ষেত্রজ্ঞ? তুই কেমন ক'রে বুঝবি যে, কবে ক্ষেত্র নরম হয়েছে, কবে তাতে বীজ

প্রোথিত করেছি। কবে তোকে ব্যাকুলতা দিয়ে ক্ষেত্রে অশ্রু-জল ফেলিয়েছি, কবে পচা কামনা-বাসনাকে সারে রূপান্তরিত করেছি—এসব তুই বুঝবি কেমন ক'রে? তুই শুধু এইটে জেনে রাখ্, এইটে বোঝ্ যে তোর ক্ষেত্রের জন্য একজন ক্ষেত্রজ্ঞ তুই পেয়েছিস্। তোর আর ভাবনাচিন্তা নেই।'

অঙ্কুরোদ্গম

তবু কি ক্ষেত্র আশ্বস্ত হয়? তবু কি সে এ আশ্বাস মানে? যখন অঙ্কুর হয়েছে, তখনও ভাবছে, 'একি হ'ল? এই কি ভগবান-লাভ? যে কামনা-বাসনার নাশ করা হ'ল, সেগুলি কত প্রকাণ্ড ছিল। আর এতো একরত্তি। বাতাসে কাঁপে, রোদ্দুরে শুকোয়, দেখতেও তো ঠিক ঘাসেরই মতন। ঠাকুরকে পেলুম না, এক একবার মনে হয় মাত্র। এ চাওয়া কি চাওয়া হচ্ছে?' ক্ষেত্রজ্ঞ হাসেন, বলেন, 'তুই কি কখনও ধান দেখেছিস যে ধান জানবি? আমি ধান জানি, এককে বহু করাই যে আমার কাজ। আমার অন্য কাজ নেই। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলানো, এই আমার খেলা।'

সফলতা

কি আশ্চর্য! কিছু বাদে ক্ষেত্র অনুভব করে—তাই তো ক্ষেত্রজ্ঞ ঠিকই বলেছেন। ঈশ্বর-বাসনা তো অন্য কামনার মতো নয়। এই ক্ষীণ বাসনার কী বিপুল শক্তি! সে অনুভব করে—'যে জন চতুর সুমেরু শিখর সুতায় বাঁধিতে পারে; মাকড়ের জালে মাতঙ্গ বাঁধিলে এসব মিলয়ে তারে।' যতই সে এই চিন্তা করে, ততই সে সমুন্নত হয়, অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়। শ্যামলতা আর থাকে না। সে যে শুধু সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয় এমন নয়, সেই আভা তার সারা গায়ে ফুটে ওঠে। শিশিরের পেলবতাতে আর সৌকুমার্যে সে মণ্ডিত হয়। বাতাস এসে তার কানে কানে কি মেদুর বাঁশীর সুর বাজিয়ে তাকে দোলা দিয়ে যায়। সে থেকে থেকে কেঁপে ওঠে; কখন বা অশ্রুসিক্ত, কখন বা হাস্যদীপ্ত। তার শীর্ষদেশে সে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বর্ণপ্রভ আশীর্বাদ বহন করছে। সে জানে, তাতে ক'রে যে জগতের ক্ষুধা মিটবে এই শুধু নয়, তাতে তার নিজের অমৃতত্বও নিহিত আছে। সে মরেও মরবে না। সে মরতে পারে না। সেই অমৃতের সুবাস আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে।

পতিত যে পতিতই রইল

ট্রেন ছুটে চলেছে। তখন মনে উঠছে, 'হায়, ঠাকুর, এ সবই কি কথার কথা? ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ—এসব কি পুঁথির পাতাতেই নিবদ্ধ থাকবে? তুমি কি শুধু গুটিকয়েক ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলাবার জন্যই আস? বন বাদাড়, পতিত জমি—এইতো বেশী দেখতে পাচ্ছি। কটি ক্ষেত্রে ধান ফলছে?' তখন মনের মধ্যে ঠাকুরই উত্তর দিচ্ছেন, 'তুই কি জানিস্ না যে আমি শুধু ক্ষেত্রজ্ঞ নই, ক্ষেত্রস্বামীও। জমি পতিত হ'ক আর যাই হ'ক, ও আমারই জমি। ওর এক ইঞ্চিও অপরে নিতে পারে না। সামান্য জমিদার কত কাণ্ড ক'রে, কত ফৌজদারী ক'রে নিজের অধিকার বজায় রাখে, আর আমি বুঝি ছেড়ে দেব? পতিত রেখেছি—সে আমার ইচ্ছা। আমার কাছে পতিতই বা কি, আর শস্যপূর্ণই বা কি—তুই-ই আমার জমি। আজ যে ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ, কাল সে পতিত; আবার আজ যে ক্ষেত্র পতিত, কাল সে শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ, কে বুঝবে বল্ তো?'

'তুঁহু জগন্নাথ'

এ কী ঠাকুর! একী হ'ল? পতিত থাকবার গ্লানি আমার মন থেকে চলে যাচ্ছে যে, আমি কি একেবারেই জড়? তোমাকে চাই না। তবু ব্যাকুলতা নেই! না, না, তুমি যে ব্যথাহারী, তাই ব্যথা দূর হয়েছে। সত্যি তো, আমি কেন ব্যাকুল হবো? তুমি তো স্বীকার করেছ, প্রভু, যে আমি তোমার,—আমি যাই হইনা কেন, আমি যে তোমার,—তুমি জগন্নাথ, আমি তো জগৎছাড়া নই,—তুমি আমারও নাথ, আমার স্বামী, আমার প্রভু, আমার দয়িত, আমার প্রিয়, আমার ঠাকুর। তুমিই তো বলেছ যে তোমারই সব, আমিও তোমার, তাহলে মানব-জমিন পতিত থাকুক আর সোনাই ফলুক, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। তোমারই জমি, তোমারই ফসল!

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

বিষয়-পরিত্যাগ বিড়ম্বনা

তৃষ্ণানদী উত্তীর্ণ হইয়া যোগিগণ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, কিন্তু বিষয় পরিত্যাগ করা কিংবা তৃষ্ণারহিত হওয়া অসম্ভব। বিষয়-ত্যাগ বড়ই দুষ্কর, কারণ মোহ-প্রভাবে সে চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিরল কোন ভাগ্যবান পুরুষই উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন—ইহাই বর্তমান দশটি শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরপরিগৃহীতাশ্চ বিষয়াঃ
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্ ॥১১॥

অনাদি সংসার-পরম্পরায় (জন্ম পরম্পরায়) সকাম পুণ্যকর্মসমূহে আমি কোন কল্যাণ দেখিতে পাই না। পুণ্যকর্মাদির ফল (সম্পদাদি) বিচার-দৃষ্টিতে (অনিত্য ও দুঃখদ বলিয়া) আমার চিত্তে ভয়ই উৎপন্ন করিতেছে। মহা পুণ্য দ্বারা সঞ্চিত দীর্ঘকালব্যাপী বিষয়ভোগ বিষয়াসক্তদের অশেষ দুঃখদান করিবার জন্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১১

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাপি বিষয়া
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ
স্বয়ং ত্যক্তা হ্যেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি ॥১২॥

বিষয় সর্বদা পরিত্যাজ্য। পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্বক বিষয় ত্যাগ করিলে উহা তাহার পরম আনন্দের হেতু হইয়া থাকে—তাই বলিতেছেন: দীর্ঘকালস্থায়ী ভোগও একদিন অবশ্য শেষ হইয়া যায়। বিষয় নিজেই নিঃশেষিত হ'ক বা পুরুষ তাহাকে ত্যাগ করুক, উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়ের সহিত বিচ্ছেদ—এই দুই প্রকার বিচ্ছেদের প্রভেদ কি? তবে বিষয়াসক্ত মানব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করে না কেন? বিষয় স্বয়ং পুরুষকে ত্যাগ করিলে (অর্থাৎ বিনষ্ট হইলে) উহা ঐ ব্যক্তির অসীম মানসিক পরিতাপের হেতু হইয়া থাকে; কিন্তু পুরুষ স্বয়ং তুচ্ছত্ববুদ্ধি সহায়ে উহা ত্যাগ করিলে ঐ ত্যাগ তৃষ্ণোপশমরূপ অসীম সুখের কারণ হইয়া থাকে।১২

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকনির্মলধিয়ঃ কুর্বন্ত্যহো দুষ্করম্
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগভাঞ্জ্যপি ধনান্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ।
সম্প্রাপ্তান্ন পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তৌ দৃঢ়প্রত্যয়ান্
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহানপি পরং ত্যক্তুং ন শক্তা বয়ম্ ॥১৩॥

বিষয়-ত্যাগে সমর্থ নিঃস্পৃহ বিবেকিপুরুষগণকে অভিনন্দন করত মনোরথমাত্রলব্ধ ধনাদিতে স্পৃহাযুক্ত ব্যক্তিকে ভর্তৃহরি নিন্দা করিতেছেন: ব্রহ্মজ্ঞান-বিচার সহায়ে নির্মলচিত্ত মহাপুরুষগণ সম্পূর্ণ

স্পৃহাশূন্য হইয়া দারাপুত্রধনাদি প্রাপ্তভোগ্যবস্তুও ত্যাগ করিয়া থাকেন ; অহো ! ইঁহারা কি দুষ্কর ব্রতই না সাধন করিয়া থাকেন ! আমরা কিন্তু—যে বস্তু অতীতে লব্ধ হয় নাই, বর্তমানেও যাহা হস্তগত নহে এবং ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইলেও যাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না, এমন কল্পিত বিষয়সমূহে অর্থাৎ বিষয়ের আশাও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নই ।১৩

ধন্যানাং গিরিকন্দরেষু বসতাং জ্যোতিঃ পরং ধ্যায়তাম্
আনন্দাশ্রুকণান্ পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ ।
অস্মাকং তু মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতট-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরং ক্ষীয়তে ॥১৪॥

নির্জনসেবী আত্মচিন্তনপরায়ণ পুরুষগণই ধন্য, সুখচিন্তন-তৎপর ব্যক্তির জীবন ব্যর্থ, তাই কবি বলিতেছেন : নির্জন গিরিকন্দর-নিবাসী জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরব্রহ্মের ধ্যানকারী পুণ্যাত্মা মহাত্মাগণের নেত্রবিগলিত আনন্দাশ্রু তাঁহাদের অঙ্কোপবিষ্ট বিহঙ্গকুল নির্ভয়ে পান করিয়া থাকে। অহো তাঁহারা ধন্য ! আমাদের জীবন মনোরথরচিত ভবন ও জলাশয়তটের ক্রীড়াকাননে বিহারকৌতুকাসক্ত হইয়াই ব্যতীত হইয়া গেল, (অর্থাৎ মিথ্যা কল্পনাতেই অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে) ।১৪

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্ ।
বস্ত্রং বিশীর্ণ-শতখণ্ডময়ী চ কন্থা হা হা তথাপি বিষয়া ন পরিত্যজন্তি ॥১৫॥

বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। বিষয়াভিভূত অথচ অনুতপ্ত পুরুষের ভাব লইয়া লেখক বলিতেছেন : আমি মধুরাদিরসবিহীন ভিক্ষান্নে প্রাণ ধারণ করিতেছি, আহার একবার মাত্র। ভূমিতলই আমার শয্যা অর্থাৎ শয্যাচ্ছাদন কিছুই নাই ও একমাত্র স্বদেহই আমার কুটুম্ব অর্থাৎ সেবক-স্বজনাদি আমার কেহই নাই ; শতবিচ্ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড-রচিত কন্থাই আমার পরিধেয় বসন অর্থাৎ বাহ্য ভোগসাধন সর্বস্বই আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু হায় ! কি আশ্চর্য, এরূপ অবস্থাতেও বিষয়বাসনা আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ।১৫

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনকলশাবিত্যুপমিতৌ মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্ ।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরশিরঃস্পর্ধি জঘনং মুহুর্নিন্দ্যং রূপং কবিজনবিশেষৈর্গুরুকৃতম্ ॥১৬॥

কবিগণ অতি রমণীয় বলিয়া বর্ণনা করিলেও বিচারদৃষ্টিতে কামিনীর রূপ ভোগ্যবিষয়, সুখ ও দুঃখের কারণ তাহা ত্যাগের জন্য এই শ্লোকে তাহার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে ।১৬

একো রাগিষু রাজতে প্রিয়তমা দেহার্ধধারী হরো
নীরাগেষু জনো বিমুক্তললনাসঙ্গো ন যস্মাৎ পরঃ ।
দুর্বারস্মরবাণপন্নগবিষব্যাবিদ্ধমুগ্ধো জনঃ
শেষঃ কামবিড়ম্বিতান্ন বিষয়ান্ ভোক্তুং ন মোক্তুং ক্ষমঃ ॥১৭॥

একমাত্র মহাদেবই যথার্থ অনুরাগী ও বিরক্ত ;—অনুরাগিপুরুষগণের মধ্যে আপন প্রিয়তমা পার্বতীর অর্ধাঙ্গ বামাঙ্গে ধারণকারী মহাদেব অতুলনীয়রূপে বিরাজমান, অর্থাৎ ক্ষণমাত্রবিচ্ছেদেও অসহিষ্ণু হইয়া বামাঙ্গে প্রিয়তমাকে ধারণ করাতে সদাশিব প্রেমিকশ্রেষ্ঠ ; পুনঃ বীতরাগ পুরুষ-

গণের মধ্যেও মহাদেব হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নাই, কারণ ললনার প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি নাই। এই দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত অপর সকলেই দুর্নিবার মদনবাণরূপ সর্পের বিষে বিদ্ধ হইয়া মূঢ় হইয়া আছে, তাহারা কামপ্রেরণায় সংগৃহীত (স্ত্রী-অন্ন- পানাদি) বিষয় ঠিক ঠিক ভোগ করিতেও পারে না, ত্যাগ করিতেও পারে না। ১৭

অজানন্ দাহাত্ম্যং পততু শলভস্তীব্রদহনে
স মীনোঽপ্যজ্ঞানাদ্ বড়িশযুতমশ্নাতু পিশিতম্
বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥১৮॥

মোহের দুর্নিবারত্ব বর্ণিত হইতেছে : রূপমুগ্ধ পতঙ্গ অগ্নির দহন-সামর্থ্য (ও দহন-যন্ত্রণা) না জানিয়া জাজ্বল্যমান অগ্নিতে প্রবেশ করে ও বিনষ্ট হয়, মৎস্যও আসন্ন বিনাশ বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়াই বঁড়শি-গ্রথিত মাংসখণ্ড গিলিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হায়, কি আশ্চর্য, আমরা বিচারে সমর্থ হইয়াও অশেষ অনর্থ-সঙ্কুল ভোগ্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিতে পারি না। অহো! মোহের মহিমা কি দুর্বিজ্ঞেয়!১৮

তৃষা শুষ্যত্যাস্যে পিবতি সলিলং শীতমধুরম্
ক্ষুধার্তঃ শাল্যন্নং কবলয়তি মাংসাদিকলিতম্
প্রদীপ্তে কামাগ্নৌ সুদৃঢ়তরমালিঙ্গতি বধূম্
প্রতীকারং ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্যস্যতি জনঃ ॥১৯॥

অজ্ঞান-প্রভাবেই ভোগবিষয়ে পুরুষ সুখবুদ্ধি করিয়া থাকে।—তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মানুষ শীতল সুমিষ্ট জল পান করিয়া থাকে, ক্ষুধার্ত হইলে দধি-ঘৃত-মাংসাদিসহ সুস্বাদু অন্ন ভোজন করে, ইত্যাদি। বিচারদৃষ্টিতে ঐগুলি তত্তৎ রোগের প্রতিষেধক ঔষধমাত্র, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ লোকে ঐগুলি সুখ—এইরূপ বিপরীত জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

তুঙ্গং বেশ্ম সুতাঃ সতামভিমতাঃ সংখ্যাতিগাঃ সম্পদঃ
কল্যাণী দয়িতা বয়শ্চ নবমিত্যজ্ঞানমূঢ়ো জনঃ
মত্বা বিশ্বমনশ্বরং নিবিশতে সংসারকারাগৃহে
সংদৃশ্য ক্ষণভঙ্গুরং তদখিলং ধন্যস্তু সংন্যস্যতি ॥ ২০ ॥

সংসারবিষয়াসক্তিবশতঃ অজ্ঞানী বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবেকী পুরুষ সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করত কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।—সমুন্নত গৃহ, বিদ্বজ্জনপ্রশংসিত বিদ্যাবিনয়াদিগুণবিশিষ্ট পুত্রগণ, অপরিমিত ধনরাশি, কল্যাণী পত্নী ও নব যৌবন লাভ করত মোহমুগ্ধ মানব ঐ গুলি চিরস্থায়ী মনে করিয়া সংসাররূপ কারাগৃহে প্রবেশ করে এবং আসক্ত হয়। কিন্তু ভাগ্যবান পুরুষই সম্যক্ বিচার সহায়ে সর্ববিষয়ভোগ ক্ষণস্থায়ী জানিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শ্রীশৈলম্-যাত্রা

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

বহুদিন হইতে বিখ্যাত শিবক্ষেত্র 'শ্রীশৈলম্' দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দেবাদিদেব মহাদেবের অশেষ কৃপায় সম্প্রতি উহা পূর্ণ হইয়াছে।

এ বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী-উৎসবে স্থানীয় ভক্ত ও বন্ধুদের সাগ্রহ আহ্বানে হায়দ্রাবাদ যাইবার সুযোগ হইয়াছিল। সেকেন্দ্রাবাদের উপকণ্ঠে বেগমপেট এরোড্রোমের পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণমঠ সুন্দর ও নির্জন পরিবেশে অবস্থিত। মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শিষ্য স্বামী যোগেশ্বরানন্দ কর্তৃক উক্ত মঠ প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে স্থাপিত। বর্তমানে স্থানীয় কয়েকজন ভক্ত উহার পরিচালনা করিতেছেন। এই দূর দেশেও শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতি অশেষশ্রদ্ধাসম্পন্ন বহুসংখ্যক ভক্ত ও বন্ধু দর্শনে আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছিল। এই আনন্দ পরিপূর্ণতা লাভ করে—যেদিন সেকেন্দ্রাবাদে মহবুব কলেজ হলে স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু বলিবার আহ্বান আসে, কারণ ঐ হলের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াই আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ১৮৯৩ খৃঃ ১২ই ফেব্রুআরি প্রায় একসহস্র শ্রোতার সম্মুখে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার প্রথম সাধারণ অভিভাষণ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ঐ হল আমাদের নিকট একটি তীর্থস্থান।

হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহর দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান মাত্র চার মাইল। সেকেন্দ্রাবাদ শহরে বিখ্যাত পুরাতন কালীমন্দির দর্শনে খুব আনন্দ হইল। উভয় শহরের এবং উহাদের নিকটবর্তী অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ, যথা—সালর-জঙ্গ মিউজিয়াম, গোলকুণ্ডা ফোর্ট, ওসমান সাগর প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্বক সেকেন্দ্রাবাদ হইতে রাত দশটায় বাঙ্গালোর-গামী ট্রেনে উঠিয়া ১৫১ মাইল দূরে কার্নুল শহরে অবতরণ করি ভোর পাঁচটায়। কার্নুল অন্ধ্রপ্রদেশের একটি জিলা-শহর। অন্ধ্রপ্রদেশ মাদ্রাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর কার্নুলেই প্রথম অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। বেশ বড় শহর। মাদ্রাজ হইতে ইহার দূরত্ব ৪০৭ মাইল। বোম্বাই লাইনের গুণ্টাকল জংশনে ট্রেন বদল করিয়া মিটার গেজ ট্রেনে কার্নুল যাইতে হয়।

কার্নুল হইতে রোজ দুইখানি বাস শ্রীশৈলম্ যায়—প্রথমখানি ছাড়ে ভোর সাড়ে পাঁচটায় এবং দ্বিতীয়খানি দুপুর সাড়ে বারোটায়। কার্নুল হইতে শ্রীশৈলম্ ১১০ মাইল। পথে বাসের দুইটি প্রধান বিরতিস্থান; প্রথমটি ৪৫ মাইল দূরে আত্মকুরে, পথ সমতল; দ্বিতীয়টি দোরনালে, আত্মকুর হইতে ইহার দূরত্ব ৪০ মাইল—কিছু কিছু চড়াই উৎরাই আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর--দুই পাশে শাল ও বাঁশের ঘন জঙ্গল। কোথাও ক্বচিৎ আবাদী ক্ষেত্র দেখা যায়। দোরনাল হইতে প্রকৃত পাহাড়ী রাস্তা শুরু হইল—এখান হইতে শ্রীশৈলমের দূরত্ব ৩৫ মাইল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। পথের দুধারে নানাপ্রকার বৃক্ষলতা পুষ্প-পরিপূর্ণ জঙ্গল। দৃশ্য অতি মনোহারী। সর্বোচ্চ স্থান যাহা অতিক্রম করিতে হয়, সমুদ্র হইতে তাহার উচ্চতা ২৮৩৫ ফুট। উহার পরই আবার উৎরাই শুরু। পাঁচ-ছয় মাইল

দূর হইতেই শ্রীশৈলম্ পর্বতের বিস্তীর্ণ উপত্যকা ও মন্দির এবং তাহার পাশেই কৃষ্ণানদী দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণানদীকে এখানে পাতাল-গঙ্গা বলা হয়। মন্দির হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। জল স্পর্শ করিতে হইলে অনেক নীচে নামিতে হয়। অনেক যাত্রী এই পবিত্র নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া থাকেন। মন্দিরের খুব কাছেই বাস-স্ট্যাণ্ড। কার্নুল হইতে শ্রীশৈলম্ পৌছাইতে প্রায় ছয় ঘণ্টা লাগে, এবং বাসের ভাড়া টাকা ৬৩৭। এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যতম জিলা-শহর গুণ্টুর, মহকুমা-শহর নন্দীয়াল এবং রেলওয়ে জংশন গুণ্টাকল হইতেও শ্রীশৈলম্ পর্যন্ত সোজা বাস চলে। 'শ্রীশৈলম্ দেবস্থানম্' কর্তৃক বাসগুলি পরিচালিত; ঐ গুলি মন্দিরেরই সম্পত্তি। উহা হইতে মন্দিরের বেশ আয় হয়। রাস্তা বরাবরই পিচের; গত দুই বৎসর হইতে শ্রীশৈলম্ পর্যন্ত বাস যাতায়াত করিতেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন ঐ তীর্থ দর্শন করিতে আসেন, তখন রাস্তাগুলি নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য, দূর হইতে হাজার হাজার দর্শনেচ্ছু ভক্ত নরনারীর মন্দির-দর্শনের খুবই সুবিধা হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বেও আত্মকুর হইতে বাসে নাগলুটি পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে পদব্রজে ২৫ মাইল অতিক্রমপূর্বক শ্রীশৈলমে পৌছিতে হইত। পাকদণ্ডী পথে দূরত্ব কম ছিল। যাঁহারা পদব্রজে যাইতেন, তাঁহারা শ্রীশৈলমের পাঁচ মাইল পূর্বে 'শেখর' নামক মন্দিরের চূড়ায় আরোহণ পূর্বক সেখান হইতে প্রথমে মন্দির দর্শন করিতেন। শেখরের উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফুট; উঠিবার সিঁড়ি আছে। এখনও গরীব যাত্রীরা নাগলুটি হইতে পদব্রজেই গমন করিয়া থাকেন। দেবাদিদেব মহাদেবের স্মরণ মনন করিতে করিতে মনোরম লতাপুষ্প-শোভিত পাহাড়ী পথ ধীরে ধীরে অতিক্রম পূর্বক অবশেষে গন্তব্যস্থল—শ্রীভগবানের পদতলে উপস্থিত হইতে পারিলে যাত্রীর মন বিমল আনন্দে ও স্বস্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইত। আজকাল সর্বত্র যানবাহনের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গম তীর্থগুলি অনেকেই হয়ত দর্শন করিতে পারিতেছেন, কিন্তু ঐ স্থানগুলির গাম্ভীর্য যেন কমিয়া যাইতেছে।

সহজলভ্য বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ সাধারণতঃ কমই হইয়া থাকে। যাহা দুর্লভ ও কষ্টসাধ্য—তাহা পাইলে মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। শ্রীভগবান ভক্তানুগ্রহার্থই যেন স্বীয় আবাসস্থান নির্বাচন করিয়াছিলেন বিপৎসঙ্কুল ও অত্যন্ত দুর্গম পাহাড় পর্বত গুহা ও জঙ্গলের মধ্যে। বদরীনাথ, কেদারনাথ, কৈলাস, অমরনাথ প্রভৃতি উহার সাক্ষ্য দেয়। স্বভাবতই ঐসব তীর্থদর্শনে পূর্বে অনেক সময় লাগিত এবং তীর্থযাত্রীরা ঐ সময় শ্রীভগবানের স্মরণ-মননে অতিবাহিত করিত।

যাহা হউক, এখন আমরা পূর্বকথার অনুসরণ করি। পূর্ব-ব্যবস্থানুযায়ী কার্নুলের পরিবহণ-পরিচালক শ্রীশৈলম্-গামী একখানি বাসে আমাদের জন্য আসন পূর্বেই সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভোর ৬টায় তাঁহার বাসা হইতেই আমরা বাসে উঠিলাম। এতদিনের স্বপ্ন শীঘ্রই সফল হইবে ভাবিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। দ্রুতগামী (express) বাসটি পথে মাত্র ৩।৪ জায়গায় থামিয়া দীর্ঘ ১১০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্বক দুপুর সাড়ে বারোটায় আমাদের মন্দিরের প্রায় সামনে আনিয়া উপস্থিত করিল। এখানে প্রথমে ধূলাপায়ে ঠাকুর-দর্শনের বিধি আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে আমাদের বিছানাপত্র রাখিয়া তাড়াতাড়ি গোপুরম্ অতিক্রমপূর্বক

গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা পর্যন্ত কোনরূপ দর্শনী না দিয়া সকলেই দর্শন করিতে পারেন। অন্য সময় যাইতে হইলে যাত্রীপিছু ১৲ টাকা প্রবেশ-ফি দিতে হয়। মন্দিরের কর্মচারীকে ১৲ টাকা দিয়া আমরা গর্ভমন্দিরে একেবারে দেবতার সামনে আসিয়া পড়িলাম। ভিড় কম থাকায় খুব ভালভাবেই দর্শনাদি হইল। দর্শনী দিয়া যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সকলেই ভগবানকে মস্তকের দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন।

মন্দিরের কর্মচারীকে পূর্বেই খবর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি বাথরুমসহ দুইকামরার একটি কুটীরে (cottage) আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের একটি প্রাক্তন ছাত্রও আমার সঙ্গে হায়দ্রাবাদ হইতে আসিয়াছিল। এই কুটীরগুলির ২৪ ঘণ্টার ভাড়া ১০৲। ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, কিন্তু জলের ব্যবস্থা তখনও হয় নাই। কুটীরের রক্ষক রাস্তার ধারে অবস্থিত জলের কল হইতে জল আনিয়া দেয়। আসবাবের মধ্যে দুই খানি লোহার খাট, টেবিল, চেয়ার, জলের কুঁজা, ঘড়া ও বাথটব আছে। এইরূপ মাত্র ৫টি কুটীর আছে। আমার পাশের কুটীরে শৃঙ্গেরী-মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য সদলবলে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনদিন পূর্বে তিনি শ্রীশৈলম্ দর্শনে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে প্রায় ৭০।৮০ জন লোক, ২টি মটরগাড়ী, ১টি লরী ও ২টি ছোট বাস, সবই ওঁর নিজের। অন্ধ্র গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫।৬ জন পুলিশ কনেস্টবল তাঁহার শরীর-রক্ষক হিসাবে আসিয়াছিল। উনি ঐদিনই বিকালে রওনা হইবেন, কাজেই স্নানের পরই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া ২০।২৫ মিনিট হিন্দীতে কিছু আলাপ করিলাম। রামকৃষ্ণ মঠের কোন কোন সাধুকে তিনি চেনেন, কয়েকটি আশ্রমেও গিয়াছেন; উদারভাবসম্পন্ন দেখিয়া আনন্দ হইল। আমাদের কিছু কিছু পুস্তকাদিও পড়িয়াছেন, অনেক ভাষা জানেন, সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। তাঁহার মাতৃভাষা তেলুগু। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিলেন, 'উনি তো সমাধিমান্ পুরুষ ছিলেন।' আরও বলিলেন, 'আজকাল সাধুরা কিছু সেবাকাজ না করিলে দেশের লোক তাহাদের পছন্দ করে না, কিন্তু আমাদের কোন কাজ করার উপায় নাই, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুরা দেশের সেবা করিয়া আমাদের মুখ রক্ষা করিতেছেন'—ইত্যাদি। তেলুগু ভাষায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ' পুস্তক তাঁহাকে উপহার দিলাম, এবং তিনিও খুব আনন্দের সঙ্গে উহা গ্রহণ করিলেন। সাড়ে তিনটার সময় তিনি সদলবলে রওনা হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে মন্দিরের ভোজনালয় (canteen) হইতে বড় টিফিন কেরিয়ারে আমাদের খাবার আসিয়া গিয়াছে। আহারের পর একটু বিশ্রামান্তে শ্রীশৈলম্ স্থানটি দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। সমগ্র উপত্যকাই প্রায় মন্দিরের সম্পত্তি। রাস্তার দুধারেই বিরাট বিরাট ধর্মশালা নির্মিত হইতেছে। ঐসব কাজের জন্য প্রায় পাঁচশত শ্রমিক পরিবার এখানে অস্থায়িভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। তাহাদের জীবনযাত্রা খুবই অনাড়ম্বর। 'তিরুপতি দেবস্থানম্'ও এখানে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিতেছেন। এখানে ডাকঘর, হাসপাতাল, থানা এবং একটি টুরিষ্ট-হোম আছে। দেখিলাম, কয়েকজন ইওরোপীয় ভদ্রলোকও এই স্থানটি দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। অন্ধ্র সরকারের বিশেষ আগ্রহ যে, তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার সময় ২৫।৩০ কোটি টাকা

ব্যয়ে এখানে একটি জলাধার (Dam) নির্মাণ করা হয়। বলা বাহুল্য, ঐ কাজ আরম্ভ হইলে এখানকার সৌন্দর্য অনেকাংশেই ব্যাহত হইবে। কয়েকটি দোকান ও ২।৩টি হোটেল আছে। যে হারে নির্মাণকার্য চলিতেছে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই ইহা একটি ছোটখাটো শহরে পরিণত হইবে।

স্থানটি দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল ছিল বলিয়া পূর্বে বছরে মাত্র কয়েকদিন করিয়া দুইবার পুরোহিতরা আসিয়া ভগবানের পূজাদি করিতেন—শিবরাত্রির সময় কয়েকদিন এবং তেলুগু নববর্ষের (মার্চ-এপ্রিল) সময় কয়েকদিন। কিন্তু বাস-চলাচলের পর হইতে এখন রোজই নিয়মিত পূজাদি হইয়া থাকে। গত শিবরাত্রির সময় কয়েকদিন ধরিয়া প্রায় এক লক্ষ যাত্রী আসিয়াছিল। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রান্তরেই তাহারা রন্ধনাদি কার্য ও রাত্রে শয়ন করিয়াছিল। শীতকালে বাঘের উপদ্রব খুব বেশী। গত শীতের সময়ও ৫০।৬০টি গবাদি পশু বাঘে লইয়া গিয়াছে। সাপও যথেষ্ট—কখন কখন রাতে বিছানায় পর্যন্ত আসে, কিন্তু বোধ হয় শিবের স্থান বলিয়া এ পর্যন্ত কাহাকেও দংশন করে নাই।

মন্দিরের প্রবেশ-পথ বড়ই অপরিষ্কার। এ বিষয়ে মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। মন্দিরের মধ্যে কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দিরের চারিপাশে সুউচ্চ পাথরের দেওয়াল। দেখিলেই মন্দিরটি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের উঠান পাথর দিয়া বাঁধানো।

ভারতবর্ষে বিখ্যাত দ্বাদশটি শিবক্ষেত্র আছে। ঐসব স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ বলা হয়। শ্রীশৈলমে অধিষ্ঠিত দেবতা শ্রীমল্লিকার্জুন এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়। জ্যোতির্লিঙ্গগুলির নাম :

(১) শ্রীসোমনাথ (সৌরাষ্ট্রের প্রভাসপট্টনে),

(২) শ্রীমল্লিকার্জুন (অন্ধ্রদেশের শ্রীশৈলম্‌ পর্বতে),

(৩) শ্রীমহাকাল (উজ্জয়িনীতে),

(৪) শ্রীওঁকারেশ্বর (নর্মদাতীরে ; ইহার অপর নাম অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর),

(৫) শ্রীকেদারনাথ (হিমালয়ে),

(৬) শ্রীভীমশংকর (দুইটি স্থানকে ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বলিয়া দাবী করা হয়—প্রথমটি বোম্বাই-পুনা লাইনের নিরাল স্টেশনের অন্তর্গত, দ্বিতীয়টি আসামে গৌহাটির নিকট ব্রহ্মপুর পাহাড়ে),

(৭) শ্রীবিশ্বনাথ (বারাণসী),

(৮) শ্রীত্র্যম্বকেশ্বর (নাসিক হইতে ১৮ মাইল, গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানের নিকট),

(৯) শ্রীবৈদ্যনাথ (ইহার অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রও দুইটি বলা হয়, একটি দেওঘরে এবং অপরটি হায়দ্রাবাদের নিকট পার্লীতে),

(১০) শ্রীনাগেশ্বর (ইহারও দুইটি স্থান নির্দেশ করা হয়—প্রথমটি সৌরাষ্ট্রের দ্বারকার সন্নিকটে, দ্বিতীয়টি হায়দ্রাবাদের নিকট আউধগ্রামে),

(১১) শ্রীরামেশ্বর (মাদ্রাজ প্রদেশের রামনাদ জিলায়, সমুদ্রের ধারে) এবং

(১২) শ্রীঘুমেশ্বর (এলোরা গুহার নিকট, ঔরঙ্গাবাদ জিলায়)।

শ্রীশৈলমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমল্লিকার্জুনের নাম সম্বন্ধে দু-রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, অর্জুন এখানে মল্লিকা ফুল দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডব এই মন্দির-দর্শনে আসিয়াছিলেন এবং মূল মন্দিরের পার্শ্বে যে ছোট ছোট পাঁচটি মন্দির আছে তাহা তাঁহাদের দ্বারাই স্থাপিত।

দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণানদীতীরস্থ চন্দ্রগুপ্তপুরমের রাজার কন্যা চন্দ্রাবতী সংসারে

বীতরাগ হইয়া শ্রীশৈলমে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার একটি সুলক্ষণা গাভী কেন দুধ দেয় না, ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে একদিন দেখিলেন যে গাভীটী গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এক শিবলিঙ্গের উপর সমস্ত দুধ ঢালিয়া দেয়। মহাদেব রাজকুমারীকে স্বপ্নেও জানাইলেন যে তিনি ওখানে অবস্থান করিতেছেন। তদবধি রাজকুমারী চন্দ্রাবতী প্রতিদিন মল্লিকা ফুল দ্বারা ঐ শিবলিঙ্গের পূজা আরম্ভ করেন এবং মহাদেব তখন হইতে মল্লিকার্জুন নামে প্রসিদ্ধ হন। মন্দিরের অভ্যন্তরে এক প্রস্তরফলকে এই কাহিনী বর্ণিত আছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে শ্রীশৈলম্ অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। মহাভারতে ইহার উল্লেখ নিম্নরূপ :

শ্রীপর্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ ॥
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥

—বনপর্ব, ৮৩ (১৯-২০)

অর্থাৎ শ্রীপর্বতে (শ্রীশৈলে) পরম জ্যোতিষ্মান্ মহাদেব মহানন্দে দেবী পার্বতীর সহিত বিরাজমান। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও সেখানে অন্যান্য দেবতাদের সহিত বাস করেন; এখানে স্বর্গীয় হ্রদে পবিত্রমনে ও সংযতচিত্তে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সমগ্র পরিবার মুক্তিলাভ করে।

এখন অবশ্য হ্রদ দেখা যায় না—হয়ত উহা পাতাল-গঙ্গাকেই উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। শ্রীশৈলমের অন্য নাম ঋষভগিরি। কোন কোন পুরাণেও শ্রীশৈলমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্নানের সংকল্প-মন্ত্রেও শ্রীশৈলম্-নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কথিত আছে, বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন এখানে কোন এক গুহায় অনেক বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। নাগার্জুন খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধধর্মের মহাযান-শাখার ইনি প্রবর্তক। নাগার্জুনের পর চার পাঁচ শত বৎসর এই স্থান বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ম্লান হইবার পর ইহা পুনরায় হিন্দুদের অধিকারে আসে। ইহার পর বীরশৈব বা লিঙ্গায়েতদের ইহা একটি প্রধান ঘাঁটি হয়। পাতালগঙ্গার তীরে অনেক শিবলিঙ্গ তখন পাওয়া যাইত এবং বীরশৈবেরা ঐ সব লিঙ্গ প্রত্যেকের নিকট রাখিতেন। এখনও মহীশূর অঞ্চল হইতে বহু বীরশৈব এ স্থান দর্শন করিতে আসেন।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন ও হুয়েন সাং তাঁহাদের ভ্রমণ-বিবরণীতে শ্রীশৈলমের কথা এবং ইহার সহিত নাগার্জুনের সম্পর্ক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে যে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে যে কোন হিন্দু দেবতাকে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারেন, ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল—এইরূপ বলা হয়।

এই মন্দিরের প্রাকারের মধ্যেই পশ্চিম দিকে দেবীর ছোট মন্দির বিরাজিত। দেবীর নাম ভ্রমরাম্বা বা মাধবী। বিখ্যাত অষ্টাদশ শক্তিপীঠের ইহা অন্যতম। কথিত আছে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী এখানে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং দেবী প্রসন্না হইয়া শিবাজীকে একটি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। ঐরূপ একটি তৈলচিত্র দেবীর মন্দিরে রহিয়াছে। শিবাজী আত্মগোপন করিয়া কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করেন এবং তখন মন্দিরের উত্তর দিকে একটি বিরাট গোপুরম্ বা দরজা নির্মাণ করেন। এ ছাড়া মন্দিরের পূর্বে ও দক্ষিণে প্রবেশদ্বার আছে। পূর্বদিকের গোপুরমের সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে। ইহাই প্রধান প্রবেশদ্বার এবং এই দ্বার দিয়াই সাধারণতঃ যাত্রীরা যাতায়াত

করেন। দেবীর আসল মূর্ত্তি কদাচিৎ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহা দুর্গা অথবা কালীমূর্ত্তি। পূর্বে এখানে পশুবলি হইত। দেবীর সম্বন্ধে যে শ্লোকাষ্টক আছে, অনেকের মতে উহা আদিশঙ্করাচার্য-রচিত। উহার শেষ শ্লোকটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

গায়ত্রীং গরুড়ধ্বজাং গগনগাং গান্ধর্বগানপ্রিয়াম্,
গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিসুতাং
গন্ধাক্ষতালঙ্কৃতাম্।
গঙ্গাগৌতমগর্গসংস্তুতপদাং
তাং গৌতমীং গোমতীম্,
শ্রীশৈলস্থলবাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে॥

—অর্থাৎ, শ্রীশৈলবাসিনী মঙ্গলপ্রদা মাতা ভগবতীকে আমি স্মরণ করি। তিনি গায়ত্রী, গরুড়ধ্বজা, আকাশগামিনী এবং তিনি গন্ধর্বদের গীত ভালবাসেন। তিনি অতি গম্ভীরা, গজগামিনী, হিমালয়কন্যা এবং গন্ধ ও অক্ষতের দ্বারা সুশোভিতা। তিনি গঙ্গা, গৌতম ও গর্গের দ্বারা সম্পূজিতা এবং তাঁহাকে গৌতমী ও গোমতী বলা হয়। এই শ্লোকে 'গ' অক্ষরের ব্যবহার লক্ষণীয়।

কথিত আছে যে সীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্রও এই স্থান দর্শন করিয়াছিলেন। সীতাদেবী শিবের একটি সহস্রলিঙ্গ ভ্রমরাম্বা-দেবীর মন্দিরের প্রবেশপথের বামদিকে স্থাপন করেন। শ্রীরামচন্দ্রও শিবলিঙ্গ এখানে স্থাপন করেন; উহা অদ্যাপি বর্তমান। পূর্বদিকের প্রধান প্রবেশদ্বারের একটু উত্তরে আর একটি ছোট শিবমন্দির আছে। শিবলিঙ্গ প্রায় দেড়ফুট উঁচু—এটিকে বৃদ্ধ মল্লিকার্জুন বলা হয়। এটি অধিকাংশ সময়ই জলসিক্ত থাকে।

মন্দিরের কার্য পরিচালনার জন্য অন্ধ্র সরকার একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনি যাত্রীদের সুখসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ইঁহার সহায়তায় আমি সন্ধ্যা ৭টা হইতে প্রায় ৯টা পর্যন্ত শ্রীমল্লিকার্জুনের পূজাদি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রধান পুরোহিত আমাকে তাঁহার আসনে বসাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ভগবানের পূজাদি অতি সুন্দর ভাবে করাইলেন। শ্রীমল্লিকার্জুন লিঙ্গটি পাথরের, এবং গৌরীপট্ট হইতে ৪ ইঞ্চি আন্দাজ উঁচু। পূজার পর অনেকক্ষণ মন্দিরের মধ্যে একা থাকিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ মনন করিতে পারায় নিজেকে খুবই ভাগ্যবান্ মনে হইল।

রাত ৯টায় যখন মন্দিরের বাহিরে আসিলাম, তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। দেখিলাম, শ্রীমল্লিকার্জুনের ধাতুনির্মিত উৎসব-মূর্তিটি পালকিতে বসানো হইয়াছে এবং কয়েকশত ভক্ত নরনারী—অধিকাংশই বীরশৈব—দেবতার নানারূপ স্তবস্তুতি করিতেছেন। তাঁহাদেরই চার-পাঁচজন পালকি বহন করিবেন। মশালের আলোকে চারিদিক আলোকিত, বিবিধ সুমধুর বাদ্যে দিগন্ত পরিপূর্ণ। পুরোহিত আসিয়া আরতি করিলেন এবং তারপর অনেকেই সেই পালকির নীচে দিয়া অপর দিকে যাইতে লাগিলেন। এর পরই প্রদক্ষিণ শুরু হইবে। হঠাৎ দেখিলাম পালকি যেখান দিয়া যাইবে তাহার সামনেই ৩০।৪০ জন নরনারী পাশাপাশি লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। উদ্দেশ্য, শ্রীভগবান তাঁহাদের শরীরের উপর দিয়া যাইবেন। তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া পালকি একটু থামিলে আবার আরতি হইল এবং সামনে আবার ঐরূপ অনেকেই লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন—এইভাবে অনেক মহিলা ও পুরুষ ভক্ত একাধিকবার ঐরূপে শয়ন করিলেন এবং শ্রীমল্লিকার্জুনের পালকি তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতে লাগিল।

আমিও একবার ইঁহাদের সঙ্গে পুরা প্রদক্ষিণ করিলাম, ইহাতে প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট লাগিল। এইভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতার শয়ন দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে দেবী ভ্রমরাম্বার মন্দিরে যাইয়া তাঁহার পূজাদি করাইলাম; পুরোহিত ছাড়া দেবীকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। প্রণামান্তে আনন্দপূর্ণ মনে প্রায় রাত ১০টায় কুটীরে ফিরিলাম। তখন মন্দিরের প্রধান কর্মচারী আমাদের খোঁজখবর লইতে আসিলেন এবং মন্দিরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। পরদিন সকাল ৬টার বাসে আমাদের ফিরিবার কথা। ভোর ৫॥ টায় মন্দির খোলা হয়। কর্মচারীটি বলিলেন, 'আপনার জন্য আমি কাল ৫টায় মন্দির খোলার ব্যবস্থা করেছি, ঐ সময় আপনি শ্রীমল্লিকার্জুন স্বামীর বিশেষ অভিষেক (স্নান) করাবেন, পুরোহিতকেও বলে রেখেছি। ভোরে গরমজলে স্নান ক'রে যাবেন, আমি গরম-জলের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।' কুটীরের রক্ষক পরদিন ভোর ৩॥ টায় আসিয়া গরমজল করিয়া দিল এবং স্নানান্তে পৌনে পাঁচটায় মন্দিরে গেলাম। কয়েকজন পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ সমস্বরে অতি সুমধুর সঙ্গীত ও শ্লোক দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে জাগ্রত করিলেন। ইহা অনেকটা তিরুপতির 'সুপ্রভাতমে'র ন্যায়। তিরুপতিতে ভোর পাঁচটায় বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া নানারূপ প্রার্থনা ও স্তবাদির দ্বারা ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করান।

ইহার পরই গর্ভমন্দিরে প্রবেশপূর্বক শ্রীমল্লিকার্জুনের সামনেই পুরোহিতের আসনে উপবিষ্ট হইলাম। পুরোহিত পূর্বেই অভিষেকের বিভিন্ন দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নানারূপ সুন্দর সুন্দর বৈদিক মন্ত্র পাঠ করাইয়া আমাকে দিয়া শ্রীভগবানের অভিষেক ও পূজাদি করাইলেন। জল, দুধ, দই প্রভৃতির দ্বারা অভিষেক করিলাম এবং কচি কচি সুন্দর বিল্বপত্র দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিতে পারায় পবিত্র উষাকালে মন অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, এবং শ্রীভগবানের অহেতুক কৃপার কথা স্মরণ করিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। প্রায় ৪৫ মিনিট লাগিল।

বাস ছাড়িবার সময় অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে এবং যাত্রীপূর্ণ বাস আমাদেরই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মন্দিরের প্রধান কর্মচারী তাড়াতাড়ি গরম দুধের ব্যবস্থা করিলেন এবং বাসেও সর্বাপেক্ষা আরামপ্রদ আসনে আমাদের বসাইয়া দিলেন; বাসের যাতায়াত ভাড়া, কুটীরের ভাড়া বা আহারাদির জন্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক শ্রীমল্লিকার্জুনের শ্রীমন্দির উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রণাম করিয়া তাঁহার অপার কৃপার কথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যতক্ষণ দেখা যায়, মন্দিরের গোপুরম্ দর্শন করিতে করিতে বার বার এই কথাই মনে হইতে লাগিল, আবার কি শ্রীমল্লিকার্জুন আমাকে শ্রীশৈলমে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লইয়া আসিবেন?

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্বরম্ ॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাবনে ॥
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘুশ্বেশং শিবালয়ে ॥

বাদল সাঁঝে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষাল

(১)

আজকে এল বাদল দোলা
আরাত্রিকের বাতি,
আঁধার ঘরে উঠল জ্বলে
পঞ্চপ্রদীপ-ভাতি।

মেঘের কোলে ডাক এসেছে
বার্তা বুকে নিয়ে ;
পরাণ আমার উঠছে কেঁপে
মেঘের পানে চেয়ে।

মনে পড়ে জন্মতিথি
কখন সন্ধ্যা বেলা ;
মনে পড়ে অচিন আঁখি
দেখে মেঘের খেলা।

মনে পড়ে কোন গৃহটি
যেন চিনি চিনি,
মনের কোণে বাঁশী বাজে
সুরের রিনিঝিনি।

(২)

অতল জলে পৃথ্বী যখন
মগন ছিল ঘুমে,
দিনের দেখা নাই আকাশে
ছিল আঁধার চুমে ;

হঠাৎ বেজে উঠল বাঁশী
সারা আঁধার জুড়ে,
হঠাৎ ফুটে উঠল আলো
বাঁশীর সুরে সুরে।

সেই সুরেতে পাগল হ'ল
আজকে আমার মন।
না-দেখা সেই বাঁশী-বাদক
কাঁদায় অনুক্ষণ।

নিশীথ গগন গানে ভরা
বলে রে আয়, আয়।
আমার সাথে গাইবি যদি
আয় রে, চলে আয়।

সমালোচনা

বেদান্তদর্শন (দ্বিতীয় ভাগ)—অনুবাদক ও ব্যাখ্যা-কারক স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। পৃষ্ঠা ২১৩ হইতে ৪৮৪ ; মূল্য চার টাকা।

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ কর্তৃক এই বেদান্তদর্শনের প্রথম ভাগে চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যা অনেক পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে 'ঈক্ষত্যধিকরণ' হইতে 'অন্তর্যাম্যধিকরণ' পর্যন্ত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলির পদচ্ছেদ, অর্থ, শাঙ্কর-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্যের তাৎপর্যবোধক একটি টীকা বঙ্গভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে। সূত্র ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ মূলানুযায়ী যথাযথভাবে সম্পাদিত হওয়ায় বঙ্গভাষাভাষী পাঠকগণের বেদান্তদর্শন অধ্যয়নের যথেষ্ট সাহায্য হইবে বলিয়া মনে হয়। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনের বিচার-পদ্ধতি পূর্বমীমাংসা-সাপেক্ষ বলিয়া পূর্ব-মীমাংসার পদার্থ-জ্ঞান না থাকিলে বেদান্তদর্শন যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। লেখক তাঁহার স্বরচিত 'ভাবার্থদীপিকা' নামক টীকাতে পূর্ব-মীমাংসার প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রদর্শন দ্বারা প্রত্যেক অধিকরণের পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তের মূল বক্তব্যগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৈয়াসিক ন্যায়মালার ব্যাখ্যা বহু পূর্বেই রামচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে উহার অনুবাদ না দিলেও চলিত। বরং অধিকরণের বিষয়ীভূত শ্রুতিবাক্যগুলির তাৎপর্য একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিলে ও 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' ইত্যাদি সূত্রে অনুমানের আকারগুলি একটু প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। —মেধাচৈতন্য

Outlines of Vedanta, by R. Krishnaswami Aiyar; foreword by T. L. Venkatarama Aiyar (Judge, Supreme Court of India). Published by Chetana, Bombay 1. Page 163+xvii, Price: Indian Edition Rs. 4.50.

বিজ্ঞানের যুগে পাশ্চাত্যশিক্ষা-প্রভাবে যাহাদের মনে অধ্যাত্ম বিষয়ে এক প্রকার সংশয় আসিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি লিখিত। শাংকর বেদান্ত-চিন্তার সহায়ক গ্রন্থখানি পাঠে মানুষের মনে জীব জগৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা হইবে। প্রথম স্তরে লেখক বিষয়-বিষয়ী পার্থক্য বিচার করিয়াছেন। জীব বিষয়ী, ভোক্তা, এবং জগৎ বিষয়, ভোগ্য। দ্বিতীয় স্তরে স্বরূপতঃ সকলই যে এক, ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য; জীব ও জগৎ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কিছু নয়। তবে এই তত্ত্ব সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তর্কের দ্বারা ইহা জানা যায় না; 'বিজ্ঞাতাকে কিভাবে জানিবে?'—এইখানেই বেদ বা শ্রুতি প্রমাণের প্রয়োজন।

অতঃপর লেখক কর্ম ও উপাসনা কিভাবে জ্ঞানলাভের সহায়ক, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। মোট ১৮টি অধ্যায়ে লেখক বিষয়গুলি বিভক্ত করিয়াছেন। অধ্যায়ের মধ্যে অনুচ্ছেদে বক্তব্য বিষয় প্রশ্নাকারে বা সিদ্ধান্তাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরিভাষা-শূন্য এবং দৃষ্টান্তবহুল পুস্তকখানি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তত্ত্বান্বেষীদের উপযোগী হইয়াছে। পৃথক পরিশিষ্ট অথবা পুস্তকের কলেবরে সিদ্ধান্তের সমর্থক শ্রুতি (উপনিষদ) বা আচার্যের উক্তি থাকিলে গ্রন্থখানির মর্যাদা বাড়িত।

ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্ঃ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটক (বাংলা অক্ষরে) ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী-মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা মোট ৮২ঃ ভূমিকা ও বিষয়বস্তুর সার সঙ্কলন ৩২ পৃঃ; মূল নাটক ৩৬ পৃঃ, শ্লোকসূচী ও কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা সঙ্গীত ১৪ পৃঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী জননী বিষ্ণুপ্রিয়ার অমিয় জীবন-চরিত এ যাবৎকাল সাধারণে প্রায় অজ্ঞাত ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল তাঁহার সেই অপূর্ব চরিত্র-মহিমা এরূপ সুললিতভাবে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া সকলেরই অশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইলেন। তাঁহার গবেষণা গ্রন্থাবলী দেশে বিদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। আনন্দের বিষয় যে,এখন তাঁহার মৌলিক রচনাও সমভাবে সমাদৃত হইতেছে। এই দিক হইতে তাঁহার বিরচিত সংস্কৃত দূতকাব্যের ইতিহাস, শাশ্বতী ও ভাস্বতী, নাটক ঘটকর্পর ও পদাঙ্ক-দূতের টীকা, সঙ্গীত ও কবিতাবলী, শক্তিসাধন কাব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর চৌধুরী রচিত 'ভক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ম্' নামক নাটকটির ভাষা ও ভাবগৌরব অনুপম। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য কঠিন বলিয়া অকারণ ভীত হন, তাঁহারা যদি এইরূপ একটি সহজ সরল সংস্কৃত নাটক পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই ভীতি নিশ্চয়ই দূর হইবে। ভাষার মাধুর্য ও ঝঙ্কার পরম রমণীয়। নাটকটির ভাষার গাম্ভীর্য, ভক্তিভাবের নিগূঢ়তা, বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব এবং আঙ্গিকের নৈপুণ্য সম্মিলিতভাবে ইহাকে একটি উচ্চশ্রেণীর নাটকে পরিণত করিয়াছে। নাটকটির আর একটি বিশেষ সম্পদ—বিভিন্ন ছন্দে বিরচিত বহুসংখ্যক কবিতা ও গান। প্রহসন দৃশ্যটিও উপভোগ্য। এই নাটকটি 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' হইতে সর্বপ্রথম আধুনিক সংস্কৃত নাটকরূপে প্রচারিত হইবার সম্মান লাভ করিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ভারতের বহু স্থানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্থার তত্ত্বাবধানে অভিনীত হইয়া যশঃ অর্জন করিয়াছে।

আমাদের স্থির বিশ্বাস যে, এই মনোরম নাটকটির মাধ্যমে একাধারে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভক্তিধর্মের প্রচার ও প্রসার হইবে।

মহাপ্রভুহরিদাসম্ঃ নূতন সংস্কৃত নাটক (দেবনাগরী অক্ষরে) ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত। ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ প্রাচ্যবাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা; পৃষ্ঠা ৮৮+১৬।

বাংলা অক্ষরে সুবিস্তৃত ভূমিকাসহ একটি, এবং দেবনাগরী অক্ষরে আর একটি—এই নাটকটির দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। দেব-নাগরী সংস্করণটি পূর্বে সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তাঙ্ক এই নাটকে হরিদাসের জীবনের সকল প্রসিদ্ধ ঘটনাই অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাসের মিলন ও বিরহের শেষ কয়েকটি দৃশ্য সকলেরই চক্ষুতে অশ্রু সঞ্চার করিবে।

নাটকের সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও মধুর ভাষা তাহার শ্রেষ্ঠ গৌরব। বিভিন্ন ছন্দে বিরচিত বহু-সংখ্যক কবিতা ও সঙ্গীতের অপূর্ব ঝঙ্কারে ও তানে সমগ্র নাটকটি পরিপূর্ণ।

নালন্দা গবেষণা বিহারের বরেণ্য অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাটি গ্রন্থের উৎকর্ষ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছে।

—পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ

গিরিশচন্দ্র ঃ শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা (মার্চ ১৯৫৪)। প্রকাশকাল ১৯৬০। পৃঃ ১৪০ ; মূল্য—৩'০০ টাকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'গিরিশ-বক্তৃতাবলী'।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার শৈশব থেকে গিরিশচন্দ্রকে দেখেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে পরিণত বয়সে এই ভক্ত-ভৈরবের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য অনুভব করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলার নাট্যজগতের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা রয়েছে। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা রঙ্গমঞ্চ উনিশ শতকে যে অধ্যাত্ম-প্রেরণা সঞ্চার করেছিল, তার প্রধান কারণ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। এই বইখানি পড়তে পড়তে সেই অতীত কাহিনীর স্মৃতি আবার মানস-পটে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

গ্রন্থকার মানুষ গিরিশচন্দ্র, নট গিরিশচন্দ্র, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র, ভক্ত গিরিশচন্দ্র—এই কয়টি ভাগে গিরিশচন্দ্রকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের গুণাবলী সম্বন্ধে লেখক যতটা অবহিত, ত্রুটি সম্বন্ধে ততটা নন। কারণ গিরিশচন্দ্রের ভক্তি ও ব্যক্তি-মহিমায় তিনি মুগ্ধ। তাছাড়া গিরিশচন্দ্র সে-যুগের শ্রেষ্ঠ নট—রঙ্গমঞ্চে তো বটেই, সেই সঙ্গে জীবন-রঙ্গমঞ্চের গিরিশ-চন্দ্রের জীবনকাহিনীও এক অপূর্ব নাট্যসৃষ্টি। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র এতটা অবিমিশ্র সাধুবাদের অধিকারী নন। তাঁর নাটকের মধ্যে লোকশিক্ষার উপকরণ যতটা মেলে, সাহিত্যিক উৎকর্ষ ততটা মেলে না। সমসাময়িক যুগে তাঁর নাটক যে পরিমাণে পাঠকচিত্তকে অভিভূত ক'রত, আধুনিককালে তার তুলনায় অতি সামান্যই করে। বিশেষতঃ পৌরাণিক নাটকগুলির বেলায় একথা বলা চলে। গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনেয় গুণে সমৃদ্ধ। তাই 'প্রফুল্ল' নাটকের গতিবেগ আজ অবধি খুব কম নাটকেই দেখতে পাওয়া যায়। 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের ভক্তিরস গভীরতার বিচারে অতুলনীয়। ভক্তি-সঙ্গীতেও গিরিশচন্দ্রের দান স্মরণীয়। মানুষ গিরিশচন্দ্র ও ভক্ত গিরিশচন্দ্র—অধ্যায় দুটিতে লেখক গিরিশ-মানসের জটিল গ্রন্থিগুলি উন্মোচিত ক'রে এই আশ্চর্য মানুষটিকে শ্রোতা ও পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। নট-জীবনের অসম্মানকে সানন্দে বরণ ক'রে নিয়ে গিরিশচন্দ্র কেমন ক'রে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের দিব্যব্যক্তিত্বস্পর্শে ধন্য ক'রে তুলেছিলেন, অটল বিশ্বাসের বলে জীবনের সব অন্ধকারকে জয় ক'রে ভক্ত-হৃদয়ের পুণ্য আলোকে ভগবানের মহিমা উদ্ভাসিত ক'রে তুলেছিলেন—সে কাহিনী যুগে যুগে ব্যথিত পীড়িত মানবাত্মার সান্ত্বনা হ'য়ে থাকবে। গ্রন্থটির যোগ্য সমাদর প্রার্থনা করি।

মা-মণি ঃ শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত। প্রকাশক স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, আমিনাবাদ, লখনউ। দাম—১'২৫ ; পৃঃ ৪৮।

সহজ সরল ছড়ার মধ্য দিয়া জীবনী রচনার প্রচেষ্টায় শ্রীসুকমল দাশগুপ্তের আন্তরিক প্রচেষ্টার আর একটি সুন্দর নিদর্শন এই 'মা-মণি' বইটি। ছোটদের উপযুক্ত ক'রে এই কবি আরো কয়েকটি জীবনী এইভাবে লিখেছেন। কিন্তু মায়ের জীবনের মত বিষয়বস্তু পেয়ে তাঁর রচনাভঙ্গী সুন্দরতর হয়েছে। মায়ের জীবনের সেই সব ঘটনাগুলির উপরই লেখক জোর দিয়েছেন, যে সব ঘটনায় মায়ের মাতৃ-হৃদয়টি সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত। তাই 'মা-মণি' নামটি সার্থক।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট ভালই। শিশুদের মধ্যে এই বইটির প্রচার আশা করি।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর: কেন্দ্রটি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অধ্যাত্ম শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা বিস্তার ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সমাজ-সেবা কার্য করিয়া আসিতেছে। ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ কার্য-বিবরণীতে কেন্দ্রটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সুস্পষ্ট।

প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া ক্লাস ও প্রতি মাসে দুইটি অতিরিক্ত ক্লাস এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দান করা হয়।

সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত 'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' বালকদের জন্য, এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়' বালিকাদের জন্য—তামিল ভাষা শিক্ষা বিস্তার করিতেছে। প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় মিশন-সংশ্লিষ্ট আছে। বার্টলি রোডের উপর বালক বিদ্যা-ভবন (Boys' Home) সুষ্ঠু পরিচালনায় উন্নতি লাভ করিতেছে। ৩০টি ছাত্রকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করা হয়। তাহারা বিদ্যার্থী-আশ্রমে থাকিয়া বিভিন্ন ইংরেজী স্কুলে অথবা শিল্প-বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে। দর্জি বিভাগে ছেলেরা নিজেদের জামা তৈয়ারী করে।

মিশনের গ্রন্থাগার ও পাঠাগার শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৪,২৮০পুস্তক আছে। পাঠাগারে বহু প্রয়োজনীয় পত্র ও পত্রিকা আনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি অনুষ্ঠান পূজা ও উৎসবের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

গত উৎসবে ৬ই জুন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে বালক বিদার্থী-ভবনে (Boys' Home) একটি ছাত্রাবাসের দ্বার উন্মোচন করেন।

রাঁচি: ১৯৩০ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটির ১৯৫৯ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী আমরা পাইয়াছি। দাতব্য চিকিৎসা-বিভাগে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় দশ হাজার রোগীকে হোমিওপ্যাথিক ও বাওকেমিক ঔষধ দেওয়া হয়; বিশেষ ক্ষেত্রে এলোপ্যাথিক ঔষধ ও পথ্য দিবার ব্যবস্থাও ছিল। নিকটস্থ ১৪টি আদিবাসী গ্রামে গুঁড়া দুধ বিতরিত হয়, ৬৪ জন দরিদ্রকে কম্বল, জামাকাপড় দেওয়া হয়।

নবনির্মিত গ্রন্থাগারে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রায় ১৪০০ মূল্যবান্ পুস্তক ছিল। সুসজ্জিত পাঠগৃহে ১৫ খানি সংবাদপত্র, ও ৬০ খানি বিভিন্ন প্রকারের পত্রিকা (ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা) রাখা হয়। দৈনিক পাঠকের গড় সংখ্যা ছিল ২৫। মাঝে মাঝে পাঠগৃহে বিশিষ্ট বক্তারা বক্তৃতা দেন, কখন বা শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র দেখানো হয়। মাঝে মাঝে ভক্তিমূলক গানের আসরের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

আশ্রমে দৈনিক পূজা আরাত্রিক ভজন, এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম-কীর্তন হয়। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খৃষ্টের জন্মদিন যথাযথভাবে পালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর ১৩টি জনসভা, আশ্রমে ১৭০টি ও বাহিরে ৩৩টি শাস্ত্রালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রমে মন্দির-নির্মাণের প্রচেষ্টা চলিতেছে; তজ্জন্য সম্পাদক ১৫,০০০ টাকার আবেদন জানাইয়াছেন।

কানপুর ঃ আশ্রমটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজ একটি বৃহৎ কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতা, গবেষণা, শিক্ষাবিস্তার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এই আশ্রমের প্রধান কর্মপন্থা। ১৯৫৯ খৃঃ কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত।

দৈনন্দিন পূজা, উপাসনা, ধ্যান-ধারণা এই আশ্রমস্থ মন্দিরে সম্পন্ন হয়, এবং প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আশ্রম-গৃহে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গত বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পূজা হয় এবং ঐ উপলক্ষে ভজন সঙ্গীত, জীবনী আলোচনা, সাধারণ সভা ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ভগবান বুদ্ধ, শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্টের জন্মদিবস পালন করা হয়। দীপালী ও ৺কালীপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

আশ্রম-সংলগ্ন নিজস্ব গৃহে অবস্থিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে কার্য করিতে থাকে। সাধারণ বিদ্যাদান ভিন্ন শারীরিক ও নৈতিক চরিত্রগঠন এই বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। ছাত্রগণের দিনলিপি-লিখন-পদ্ধতির প্রবর্তন ও তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে সুপরিচালিত করা এই বিদ্যাকেন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য। গত বৎসরের শেষে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৮৩ জন। উচ্চ বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রের হার ৮৩%।

এই কেন্দ্রের চিকিৎসা-বিভাগে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাখায় ১,১৮,১৫১ জন রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসালাভ করে। ১২৭৭ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত দান ১৯,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটী ছোট এক্স-রে যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। আশ্রম-সংলগ্ন শারীরিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও হরিজন-আখ্ড়ার কার্য সুনিয়মে পরিচালিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

বালিয়াটী (ঢাকা): গত ২০শে হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ বালিয়াটী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ভজন, দ্বিতীয় দিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও অপরাহ্ণে নগরকীর্তন হয়। শেষ দিন রবিবার প্রভাতে উষা-কীর্তনের পর হইতে পূজা, চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ হয়। মধ্যাহ্নে (প্রায় ৪,০০০) দরিদ্রনারায়ণ সেবার পর অপরাহ্ণে সভায় বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরিত হইলে সভাপতি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় ভক্তগণ 'কয়েদী' নাটক অভিনয় করেন।

মালদহ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রমের বার্ষিক উৎসব নয় দিবস ধরিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন ২১শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী ছায়া-চিত্র ও সঙ্গীত সহযোগে আলোচিত হয়। দ্বিতীয় দিনে 'সারদা গীতি-কথা', ৩য় ও ৪র্থ দিনে ছায়াচিত্রে সঙ্গীত সহযোগে রাম-সীতার অপূর্ব জীবন-কথা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। ৫ম দিনে স্থানীয় যাত্রাদল নিমাই-সন্ন্যাস অভিনয় করে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 'বর্তমান শিক্ষা ও ধর্ম' বিষয়ে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রি ৮॥ ঘটিকায় শ্রীনন্দলাল দে ভক্তিরত্ন মহাশয়ের রামনাম কীর্তন ৪ দিনই

হইয়াছিল। ২৭, ২৮, ও ২৯শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ 'মা সারদাদেবী ও আদর্শ নারীচরিত্র', 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান যুগ' 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব অবদান' বিষয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর ভজন, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম সম্পন্ন হয়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় প্রসাদ-বিতরণ শুরু হয়, এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সভায় প্রত্যহ চার পাঁচ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হইত। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত উদার, সহিষ্ণু, সহজ, সরল ধর্মমতের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলেন।

যুব-শিবির

জনশিক্ষা মন্দির (বেলুড়) —গত ১লা বৈশাখ হইতে পক্ষকালব্যাপী জনশিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে প্রায় ৫৬জন ছাত্র, শিক্ষক ও সমাজসেবী লইয়া সারদাপীঠের মাঠে যুব-শিবির পরিচালিত হয়। বিভিন্ন দিনে প্রায় ১৬জন বক্তা সমাজশিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। সমাজসেবীদের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই এই যুব-শিবিরে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, সদাচার, প্রার্থনা, কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম, প্রাথমিক সেবা, হাতের কাজ প্রভৃতি ছিল দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত। শিবিরের যুবকেরা স্থানীয় পল্লীর ড্রেন সাফ করে ও পুকুরের পানা তোলে।

এই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় সারদাপীঠের বিবেকানন্দ-উৎসব। যাত্রা, কথকতা, কালীকীর্তন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আলোচনা প্রভৃতি পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল।

শিল্পমন্দিরের উদ্যোগে একটি ছোট শিল্প প্রদর্শনী, এবং ছোটছেলের হাতের কাজ, ছবি ও প্রাচীর-পত্রিকা দেখানো হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউ ইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়: [প্রধান বক্তা স্বামী নিখিলানন্দ, সহায়ক স্বামী বুধানন্দ]

জানুআরি: ব্রহ্ম-আত্মা-ওঁ; জীবনকে আধ্যাত্মিকভাবে সৃজনশীল করা; উচ্চতর মন ও তাহার ক্রমবিকাশ; মানুষের বুঝাপড়া ও ঐক্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ; প্রার্থনা—কেন ও কিভাবে?

ফেব্রুআরি: গৃহীর জন্য ধর্মীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা; অন্তরের যে দুইটি ধ্বনি আমাদের কাছে আসে; অবকাশের আধ্যাত্মিক ব্যবহার, ভগবৎ-প্রেমিক শ্রীরামকৃষ্ণ।

মার্চ: 'আত্মা'-কেন্দ্রিক জীবন, মরমী হিন্দু সাধক শ্রীচৈতন্য; ব্যক্তিগত আত্ম-বিকাশের রহস্য; আত্মশুদ্ধি।

এপ্রিল: পবিত্রতার শক্তি; পুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনে নারীর অনুপ্রেরণা, ক্রুশ-এর অর্থ, পুনরুত্থানের রহস্য; ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত রাণী মীরা।

মে: ব্যক্তিত্বের একীকরণ; হিন্দু ধর্মের উদ্ধারকর্তা শঙ্করাচার্য; আধুনিক যুগে বুদ্ধ-বাণীর মর্মার্থ; সাধুসঙ্গের অবর্ণনীয় উপকারিতা; আত্ম-জিজ্ঞাসার দিব্য ভাব।

এতদ্ভিন্ন প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷টায় রাজযোগ ব্যাখ্যা ও ধ্যান, এবং প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮৷৷টায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা হয়।

যাঁহারা হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে জানিতে চান অথবা আধ্যাত্মিক সাহায্যলাভে ইচ্ছুক তাঁহারা পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া স্বামী নিখিলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

খড়গপুর : গত ২৪শে হইতে ২৯শে জুন বুধবার পর্যন্ত স্থানীয় দুর্গামন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অষ্ট প্রহর নাম-সংকীর্তন, লীলাকীর্তন, কথকতা, বিশেষ পূজা, চণ্ডী ও গীতাপাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। ২৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী যুক্তানন্দ, টাকী কলেজের অধ্যাপক শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ ভাষণ দেন। উৎসবের শেষ তিন দিন সান্ধ্যসমাবেশে কলিকাতার বেতারকথক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সঙ্গীতসহ শ্রীশ্রীচণ্ডীমাহাত্ম্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদালীলা (ষোড়শী পূজা) কথকতা করেন।

জাতীয় শৃঙ্খলা শিক্ষা

গত বৎসর (১৯৫৯-৬০) সারা ভারতের ৬২২টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তিন লক্ষেরও অধিক বালকবালিকা জাতীয় শৃঙ্খলাশিক্ষা-পরিকল্পনার আয়ত্তাধীনে শৃঙ্খলার শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এই সংখ্যা পূর্ব বৎসরের দ্বিগুণ। এজন্য মাথা-পিছু বার্ষিক খরচ পড়িয়াছে পাঁচ টাকারও কম; ভবিষ্যতে খরচ আরও কম পড়িবে। যথাসময়ে উপযুক্ত-সংখ্যক শিক্ষক গড়িয়া তুলিতে পারিলে ১৯৬১ খৃঃ জানুআরি মাসে ৮ লক্ষ বালকবালিকা এই শিক্ষার আওতায় আসিতে পারিত।

[P.T.I.]

আগামী খাদ্যসঙ্কট

১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও কৃষি-বিশেষজ্ঞ (ডক্টর জে. এন. মুখার্জি, ডঃ এ. টি. সেন, ডঃ বশী সেন, বি. সি. গুহ এবং ডঃ নীলরতন ধর) তাঁহাদের গবেষণালব্ধ বিবরণী পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমীপে দিয়াছেন :

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বাংলা দেশের খাদ্যপরিস্থিতি এখন সঙ্কটজনক। এইভাবে চলিতে থাকিলে ১৯৬৬ খৃঃ খাদ্যাভাবের পরিমাণ হইবে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বা বৈদেশিক আমদানি দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ঘাটতি মিটাইতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন : (১) জলনিকাশ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ (২) কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ (২) রাসায়নিক সার।

কলিকাতা মহানগরী

পৃথিবীর একাদশতম নগরী বৃহত্তর কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম নগরী, ১৯৫১ খৃঃ গণনায় ইহার আয়তন ৩২·৩২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৫·৪৯ লক্ষ। বসতির ঘনতা প্রতি বর্গমাইলে ৮৮,৯৫৩ বা প্রতি একরে ১৩৯ জন। উদ্বাস্তু-আগমনের পর এই সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে।

কলিকাতা পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও ব্যবসায়-কেন্দ্র। বৃহত্তর কলিকাতার দৈর্ঘ্য গঙ্গার উভয় পার্শ্বে ৪৫ মাইল। এই দীর্ঘতম শিল্পাঞ্চলে পাট, কাপড়, কাগজ ও তামাকের বহু কারখানা আছে; সহস্র সহস্র নরনারী এ সকল স্থানে কাজ করে।

১৯৫৭-৫৮ খৃঃ ফ্যাক্টরি আইন অনুসারে কলিকাতাস্থ রেজেস্ট্রীকৃত শিল্পসংস্থার সংখ্যা ১,৩৫০; একক অঞ্চলে ইহাই ভারতের সর্বোচ্চ সংখ্যা। বোম্বাইএ ব্যাঙ্কের সংখ্যা বেশী কিন্তু কলিকাতায় টাকা লেনদেন বেশী।

বাসস্থান : শতকরা ৭·৫ জন স্বতন্ত্র ঘরে বা পুরা একটি বাড়ীতে থাকিতে পান, বাকী লোককে বহু ব্যক্তির সঙ্গে একত্র থাকিতে হয়।

পেশা :	ব্যবসাবাণিজ্য	প্রায়	৪০%
	পণ্য উৎপাদন		১৬%
	জন-প্রয়োজনীয় কাজকর্ম		১৪%
	গৃহকর্ম		১২%
	সরকারী ও বেসরকারী চাকরি		১২%
	নির্মাণ কর্ম		২%

[Department of Economics and Statistics—Cal. Univ.]

উদ্বোধন

শ্রবণমঙ্গল

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্ ।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥

বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমাস্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥

[শ্রীমদ্ভাগবত, ২।৪।১৫—১৭]

জগতে যত কিছু শ্রোতব্য বিষয় আছে তন্মধ্যে ভগবৎকথাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি শত সহস্র বিষয় শ্রবণ করিয়া বৃথাই আয়ুক্ষয় করে, এবং অতর্কিতে মৃত্যুর কবলিত হয়। তাই মৃত্যুর প্রতীক্ষাবত শাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎকে শ্রীশুক বলিতেছেন :

যাঁহার নাম-কীর্তনে, যাঁহার স্মরণ দর্শন পূজা বন্দনা ও লীলাশ্রবণে মুহূর্তমধ্যে সকল পাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার যশোগাথা শ্রবণ করিলে পরম মঙ্গল লাভ হয়, তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি।

যাঁহার চরণসেবা করিয়া অন্তর্মুখী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার ভোগাভিলাষ, স্থূল সূক্ষ্ম আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকেন, সেই পুণ্যশ্লোককে নমস্কার করি।

কি তপস্বী, কি দাতা, কি যশস্বী, কি মনস্বী, কি মন্ত্রজ্ঞ, কি সদাচারী—কেহই যাঁহাতে কর্ম সমর্পণ না করিয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারেন না, সেই পূতকীর্তিকে বহুবার নমস্কার করি।

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্তন, তাঁহার স্মরণ বন্দন সেবন, তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তিসাধন-দ্বারেই মানুষ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া, দেহাত্মভাব হইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তিভূমি

যখন মানুষ চন্দ্রলোকের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করিতে চলিয়াছে, তখনও আমরা প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে পারিলাম না, পরন্তু অহরহ তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত। একদিকে আন্তর্জাতিকতার বড় বড় বুলি বলিতে ও শুনিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, অন্যদিকে স্বদেশীয় স্বজাতীয়ের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করি; বিজাতি, বিধর্মী—এমনকি বিদেশী মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করি। বিশ্বভ্রাতৃত্বরূপ মহান্ ভাবের 'দিব্যালোকে' সহোদর ভ্রাতাকে—নিজ দেশবাসীকে—প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু মনে করিয়া উৎখাত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। সর্বশেষ, বিজ্ঞানলব্ধ গতির ফলে স্থান-কাল সঙ্কুচিত হওয়ায় এবং আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার-ফলে বিপন্ন মানব স্থায়ী শান্তির জন্য যখন একটি বিশ্ব-রাষ্ট্রসংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে—তখন ধর্ম, ভাষা ও ভূষার সামান্য পার্থক্য লইয়া, অসহিষ্ণু হইয়া আমরা আদিম যুগের পদ্ধতি সহায়ে নিজেদের দেশ জাতি ও সমাজের শরীর খণ্ড বিখণ্ড করিতে উদ্যত। ভারতে আজ ইহা এক অভাবনীয় শোচনীয় বিস্ময়, ভয়াবহ অভিশাপ!

সত্য, অহিংসা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সকলের সমান অধিকার—প্রভৃতি কথাগুলি আজ যেন আমাদের বিদ্রূপ করিতেছে। প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া, ব্যাপক জীবনে ঐ মহান্ ভাবগুলির যোগ্যতা অর্জন না করিয়া আমরা ঐ কথাগুলির অপব্যবহার করিয়াছি। জাতীয় জীবনে ঐগুলি যত না আচরণ করিয়াছি, ততোধিক প্রচার করিয়াছি। লণ্ডনের একটি দৈনিক পত্রিকা ভারতের ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতা, কলহ ও মারামারি কাটাকাটিকে কটাক্ষ করিয়া কিছুদিন পূর্বে লিখিয়াছিল: 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রভৃতি কথাগুলি ভারতের রপ্তানির মাল (commodity for export)!

সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে সকল দুঃসংবাদ বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছে, আমরা তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না; সেগুলি অতিরঞ্জিত মনে করিয়া উপেক্ষাও করিব না, 'সব ঠিক হইয়া গিয়াছে' বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্তও হইব না। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশও যদি সত্য হয়, তাহার জন্য আমরা দুঃখিত, লজ্জিত, মর্মাহত। এরূপ ঘটনা যে একটি স্বাধীন দেশে ঘটিতে পারে—তাহা কল্পনাতীত। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের কথা আমরা শুনিয়াছি, জার্মানির ইহুদী বিতাড়নের কাহিনী আমরা পড়িয়াছি, ব্রিটিশ শাসনের শেষ দৃশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমরা দেখিয়াছি,—এগুলির কোন্‌টির সহিত আজিকার এই নিষ্ঠুরতার তুলনা করিব?

স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকগণের সর্বাপেক্ষা গর্বের ও গৌরবের সম্পদ সমানাধিকার তাহারা যখন দেখে একটি শ্রেণীর মানুষের নির্যাতন করিবার অবাধ অধিকার আছে, এবং অপর শ্রেণীর মানুষের আত্মরক্ষা করিবারও উপায় নাই, নিরাপত্তার কোন আশা বা আশ্বাস নাই, তখন স্বভাবতই দেশের নেতাদের সম্বন্ধে ও সংবিধান সম্বন্ধে তাহাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়।

এ সংশয় দূর করিতে হইলে সবল ও বিশ্বস্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। আজ ভারতে কি

এমন নেতার অভাব হইয়াছে, যিনি সমগ্র ভারতকে নিজের দেশ বলিয়া ভাবিতে পারেন, সকল ভারতবাসীকে তাঁহার ভাই বলিয়া মনে করিতে পারেন? ভাষা, জাতি, প্রদেশ, ও সাম্প্রদায়িকতা আজ ভারতবাসীর দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। অধিকাংশ নেতার দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে নিজ নিজ দলীয় স্বার্থের রঙীন চশমায়।

* * *

রোগের বাহ্য লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। রোগ-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জানেন বাহ্য লক্ষণ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব হইতে শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়। রোগকে অস্বীকার না করিয়া, চাপা না দিয়া সর্বপ্রথম যথাযথভাবে রোগ নির্ণয় করিয়া উহা দূর করিবার সকল চেষ্টা করা উচিত। বর্তমানে ভারতের সমাজ-শরীরে যে ব্যাপক বিভেদ-মূলক হিংসামূলক মনোবৃত্তি ও আচরণ দেখা দিয়াছে, অচিরে তাহার প্রতীকার না হইলে ভারতের ঐক্য সমূলে বিনষ্ট হইবে।

ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আচার-পালনকারী মানুষ চিরদিনই আছে; দেশের প্রাকৃতিক গঠনের বৈচিত্র্য, জলবায়ুর বিভিন্নতা, মানুষের আকার-প্রকারের পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় কৃষ্টির ও চিন্তার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে।

ভারতীয় ঐক্যের এই সাধারণ ভিত্তিভূমি রাজনীতিকদের চোখে ধরা পড়ে না। সেই একতা খাওয়া-পরা বা কথা-বলার একতা নয়। সে একতা অন্তরের আবেদনে—ধর্মে, যাহা ভাষার উর্ধ্বে, পরিচ্ছদের অন্তরালে—এক অতীন্দ্রিয় ভাব-সাধনার মধ্যে নিহিত। ধর্মই ভারতীয় ঐক্যের দৃঢ় ভিত্তি! ধর্মই ভারতীয় মনের মিলন-সূত্র!

কামরূপ হইতে কাশ্মীর, কাশ্মীর হইতে হইতে কন্যাকুমারিকা আমরা যে পরিক্রমা করি, তাহা মন্দির-প্রদক্ষিণ। ইহাকে আমরা দেশ-ভ্রমণ বলি না, বলি তীর্থপর্যটন। আমরা মনে করি আদিজননী সতীর দেহ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া রহিয়াছে। পৌরাণিক এই কাহিনী সারাটি দেশকে পবিত্র করিয়া এক অখণ্ডতার আভাস দিতেছে! পূজাকালে প্রতি দিন যে আমরা গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু ও কাবেরীর সান্নিধ্য প্রার্থনা করি, তাহাও কি এই অখণ্ড স্বদেশ-চেতনার সাধনা নয়?

এই ধর্মভিত্তিক স্বদেশ-চেতনা সহস্র বৎসরের পরাধীনতার মধ্যেও, যোজনান্তরী ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও মনের মর্মমূলে ভারতীয় সাধনা ও কৃষ্টির একতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছে। তাই তো দেখিতে পাই, কোন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতে যে সময় লাগিয়াছে, তদপেক্ষা অতি অল্প সময়ে ধর্মের প্রভাব সারা ভারতে সঞ্চারিত হইয়াছে। কেহ কখনও প্রশ্ন করে নাই: বুদ্ধ বা শঙ্কর কোন প্রান্তের লোক; চৈতন্য, কবীর বা মীরাবাঈএর ভাষা কি? এই সর্ব-ভারতীয় ভাবের সাধনা ফল্গুধারার মতো উন-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই ভাবের ঐতিহ্য বহন করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সুপ্ত মহাজাতিকে আহ্বান করিয়া বলিয়া-ছিলেন, 'ওঠ, জাগো, জগৎ তোমার প্রতীক্ষা-রত'। জগৎকে ভারতের মহান্ আধ্যাত্মিক ভাবরাশি যখন দিবার সময় আসিয়াছে, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ কতকগুলি ভাবের অজীর্ণতা-সম্ভূত রাজনীতিক বিপর্যয়ে আমরা আত্মকলহে নিজেদের সর্বনাশের সূচনা করিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি স্বামীজীর সেই মহাবাণী, 'সদর্পে বল আমি **ভারতবাসী**! **ভারতবাসী** আমার ভাই।' ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের

এই দুর্দশা। ভারতীয় ঐক্যের মূল যে ধর্ম তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, বৈদেশিক রাজনীতির অক্ষম অনুকরণ করিয়া বিভেদগুলির উপর আমরা জোর দিয়াছি। মনে করিয়াছি, ঐহিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের মতো সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল না হইয়াই আমরা ইওরোপের মতো ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে সক্ষম হইব, আবার আমেরিকার মতো যুক্তরাষ্ট্রও চালাইতে পারিব। আমরা আজ 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ'। জাতীয় ঐতিহ্য ধর্মকে হারাইতেছি, বিজাতীয় রাজনীতিক আদর্শও ধরিতে পারিতেছি না।

নিজেদের শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া, পাশ্চাত্য ভাবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া আমরা ঐ দেশের দলভিত্তিক রাজনীতি গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের দেশপ্রেমের বা স্বজাতিপ্রেমের অণুমাত্র আমরা শিখিতে পারি নাই।

সত্যকে চাপা না দিয়া যদি অনুসন্ধান করা যায়—ভারতের আজ এখানে, কাল ওখানে ভাষা লইয়া কেন মারমুখী আন্দোলন হইতেছে, তবে দুইটি উত্তর পাওয়া যায়, (১) অজ্ঞতা (২) ক্ষমতালোলুপতা বা স্বার্থপরতা।

স্বাধীনতার দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পরেও দেশব্যাপী বিরাট অজ্ঞতার জন্য সরকারের দায়িত্ব অনস্বীকার্য; ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্য প্রধানতঃ দায়ী দলভিত্তিক রাজনীতি! দ্বিতীয়টির আলোচনা আমরা করিব না, প্রথমটির আলোচনাই করিতেছি; কারণ স্বামীজী বলিতেন, 'শিক্ষার যাদুমন্ত্রেই সর্ববিধ সমস্যার সমাধান হয়, শিক্ষাই সর্বরোগের মহৌষধ।' যদি সৎ শিক্ষার প্রবল স্রোত দেশে প্রবাহিত করিতে পারা যায়, তবে অবাঞ্ছিত বহু বাধা একদিনেই দূরীভূত হইবে। শিক্ষার অভাবেই মানুষ মানুষকে জানিতে পারে না; একটু বিভিন্নতা দেখিলেই ভাই ভাইকে ঘৃণা করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে শিখাইবে, ভালবাসিতে শিখাইবে।

আমরা উপনিষদে পড়িঃ সবই ব্রহ্ম, আমরা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। যদি নিজের মধ্যে ও সকলের মধ্যে এই ব্রহ্মভাব অনুভব করিতে পারি, তবে আমরা নিজেকে যেমন ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—তেমনই সকলকেই ভালবাসিব ও শ্রদ্ধা করিব। একই ব্রহ্ম বহুভাবে বহুরূপে বিকশিত হইয়াছেন। 'বৈচিত্র্যে একত্ব দর্শন' করিতে বলিয়া স্বামীজী বেদান্তের মহাশিক্ষার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বেদান্তের এই শিক্ষাকে পুঁথির মধ্যে বন্দী করিয়া, বিভেদ দর্শন করিয়াই ভারতের এই দুর্দশা। তাই স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—প্রতিটি গৃহের ছাদ হইতে তারস্বরে বেদান্তের মহাসত্যগুলি ঘোষণা করিতে হইবে। তবেই দূরীভূত হইবে এই অজ্ঞতামূলক সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, তবেই মানুষ প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃত মনুষ্যত্বে।

আজকাল কোথাও ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইলে প্রকৃত ব্যাপার চাপা দিয়া বলা হয়, দুর্বৃত্তেরা ইহা করিয়াছে, সমাজবিরোধীরা মাথা তুলিয়াছে। এ কথার কি অর্থ? সমাজবিরোধীরাই কি সমাজের নিয়ামক? দুর্বৃত্তেরা কি সংখ্যায় এত বেশী? জনসাধারণের অধিকাংশই যদি দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে তো আমরা একটি দুর্বৃত্তের জাতিতে পরিণত হইয়াছি। দেশের জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা বর্জন করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করার এই ফল! আর যদি মাত্র একাংশ দুর্বৃত্ত হইয়া থাকে, তবে যাঁহারা এখনও সদ্‌বৃত্ত আছেন, তাঁহাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য—পথভ্রষ্ট ভ্রাতাগণকে সুপথে ফিরাইয়া আনা, রাজনীতিক অধিকারবোধ দ্বারা নয়, ধর্মকে বাদ দিয়া নয়, উদার ধর্মভিত্তিক শিক্ষাদ্বারাই আধুনিক ভারতবাসীর সদ্‌বৃত্তি জাগাইতে হইবে, তাহাকে তাহার স্বধর্মে স্বনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। দলীয় রাজনীতির শিক্ষা আজ একদল মানুষকে কাপুরুষ করিতেছে, আর একদলকে পরপীড়ক ও পশুধর্মী করিতেছে। উদার ভাবের ধর্মশিক্ষাই উভয়কে মনুষ্যত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে; তখন একজন অন্যায় করিবে না, অন্যজন অন্যায় সহ্য না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতীকার করিবে।

আমাদের মাতৃভূমির প্রাণশক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রত্যেক জাতির একটা জন্মগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং তদনুযায়ী তাহাকে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। এক একটি জাতি যেন স্বরগ্রামের এক একটি ধ্বনি তুলিয়া জগতে এক মনোরম সঙ্গীত সৃষ্টি করে। ঐ নিজস্ব ধ্বনির মধ্যেই ব্যক্ত হয় প্রত্যেক জাতির প্রাণ। ইহাই ঐ জাতির জীবনের মেরুদণ্ড, বজ্রদৃঢ় বনিয়াদ।

আমাদের এই পুণ্যভূমিতে একমাত্র ধর্মই জাতীয় জীবনের বনিয়াদ। ভারতবাসীর জীবনসঙ্গীতে ধর্মই মূল স্বর। অপর জাতিরা রাজনীতির কথা বলুক, বাণিজ্যের প্রভাবে সমৃদ্ধি-লাভের মহিমা প্রচার করিয়া বৈশ্যবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করুক, অথবা রাষ্ট্রের বাহ্য স্বাধীনতার গৌরব কীর্তন করুক, ভারতের জনগণ কিন্তু এইসব বুঝিতে পারে না, বুঝিতে চাহেও না।

ভারতে সমাজ-সংস্কার করিতে হইলে প্রথমেই দেখাইতে হইবে, প্রস্তাবিত নূতন সামাজিক প্রথা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কতটা উৎকর্ষ আনিতে পারে। আবার রাজনীতি প্রচার করিতে হইলে গোড়াতেই বুঝাইয়া দিতে হইবে, রাজনীতি ভারতবাসীর একান্ত কাম্য আত্মিক শক্তির বিকাশে কতটা সাহায্য করিতে পারে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকে যেমন জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়, প্রত্যেক জাতিকেও তাহাই করিতে হয়। শত শত যুগ পূর্বে ভারত এইরূপ একটি লক্ষ্য বাছিয়া লইয়াছে, এবং উহাই সে আঁকড়াইয়া থাকিবে। যাহাই বল না কেন, এই লক্ষ্য নির্বাচনে ভারত ভুল কিছু করে নাই। জড়ের চিন্তা অপেক্ষা চেতনের ভাবনা, মানুষের চিন্তা অপেক্ষা ভগবানের অনুধ্যান —এমন কিছু হেয় আদর্শ নয়।

পরিণাম শুভই হউক বা অশুভই হউক, আমাদের জীবনীশক্তি নিহিত আমাদের ধর্মে। উহা আর বদলানো যায় না। উহাকে বিনাশ করিয়া উহার পরিবর্তে অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্ধিষ্ণু কোন বড় গাছ এক জমি হইতে তুলিয়া স্থানান্তরিত করিলে উহাকে সহজে বাঁচানো যায় না।

এই (ধর্মের) আদর্শ আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা শিরায় শিরায় প্রতি শোণিত-বিন্দুতে স্পন্দিত হইতেছে। বস্তুতঃ এই আদর্শ আমাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া আমাদের মূল জীবনীশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য ধর্মের আদর্শ আমরা কিছুতেই বর্জন করিতে পারি না, ইহা করিতে গেলে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ন্যূনতম বাধার পথ দিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধর্মের পথই ভারতে স্বল্পতম বাধার পথ। উহাই ভারতবাসীর জীবনের পথ, অগ্রগতির পথ, কল্যাণের পথ।

যুগ যুগ ধরিয়া জাতীয় জীবন যে লক্ষ্যের দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিলে জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। তাই, যদি তোমরা ধর্মের পরিবর্তে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অন্য কোন কিছুকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র করিয়া বস, তাহা হইলে তোমাদের পৃথিবী হইতে লোপ পাইতে হইবে। ধর্মের পথ বর্জন করিলে তোমাদের মৃত্যু অপরিহার্য। ···ধর্ম, কেবল ধর্মই ভারতের প্রাণ, উহা যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে রাজনৈতিক প্রগতি বা সমাজ-সংস্কার সত্ত্বেও—এমনকি প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে কুবেরের ঐশ্বর্য ঢালিয়া দিলেও ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নতির প্রয়োজন নাই, এ কথা আমি বলি না; শুধু তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—এ দেশে ঐ সব লক্ষ্য গৌণ, ধর্মই মুখ্য। [সংকলিত]

চলার পথে

'যাত্রী'

সকালের সূর্য প্রতিদিনের মতো আজও সেখানে উঠেছে। বিস্তারিত প্রান্তরের ধূধূ-করা বুকে আলোর দান অন্যদিনের মতো আজও সব কিছুকেই চোখের সুমুখে তুলেছে জাগিয়ে। সূর্য-স্নাত এই মহাক্ষেত্র অন্যদিন থাকে নির্জন। কচিৎ কোন চাষী হয়তো চাষের আয়োজনে লাঙ্গল আর বলদ নিয়ে ঐ দিগন্তবিসারী প্রান্তরের সুবিস্তৃত বুকে তাদের ছোট্ট ছায়ার আলপনা এঁকে এঁকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আজ এ সবের বিশেষ ব্যতিক্রম হয়েছে। এই ব্যতিক্রম-প্রসঙ্গেই এই গৌরচন্দ্রিকা।

সরস্বতী আর দৃষদ্বতী—দুটি নদী। কালের স্রোতে তারা এখন অন্য দিগন্তে চলে গেছে। প্রাচীন এই দুই নদীর সঙ্গে ভারতের বহু ইতিহাস জড়িয়ে আছে। হয়তো ভবিষ্যতেও জড়িয়ে থাকবে। শুধু ঐ নদীদ্বয় নয়, তাদের জলধাবা-ঘেরা এই সুপ্রাচীন 'সমন্ত-পঞ্চক'-প্রান্তর ভারতের মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, ইতিকথার সুগভীর শিকড়ে জড়িয়ে গিয়েছে,—জড়িয়ে গিয়েছে ঐ সঙ্গে ভারতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার শ্রেষ্ঠগ্রন্থ গীতাটিও। কথাটাকে তাহলে আর একটু বিশদ ক'রে বলি।

আজ যে জলে মেঘের রূপালি ছবি ভেসে চলে, একদিন সেই হ্রদের জলই ছিল শোণিতময়! পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় ক'রে সেই রক্তে এই প্রান্তরেই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ তৈরি করেছিলেন। একজনের পক্ষে এতগুলি লোককে মারা এবং পঞ্চ-শোণিতহ্রদ সৃষ্টি করা অসম্ভব ব'লে মনে হ'তে পারে—মনে হ'তে পারে এই আখ্যানের পেছনে হয়তো কোন 'রূপক' লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে সব চিন্তা আজকের নয়। আজ মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের আর একটু এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে গেলে দেখব—ক্ষত্রিয়-ধ্বংসের পাপরাশি থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে পরশুরাম সেই রুধিরেই পিতৃতর্পণ করছেন। তর্পণে সন্তুষ্ট হ'য়ে 'ঋচীক' প্রভৃতি পিতৃগণ পরশুরামকে তাঁর প্রার্থনামত বর দিলেন: পাপরাশি থেকে পরশুরামের হবে মুক্তি; আর এই স্থান মহাতীর্থ ব'লে পরিগণিত হবে।

মহাভারতের বনপর্বের পাতা খুলে দেখি, সেখানেও রয়েছে এই মহাক্ষেত্রের কথা। মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মকে বলছেন, এই মহাতীর্থ দর্শনমাত্র সর্বপ্রকার প্রাণীই পাপ-মুক্ত হয়; যারা এই মহাতীর্থে বাস করতে পারে না, কিন্তু সদা বাস করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাদেরও পাপ থাকে না; এক্ষেত্রের ধূলিও দুষ্কৃতকর্মাকে পরম পদ প্রদান করতে পারে।

মহাভারতের শল্যপর্বেও এক্ষেত্রের আখ্যান পাওয়া যায়। সেখানে আছে: রাজশ্রেষ্ঠ কুরুরাজ স্বয়ং এই জমি কর্ষণ করছেন—দেবরাজ ইন্দ্রের নানা উপহাস উপেক্ষা করেও। কুরুরাজ জানেন, কেন তিনি এই জমি কর্ষণ করছেন; তিনি জানেন, ভবিষ্যতে এখানেই ফলবে গীতারূপ শ্রেষ্ঠ ফসল, আর ঘটবে ভীষণ এক যুদ্ধ। তাঁর উদ্যম দেখে দেবরাজ শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েই বর দিলেন, যারা আলস্যশূন্য হ'য়ে অনাহারে এই স্থানে প্রাণত্যাগ করবে এবং যারা যুদ্ধে বাণপথবর্তী হ'য়ে নিহত হবে, তারা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাবে এবং আর কোন স্থান এর চেয়ে পবিত্র হবে না।

মনুসংহিতাতেও রয়েছে এই প্রান্তরের কথা। মনু একেই 'ব্রহ্মাবর্ত' ব'লে নির্দেশ করেছেন। দেবতাদের যজ্ঞভূমি এই ব্রহ্মাবর্ত বা কুরুক্ষেত্র। শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে—'কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনং।'

জাবাল উপনিষদেও এর কথা রয়েছে। আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, গীতা শোনালেন সে ভূমি যে পবিত্রতম হবে, পুণ্যপ্রদ হবে—এতে আর সন্দেহ কি? পরবর্তী কালেও ভারতের বহুযুদ্ধ এই প্রান্তরের উপর সংঘটিত হয়েই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথাই বলছি। কুরুক্ষেত্রে—যুদ্ধারম্ভের পূর্বে—আজও সেখানে সূর্য উঠেছে!

আজ কিন্তু এই বিস্তৃত প্রান্তর জনহীন নয়। আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য এখানে আজ ভাগ্যের দোলায় দুলছে। রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতিক নিয়ে যার সংখ্যা হবে প্রায় সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ! এই দুর্জয় সমর বন্ধ করবার জন্য বিদুর দুর্যোধনের কাছে শেষ পর্যন্ত পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। তাও তিনি দেননি। উত্তরে দুর্যোধন বলেছিলেন, 'তিলার্ধং যবষড়ভাগং সূচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী। বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।' (বিনাযুদ্ধে আমি তিলার্দ্ধ, একটি যবের ছয় ভাগের একভাগ, কিংবা সূচের আগায় যতটা মাটি ধরে, ততটা জমিও দেব না, সত্যি সত্যি ক'রে বলছি)। এই প্রতিজ্ঞা পরিণত হয়েছিল এক মহাক্রন্দনের বিধ্বংসী ভয়াবহতায়। মনে হয় সে ক্রন্দন আজও থামেনি। আজও সেখানে রোদন-বিগলিত ব্যথা ঝরে পড়ছে। যুদ্ধশেষে ঐ বিরাট সৈন্য-সংখ্যার মধ্যে কৌরবপক্ষে তিনজন এবং পাণ্ডবপক্ষে দশজন—এই তেরজন মাত্র জীবিত ছিলেন। ধ্বংসলীলার শতকরা হিসাব করলে বর্তমান পৃথিবীর প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও এর তুলনায় নগণ্য বলেই মনে হবে!

এই মহাধ্বংসযজ্ঞের পূর্বাহ্ণে অর্জুনের কপিধ্বজ রথ এসে দাঁড়াল দুই সৈন্যদলের মাঝে। অর্জুন দেখে নিতে চান, কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণও আছেন সেই রথে—রথী হিসাবে নয়, সারথি হিসাবে। আত্মীয় স্বজনদের দেখে অর্জুনের হঠাৎ মোহ উপস্থিত হ'ল। রক্তে যার রোদ্দুরের গান সেই মহাধনুর্ধর আজ আর যুদ্ধ করবেন না, ব'লে বসলেন। এই হচ্ছেন সেই অর্জুন যিনি নিজের শৌর্য-বীর্য প্রভাবে স্বয়ং উমাপতি শঙ্করকেও করেছিলেন বিমুগ্ধ, এই সেই অর্জুন যিনি আত্মশক্তি-বলে স্বর্গালয়ে গমন ক'রে দেবতাগণেরও প্রীতিভাজন হয়েছিলেন এবং রণ-পাণ্ডিত্য দেখিয়ে দিব্যাস্ত্র লাভ করেছিলেন, এই সেই অর্জুন যিনি অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তরের গোধন-হরণের কালে একাই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁদের হতবল করেছিলেন; এই সেই অর্জুন যাঁর (পার্থ, কৌন্তেয়) নামেই তাঁর মায়ের নাম হ'য়ে উঠত উজ্জ্বল। কিন্তু মোহের জালে এই রকম মহাপ্রাণেরও মনে কি ক'রে যে জট বেধে যায়, তা কে জানে? আজ তিনি যুদ্ধ করতে চান না।

কিন্তু মোহগ্রস্ত হ'লে কি হবে? চেতনার মহা উৎস শ্রীকৃষ্ণরূপ আনন্দ-সত্তা যে আজ অর্জুনের পাশে। গীতার জাগরণী বাণী শুনিয়ে অর্জুনকে করলেন তিনি উদ্বুদ্ধ। অপনীত-মোহ অর্জুনও তখন জানালেন, 'করিষ্যে বচনং তব' (তোমার কথামতই কাজ করব)। শ্রীকৃষ্ণের বহুকীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই গীতা। এ গীতা তাঁর হৃদয়—'গীতা মে হৃদয়ং পার্থ'। সেই পূর্ণাবতারের—গীতাকারের আবির্ভাব-দিন জন্মাষ্টমীর কথা স্মরণ করেই আজ এত কথা বললাম।

চল পথিক, জন্মাষ্টমীর এই পুণ্যদিনে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে মনের যাদুকরী মোহ মায়া দূর করি। চল চল, আজ তাঁকে আহ্বান জানাই আমাদের প্রাণ-বেদিকায়। তিনি এলে আমাদের মন-পঙ্কে ফুটে উঠবে পঙ্কজ। আর তার সৌরভে আমাদেরও পূত মনে প্রতিজ্ঞা জাগবে—'করিষ্যে বচনং তব'। চল চল, আর দেরি নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

কৃষ্ণাষ্টমী

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষাল

তারকা-স্তিমিত আঁধার রাত্রি
প্লাবন বহিয়া যায়,
ধরণীর বুকে নাহি কলরোল
বিশ্ব লুপ্তপ্রায়।

আকাশ ভেদিয়া আঁধার ফুঁড়িয়া
উঠিল আলোর রেখা,
মুগ্ধ নয়নে হেরিনু গগনে
'মাভৈঃ' বার্তা লেখা।

নাহি কোন ভুল, এসেছ যে তুমি
প্রেমময় পারাবার!
তোমার পরশ করিল সরস
প্রস্তর-কারাগার।

নিখিল বিশ্বে করিলে প্রচার—
ধর্মের হবে জয়,
নূতন পৃথিবী করিলে সৃজন
নাশি পাপ তাপ ভয়।

কুরু কংসের ধ্বংসের গাথা
নহে সব পরিচয়,
তব বিভূতির কত গুণগান
তাও নাহি মনে লয়।

মোর কাছে তুমি রাখাল বালক
মোহনমুরলীধারী,
বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন তুমি
যমুনা-পুলিনচারী।

ধর্ম তোমার সুমহান্ প্রভু
তারও বড় তব বাঁশী,
নিখিলের হিয়া ভুলায়েছ তুমি
প্রিয়তম-রূপে আসি।

আজও বাজে তব আহ্বান-সুর
আজও ওঠে সেই তান,
লুব্ধ পরান শুনিতে চাহে তা,
দাও মোরে সেই কান।

শ্রীশ্রীরাধাস্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরীণ-বিরচিতা
বঙ্গানুবাদ : ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

নতোঽস্মি রাধে দুরিতবাধে নিখিলনিকেতানন্দে।
মহাভাবখনি মঞ্জুলহাসিনি সেবিতহৃন্মকরন্দে ॥১

বৃন্দাবনগত-নন্দসুতাদৃত-লম্ভিতমাদনভাবে।
বরনৃপতনুজে কতধৃতমনুজে দুরিতদুষ্কৃতদাবে ॥২

নির্জিতাজিতে নিখিলপূজিতে চূর্ণিতমন্মথদর্পে।
প্রেমবংশবদ-যমুনার্চিতপদ-ঘাতিতদানবসর্পে ॥৩

অয়ি বরমানিনি কৃষ্ণশিখামণি-ভাস্বরচরণদ্বন্দ্বে।
তব পদকমলে নতভক্তদলে স্থাপয় বিশ্ববিবন্দ্যে ॥৪

নমো নামা রাধা অপগতবাধা নিখিলানন্দকারিণী।
মহাভাবখনি মোহনহাসিনি মনোমধুপ্রদায়িনী ॥১

বৃন্দাবনধনী কৃষ্ণবিমোহিনী হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপিণী।
নৃপতিনন্দিনী মানবপাবনী পাপতাপনিবারিণী ॥২

মাধবজয়িনী ভুবনাদরিণী কন্দর্পদর্পনাশিনী।
প্রেমবিলাসিনী যমুনাতারিণী দানবসর্পঘাতিনী ॥৩

কঠোরমানিনী কৃষ্ণশিরোমণি-প্রোজ্জ্বলপদধারিণী।
শরণদায়িনী পূজকপালিনী বিশ্ব-স্তবনোল্লাসিনী ॥৪

জীবন, জীবিকা ও শিক্ষা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

শিক্ষার চিরন্তন আদর্শ ও যুগোপযোগী আদর্শ,—দূর লক্ষ্য ও নিকট লক্ষ্য

স্বামী বিবেকানন্দ একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত বাক্যে আমাদের ব'লে গিয়েছেন: শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'মানুষ' তৈরি করা। 'মনুষ্যত্ব' অতি ব্যাপক জিনিস। আমাদের ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সবচেয়ে উঁচু দরের মনুষ্যত্ব শুধু ব্রহ্মজ্ঞ. স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেই বিদ্যমান। অত উঁচু জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ না ক'রে সাধারণভাবে একথা বলতে পারা যায় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করা ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভের দিকে এগিয়ে দেওয়া। জীবনসংগ্রামে পরাঙ্মুখতা কিংবা পরাজয় মনুষ্যত্বহীনতারই পরিচায়ক। যে সমস্ত চারিত্রিক দোষত্রুটির জন্য আজ আমরা জীবনসংগ্রামে পরাঙ্মুখ কিংবা পর্যুদস্ত,—শিক্ষার নিকট-উদ্দেশ্য হবে সর্বাগ্রে সেগুলি দূরীভূত করা। আলস্য, জড়তা, শ্রমবিমুখতা, আরামপ্রিয়তা, নিয়মবিরোধিতা, বাগাড়ম্বর—এ সবই হচ্ছে বর্তমানে আমাদের—বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুদের—প্রধান চারিত্রিক ত্রুটি। শিক্ষাপ্রণালীর আশু লক্ষ্য হওয়া উচিত এগুলির দূরীকরণ, এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন। এ জন্য পুঁথিগত ও পোশাকী শিক্ষার পরিবর্তে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তির জন্য শিক্ষানবীশীর (Apprenticeship System) পুনঃপ্রবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। 'পুনঃপ্রবর্তন' কথাটা ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করা হ'ল, যেহেতু এই শিক্ষানবীশীই ছিল এ দেশের সনাতন প্রথা। বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় এবং কালের ও রুচির পরিবর্তনে দেশের অনেক শিল্প ও তার আনুষঙ্গিক বৃত্তি ইংরেজ আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৃত্তিনাশের ফলে পুরাতন বৃত্তির জন্য শিক্ষানবীশী আপনা হতেই বিলুপ্ত।

বর্তমানে সর্বাধিক প্রয়োজন—বাধ্যতামূলকভাবে বৃত্তির জন্য শিক্ষানবীশী

এখন নূতন নূতন বৃত্তির জন্য নূতনভাবে শিক্ষানবীশী চালু করতে না পারলে বাঁচবার উপায় নেই। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে এই শিক্ষানবীশীর সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত না করলে আমাদের দুর্দশা ঘুচবে না। বর্তমান অবস্থায় স্কুলে ভরতি হলেই ছেলেমেয়েদের কাজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস চলে যায়; কোন কাজেই তাদের মন বসে না। 'কী কাজ করতে চাও? কী হ'তে চাও? কোন্ কাজ তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?'—এরূপ প্রশ্নের সোজা ও স্পষ্ট জবাব খুব কম ছেলেমেয়েদের নিকটেই পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ এই যে, বাড়ীতে কিংবা স্কুলে কোন হাতের কাজ নিয়মিতভাবে না করাতে কাজের আনন্দ এরা জীবনে উপভোগ করে না; এবং কাজ ক'রে নিজে খেতে হবে এবং অপরকে খাওয়াতে হবে, এই দায়িত্ববোধ তাদের মনে জাগবার ও বাসা বাঁধবার সুযোগ পায় না।

ইংলণ্ড, জার্মানি ও স্কেণ্ডেনেভীয় দেশগুলিতে প্রধানতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী ব্যবস্থা প্রচলিত। সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখেই ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ বৃত্তি বাছাই ক'রে 'শিক্ষানবীশ' হ'য়ে সেই

বৃত্তিতে ঢুকে পড়ে, পিতামাতার বৃত্তিভোগী হ'য়ে স্কুল কলেজে গিয়ে ভিড় জমায় না। ফ্রান্সের ব্যবস্থা কিছুকাল পূর্বেও ছিল অনেকটা আমাদের মতো। ওখানে পুঁথিগত বিদ্যার কদর বেশী। এর ফলাফল সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'আত্মজীবনী'তে ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক লা বোঁর (Le Bon) মত উদ্ধৃত করেছেন। পড়লে মনে হয় ঠিক যেন আমাদের অবস্থারই বর্ণনা। এই বহুমূল্য শিক্ষাপ্রদ অভিমতটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত ; পুঁথিপড়া বিদ্যার অপকৃষ্টতা ও অপকারিতা

"[ফরাসী] শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রধান দোষ এই যে, মনস্তত্ত্বের একটি মারাত্মক ভুল ধারণার উপর উহা প্রতিষ্ঠিত। ধারণাটি হচ্ছে এই যে, কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করলেই বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। এই ধারণার বশে পাঠ্যতালিকা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ ও ভারাক্রান্ত করা হয়েছে। পাঠশালা থেকে শুরু ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দরজা পেরোনো পর্যন্ত একটি যুবক শুধু গাদা গাদা বই মুখস্থ ক'রে যায় ; তার নিজের বিচারবুদ্ধি কিংবা উদ্ভাবনী শক্তি খাটাবার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং কোন সুযোগও ঘটে না। তার পক্ষে শিক্ষা মানে শুধু মুখস্থ করা এবং মাষ্টারমশায়দের নির্দেশ পালন করা। এই যে শিক্ষা, এটা যদি অকেজো-মাত্র হ'ত, তবে ছাত্রদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকতে পারতাম। * * * কিন্তু বস্তুতঃ এটা হচ্ছে সমূহ দুর্গতির কারণ। যারা এই শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর দিয়ে যায়, তাদের মনের এক দারুণ পরিবর্তন ঘটে। যে সামান্য অবস্থার মধ্যে হয়তো তারা জন্মেছিল, তার প্রতি তাদের এক গভীর বিতৃষ্ণার ভাব উপস্থিত হয়, —ঐ অবস্থায় তারা আর কিছুতেই ফিরে যেতে চায় না। মজুরের ছেলে আর মজুর হ'তে চায় না, কৃষকের ছেলে আর কৃষক হ'তে চায় না ; আর যারা ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, তারা তো সরকারী চাকরি ব্যতীত আর কোন কিছুর কথা ভাবতেই পারে না। ফ্রান্সের স্কুল-গুলি মানুষকে জীবনসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে না। ওখান থেকে যারা বেরোয়, তারা সকলেই চায় সরকারী চাকরি,—অর্থাৎ যেখানে নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে, শুধু অপরের নির্দেশমত চ'লে, নিজের দায়িত্বজ্ঞান ও উদ্ভাবনীশক্তি একটুও না খাটিয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটানো ও রোজগার করা যায়। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, যারা সমাজের সব নীচের ধাপের লোক তাদের মনে দারুণ অসন্তোষ, তারা বিপ্লবের জন্য সদাই প্রস্তুত। আর সমাজের উপরের স্তরে তৈরী হয়েছে এক হাল্কা মনোবৃত্তির 'ভদ্রশ্রেণী'—যারা শ্রদ্ধাহীন ও নিষ্ঠাশূন্য ; 'গবর্ণমেন্ট'ই তাদের নিকট একমাত্র কর্মদাতা, সিদ্ধিদাতা 'বিধাতা', অথচ গবর্ণমেন্টকেই তারা সময়ে অসময়ে সমালোচনা করতে কসুর করে না এবং যা কিছু অভাব-অনটন, তার জন্যে গবর্ণমেন্টকেই তারা সম্পূর্ণ দায়ী বলে বরাবর অভি-যুক্ত করে। পাঠ্যতালিকার সাহায্যে গবর্ণমেন্ট দলে দলে ডিপ্লোমাধারী তৈরি করছে বটে ; কিন্তু চাকরিতে স্থান পাচ্ছে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। বাকি সবাই শুধু বেকারের দল পুষ্ট করছে।"

* * *

অর্ধশতাব্দী পূর্বে ফ্রান্সের সম্পর্কে এই যে সকল মন্তব্য করা হয়েছিল, আমাদের বর্তমান অবস্থার সম্পর্কে তা হুবহু প্রযোজ্য। নানা দোষত্রুটিতে পূর্ণ এবং বাস্তব প্রয়োজনের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-রহিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে অর্থ, সামর্থ্য এবং সময়ের কত যে অপচয় হচ্ছে, তা ব'লে শেষ করা যায়

না। জীবন ও জীবিকা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুণ এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা 'মানুষ-তৈরি'র বিশেষ কিছুই সাহায্য হচ্ছে না। শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হৃদয়ের শিক্ষা। যে শিক্ষা দ্বারা পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি প্রকৃত দায়িত্ববোধ ও গভীর ভালবাসা জন্মে না—তাকে কিছুতেই হৃদয়ের শিক্ষা বলা যায় না, এবং তা দ্বারা কখনও প্রকৃত মানুষ তৈরী হ'তে পারে না।

আমেরিকা, আয়র্লণ্ড ও ইস্রাইলের দৃষ্টান্ত

জীবিকার্জনের এবং সুষ্ঠুভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপনের শিক্ষাই বর্তমানে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং উপযোগী শিক্ষা। এই সিদ্ধান্তের পরিপোষক প্রমাণ আধুনিক ইতিহাসে দু-তিনটি সমাজের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা পেতে পারি। আমেরিকায় যখন নিগ্রোদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তখন বিশেষভাবে এই সমস্যা দেখা দেয় যে—কি ক'রে তাদের চরিত্রবান্ ও স্বাবলম্বী করা যায়। 'হ্যাম্পটন কোর্ট' নামক স্থানে পুণ্যাত্মা জেনারেল আর্মষ্ট্রং তাদের জন্য যে বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জীবিকানির্বাহের শিক্ষা' (Education for Life)। আর্মষ্ট্রং প্রথমেই উপলব্ধি করেন যে 'ভদ্রসমাজে প্রচলিত শৌখীন কিংবা পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা নিগ্রোদের উদ্ধারসাধন হবে না। কেমন ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে দৈনিক জীবন যাপন করতে হয়, জীবিকার্জন করতে হয়, বাধাবিঘ্ন ও আপদ্‌বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়, নিজের জাতিকে ভালবাসতে হয়, আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়—তেমন শিক্ষাই হবে দীর্ঘকালের দাসত্ব-জর্জরিত নিগ্রোজাতির প্রকৃত শিক্ষা। সহস্র সহস্র নিগ্রো যুবক আর্মষ্ট্রং-এর বিদ্যালয়েই মানুষ হয়েছিল এবং তাদেরই মধ্যে একজন, (স্বনামধন্য বুকার টি ওয়াশিংটন) পরে 'টাস্কেগী' স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখা যায় আয়র্লণ্ডে,—স্যার হোরেস্ প্লাঙ্কেট ও জর্জ রাসেল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের গঠনমূলক কাজে। জীবিকার্জনের চেষ্টার এবং তারই ভিতর দিয়ে মনুষ্যত্ব-বিকাশের উপরেই তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। তৃতীয় দৃষ্টান্ত আজকের দিনের ইস্রাইল। ওখানেও জীবিকার্জনের ব্যবস্থাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জীবিকার্জনের জন্য হাতে কাজ করছে। স্কুল-কলেজ প্রভৃতি হচ্ছে জীবিকার্জনের ও জীবনগঠনের সহায়ক। নিছক বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানলাভের দিক্ থেকেও এই শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী। আমাদের স্কুল-কলেজ থেকে যারা পাস ক'রে বেরোয়, তাদের মধ্যে ক-জন জীবনব্যাপী লেখাপড়ার চর্চা বজায় রাখে? বরঞ্চ অধিকাংশ ছাত্রের মনেই লেখাপড়া সম্পর্কে এমন একটা ভীতি, বিতৃষ্ণা এবং অবজ্ঞার ভাব জন্মে যে, পরীক্ষা পাসের পর বড় জোর উপন্যাস এবং সংবাদপত্র ব্যতীত আর কিছু কেউ পড়ে না। বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া একটু ধীর গতিতে শিখলে বরঞ্চ পাঠের অভ্যাস সারা জীবন বজায় থাকার সম্ভাবনা, আর এরূপ বজায় থাকাতেই লেখাপড়া শেখার আসল সার্থকতা।

নানাবিধ কায়েমি স্বার্থ

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী শ্রেণীবিশেষের জন্য পরিকল্পিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল। 'ভদ্র'-শ্রেণীর ছেলেরা, যারা সরকারী চাকরিতে এবং ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট বৃত্তিতে যাবে, তাদের জন্যই এই শিক্ষা। তাও আবার ইংরেজী ভাষা যতদিন শাসনকার্য পরিচালনে ব্যবহৃত হ'তে থাকবে—ততদিনই এর বিশেষ কদর। 'ভদ্র'শ্রেণীতে প্রবেশলাভের উদ্দেশ্যে

'মহতে'র অনুকরণে অন্যেরাও এই শিক্ষার প্রতি ঝুঁকেছে। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রচলিত ধরনে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা ছাপ-মারা ব্যক্তিদের সংখ্যা যত বাড়ছে, ততই প্রয়োজন না থাকলেও—এমন কি, 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' জেনেও সরকারী চাকরির সংখ্যা দিন দিন বাড়াতে হচ্ছে ; নইলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। একজন চাকরি পেলে আরও অন্ততঃ ৫০ জন আশায় আশায় থাকে। কিন্তু তবুও কিছুতেই কূল পাওয়া যাচ্ছে না। পাস করাবার কারখানার সংখ্যা, পাসের সংখ্যা এবং তার ফলে তথাকথিত 'শিক্ষিতে'র সংখ্যা, 'শিক্ষিত অকর্মণ্য' ও 'শিক্ষিত বেকারের' সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে। নানা ধরনের কায়েমি স্বার্থ এই ব্যাপারে জড়িত আছে ; তার বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুঃসহ অবস্থার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং বাধ্যতামূলকভাবে অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষানবীশীর প্রবর্তন। ঘোর তমোগুণে নিমজ্জিত জাতিকে কর্মঠ ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন করবার এই এখন প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে মনে হয়। কত বয়সে বৃত্তিমূলক শিক্ষানবীশী শুরু হবে, তা দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, জাতীয় চরিত্র, প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের জলবায়ু ও অধিবাসীদের স্বভাবনিহিত আলস্যপরায়ণতার কথা মনে রাখলে স্বীকার করতেই হবে যে—বৃত্তিশিক্ষা এদেশে অল্পবয়সেই আরম্ভ হওয়া উচিত। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়েছে যে হাইস্কুল দূরের কথা, পাঠশালা ডিঙোলেই কোন ছেলে সাধারণতঃ আর হাতের কাজ করতে চায় না। ঘরের ভিতরে (হয়তো ইলেকট্রিক পাখার নীচে) দিনের মধ্যে ৫।৬ ঘণ্টা কাটানোতে একবার অভ্যস্ত হ'লে পর আর কেউ রোদবৃষ্টিতে বাইরের কাজে যেতে চাইবে না। এটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয় ; সুতরাং এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃত্তিশিক্ষা যথাসম্ভব অল্পবয়সেই আরম্ভ হয়, যাতে ছেলেমেয়েরা শ্রমশীলতায় ও কষ্টসহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হ'য়ে উঠে। আর লেখাপড়ার চর্চাকে বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে, যাতে কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পায় এবং যারা মেধাবী তারা ক্রমশঃ উপরের দিকে যাবার সুযোগ পায়। এরূপ ব্যবস্থা করা মোটেই অসম্ভব বা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপারও নয়।*

পোশাকী শিক্ষা জাতিকে মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে

জাতিকে পরিশ্রমী, কর্মকুশল ও দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন না করতে পারলে আমাদের পক্ষে টিকে থাকাই অসম্ভব। এক হিসাবে বলতে গেলে—যে ইংরেজী শিক্ষা সর্বাগ্রে ও সোৎসাহে গ্রহণের ফলে বাঙালী হিন্দুরা বিগত একশত বৎসর কাল কয়েকটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য ও বাহাদুরি দেখাতে পেরেছে, সেই শিক্ষার প্রসারই আজ আমাদের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। যারা আমাদের তুলনায় অশিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত তাদের নিকট—বিহারী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, চীনা প্রভৃতি এবং বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী ও কারিগরদের নিকট—আমরা জীবনসংগ্রামে প্রতিপদেই পরাজিত হচ্ছি। লেখাপড়ার ফল যদি এই হয়, তবে এমন লেখাপড়া বন্ধ করাই উচিত।

* কিন্তু অসাধ্য অথবা দুঃসাধ্য না হলেও অদূর ভবিষ্যতে যে শিক্ষাব্যবস্থার এরূপ সংস্কার সাধিত হবে, এরূপ আশা আপাততঃ দুরাশা মাত্র, শুধু সরকারের উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যাঁরা দেশের ও সমাজের প্রকৃত হিতকামী তাঁদেরও এই জীবন-মরণ সমস্যা সম্পর্কে ভাবতে হবে, প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে।

আজকাল রব উঠেছে, পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে 'Practical Bias' ও 'Rural Bias' ঢুকাও, স্কুলে দু-একটা শৌখীন হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা রাখ, একটা ক'রে Hobby Centre খোল, তাহলেই বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি দূর হ'য়ে যাবে, স্কুল-কলেজ থেকে 'কাজের মানুষ' বেরুবে। এগুলি ভাল জিনিস হ'তে পারে; কিন্তু এ সমস্তই হ'ল শৌখীন ব্যাপার। এগুলো ঠিকমত করলে একটু হাত-পা চালনা হ'তে পারে এবং শখ মিটতে পারে; কিন্তু বৃত্তিনির্বাচনের ব্যাপার মুলতুবীই থেকে যায়। পক্ষান্তরে কেউ শিক্ষানবীশ হয়েছে বললে বুঝতে হবে যে তার বৃত্তি নির্বাচন হয়েই গিয়েছে। শিক্ষানবীশী মোটেই শৌখীন ব্যাপার নয়। শিক্ষানবীশকে দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করতে হয়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ প্রত্যহ ক'রে দিতে হয়। জীবনসংগ্রামে কি ক'রে সাফল্য লাভ করা যায়, তার শিক্ষা ওখানেই হাতে কলমে আবস্ত হ'য়ে যায়।

বৃত্তিশিক্ষার প্রবর্তন যদি করা হয়, তবে তা বাধ্যতামূলক করতে হবে। নতুবা শুধু ব্যবস্থায় কোনই ফল হবে না। নিয়ম করা উচিত হবে যে—মেধাবী ছেলেমেয়ে ব্যতীত কেউ উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য স্কুল-কলেজে ভরতি হ'তে পারবে না। স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলিকে সত্যিকারের বিদ্যাপরীক্ষায় পরিণত করতে হবে; নতুবা বর্তমানের গড্ডালিকা স্রোত কিছুতেই থামানো যাবে না। একে তো পাসের ও ডিগ্রির মোহ সমগ্র দেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, তার উপর অনেক কিছু কায়েমি স্বার্থ এই ভুয়া শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে, দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে কঠোরভাবে এগুলির বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে ঈপ্সিত পরিবর্তন অসম্ভব।

কালের প্রভাবে ও শিক্ষাব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিতে আমাদের জীবনের ভিত্তিই আজ টলায়মান। তাই জীবিকা ও শিক্ষার পারস্পরিক কথা একটুখানি আলোচনা করা হ'ল। বলা বাহুল্য এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যে এই বিরাট্ বিষয়ের বিশদ আলোচনা অসম্ভব। গোড়াতেই বলা হয়েছে যে জীবিকার যথোপযুক্ত সংস্থান ব্যতিরেকে মানব-সমাজের পক্ষে উন্নত জীবন সম্ভব নয়। উচ্চতর জীবনের সঙ্গে জীবিকার্জনের এবং দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মের কোন বিরোধ আছে—এ কথা মনে করা ভুল। ভারতবাসীরূপে যে মহৎ চিন্তাধারা এবং যে মহান্ সত্যসমূহ আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছি, তার মর্মকথা এই যে যদি জীবনের লক্ষ্য ঠিক থাকে এবং জীবনকে সর্বদা সেই লক্ষ্যের অভিমুখীন রাখা যায়, তবে তুচ্ছতম দৈনিক কাজকর্মও বিরাটের পূজাতে পরিণত হয়, এবং হৃদয়ে পরা শান্তি ও আনন্দ উৎপাদন করে।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

'কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হ'ল? যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।'

[স্বামি-শিষ্য সংবাদ—পূর্বকাণ্ড, ১৭৮ পৃঃ]

বৈষ্ণব সাধনার পঞ্চভাব

স্বামী জীবানন্দ

কাউকে গভীরভাবে ভালবাসলে তার সঙ্গে আমাদের কোন না কোন একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সমস্ত ভালবাসার আধার পরম আনন্দ-স্বরূপ ভগবানের প্রতি ভালবাসা গভীরতর হ'লে তাঁর সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বিভিন্ন ভাবে আনন্দ আস্বাদন করবার বাসনা জাগে। যিনি নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব তাঁতে একটা ভাব আরোপ ক'রে সাধক তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে পেতে চেষ্টা করেন।

জগতে সকল ধর্মেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। ভারতে এই ভাবের সাধনা বিশেষ প্রচলিত; এই সাধনার সাধ্য বস্তু সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ঐশ্বরিক ভাব মানুষ নিজের মানবীয় ভাবেই বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারে; ভক্তগণ তাই ভগবানের উপাসনা-বিষয়ে লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার করেন।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবের মাধ্যমে রসস্বরূপ ভগবানকে আস্বাদনের কথা বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রে আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলা অনুধ্যান করলে পঞ্চভাবের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হয়। সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সব ভাব নিয়ে সম্বন্ধ স্থাপিত, শান্তাদি ভাবগুলি তারই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ রূপ। ভারতে বৈদিক যুগে শান্তভাবের, রামায়ণের যুগে শান্ত দাস্য ও সখ্যভাবের এবং পরবর্তী যুগে সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম বিকাশ হয়েছিল।

শান্তাদি পাঁচটি ভাবের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি দ্বারাই চরম উপলব্ধি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু গুণবিচারে মধুর ভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। দাস্যে শান্তভাব বিদ্যমান, সখ্যে শান্ত দাস্য, বাৎসল্যে শান্ত দাস্য ও সখ্য এবং মধুরভাবে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য চারটি ভাবই বিদ্যমান। সুতরাং পরেরটি পূর্বেরটি থেকে উৎকৃষ্ট—এইজন্য মধুর-ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ।

শান্ত-ভাব

যখন ভক্তের হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়নি, কেবল বাহ্য ভক্তি অপেক্ষা কিছু উন্নত ধরনের ভাবের উদয় হয়েছে, তখন সেই ভক্তির নাম শান্ত-ভক্তি। ভগবানের ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের অপূর্ব মহিমাদর্শনে তার চিত্ত শান্ত হ'য়ে যায়, তখন তার মনে কোনরূপ ভেদভাব বা সুখ-দুঃখে বিচলিত ভাব থাকে না। ভগবানকে একটিবার দর্শন করতে পারলেই যেন ভক্ত কৃতার্থ হয়। মনে হয় ভগবান অপূর্ব মহিমান্বিত। শান্ত-ভক্তের মন বিষয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হ'য়ে শান্ত ও সমাহিত ভাব ধারণ করে। বাসনাজয় ও ভগবানে অনুরক্তি শান্ত-ভক্তির লক্ষণ। এই দুটি গুণ অর্জনের জন্য শান্ত ভক্তের নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকায় তার মন থেকে দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য প্রভৃতি চলে যায় এবং তার চিত্ত নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলের মতো স্বচ্ছ ও নির্মল হয়।

কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুইগুণে
এই দুইগুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে,
আকাশের শব্দগুণ যেমন ভূতগণে।
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা-গন্ধহীন
পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥ চৈঃ চঃ

শান্ত-ভক্তি দুই শ্রেণীর: পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ। ভগবৎদর্শনের পূর্বাবস্থা পরোক্ষ;

ভগবানকে দর্শন করার পরের অবস্থা সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ। পরোক্ষ শান্ত-ভক্তির আবির্ভাবে ভক্তের চিত্তে সদাই ব্যাকুলতা ভগবানকে দর্শন করার জন্য।

সাধক-কবি রজনীকান্ত সেনের একটি গানে পরোক্ষ শান্ত-ভক্তির ভাবটি পরিস্ফুট :

আছ অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
　　ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়,
　　শশীতারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া;
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
　　দাওগো দেখায়ে বুঝায়ে।

শান্ত-ভক্ত ধীর স্থির, সুখদুঃখে অবিচলিত। সুখ দুঃখ সবই তাঁর কাছে ভগবানের দানস্বরূপ, তাঁর দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ, সকল জীবই ভগবানের সৃষ্ট—এই চিন্তা নিরন্তর থাকায় তিনি সর্কলের প্রতি কৃপাপরবশ হন। সর্বভূতে সমভাব—শান্ত-ভক্তের প্রধান লক্ষণ; তিনি সর্বজীবে তাঁর ইষ্টকে দর্শন করেন।

মুনি-ঋষিগণই শান্তভক্তের দৃষ্টান্ত। সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার এই ব্রহ্মর্ষিগণ শান্ত-ভক্তি সহায়ে ভগবানকে লাভ করেছিলেন দেবর্ষি নারদ, শুকদেব, বিদুর প্রভৃতি শান্ত ভক্তের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

দাস্য-ভাব

ভক্তরাজ রায় রামানন্দের সঙ্গে রসতত্ত্ব আলোচনাকালে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য শান্ত-রসকে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রথমাবস্থা বলেছেন।

দাস বা ভৃত্যভাবে আপনাকে চিন্তা ক'রে ভগবানের যে উপাসনা করা হয়, তাকে বলে দাস্য-ভক্তি। ভগবান সেব্য, ভক্ত সেবক। দাস্য-ভক্তিতে ভগবান ভক্তের দ্বারা প্রভুরূপে পূজিত হন।

শান্তভাবে সাধক ভগবানের মহিমাদর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে হচ্ছিল—ভগবান অনন্ত অসীম, ভাবাতীত ইত্যাদি। এইরূপ ঐশ্বর্য পরিচিন্তনে সেই সাধকের চিত্তে ভগবানের প্রতি ভালবাসা উৎপন্ন হওয়ায় ক্রমশঃ এই অনুভূতি হ'তে থাকে—ভগবান অনন্ত বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যে আমার নিকট সম্বন্ধ, তিনি প্রভু আমি দাস। সাধকের এইরূপ মানসিক অবস্থায় ভগবান থেকে তিনি বেশী দূরে থাকেন না। তখন সাধক ভাবাবেশে আকুল হৃদয়ে প্রভুকে সেবা করার জন্য ব্যস্ত হন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর উপর নির্ভরশীল হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে,
পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর,
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।
শান্তের গুণ দাস্যে তাহে অধিক সেবন,
অতএব দাস্যরসের হয় দুই গুণ।

দাস্য-ভাবের দুইটি স্তর : প্রথম স্তর 'সম্ভ্রম', দ্বিতীয়—'গৌরব'। প্রথম স্তরে ভক্ত দাস হ'য়ে ভগবানকে সম্ভ্রমের সহিত সেবা করেন, বিশ্বাসী ভৃত্যের প্রভুভক্তিই দাস্য-ভাবের আদর্শ। দাস্য-ভক্ত বলেন—

'প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম,
　　ম্যয় গোলাম তেরা,
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা।'

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ গৌরব-প্রীতিতে ভক্ত প্রভুকে পিতৃতুল্য মনে ক'রে সেবা ক'রে গৌরব অনুভব করেন। ভগবানে এই প্রীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে স্নেহ মান প্রণয় অতিক্রম ক'রে 'রাগ' উৎপন্ন হ'লে দাস্য-ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে।

উদ্ধব, অক্রুর প্রভৃতি দাস্য-ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছিলেন। মহাবীর হনুমান দাস্য-ভাবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। প্রভু রামচন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে মহাবীর বলেছিলেন:

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

—হে রাম, দেহবুদ্ধিতে আমি তোমার দাস; জীববুদ্ধিতে তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর আত্মবুদ্ধিতে তুমিই আমি—এই আমার নিশ্চিত মত।

মহাবীরের দাস্য-ভক্তি চরম অদ্বৈতানুভূতির স্তরে পৌঁছেছিল! শ্রীচৈতন্যাবতারে তাঁর নিত্য সেবক গোবিন্দ দাস্য-ভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সংসারাশ্রমে দাস্য-ভাব অবলম্বন করতে পারলে জীবন-সংগ্রামে কঠিন সমস্যার অতি সহজ ও সরল সমাধান হয়। বিশ্বাসী ভৃত্যের মতো ভগবানের সংসারে আপন কর্তব্য অনাসক্তভাবে ক'রে কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করতে পারলে সংসারাসক্তি কেটে গিয়ে পরা ভক্তি লাভ হয়।

সখ্য-ভাব

সখ্য-ভাবে শ্রীভগবানের উপাসনার নাম সখ্য-ভক্তি। দাস্যভাবে ভগবানের প্রতি অনুরাগ যতই গাঢ় হয়, ততই ভক্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হন। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে একটা দূরত্ব থাকে, ভৃত্য প্রভুর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশতে পারে না। ভগবানের প্রতি ভালবাসা প্রগাঢ় হ'লে এই ভেদভাব থাকে না। তখন ভক্তের মনে হয়—ভগবান আমার সখা, আমার বন্ধু, তাঁর মতো বান্ধব আমার আর কেউ নেই। এইরূপে ভগবানের সহিত ভক্তের ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতা হয়, ভক্ত ভগবানকে প্রাণ ঢেলে দেন, নিজের উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেও সঙ্কুচিত হন না। ভক্তের যা প্রিয়, তাই-ই ভগবানকে দিয়ে তাঁর তৃপ্তি। ভক্ত ভগবানকে আপনার থেকেও আপনার মনে করেন।

যেমন প্রিয়তম বন্ধুর নিকট লোকে আপনার হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দেয়, জানে বন্ধু তার দোষের জন্য তিরস্কার না ক'রে যাতে হিত হয় তারই চেষ্টা করবে, সেইরূপ সখ্য-ভাবের সাধক ভগবানের কাছে অন্তরের গভীরতম প্রদেশের গোপনীয় সকল বিষয় প্রকাশ ক'রে নিশ্চিন্ত হন।

'চৈতন্যচরিতামৃতে' সখ্য-ভক্তির গুণ, লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এই ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয়;
দাস্যে সম্ভ্রম গৌরব সেবা, সখ্য বিশ্বাসময়।
কাঁধে চড়ে কাঁধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ,
কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য, গৌরব-সম্ভ্রমহীন,
অতএব সখ্যরসের তিন গুণ চিন।
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান,
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান।

সখ্য-ভাবের সাধক ভগবানের সহিত আহার বিহার শয়ন উপবেশন ক্রীড়া সঙ্গীত হাস্য পরিহাস প্রভৃতি করেন। বৃন্দাবনের রাখাল বালকগণ তাঁদের নিত্য খেলার সাথী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে ব্যবহার করতেন, তাতে সখ্য-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। তাঁদের আচরণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ ছিল না, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সরলতা ও অকপট ভালবাসা ছিল। শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি ব্রজবালকগণ ভগবানকে সখ্যভাবে লাভ করেছিলেন।

বয়সভেদে সখ্য-ভাবের সাধনা চার রকম: সুহৃদ্‌রূপে (নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ

ভেবে), সখারূপে (নিজেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ভেবে), প্রিয়সখা-রূপে (সমবয়স্করূপে চিন্তা ক'রে), নর্মসখারূপে (তাঁর ক্রীড়াসহচররূপে চিন্তা ক'রে)। সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, অর্জুনাদি—সখ্যভাবের সাধনার দৃষ্টান্ত।

সখ্যভাবের সাধক ভক্ত মনে করেন, ভগবান যেন তাঁর অনন্তকালের খেলার সাথী। এই জগৎ তাঁর খেলাঘর, খেলাচ্ছলেই ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি স্থিতি লয়—সবই তাঁর খেলা— অনবরত এই খেলা চলছে, প্রতি অণু-পরমাণুতে তিনি এই খেলা করছেন।

বাৎসল্য-ভাব

ভগবানকে নিজের সন্তানভাবে—বাল-গোপাল জ্ঞানে যে উপাসনা তাকে বলা হয় বাৎসল্য-ভাবের সাধনা। এই সাধনায় স্নেহ-মমতার এমনই প্রাবল্য থাকে যে ভগ-বানকে ঠিক নিজের সন্তান ব'লে প্রতীতি হয়, ভগবানে যে ষড়ৈশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ— এ চিন্তা মনে আসে না। ঐশ্বর্যের চিন্তায় ভয় থাকে; ভগবান কত বড়, কত মহান্—এই ভয়! বাৎসল্যে সে ভয় নেই।

ভগবানের সহিত ভক্তের নিকটতা হওয়ায় ভালবাসা এতই প্রগাঢ় হয় যে তখন ভগবান ভক্ত অপেক্ষা ছোট হ'য়ে যান অর্থাৎ তখন ভক্ত মনে করেন—আমি না খাওয়ালে কে গোপালকে খাওয়াবে, আমি না দেখাশোনা করলে কে তাকে দেখবে? এই প্রকারে ভক্তের নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব উদিত হয়। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার মতো ভালবাসা লৌকিক জগতে আর দেখা যায় না। এই ভালবাসা কোন প্রকার প্রতিদানের অপেক্ষা করে না, নিঃস্বার্থ ও অযাচিতভাবে মাতাপিতা তাঁদের সন্তানের ওপর ভালবাসা ঢেলে দেন; সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ক'রে সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। ভগবানের প্রতি ভক্তের যখন এই প্রকার ভালবাসার উদয় হয়, তখন ভক্ত ভগবানের দর্শনে পরমানন্দ লাভ করেন এবং অদর্শনে জগৎ শূন্য দেখেন। বাৎসল্য-রস সম্বন্ধে চৈতন্য-চরিতামৃতের উদ্ধৃতি :

বাৎসল্যে শান্তের গুণ দাস্যের সেবন ;
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার,
মমতা-আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার।
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান,
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে,
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্যজ্ঞানিগণে।

নন্দ, যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্য-ভাবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ভাবের সাধন করলে ভগবান বালগোপালরূপে দর্শন দেন এবং মায়িক মনুষ্য-শিশুর ন্যায়ই বাল্য-চপলতা নিয়ে ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন।

বাৎসল্য-ভাবের সাধনার অবস্থায় ভগবানের ঐশ্বর্য-জ্ঞান একেবারেই থাকে না এবং কোন প্রকার ঐশ্বর্যের ভাব দর্শন করলে ভক্ত গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হন। শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে মা যশোদা তাঁর ঐশ্বর্য না দেখে অমঙ্গল আশঙ্কাই করেছিলেন।

বাংলার আগমনী সঙ্গীতের মাধ্যমে বাৎসল্য-রসের আর একটি দিক সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মা মেনকা কন্যা উমার সুখের জন্য কিরূপ চিন্তিত হয়েছেন, তা কত শত গানে অভিব্যক্তিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের মতো খৃষ্ট ধর্মেও বাৎসল্য-ভাবের সাধনা দেখতে পাওয়া যায়।

মধুর-ভাব

মধুরভাবে ভাবের পরাকাষ্ঠা। 'চৈতন্য-চরিতামৃতে' মধুরভাবের বর্ণনা ঃ

এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার,
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার।
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্ দরশন,
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে,
কৃষ্ণ-কৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে।

মধুরভাবে ভক্ত আপনাকে কান্তা ও ভগবানকে কান্ত মনে ক'রে সাধনা করেন। যাঁরা এইভাবে সাধনা করেন তাঁদের মত—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জগতে একমাত্র পুরুষ আর জীবমাত্রেই প্রকৃতি। যখন ভক্ত ভগবানের জন্য সর্বদা তন্ময়ভাবে চিন্তা করেন, তখন তাঁর অদর্শনে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর ধ্যানে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। এইরূপে তাঁর প্রীতি প্রেমে পরিণত হয়। তখন ভক্ত ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করেন। সর্ব চিন্তা কান্তের চিন্তাতেই পর্যবসিত হয়। সেই অবস্থায় ভক্ত-ভগবান নেই, ধ্যাতা-ধ্যেয় নেই—সবই একত্বে বিলীন। ভক্ত ভগবানে আত্মহারা হ'য়ে যান। তাঁর অন্তর বাহির পরিপূর্ণ হয়, সর্বত্রই ভগবদ্দর্শন হ'তে থাকে।

মধুরভাবে পাঁচটি ভাবই বিদ্যমান। এই জন্য মধুর-ভাব সর্বশ্রেষ্ঠ। মধুর-ভাবের সাধিকা মীরার কণ্ঠে অপূর্বভাবে ধ্বনিত হয়েছিল :

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।
যাকে সির মোরমুকুট মেরে পতি সোঈ॥

ভগবদ্‌বিরহে মীরা গাইছেন :

তুম্‌হরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা
অব মোহি কেঁও তরসাও।
বিরহ-বিথা লাগী উর অন্দর
সো তুম আয় বুঝাও॥

রাসপূর্ণিমার রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপী-গণকে প্রেমের পূর্ণত্ব আস্বাদন করাবার জন্য অন্তর্হিত হ'লে বিরহে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবে পূর্ণ হ'য়ে গোপীদের কেউ কেউ বলেছিলেন 'আমিই কৃষ্ণ, দেখ দেখ আমি কিরূপ মনোহররূপে গমন করছি। তোমরা ভীত হ'য়ো না, আমি তোমাদের রক্ষা ক'রব।' কেউ বা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের অনুকরণ করতে লাগলেন। কেউ তাঁর শৈশব অবস্থার অনুকরণ ক'রে হামাগুড়ি দিতে লাগলেন। দুই জন গোপী কৃষ্ণ-বলরাম ও অন্য দুইজন রাধা-কৃষ্ণ হ'য়ে বাঁশী বাজাতে লাগলেন। গোপীরা আর কৃষ্ণ-বিরহিণী নন, কৃষ্ণ ভেবে তাঁরা কৃষ্ণই হ'য়ে গিয়েছেন!

সৎ-চিৎ-আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তির সৎ-অংশ সন্ধিনী; চিৎ-অংশ সংবিৎ, এবং আনন্দ-অংশ হ্লাদিনী নামে খ্যাত। আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এই হ্লাদিনীশক্তি-স্বরূপে আপনিই আপনার সুখ আস্বাদন করেন।

'সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।' চৈঃ চঃ

হ্লাদিনীর সারাংশই প্রেম। প্রেমের সারাংশই মধুর-ভাব। শ্রীমতী রাধারাণী মহাভাব-স্বরূপা। তিনি ঘনীভূত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম।

বৈষ্ণবাচার্যগণ বলেন, প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার ক'রে মধুর-রস আস্বাদন করবার জন্যে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন।

শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার,
নিজরস আস্বাদিতে কৈল অবতার। চৈঃ চঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের দুটি লক্ষণ বলছেন :

প্রথম—জগৎ ভুল হ'য়ে যাবে। ঈশ্বরে এত ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য। চৈতন্যদেব 'বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে'। দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, এর উপরও মমতা থাকবে না,

দেহবুদ্ধি একেবারে চলে যাবে। ঝড় উঠলে যেমন গাছপালা আর দেখা যায় না, সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবৎপ্রেমের উদয় হ'লে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়।

যখন ভক্তের মনে হবে, 'আমি জ্ঞান চাই না, শক্তি চাই না, মুক্তি চাই না—শুধু চাই তোমাকে, তুমিই আমার প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, জীবনের জীবন, তুমিই আমার সর্বস্ব; তোমাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে রেখেই আমার শান্তি, আমার পরমানন্দ'—তখন প্রকৃত প্রেমের উদয় হয়।

ভগবানের সহিত ভক্তের একাত্মবোধের নামই প্রেম। প্রেম একবার অঙ্কুরিত হ'লে সুখ দুঃখ, ভয়-সঙ্কোচ কিছুই থাকে না; থাকে শুধু আত্মহারা তন্ময়তা। প্রেমের এই চরম অবস্থায় ভক্ত সূর্যে দেখে ভগবানের জ্যোতি, চন্দ্রমায় তাঁর লাবণ্য, কুসুমে তাঁর হাসি, পাখির কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে শোনে তাঁরই প্রেমগীতি, নব নব ভাবের আবেশে ভগবান ভক্তকে বিভোর ক'রে তোলেন--ভক্ত তখন প্রেমাস্পদ ভগবানকে অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সর্বভূতে দর্শন ক'রে কৃতার্থ হন।

এসো হে জ্যোতির্ময়

শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

মুখোসে আবরি' মুখ,—
দেখাইয়ে ভীতি আশ্রিতে কেন
কর প্রভু, কৌতুক?
কোথায় লুকালে নবনীল নভে
শ্যাম সুন্দর শোভা?
কোথায় লুকালে ফোটা পদ্মের
সৌরভ মনোলোভা?
কোথায় লুকালে শ্যাম কুঞ্জের
কুহু কণ্ঠের ধ্বনি?
কোথায় লুকালে সে যমুনা-তট,
যেথা তুমি নীলমণি?

দুর্গম পথে ভয়াল মূরতি
দেখাইয়ে বার বার;
ওহে চতুরালি, ছলনা আমাকে
কতই করিবে আর?
সারা পথ যদি, দেখাইবে ভীতি
তুমি এই বেশ ধরে,
থেক মোর সাথে, যেও নাক কভু
দূরে দূরে, সরে সরে।
সদাই দিওনা ফাঁকি,
মেঘলা আকাশে ও-চাঁদ বদনে
দিও উঁকি থাকি থাকি।

দুঃখের গুরু ভার,
বহিবারে যদি সৃজিয়াছ, প্রভু
হাসি মুখে কর পার,
(আজ) এসো হে জ্যোতির্ময়!
ঝড়ে কাঁপা তরু ফুলে-কিশলয়ে
তোমারি ঘোষুক জয়।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটী]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনযাত্রায় অরণ্য বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। নগরের ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া ঋষিগণ অরণ্যে বাস করিয়া সমাহিতচিত্তে অমৃতত্ব-লাভের সাধনা করিতেন—ইহাই ছিল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতে নাগরিক সভ্যতা ও আরণ্য সংস্কৃতি পাশাপাশি বিরাজ করিত। নগর শিক্ষা দিত শিল্প, সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য—প্রলুব্ধ করিত বিলাস, ঐশ্বর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগে। অরণ্য শিখাইত কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যা, মৌন তিতিক্ষা, দর্শন, উপনিষদ্—প্রবুদ্ধ করিত ত্যাগে ও অমৃতত্বলাভে। অরণ্যের প্রভাব অতিক্রম করিয়া নাগরিক সভ্যতা মানবজাতিকে সর্বাংশে গ্রাস করিয়া ভোগসর্বস্ব, জড়বাদী করিয়া তুলিতে পারে নাই। বরং জীবনযাত্রা বহু পরিমাণে অরণ্যের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সংযম, ধর্ম, ন্যায় ও নীতির অভাব ছিল না। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছিল একদা ভারতবর্ষের অরণ্য-জীবনে—শান্ত নির্জন তপোবনে। নাগরিক জীবনে উচ্চচিন্তা অনুশীলনের অবকাশ বিরল। বর্তমানে অরণ্য-জীবন বিলুপ্ত, নাগরিক সভ্যতা যান্ত্রিক। এই যান্ত্রিক সভ্যতাই সর্বত্র মানব জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জ্ঞানের আরাধনার পরিবর্তে বিজ্ঞানের উপাসনার ফলে সমগ্র মানবজাতি শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন, বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীত। কবি তাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।'

বাল্মীকি-রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে রামচন্দ্রের অরণ্য-বাস-কাহিনীর সহিত অরণ্য-জীবনের সুন্দর বর্ণনা আছে। রাক্ষস-ভয়ে সন্ত্রস্ত চিত্রকূট-নিবাসী বানপ্রস্থাশ্রমী মুনিগণ ঐ স্থান পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলে তাঁহাদের পরামর্শে রামচন্দ্রও চিত্রকূটে বাস সঙ্গত মনে করিলেন না। অতএব পুনরায় লক্ষ্মণ ও সীতা সহ যাত্রা করিয়া তিনি প্রথমে অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি সস্ত্রীক কঠোর তপশ্চরণে রত ছিলেন। রামচন্দ্রকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তপঃসিদ্ধা, তাপসী, ব্রহ্মচারিণী স্বীয় পত্নী অনসূয়াকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন রামপত্নী যশস্বিনী বৈদেহীকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া অভিলষিত ভোগ্যবস্তু প্রদান করেন,—

পত্নীং স চ মহাবৃদ্ধাং সিদ্ধামৃদ্ধাং তপোধনাম্।
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ব্রহ্মচারিণীম্॥
প্রতিগৃহ্ণীষ বৈদেহীমিত্যাহ মুনিপুঙ্গবঃ।
যোজয়স্ব প্রকামৈস্ত্বং রামপত্নীং যশস্বিনীম্॥

সীতা রাজকন্যা, রাজবধূ হইয়াও অতি বিনীতভাবে অনসূয়ার নিকট উপদেশ গ্রহণ করেন। উপদেশ-প্রদানান্তে অনসূয়া তাঁহাকে বস্ত্রা-লঙ্কার উপহার দেন। নারীগণ যে কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া অলৌকিক শক্তির অধি-কারিণী হইতেন অনসূয়া-প্রসঙ্গ তাহার প্রমাণ। আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁহাদের সমান অধিকার ছিল ও ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তাঁহারাও খ্যাতি লাভ করিতেন। অত্রিমুনির নির্দেশে রামচন্দ্র অতঃপর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

বহু শতাব্দী পার হইয়া বর্তমানে

'দণ্ডকারণ্য' নামটি আমাদের নিকট বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছে। উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান-কল্পে 'দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা' ব্যর্থ অথবা সার্থক হইতে চলিয়াছে, তাহার সমালোচনায় সংবাদপত্রগুলি মুখর। সর্বত্র জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। বর্তমানে দণ্ডকারণ্য অঞ্চ উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য অবলম্বনে উদ্বাস্তুগণের জীবিকা-নির্বাহের প্রচেষ্টা চলিতেছে। অরণ্যের আদি-বাসিগণের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হইতেছে। রাম-চন্দ্রকে যে দণ্ডকারণ্য আশ্রয় দিয়াছিল, তাহার সহিত আজিকার দণ্ডকারণ্যের কত পার্থক্য। ভারতবর্ষের অতীত জীবনযাত্রার সহিত বর্তমান জীবনযাত্রার সাদৃশ্য অতি অল্প। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবর্তনও কম ঘটে নাই। বিশাল দণ্ডকারণ্যে নিবিড় অরণ্যানী হয়তো এখনও কোন কোন স্থলে বর্তমান, কিন্তু বেদগান-মুখরিত আজ্যধূমে সমাচ্ছন্ন তদানীন্তন আশ্রম-মণ্ডলের চিহ্নমাত্র নাই। বহু শতাব্দীর ব্যবধান অতিক্রম করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদানুসরণপূর্বক বাল্মীকি-বর্ণিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলে তাহার অন্য রূপ আমাদের মানসচক্ষে আবির্ভূত হইবে।

দণ্ডকারণ্য অতি বিশাল। কোথাও বিশাল-দ্রুমরাজি-সমাচ্ছন্ন বহুদূরবিস্তৃত গহন নিবিড় অরণ্যানী, সেখানে সূর্যালোক-প্রবেশের পথ রুদ্ধ। বন্য মৃগকুল শার্দূল ও হস্তিগণে পূর্ণ, অশ্রান্ত ঝিল্লী-রবে মুখরিত, সিংহ ও ব্যাঘ্রশব্দে নিনাদিত ভয়ঙ্কর অরণ্য। আবার কোথাও সুমিষ্ট ফল-ভারে আনত পাদপসমূহে পরিবেষ্টিত রমণীয় কানন, বিচিত্র লতাপুষ্প-সমাচ্ছন্ন শিলাতল, পদ্মশোভিত সরোবর, স্বচ্ছসলিল তড়াগ ও গিরি-প্রস্রবণে পরিশোভিত, বিবিধ পক্ষীর বিচিত্র মধুর কলরবে মুখরিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নিলয় দণ্ডকারণ্যের এই সকল কাননে সংসারবিরাগী ঋষিগণ আশ্রমজীবন যাপন করিতেন; সমগ্র দণ্ডকারণ্যে এইরূপ বহু আশ্রম ছিল। রামচন্দ্র আগ্রহের সহিত ঐ সকল আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছিলেন,—

প্রবিশ্য স মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমুত্তমম্।
দদর্শ রামো দুর্ধর্ষং তাপসাশ্রমমণ্ডলম্॥
কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।
দুষ্প্রবেশং দুবালক্ষ্যং সূর্যমণ্ডলবর্চসম্॥
শরণ্যং সর্বভূতানাং সুসমৃদ্ধং শ্রিয়া যুতম্।
সেবিতঞ্চোপনৃত্যঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ।
পবিত্রমমলং দিব্যং সিংহশার্দূল-নাদিতম্॥
বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্ভাণ্ডৈ রুচিরৈঃ শুভৈঃ।
মহদ্ভিস্তোয়কলসৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্।

—কুশ ও চীরে পরিব্যাপ্ত, ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাস-জনিত প্রভায় সমাবৃত সূর্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি-মান্ আশ্রমগুলি বস্তুতঃ সাধারণের নিকট দুরালক্ষ্য ও দুষ্প্রবেশই ছিল। অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন পবিত্র নির্মল ও দিব্যভাবাপন্ন আশ্রমমণ্ডল ছিল সর্বপ্রাণীর আশ্রয়স্থল। সর্বদা বেদধ্বনি ও যজ্ঞমন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত, যজ্ঞশালায় প্রজ্বলিত অগ্নি, স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞভাণ্ডসমূহ, বৃহৎ জলকলস ও ফলমূলসমূহ আশ্রমের শোভা বর্ধন করিত।

এই সকল পবিত্র তাপসাশ্রমে বাস করিতেন ফলমূলভোজী, জিতেন্দ্রিয়, চীর ও কৃষ্ণাজিন বসনধারী তেজঃসম্পন্ন বিভিন্ন সাধনমার্গের মুনিবৃন্দ। তাঁহাদের উগ্র কঠোর তপস্যার কিছু কিছু বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের সহিত যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুনিবৃন্দ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বৈখানস মুনিগণ—অকর্ষিত ভূমিতে জাত ফলমূলাদি আহার করিয়াই তাঁহারা জীবন ধারণ করিতেন; নূতন খাদ্য প্রাপ্ত হইলে পুরাতন খাদ্য যাঁহারা ত্যাগ করিতেন, সেই বালখিল্য মুনিগণ, স্বয়ংপতিত

ফলাদি ভক্ষণ অথবা সূর্য কিংবা চন্দ্রের রশ্মি পান করিয়া জীবন-ধারণে অভিলাষী মরীচিপ-গণ, ও অপক্ক অন্ন প্রস্তর দ্বারা কুট্টিত করিয়া ভক্ষণ-কারী অশ্মকুট্টগণ। কেহ বা পত্রাহারী অথবা সলিলাহারী, কেহ বা অভ্রাবকাশী অর্থাৎ বর্ষা-কালে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারা সহ্য করিতেন, কেহ বা স্থণ্ডিলশায়ী, আস্তরণশূন্য কঠিন ভূমিতলে শয়ন করিতেন। উপবাসরত কেহ হয়তো জলে কল্পান্তস্থায়ী অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল জলে অবস্থান করিতেন। অপর কেহ হয়তো পঞ্চ-তপার অনুষ্ঠানে নিরত। দীর্ঘদিন অন্তর আহার গ্রহণ করাই ছিল কাহারও তপস্যা। আবার কেহ হয়তো নিরাহার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। নিষ্কাম অথবা সকাম উপাসনায় রত অন্যান্য মুনিবৃন্দও ছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্য-অন্তর্গত আশ্রমমণ্ডল পরিদর্শনকালে এই প্রকার বহুবিধ তপস্যাপরায়ণ ও ব্রতানুষ্ঠান-সম্পন্ন মুনিগণের সাক্ষাৎলাভ করেন। এইভাবে প্রসন্নচিত্তে পরম আনন্দে আশ্রমসমূহে বাস করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের দশ বৎসর অতীত হইয়াছিল।—

তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমে সুখম্।
রমতাশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ ॥৮

রামচন্দ্রের বনবাস-বার্তা সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও অতুলনীয়া সুন্দরী তরুণী পত্নী সহ রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনবাস করিতেছেন, এই সংবাদ স্বভাবতই বনবাসিগণের নিকট কৌতূহলের বিষয়। রামচন্দ্র যখন যে আশ্রমে গমন করিতেন, ঐ আশ্রমের এবং দূর দূরান্তর হইতে বনবাসী ঋষি ও মুনিগণ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ছুটিয়া আসিতেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্য সৌন্দর্য ও সৌকুমার্য তাঁহাদের নিকট বিস্ময়কর ছিল। রামচন্দ্রের অপূর্ব বিনয় ও উদার মধুর বচন তাঁহাদের চিত্ত হরণ করিত। ইহা ব্যতীত রাক্ষস-অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ-লাভের আশায় তাঁহারা অমিততেজসম্পন্ন শ্রীরামচন্দ্রের শরণপ্রার্থী হইতেন।

রাক্ষসাধিপতি রাবণের ভ্রাতা খরের অত্যাচার পম্পা ও মন্দাকিনী-তীরবাসী ও চিত্রকূটনিবাসী মুনিবৃন্দের আশ্রমসমূহে ক্রমশই বর্ধিত হইতেছিল। জনপদ হইতে দূরে অরণ্যস্থিত এই আশ্রমসকল ছিল রাক্ষসগণের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। তখন দেশে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিশেষ প্রচলন ছিল। গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি ছিল তপস্বিগণের নিত্য সেব্য। ইহা ব্যতীত যখনই তাঁহারা অন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইতেন, তখনই যজ্ঞানল প্রজ্বলিত ও ধূম উত্থিত হইলেই রাক্ষসগণ দল বাঁধিয়া যজ্ঞ-বিনাশের অভিপ্রায়ে ছুটিয়া আসিত। তপস্যা-নুষ্ঠানে রত মুনিগণ জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ এবং প্রাণিনিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত, সুতরাং তাঁহারা ছিলেন রাক্ষসদিগের অত্যাচার-দমনে অপারগ। রামচন্দ্রের দর্শনে তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, তিনি যেন রাক্ষস সংহার পূর্বক তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন দূর করেন।

সাক্ষাৎ সূর্যমিবোদ্যন্তং তং দৃষ্ট্বা ধর্মচারিণম্।
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্নন্ ধৃতব্রতাঃ।

—ব্রতনিষ্ঠ সেই মহর্ষিগণ উদীয়মান সূর্যের ন্যায় সুন্দরদর্শন ধর্মচারী রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া মাঙ্গলিক বাক্যসমূহ প্রয়োগপূর্বক তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

বস্তুতঃ রামচন্দ্র যে আশ্রমে গমন করিতেন, সেখানেই তাঁহাকে সকলে বন্য ফলমূল পুষ্প ও সলিল দ্বারা অর্চনা করিয়া তাঁহাদের আশ্রমে বাসের জন্য অনুরোধ করিয়া নানাভাবে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া আশ্বাস প্রার্থনা করিতেন:

ত্বং নো ধর্মঃ পিতা রাম তথা শরণদঃ সখা।
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ ॥

—রাম তুমি আমাদের ধর্ম, পিতা, আশ্রয়-দাতা, সখা; তুমি আমাদের পূজনীয় এবং রাজা বলিয়া সম্মানার্হ। আমরা তোমারই রাজ্যনিবাসী বনবাসী; আমাদের রক্ষা করা তোমার কর্তব্য; সুতরাং হে রঘুশ্রেষ্ঠ, নগরে অথবা বনে যেখানেই তুমি অবস্থান কর—তুমিই আমাদের রক্ষক।

আর্তাঃ স্ম শরণং রাম ভবন্তং সমুপাগতাঃ।
পরিপালয় নঃ সর্বান্ সবাহুবলমাশ্রিতঃ।
ঐশ্বরোঽয়ং পরোভাবঃ শূরত্বং নাম রাঘব ॥

—রাম, আর্ত আমরা তোমার শরণাপন্ন, তুমি বাহুবলে আমাদের রক্ষা কর! হে রাঘব, আত্মরক্ষণরূপ উৎকৃষ্ট স্বভাবই নৃপতিগণের বীরত্বের ও মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ঐ প্রকারে স্তুত হইয়া রাম কিন্তু অতি বিনীতভাবে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন:

নৈবমর্হথ মাং বক্তুমহমেব সলক্ষ্মণঃ।
তপঃশ্রুতবয়োবৃদ্ধান্ ভবতঃ শরণং গতঃ ॥

—আমাকে এই প্রকার বলা আপনাদের সঙ্গত নহে, লক্ষ্মণের সহিত আমি—তপোবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ আপনাদের শরণাপন্ন।

যথাবিহিত রাজা হইয়া অযোধ্যায় অবস্থান করিলে রামচন্দ্র প্রজাবঞ্জক নৃপতিরূপে খ্যাতিলাভ করিতেন নিশ্চিত, কিন্তু তাহা হইলে সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্টের দমন সংসাধিত হইত না। সংসার-বিরাগী তপস্বিগণ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াই কি তপস্যার ফল লাভ করেন নাই? বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার অভিলাষী হইয়াই রামচন্দ্র বিশাল দণ্ডকারণ্যস্থিত বিভিন্ন আশ্রম-মণ্ডল পরিদর্শন করেন। পরে রাক্ষস-সংহার দ্বারা সর্বত্র শান্তি ও ধর্ম স্থাপিত হয়। প্রত্যেক অবতারের জীবনই পরবর্তীকালে সুপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। রামচন্দ্রের বনবাস অসঙ্গত অথবা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। বিষ্ণুর নিকট দেবতাদিগের শরণপ্রার্থী হইয়া গমন ও তৎকর্তৃক রাবণবধের আশ্বাস-প্রদান দ্বারা ইহাই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

রামচন্দ্রকে অবতার বলিয়া হয়তো সকলে তখন বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মানব নহেন। রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহারা এক দিব্য অলৌকিক আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে আকর্ষণ সর্বযুগের অবতার-চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন আনন্দোচ্ছ্বাসে তরঙ্গস্ফীত হয়, রামচন্দ্রের দর্শনে সেই পবিত্র-চিত্ত মুনিগণ এক অপার্থিব আনন্দে মগ্ন হইতেন। বিখ্যাত ঋষি শরভঙ্গ দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া রামচন্দ্রের প্রতীক্ষারত ছিলেন। রামচন্দ্রের দর্শনলাভে ধন্য হইয়া শরভঙ্গ তাঁহার সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দেহ বিসর্জন করেন। সুতীক্ষ্ণ ঋষি রামকে দর্শন করিবামাত্র আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের দর্শন-আশাতেই তিনি জরাজীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আরোহণ করেন নাই।

নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অগস্ত্যমুনি বিশেষ খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষে রামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলে শিষ্যসমভিব্যাহারে মুনি রামচন্দ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। পরে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত তাঁহার অর্চনা করিয়া মুনিবর রামচন্দ্রকে ধনু ও খড়্গ উপহার প্রদান করেন। অগস্ত্যের নির্দেশানুসারে রাম অতঃপর গোদাবরী-তীরে পঞ্চবটীকাননে পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিতে যান।

রামচন্দ্র মুনিগণকে রাক্ষসবধের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া অভয় দিলে সীতা উপদেশচ্ছলে

রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের অকারণ শত্রুতাচরণ সমুপস্থিত হইয়াছে। শত্রুতা ব্যতিরেকে রাক্ষসবধ যুক্তিসঙ্গত নহে। পর-হিংসাকৃত রাক্ষসগণের সহিত বৈরতারূপ ব্রত কি তাঁহার পক্ষে হিতকর হইবে? সজ্জনগণ অহিংসা দ্বারাই পরম ধর্ম লাভ করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র যখন বনবাস করিতেছেন, তখন অহিংসা ধর্ম পালন করা তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া যেন তিনি পুনরায় ক্ষাত্রধর্ম পালন করেন। উত্তরে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তিনি যখন শরণাগত মুনিবৃন্দকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, তখন প্রতিজ্ঞভঙ্গে তিনি অক্ষম।

পঞ্চবটীকাননে বাসের পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু রাক্ষসগণের সহিত রামের বিরোধ বা সংগ্রামের কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই। কেবল বিরাধ-নামক রাক্ষস কর্তৃক সীতা আক্রান্ত হইলে রামচন্দ্র তাহাকে বধ করেন। বিরাধ রাক্ষস বলিয়া উক্ত হইলেও বর্ণনাপাঠে মনে হয় বনচর কোন অতিকায় হিংস্র প্রাণী। পঞ্চবটী বনে বাস করিবার অল্পকাল পরে দৈবক্রমে রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী রাক্ষসী শূর্পনখা আসিয়া উপস্থিত হইলে রাক্ষসগণের সহিত রামের সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

শূর্পনখার আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনাপাঠে তাহার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা করা যাইতে পারে। শূর্পনখা অপ্রিয়দর্শনা, বিরূপনয়না, তাম্রবর্ণকেশা, বিকৃতাকারা, অতিভীষণস্বরা, বিকটভাষিণী, দুর্বৃত্তা। রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া শূর্পনখা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চায়। সীতাকে দেখাইয়া রাম তাহাকে লক্ষ্মণের নিকট ঐ প্রস্তাব করিতে বলেন। অতঃপর শূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূর্পনখার নাসিকা কাটিয়া দেন। শূর্পনখা তাহার ভ্রাতা খরের নিকট নিজের দুর্দশা জ্ঞাপন করিলে খর দূষণ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ সহ পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামের সহিত রাক্ষসগণের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাম একাকী সমুদয় রাক্ষস বিনাশ করিলেন। দণ্ডকারণ্য রাক্ষস-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হইল না; বরং যে দুষ্টদমনের জন্য রামচন্দ্রের আগমন সেই কার্যের আরম্ভ মাত্র হইল বলা চলে।

লাঞ্ছিতা শূর্পনখা তখন ভ্রাতা খরের বিনাশ দর্শনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসাধিপতি অগ্রজ রাবণের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

প্রার্থনা

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

যে টুকু অংশ গ্রহণ করেছি
এ বিশ্ব-অভিনয়ে,
পূর্ণ যেন তা হ'য়ে যায় প্রভু
তোমার আশীষ লয়ে।
আমার বলিতে যাহা কিছু সব
হয় যেন নিরসন,
যাহা কিছু করি সবি যেন ভাবি
তোমারই অনুশাসন।

জেগে রই যবে তুমি মোরে দিও
কর্ম করিতে শকতি,
ঘুমাব যখন কর্ম-ক্লান্ত
তুমি দিও কোল পাতি।
ধূলি হ'য়ে যদি উড়ে যাই কভু
তব পদে দিও ঠাঁই,
তোমারি চরণে 'আমি ও আমার'
—সব কিছু ভুলে যাই।

ডক্টর ঝিভাগো

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বোরিস্ পাস্তারনেক (Boris Pasternak) পৃথিবীর নামজাদা ঔপন্যাসিকদের দলে ঠাঁই পেয়েছেন Doctor Zhivago লিখে। এই বইখানিকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্যজগতে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি? দেখিই না, বইখানি কেমন! দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে ডক্টর ঝিভাগো পড়া শুরু হ'ল।

উপন্যাসের আরম্ভে নায়ক ঝিভাগো মায়ের সমাধিভূমিতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট। রোরুদ্যমান বালককে মামা নিয়ে চলেছে বাড়ীতে। এই মৃত্যুর পাণ্ডুর পটভূমিতে ঝিভাগোর জীবনের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়।

অভিজাত বংশের ছেলে ঝিভাগো অল্পবয়সেই মা-বাপকে হারিয়েছে। মামা তাকে শোনায় খ্রীষ্টের কাহিনী। উপন্যাসের শুরুতেই পঞ্চম পরিচ্ছেদে মামার কথাবার্তা থেকে আমরা বুঝতে পারি, এ বই মার্ক্সবাদীদের মনঃপূত হবার কথা নয়। ক্যাণ্ট্ বা মার্ক্সকে ঘিরে দল বাঁধার যে মনোভাব, তার মধ্যে কি মেলে সত্যের সন্ধান? সত্যান্বেষণ ব্যক্তিগত সাধনার বস্তু। সত্যনিষ্ঠা পারে না দলনিষ্ঠার সঙ্গে তালে তাল দিয়ে চলতে। আর একটা কথা। মুড়ি-মিছরির কখনো একদর হ'তে পারে না। পৃথিবীতে এমন বস্তু অল্পই আছে, যার কাছে জীবন মনপ্রাণ নিঃশেষে নিবেদন করা যায়। আমরা শুধু খ্রীষ্টের মতো অমৃতের বার্তাবহের কাছেই হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারি। খ্রীষ্টের বাণীর মধ্যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসার কথা রয়েছে, আর ভালোবাসাই হচ্ছে মামার ভাষায়ঃ প্রাণোত্তমের পরম প্রকাশ (the supreme form of living energy)। খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীর মধ্যে রয়েছে একটি মুক্ত ব্যক্তিত্বের (free personality) আব মহাদর্শের জয়গান। মামা বলছেন বন্ধুকেঃ It was not until after Christ that time and man could breathe freely. —খ্রীষ্টজন্মের আগে তো তমসার যুগ, রক্তারক্তি, হিংস্রতা, পশুত্ব। একজন মানুষ অন্যদের স্বাধীনতা হরণ করলে মনুষ্যত্বের গৌরব হারিয়ে ফেলে—এ চিন্তা কারও মনে তরঙ্গ তখনও তোলেনি।

এ রকমের চিন্তা নিশ্চয়ই জড়বাদের প্রসারের পক্ষে অনুকূল হ'তে পারে না। তাই উপন্যাসের প্রথম ভাগেই দেখতে পাই, মামাকে খ্রীষ্টের কাছে আনুগত্যের জন্যে মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর। সিভিল সার্ভিসের চাকরিটি তিনি খুইয়েছেন খ্রীষ্টের প্রেমধর্মের জয়গান করার জন্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা মামাকে বঞ্চিত করেছে স্বচ্ছন্দভাবে কোথাও যাওয়া-আসার অধিকার থেকে।

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'—ভাগ্নে ঝিভাগো মামার সান্নিধ্যেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে। তার শিশুমনের ওপরে মামার প্রভাব সঞ্চারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ঝিভাগো এক জায়গায় স্বীকারই করেছে, 'I am supposed to have been corrupted by his influence.' —অনেকেরই ধারণা মামার ভাবপ্রভাবেই তার জীবন ও মন 'দূষিত' হয়েছে। ঝিভাগোর চরিত্রে খ্রীষ্টের প্রভাব প্রথম থেকেই আমরা

লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি তার জীবনের পবিত্রতাকে, লক্ষ্য করি তার নীরব নম্রতাকে, লক্ষ্য করি তার সত্যানুরাগের প্রবলতাকে। রোমা রলঁ্যার জঁা ক্রিস্তফের সঙ্গে ঝিভাগো-চরিত্রের অনেক জায়গায় মিল আছে। দু-জনেই প্রেমিক, দু-জনেই নিঃস্বার্থ, দু-জনেই সত্যানুরাগী। শুধু ক্রিস্তফের চরিত্রে পৌরুষের প্রকাশ আরও প্রোজ্জ্বল। ঝিভাগো এবং ক্রিস্তফ—উভয়কেই মূল্য দিতে হয়েছে সত্যকে গভীর ক'রে ভালোবাসার জন্যে। মিথ্যাকে দু-জনেই বরদাস্ত করতে পারেনি।

রলঁ্যা ক্রিস্তফের জীবন শুরু করেছেন সূতিকাগৃহ থেকে। সেই জীবন নানা অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে আবর্তসঙ্কুল বেগবান্ নদেরই মতো। অবশেষে মৃত্যুতে সেই জীবনের কী গরিমময় অবসান! ক্রিস্তফ জীবনকে কামনা করেছে, শান্তিকে নয়। কুরুক্ষেত্রের পর কুরুক্ষেত্রকে সে জয় ক'রে চলেছে গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের মতোই। মাঝে মাঝে পরাজয়। সেই পরাজয় ক্রিস্তফকে দমাতে পারেনি, দিয়েছে তাকে নূতনতর দৃষ্টি, নূতনতর গতিবেগ। দুঃখের হলমুখে বিদীর্ণ ক্রিস্তফের রক্তাক্ত হৃদয়ের ফাটল থেকে' বারে বারে বেরিয়ে এসেছে নবজীবনের শ্যামাঙ্কুর। দুরন্ত প্রাণবন্যায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে অপমানের স্মৃতি, ব্যর্থতার গ্লানি।

ঝিভাগো ক্রিস্তফের মতো সঙ্গীতজ্ঞ নয়; সে ডাক্তার। ক্রিস্তফ বিয়ে করেনি। ঘর বাঁধবার ইচ্ছে থাকলেও ক্রিস্তফের সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে গেছে। ঝিভাগো বিবাহিত। ঝিভাগোর জীবনও নদীর মতোই বয়ে চলেছে নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে কুড়িয়ে। 'ডক্টর ঝিভাগো' উপন্যাসকে তাই 'পথের পাঁচালি' বলা যেতে পারে। ঝিভাগোর স্বভাবের মধ্যে কোথাও উগ্রতার লেশমাত্র নেই। ঝিভাগো স্ফটিকের মতোই স্বচ্ছ, মেষশাবকের মতোই মৃদু, অথচ সিংহের মতো সাহসী। রাশিয়ার অন্তর্বিপ্লবের রক্তাক্ত পটভূমিতে দিগন্তপ্রসারী হানাহানির মধ্যে ঝিভাগো-চরিত্রে ফুটে উঠেছে খ্রীষ্টের করুণ কোমলতা। সে ধন চায়নি, মান চায়নি, চায়নি কোলাহলমুখর মহানগরীর উচ্ছল ফেনিলতা। ঝিভাগো চেয়েছিল পল্লীর নিভৃতে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে মাটির কাছাকাছি থাকতে। রাজধানী থেকে বহু দূরে পল্লীর আবেষ্টনীর মধ্যে গৃহ-জীবনকে গুছিয়ে তোলবার মুখে হঠাৎ তার জীবন বিপর্যস্ত হ'য়ে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনার ধাক্কায়। পর্টনের লোকেরা তাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গেল ছাউনিতে। আহতদের চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। কোথায় পড়ে রইল প্রিয়তম পুত্র ' এবং সন্তানসম্ভবা সহধর্মিণী। কঠিন বাস্তবের আকস্মিক রূঢ় আঘাতে জীবনের স্বপ্ন এক লহমায় চুরমার হ'য়ে গেল! বিপ্লবের ফেনিল আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে ডাক্তারের জীবন চলতে লাগল এখান থেকে ওখানে। অন্তরে তার নিদারুণ নিঃসঙ্গতা। পালাতে চেয়েছে কতবার! সফলকাম হ'তে পারেনি। নেতাদের হৃদয়ে দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। বিপ্লবের নামে হেন নিষ্ঠুরতা নেই, যা তারা না করতে পারে! লারা বলছে, 'নেকড়ে বাঘের চেয়েও তারা হিংস্র!' ডাক্তার ঝিভাগোর হৃদয়ের কান্না শোনবার মতো কান কোথায়? নেতাদের মনের যে-চেহারা পাস্তারনেক ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে, তাতে তাঁদের খুশী হওয়ার কথা নয়; আর সেই জন্যেই পাস্তারনেকের কীর্তি তাঁর স্বদেশে অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে রইল।

উপন্যাস পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে রক্ত হিম হ'য়ে যায়! কোন দেশে যখন রক্তাক্ত অন্তর্বিপ্লবের ঝড় বইতে আরম্ভ করে, তখন বিপ্লবের দোহাই দিয়ে যে-সব কাণ্ড ঘটতে থাকে সেগুলি কী অমানুষিক! একথা ঠিক যে এই বিপ্লবের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা (historical inevitability) থাকতে পারে। একথা ঠিক যে দীর্ঘকাল ধ'রে নির্যাতন ভোগ করতে করতে অবশেষে একদিন সর্বহারা-রা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, আর সেদিন মরিয়া হ'য়ে নিরন্নেরা কতদূর হিংস্র হ'য়ে উঠতে পারে—তার সীমারেখা ঠিক করবে কে?

তবু চারিদিকের অনিবার্য রক্তারক্তির মধ্যে যে কোন সংবেদনশীল মানুষের অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়ে একটি মহাজিজ্ঞাসা বারংবার উঁকি মারে: হিংসার রাস্তায় কি হিংসাকে নিবারণ করা সম্ভব? কোন মানুষকে, কোন সম্প্রদায়কে, কোন জাতিকে ঘৃণা ক'রে কি আমরা মানুষের সমাজকে নবজীবনের উপকূলে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল লিখেছেন:

I don't know whether anybody deserves to be hated, but I do know that hatred of those whom we believe to be evil is not what will redeem mankind. [—Human Society in Ethics and Politics]

রাসেলের এই বাণীরই প্রতিধ্বনি ডাঃ ঝিভাগোর কণ্ঠে। রেলগাড়ীতে সহযাত্রীকে তিনি বলছেন:

I used to be very revolutionary-minded, but now I think that nothing can be gained by violence. People must be drawn to good by goodness.

—আমিও ছিলাম ভাবের দিক দিয়ে বিপ্লবী, এখন কিন্তু ভাবি হিংসার দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। জনগণকে কল্যাণের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে কল্যাণের পথেই।

এ যেন ঝিভাগোর কণ্ঠে আমাদের অতি পরিচিত, অতি পুরাতন বাণী। হিংসার রাস্তায় শেষ পর্যন্ত একটা মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না—একথা বলছেন কে? বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন আকাশচারী কোন কবি নয়, পর্বত-গুহাবাসী কোন সন্ন্যাসীও নয়। বলছেন ডাক্তার ঝিভাগো, যিনি কবি হলেও অন্তর্বিপ্লবের আগুনে জাজ্বল্যমান দেশের বীভৎস রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত। ডাঃ ঝিভাগো অভিজাত বংশের ছেলে হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিক্রিয়াপন্থী নয়। তবু জিঘাংসার প্রাবল্যে মানুষ তার আদর্শবাদ সত্ত্বেও কত নিচে নেমে যেতে পারে, ক্ষমতার নেশায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে কোন্ রসাতলে তলিয়ে যায়—তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ডাক্তার ঝিভাগোর চক্ষু থেকে সমস্ত আবরণ খসিয়ে দিয়েছে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত নেতারা যেন পৌরাণিক যুগের দেবতা; বিপ্লব তাদের পায়ে সাজিয়ে রেখেছে পূজার নৈবেদ্য। ক্ষমতার মদিরা পান ক'রে তাদের ভেতর থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে সমস্ত কোমলতা। একটা উদ্দেশ্যের রথকে তারা চালিয়ে নিয়ে চলেছে, আর সেই রথের চাকায় কত যে নিরীহ জীবন গুঁড়িয়ে গেল, সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই! যেন-তেন-প্রকারেণ বিপ্লবকে জয়ী করা চাই। লারা বলছে ঝিভাগোকে তার স্বামী এবং স্বামীর সহকর্মীদের লক্ষ্য ক'রে: They are made of stone, these people, they aren't human with all their rules and principle. —এরা পাষাণে তৈরী, এদের যতই নিয়ম নীতি থাকুক, এরা মানুষ নয়। একথা ঠিক যে, অত্যাচারকে নির্মূল করবার জন্যে বিপ্লবের

নেতৃত্ব করেন যাঁরা, তাঁদের নিষ্ঠুর হ'তেই হয়। সব দেশেই হয়, আমাদের দেশেও হয়েছে। কত মা কেঁদেছে, কত সুখের সংসার চুরমার হ'য়ে গেছে, রক্তের নদী বয়েছে দিকে দিকে। কিন্তু সে রক্ত ছিল আমাদেরই রক্ত—স্বেচ্ছায় প্রবাহিত। গণবিপ্লবের সেই অন্তরের শিখায় পুড়ে সৈনিকদের নৈতিক চরিত্র আরও মহিমময় হ'য়ে ওঠে! মৃত্যুর গর্ভ থেকেই তো জীবনের অঙ্কুর জাগে। অত্যাচারীকে বাধা দিলে সে তো মারবেই। সেই মরণকে হাজারে হাজারে বরণ করতে পারলে তবেই না অত্যাচারের অবসান সম্ভব!

মার্ক্সবাদ মূল্য দেয় লক্ষ্যকে—শ্রেণীহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে। শ্রেণীসংগ্রাম মার্ক্সবাদের অনেকখানি জুড়ে আছে—একথা সত্য। কিন্তু মার্ক্সবাদীরা—যে লক্ষ্যে বিশ্বাস করে, সেই শ্রেণীহীন সমাজে শেষ পর্যন্ত শ্রেণী-সংঘর্ষের অবসান ঘটেছে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমন্বয়ের মধ্যে। সেখানে ক্ষমতার প্রতীক রাষ্ট্রেরও কোন অস্তিত্ব নেই—'the state withers away'. সে বিপ্লবের অন্তে যেমন প্রেম শান্তি সমন্বয়, আদিতেও তেমনি প্রেমেরই প্রেরণা! সর্বহারাদের শৃঙ্খলমুক্ত দেখবার দুরন্ত আগ্রহই কি মার্ক্স ও লেনিনকে বিপ্লবের সুদুর্গম শৈলপথে টেনে আনেনি? মার্ক্সবাদীদের লক্ষ্য তো ভালোই; কিন্তু এ লক্ষ্য যে অনেক-দূরে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের মতো! মাঝখানটাতে লড়াই, একনায়কত্বের রুদ্রলীলা, মতবাদের গোঁড়ামি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল কার্ল মার্ক্সের উপরে যে পণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, তার উপসংহারে আছে:

It is true that as a result of social revolution, the division of classes, is expected ultimately to disappear giving place to complete political and economic harmony. But this is a distant ideal, like the Second Coming; in the meantime, there is war and dictatorship and insistence upon ideological orthodoxy.

সত্যকে এবং প্রেমকে মূল্য না দিয়ে লক্ষ্যকে সর্বেসর্বা করলে বিপ্লব একটা দেশকে কোন্ নরকাগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে—তারই পরিচয় পাস্তারনেকের উপন্যাসের মধ্যে। ডাক্তার ঝিভাগো অকুণ্ঠভাষায় Sandevyatovকে বলছে: I don't know of any teaching more self-centred and further from the facts than Marxism. মার্ক্সের মতবাদে অনেক কিছুকে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলও ঝিভাগোর মতোই বলেছেন, 'a myth which cannot be accepted by anyone capable of rational thoughts'. একটা পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল লক্ষ্যে পৌছানো কি বিরোধী পক্ষকে ঘৃণা ক'রে সম্ভব? যার সঙ্গে মতে মিললো না তাকে চুরমার ক'রে দেবার যে আসুরিক ফিলজফি; সে ফিলজফি কি মানবসমাজের কল্যাণের পক্ষে আদৌ অনুকূল?—এ প্রশ্ন জেগেছে ডাক্তার ঝিভাগোর সত্যানুসন্ধিৎসু মনে। সাংঘাতিক প্রশ্ন। 'End justifies the means' —এই মতবাদকে তিনি অভ্রান্ত ব'লে স্বীকার করতে পারেননি। এ যুগের চিন্তাজগতের অনেক মহারথীই তো হিংসাকে সমর্থন করেননি। আলডুস্ হাক্সলি করেছেন? বানার্ড-শ বা রাসেল করেছেন? গান্ধী করেছেন? জগতে নানা মুনির নানা মত তো থাকবেই। নীটসের সুপার ম্যানের আইডিয়ায় আর শ্রীঅরবিন্দের সুপার-ম্যানের আইডিয়ায় কত তফাৎ! নীটশের চোখে অতিমানব নেপোলিয়ান। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তায়, দুর্জয় সাহসে, ক্ষমতার প্রতি প্রবল অনুরাগে। তাঁর মধ্যে করুণার এবং কোমলতার অল্পতা। রাসেল

বিশ্বাস করেন : নীটশের শিষ্যদের খেলা ফুরিয়ে গেছে। আশা করা যায়, সর্বজনীন প্রেমের আদর্শই পৃথিবীতে জয়ী হবে!

এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে ও জীবনকে দেখা, এই যে মতবাদের বৈচিত্র্য—এ বিচিত্রতা চলে গেলে পৃথিবীটা কি নিতান্ত আলুনি হ'য়ে যেত না? এ যুগের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ্ Nunn-এর লেখাতে পড়েছিলাম :

It takes all sorts to make a world, and world becomes richer the better each becomes after his own kind.

—নানারুচির নানা মতের নরনারী নিয়েই তো আমাদের এই বিচিত্রা পৃথিবী। আমাদের প্রত্যেককেই নিজের নিজের স্বকীয়তাকে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের দ্বারাই আমরা পৃথিবীকে একটি লোভনীয় বাসস্থানে পরিণত করতে পারি। কিন্তু যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন স্থান নেই, সেখানে 'End justifies the means'-নীতি হিংসা-অহিংসার কোন ধারই ধারে না, সত্য-মিথ্যারও না। লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়ের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে—এ-কথা মার্ক্সবাদ স্বীকারই করে না। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক ওর 'ism', ধরাবাঁধা কতক থিয়োরির বাইরে গেলেই তো তুমি অপাঙ্‌ক্তেয় হ'য়ে গেলে, তুমি প্রতিক্রিয়াপন্থী—সেকেলে। ঝিভাগোর কাছে এই শাসনের জয়গান দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। লারা-কে সে বলছে : I am sick and tired of it.

সব মানুষকেই একই সুরে কথা বলতে হবে, একই মতবাদের আশ্রয় নিতে হবে, একই নায়কের তর্জনী-সঙ্কেতে পথ চলতে হবে—এ তো দাসত্ব। সংখ্যাধিক্য দিয়ে কখন সত্যনির্ধারণ হয়? ইবসেনের ডক্টর স্টকম্যান* বলছে :

I propose to raise a revolution against the lie that the majority has the monopoly of the truth.

অনেক লোক এক সঙ্গে মিলে একটা বিশেষ মতের জয়ধ্বনি দিলেই যে তা সত্য হ'য়ে গেল—এমন কোন কথা নেই। Dr. Zhivago (ঝিভাগো)-উপন্যাসে সিমা বলছে : খ্রীষ্টের আবির্ভাব পৃথিবীতে আনল একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন। কি সেই পরিবর্তন?—

The reign of numbers was at an end. The duty, imposed by armed force to live unanimously as a people, as a whole nation was abolished. Leaders and nations belonged to the past. They were replaced by the doctrine of personality and freedom.

—খ্রীষ্টের আবির্ভাবে সংখ্যাধিক্যের আধিপত্য গেল শেষ হ'য়ে। জাতিহিসাবে একত্র বাস করতে হবে ব্যক্তিগত মতের বালাই বিসর্জন দিয়ে—এরও অবসান হ'ল। পুরাতনের চিন্তাভস্মের উপর উড্ডীন হ'ল ব্যক্তিত্বের আর স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা।

ডাঃ ঝিভাগোর মুখ দিয়ে পাস্তারনেক যত কথা বলিয়েছেন, তার মূল সুরটি হচ্ছে—ব্যক্তিত্ব আর স্বাধীনতা। এই দিক দিয়ে পাস্তারনেক ইবসেনের আর রাসেলের, হুইটম্যানের আর গান্ধীর সগোত্র। ডাঃ ঝিভাগো পাস্তারনেকের মানস সন্তান। তাই স্বাধীনতার এবং সত্যের পূজারী ডাঃ ঝিভাগো আনুগত্য স্বীকার করেছে খ্রীষ্টের কাছে, মার্ক্সের কাছে নয়। বলা বাহুল্য ডাক্তার ঝিভাগোর এই রকমের মতকে সোভিয়েত রাশিয়া সহ্য করতে পারেনি। পাস্তারনেকের এত বড়ো সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর স্বদেশে আজ অপাঙ্‌ক্তেয়। কর্তৃপক্ষের চাপে পাস্তার-

*An Enemy of the People : Ibsen.

নেককে নোবেল প্রাইজ অস্বীকার করতে হ'ল। ইতিপূর্বে আরও অনেক লেখককে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে স্বাধীনভাবে নিজের মতকে ব্যক্ত করবার দুঃসাহসের জন্যে। জীবদ্দশায় ভোল-তেয়ারের মাথা গুঁজবার জায়গা মেলেনি ফরাসীদেশে। মৃত্যুর পরে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ভোলতেয়ারের মৃতদেহ নিয়ে শোভা-যাত্রার সে কী অপরূপ দৃশ্য! এমনই হ'য়ে থাকে। তদানীন্তন ফ্রান্সের যাঁরা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁদের মন-যোগানো কথা বলতে পারেননি ভোলতেয়ার আর সেই জন্যেই নির্বাসনে কেটেছে তাঁর জীবনের দিনগুলি। ইবসেনের স্টকম্যানকে জনতার হাতে প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে সত্যকে ফাঁস ক'রে দেবার জন্যে। সত্য বললে শহরের বিপুল আর্থিক ক্ষতি। সত্যকে গোপন ক'রে গেলে শহরের শ্রীবৃদ্ধি। ডাক্তার স্টকম্যান সত্যকে চেপে গেলেই তো পারেন। মিথ্যাকে আশ্রয় ক'রে শহর যদি আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান্ হয়, তবে ডাঃ স্টকম্যান কেন মিথ্যাকে হজম করতে এত নারাজ? ডাক্তার তার উত্তর দিয়েছে অকুণ্ঠ ভাষায়:

Yes, my native town is so dear to me that I would rather ruin it, than see it flourishing upon a lie.

মিথ্যার সঙ্গে কখনো আপস চলে না, আর ইবসেনের সমস্ত লেখার মধ্যে সত্যের এবং স্বাধীনতার জয়ধ্বনি। পাস্তারনেকের ডাঃ ঝিভাগো ইবসেনের ডাঃ স্টকম্যানের মতোই সত্যের পূজারী। হিংসার মধ্যে, একনায়কত্বের মধ্যে, গোঁড়ামির মধ্যে কোন মঙ্গল নেই—এই সত্য ডাঃ ঝিভাগোর চেতনায় অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দিয়েছে। জনগণের জীবনধারায় রূপান্তর আনতে হবে, আর সেই রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকদের মাথায় যদি হাতুড়ি মারতে হয়—মারতেই হবে! বিশ্বসংসারে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন ক'রে ঢেলে সাজার দায় যেন একটি বিশিষ্ট মতবাদীদেরই! ডাঃ ঝিভাগো বলছে জনৈক নেতাকে: সমাজ উন্নয়নের কথা ব'লছ? কাজে তার কতটুকু হয়েছে? কোথায়, কতদূরে শ্রেণীহীন সমাজের অস্তিত্ব! অথচ ইতিমধ্যে শুধু কথা নিয়েই চলেছে নররক্তে হোলিখেলা,—'the mere talk about it has cost such a sea of blood, that I am not at all sure if the end justifies the means' শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল করার জন্যে একনায়কত্বের নিষ্ঠুর তাণ্ডব-লীলাকে ডাক্তার ঝিভাগো কিছুতেই সমর্থন করতে পারছে না। বলা বাহুল্য, একদলীয় (tolalitarian) রাষ্ট্রে সমষ্টিরই জয়গান, ব্যষ্টির নয়, আর এই সমষ্টি বা people হচ্ছে 'an indoctrinated crowd' (জপানো জনতা)। সুরে সুর মেলাতে পারলেন না বলেই পাস্তার-নেক পৃথিবীর জয়মাল্য পেয়েও স্বদেশে আজ ব্রাত্য। তা হোক। সত্যকে এবং স্বাধীনতাকে যারা দাবিয়ে রাখতে চায় সমষ্টির দোহাই দিয়ে, তারা ব্যষ্টি-জীবনকে গ্রাহ্যই করে না:

Pulsating life no longer concerns itself with them. I am thinking of the few, the scattered few amongst us, who have absorbed new and vigorous truths.

—ইংরেজী কথাগুলি ইবসেন বসিয়েছেন সত্যের পূজারী ডাক্তার স্টকম্যানের মুখে। —জীবন ফুটছে টগ্‌বগ্ ক'রে। এই বেগবান্ জীবন জনতার রক্তচক্ষুর স্বল্পই পরোয়া করে। পাস্তারনেক সেই মুষ্টিমেয় মানুষের দলে, যাঁরা নূতনতর বলিষ্ঠ সত্যগুলিকে মজ্জায় ও শোণিতের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আর কর্তৃপক্ষের হাতে

পাস্তরনেকের লাঞ্ছনার কথা? আবার ইবসেনের ভাষাতেই বলি :

You should never wear your best trousers when you go on to fight for freedom and truth.

—সত্যের এবং স্বাধীনতার জন্যে যখন লড়াই করতে বেরুবে, মনে রেখো, নতুন জামা-কাপড় পরে কখনো বেরিও না। ক্রোধোন্মত্ত জনতা তোমার নতুন কাপড় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেবে।

তবুও 'ডাক্তার ঝিভাগো'কে প্রচার-সাহিত্যের কোঠায় ফেলা ঠিক হবে না। এর মধ্যে সাহিত্য-রস কানায় কানায় ভরে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি পাস্তারনেকের অনুরাগ সুনিবিড়। উপন্যাসের মধ্যে নরনারীর চিরন্তন হৃদয়ের খেলায় নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় আছে। 'ডাঃ ঝিভাগো' টলস্টয়ের War and Peace-এর কথা মনে করিয়ে দেয়; এই উপন্যাসে 'নেপোলিয়নিক্' যুদ্ধের পটভূমিতে টলস্টয় কারবার করেছেন মানুষের যত আদিম আবেগ নিয়ে। 'ডক্টর ঝিভাগো' রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় জীবন্ত অনুভূতিসম্পন্ন একটি মহৎ মানুষের আলেখ্য, যার অঙ্কনে সাহিত্য-স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতিভা অনুপম ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। রলাঁর জাঁ-ক্রিস্তফকে যেমন ভোলা যায় না, যেমন ভোলা যায় না টলস্টয়ের অ্যানা কেরেনিনাকে, তেমনি পাস্তারনেকের ডাঃ ঝিভাগোকেও মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। ডাঃ ঝিভাগোর সঙ্গে আমরা সকল ক্ষেত্রে মতে না মিলতে পারি, তার সমস্ত আচরণ সমর্থন করতে না পারি, কিন্তু ঝিভাগো এমনই একটি দুর্লভ মহৎ চরিত্র, যার মৃতদেহের উপরে আমরা লারার মতো অশ্রুবর্ষণ না ক'রে পারি না।

উপসংহার

পাস্তারনেকের সাহিত্যসৃষ্টির পূর্বে রাশিয়ার আর দু-জন বিখ্যাত মহারথী তাঁদের সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের জয়ধ্বজা উড্ডীন ক'রে গেছেন। এই দুজনের একজন টলস্টয়, অপরজন ডস্টয়েভস্কি। তখন চলেছে নীটশের সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের বিরুদ্ধে নির্মম অভিযান। নীটশের সুপারম্যানদের বৈশিষ্ট্য?—

They will have more strength of will; more courage, more impulse towards power, less sympathy, less fear and less gentleness.

নীটসের জয়মাল্য নেপোলিয়নের কণ্ঠের জন্যে, বুদ্ধের বা লিঙ্কনের জন্যে নয়। বিশ্বজনীন প্রেমের কোন আবেদন নেই নীটশের কাছে। কোমলতা তাঁর কাছে চারিত্রিক দুর্বলতা, প্রেম কাপুরুষতা।

নীটশের Anti-Christ এর বিরুদ্ধে ইওরোপীয় সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার মহতী প্রচেষ্টা ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসগুলিতে, তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা প্রেমের করুণ-কোমলতার প্রতিমূর্তি। ক্ষমাগুণ তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ডস্টয়েভস্কি খ্রীষ্টের কাছে অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার করেছেন। খ্রীষ্টীয় আদর্শ হিংসার সঙ্গে কোথাও আপস করেনি, মিথ্যার সঙ্গেও নয়। মার্ক্সবাদের মধ্যে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শের জয়ধ্বনি, কিন্তু সেই আদর্শে পৌছানোর জন্যে অহিংসা বা সত্যকে অপরিহার্য উপায় ব'লে কোথাও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

বলা বাহুল্য মার্ক্সবাদের সঙ্গে খ্রীষ্টের জীবন দর্শনের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শের জয়ধ্বজা উড্ডীয়মান, সেই হেতু বলশেভিস্টরা ডস্টয়েভস্কিকে

প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখবে, এমনটি আমরা আশা করতে পারি না। এই সব ভেবেই প্রথিতযশা জার্মান দার্শনিক স্পেংলার* বলছেন :

And if the Bolshevists who see in Christ a mere social revolutionist like themselves were not intellectually so narrowed, it would be in Dostoyevski that they would recognise their prime enemy.

—বলশেভিস্টরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে এমন গোঁড়া না হ'লে ডস্টয়েভস্কির মধ্যে তারা দেখত তাদের প্রধান শত্রুকে। আর আগেই তো বলেছি খ্রীষ্টীয় আদর্শের কাছে যে অকুণ্ঠ আনুগত্য ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যে সেই একই আনুগত্যের অভিব্যক্তি পাস্তারনেকের 'ডাক্তার ঝিভাগো'তে। কমিউনিস্টদের অকুণ্ঠ আনুগত্য কার্লমার্ক্সের কাছে, আর পাস্তারনেকের অকুণ্ঠ আনুগত্য খ্রীষ্টের কাছে; এবং মার্ক্সের ও খ্রীষ্টের জীবন-দর্শন নৈতিক আদর্শের দিক থেকে এক নয়, সেই হেতু সোবিয়েত রাশিয়া পাস্তারনেককে কখনই সহ্য করতে পারে না।

টলস্টয়ও খ্রীষ্টীয় আদর্শের জয়ধ্বনি করেছেন, কিন্তু দু-জনের দৃষ্টিভঙ্গী (approach) ঠিক এক নয়। যাই হ'ক এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধে হ'তে পারে না; তাই আজ এখানেই শেষ করি।

* Oswald Spengler: The Decline of the West.

ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞার বাণী?

শ্রীগৌতম সেন

যুগান্ত-সন্ধ্যায় তুমি মেঘমন্দ্র স্বরে,
উচ্চারিলে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র পরে :
যখনি ধর্মের গ্লানি দেখা দিবে পৃথিবীর মাঝে,
তুমিও যে দেখা দিবে নব নব সাজে।
বারবার আসিয়াছ এই ধরাতলে,
ঘুচায়েছ—ক্লেদ-গ্লানি তোমারি তো বলে।
গ্রহণে চন্দ্রের মতো নিষ্প্রভ মলিন এই ধরা
ভেসে গেছে আলোর বন্যায়—
হয়েছে নতুন ক'রে গড়া।

তোমার গোপন রূপ, পারেনি চিনিতে মূঢ় জন,
তোমার সাম্যের বাণী বুঝিতে পারেনি মূঢ় মন,
তারে তুমি ক্ষমিয়াছ!
তবু তুমি আসিয়াছ নব সূর্যোদয়
বারে বারে ঘোষিয়াছ, 'প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।'
আরবার দেখা দাও—অবজ্ঞাত, ধর্মহীন দেশে,
সাম্য-প্রেম-প্রশান্তির চিরন্তন প্রতীকের বেশে।
দেশজোড়া গ্লানি মাঝে
কোথা তব বরাভয় পাণি?
এ ঘোর দুর্যোগ দিনে
ভুলিলে কি প্রতিজ্ঞার বাণী?

স্বামী অখণ্ডানন্দ সমীপে চার দিন

শ্রীমতী শান্তি সেন

(১)

১৯৩৪ খৃঃ গ্রীষ্মকালে কিছুদিন নিবেদিতা বোর্ডিংএ ছিলাম। তখন প্রায়ই বিকেলে আমরা দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যেতাম। একদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরে দর্শন ও প্রণাম ক'রে বারান্দায় এসে দেখি একজন সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন—গেরুয়া-পরা, মাথায় একটি নামাবলী জড়ানো, সাদা চুলগুলি কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, ভাবলাম কে ইনি? —মঠের সাধুরা তো মুণ্ডিতমস্তক। তাঁর সঙ্গে কয়েক জন মহিলা ছিলেন, তাঁদেরও চেহারায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সেখান থেকে এসে আমরা বিষ্ণুমন্দিরে ও শিবমন্দিরে দর্শন ও প্রণাম শেষ ক'রে ঠাকুরের ঘরে গেলাম। ঠাকুরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সন্ন্যাসী বিষ্ণুমন্দিরের সিঁড়িতে বসে আছেন; পা-ছুখানি নীচের থাকে রাখা। নিবেদিতা স্কুলের অধ্যক্ষা বললেন, ইনিই ঠাকুরের শিষ্য পরমপূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ, মঠের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট। স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাব্রতের কাজে জীবন সমর্পণ করেছেন, ভারতের বহু স্থানে ঘুরেছেন। তখন আমরা সকলে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, 'এই দেখ, এরা সব মঠে এসেছে। —পণ্ডিত জওহরলালের মা, স্ত্রী ও তাদের আত্মীয়া ক-জন মহিলা। এদের দক্ষিণেশ্বর দর্শন করাতে নিয়ে এসেছি।' এইরূপ কয়েকটি কথার পর আমরা তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। পূজনীয় মহারাজকে এই আমার প্রথম দর্শন।

(২)

প্রায় দু'বছর পরে ১৯৩৬ খৃঃ ফাল্গুন মাসে একদিন সকালবেলা আমি বেলুড় মঠে যাই। ওখানে গিয়ে জানতে পারি, মঠের প্রেসিডেণ্ট মহারাজ তখন মঠেই আছেন। আমি তাঁকে দর্শন ক'রব বলাতে পূজনীয় ভরত মহারাজ ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

স্বামীজীর ঘরের পাশের ঘরে ঢুকেই তাঁকে দেখতে পেলাম, একটি চেয়ারে বসে আছেন। আমি প্রণাম করতেই তিনি বসতে বললেন। আর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী চাই। সে সময় খুব মানসিক সংগ্রামের মধ্যে আমার দিন কাটছিল, যার ফলে আমার শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। কি ক'রব ঠিক করতে পারছিলাম না। তাঁকে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা সব খুলে বলি। শুনে তিনি বললেন, 'দীক্ষা নেবে?' আমি বলেছিলাম, আমি তো দীক্ষা নেবো ব'লে তৈরী হ'য়ে আসিনি। আপনাকে পছন্দ হয় কিনা, তাই দেখতে এসেছি। —এই কথা শুনে তিনি খুব হেসে উঠলেন। এত জোরে হেসেছিলেন যে বারান্দা থেকে ভরত মহারাজ ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। পূজনীয় মহারাজ তখন আমাকে দেখিয়ে তাঁকে বললেন, 'এ কি বলছে শোন, এ নাকি দেখতে এসেছে আমাকে ওর পছন্দ হয় কিনা।' বলেন আর খুব হাসেন। পরে আমাকে সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আমাকে তোমার পছন্দ হয়?' আমি বললাম, হয়। তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়?' আমি বলেছিলাম, 'বাবার মতো'; শুনে উনি আমার মাথাটি ওঁর হাঁটুর ওপর রেখে চাপড়ে দিলেন। তখন ওঁকে প্রণাম ক'রে সুবিধামত আর একদিন আসব ব'লে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। উনি বলেছিলেন, 'আচ্ছা'।

বাইরে এলে ভরত মহারাজ বললেন, 'প্রসাদ নিয়ে যেও।' আমি তখন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরের সামনে ছোট বারান্দাটিতে গিয়ে বসে রইলাম। একজন ব্রহ্মচারী এসে ফলমিষ্টি প্রসাদ দিয়ে গেলেন। প্রসাদ পাওয়ার পরে ভরত মহারাজ এসে আমাকে বললেন, 'মহারাজ ডাকছেন, এখনই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। উনি পূজো করতে বসেছিলেন, পূজো করতে করতেই তাঁর মনে হয়েছে, এখনই তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তাড়াতাড়ি যাও, উনি পূজোর আসনে বসে আছেন।' আমি বলেছিলাম, আমি যে খেয়ে এসেছি। 'তাতে কিছু হবে না।' তখন আমি বললাম, আমি তো স্নান করিনি। 'তাতেও কিছু হবে না।' শেষে বলেছিলাম, আমি যে আজ দীক্ষা নেবো ব'লে ঠিক ক'রে আসিনি। এবারে ভরত মহারাজ একটু ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার বহু ভাগ্য যে পূজার আসন থেকে উনি নিজে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন দীক্ষার জন্য। আর দেরি ক'রো না, শিগগির যাও।'

আমি তখন ধীরে ধীরে পূজনীয় মহারাজের ঘরে গিয়ে দেখি, উনি পূজো শেষ ক'রে আসনে বসে আছেন। পুষ্পপাত্রে কিছু ফুল-বেলপাতা রয়েছে। পাশে একখানি আসন পাতা। সেখানে আমাকে বসতে বললেন। কোশা-কুশি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে আমার মাথায় গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর দীক্ষা দিলেন। শেষে দুই হাত অঞ্জলি ক'রে আমার সামনে রেখে বললেন, 'পুষ্পপাত্র থেকে ফুল তুলে নিয়ে তিন বার অঞ্জলি দাও আমার হাতে।' আমি দিলাম। তখন আমাকে দেখিয়ে দিলেন, কি ক'রে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। ছোট ছেলের মতো পা ছড়িয়ে বসে, হাত জোড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'ঠাকুর আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, আমার সাধন নেই, ভজন নেই, আমায় তুমি দেখা দাও, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।' এই কথাগুলি এত করুণভাবে বললেন যে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। শুনে আমারও কান্না পেয়ে গেল। আরও বললেন যে ঠাকুর ওঁকে এইভাবেই প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিলেন। তারপর আমি প্রণাম ক'রে বাইরে গেলাম এবং প্রসাদ পাওয়ার ঘণ্টা পড়লে সকলের সঙ্গে প্রসাদ পেতে গেলাম। ঠাকুরের এবং মহারাজের প্রসাদ আমাকে দেওয়া হ'ল।

খাওয়ার পরে আবার আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখি ঘরের একপাশে একখানি ছোট তক্তপোষে বিছানার ওপরে একটি বাঘছাল বিছানো রয়েছে, তার ওপরে উনি বসে আছেন। আর নীচে সারা ঘরটি ঢেকে একটি কার্পেট পাতা আছে। ওঁর পায়ের কাছে কার্পেটের ওপরে আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলে আমার ডান হাতখানি নিয়ে একটু ওজন ক'রে দেখলেন। তারপরে বললেন, 'হবে। অমুকের মতো।' কার মতো বলেছিলেন, সেকথা আমি ভুলে গিয়েছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি ভগবান দর্শন করেছেন কিনা। তিনি বলেছিলেন 'হ্যাঁ, যখন হিমালয়ে ছিলাম,—প্রত্যক্ষ দর্শন হয়েছিল।'

তারপরে কিছুক্ষণ ধরে ঠাকুরের কথা বলতে লাগলেন। ঠাকুর ওঁদের কত ভালবাসতেন, সেইসব কথা বললেন :

ঠাকুরের কাছে যে আমরা যেতুম, সে কি অমনি যেতুম ? তাঁর ভালবাসার টানে যেতুম। তাঁর ভালবাসার কাছে মা-বাপের ভালবাসা আলুনি বোধ হ'ত। একদিন সন্ধ্যাবেলা দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি তিনি তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের বারান্দায় মাদুরের ওপরে শুয়ে আছেন। আমি প্রণাম করলে পাশে

বসতে বললেন। তারপর উঠে বসে আমার জিবে আঙুল দিয়ে মন্ত্র লিখে দিলেন। আর বললেন, 'এই তোর দীক্ষা হ'য়ে গেল।' তারপর বললেন, 'পা-টা একটু টিপে দে তো।' আমি যেই টিপতে আরম্ভ করেছি, ঠাকুর অমনি ব'লে উঠলেন, 'ওরে থাম্, থাম্, অত জোরে নয়।' এই ব'লে আমার হাত নিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কেমন ক'রে টিপতে হবে। আমার তখন অল্প বয়স, ব্যায়াম করি। কোন ধারণাই ছিল না যে ঠাকুরের পা কত নরম। তাঁর পা ঠিক মাখনের মতো নরম ছিল। আর একদিন রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। সকালবেলা গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাকুরের কাছে গিয়েছি। একজন ভিখিরী এসেছিল, ঠাকুর বললেন, 'ঐ কোণের তাকে চারটে পয়সা আছে, দিয়ে আয় ভিখিরীকে।' আমি দিয়ে এলে বললেন, 'গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে ফ্যাল্।' আমার হাত ধোয়া হ'লে 'হরি বোল, হরি বোল' ব'লে হাত ঝাড়াতে লাগলেন, অনেকক্ষণ ধরে ঠাকুর নিজেও হাত ঝাড়লেন, আমাকে দিয়েও হাত ঝাড়ালেন।

মহারাজ আমাকে বলেছিলেন যে সেই থেকে টাকাকড়ির ওপর ওঁর এমন একটা বিতৃষ্ণা হ'য়ে গেল যে বহুকাল পর্যন্ত উনি টাকাকড়ি স্পর্শই করতে পারতেন না। পরে অনাথ-আশ্রমের প্রয়োজনে যতটা সম্ভব কম স্পর্শ করতেন।

দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে রাত্রি কাটাতেন। একদিন ঐরূপ রাত্রে ওখানে থাকার পর সকালবেলা গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাকুরের ঘরে এসেছেন; ঠাকুর ওঁকে নিয়ে মা কালীর মন্দিরে গেলেন। একেবারে চৌকাঠ পার হ'য়ে ভেতরে প্রবেশ ক'রে মায়ের একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইতিপূর্বে মন্দিরের চৌকাঠের বাইরে থেকেই তিনি মাকে এবং শিবকে দর্শন করতেন। সেদিন ঠাকুর ওঁকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ছাখ্, চৈতন্যময় শিব ছাখ্।' উনি সত্যই চৈতন্যময় শিব দর্শন করলেন। সেদিন আমাকে বলেছিলেন, 'দেখলাম জীবন্ত শিব, নিঃশ্বাস পড়ছে। দেখে আমি আনন্দে ডুবে গেলাম, আর ঠাকুর যখন বেরিয়ে এলেন, মনে হ'ল নেশা করেছেন। পা টলছে, হেথায় ফেলতে হোথায় পড়ছে।' এইসব কথার পরে আমাকে বললেন, 'শনি-মঙ্গলবারে বেশী ক'রে জপ ক'রো। ঠাকুর বলতেন, শনিবার মধুবার'। একটু পরে তিনি বাঘছালটির ওপরে একটু শুলেন, এবং আমাকেও কার্পেটের ওপরে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে বললেন। বিকেল হ'য়ে গেল। ভরত মহারাজ এসে জানালেন, ভক্তেরা দর্শন করতে এসেছেন। মহারাজ তাদের ভেতরে আনতে বললেন। সকলে প্রণাম ক'রে একে একে বাইরে যেতে লাগলেন। আমিও প্রণাম ক'রে চলে গেলাম। মহারাজ ব'লে দিলেন, 'আবার এসো।'

(৩)

কয়েকদিন পরে আমার দিদি ও ভগ্নীপতিকে নিয়ে সকালবেলা মঠে গেলাম। মহারাজকে দর্শন ক'রে বললাম, এঁরাও দীক্ষা নিতে চান। মহারাজ হেসে বললেন, 'আচ্ছা।' দিদিরা তৈরী হয়েই এসেছিলেন। ওঁদের দীক্ষা হ'য়ে গেল। সেদিন খুব ভিড় ছিল, তাই বেশী কথা হ'ল না। প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা বাড়ী চলে এলাম। দিন দুই পরে একদিন বিকেলে, আবার আমি আমার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে যাই। দাদা মহারাজকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন।

আমরা গেলেই ভরত মহারাজ আমাদের মহারাজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মহারাজ আমাদের বসতে বললেন, আর খুব খুশী হ'য়ে বলতে লাগলেন, 'আনন্দ, আনন্দ, দুঃখ কিসের? মন খারাপ কিসের? ঠাকুর আছেন। সব ভার

তিনি নিয়েছেন।' তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুড়গুড়িটি কোথায়? তাকে আনোনি?' আমি বললাম, 'দিদি আর একদিন আসবে, আজ কাজের জন্য আসতে পারেনি।' আমার দিদি দেখতে ছোটখাট ছিপছিপে ছিলেন, তাই মহারাজ ওই কথা বলেছিলেন। সেদিনও ঠাকুরের কথা হ'ল।

(৪)

দুদিন পরে বিকেলের একটু আগে, দিদিদের নিয়ে আবার মঠে যাই, মহারাজ আমাদের নাম শুনে ঘরের মধ্যে ডেকে পাঠালেন। সেদিন খুবই ভিড় ছিল। উনি চলে যাবেন ব'লে অনবরত ভক্তেরা সব আসছিলেন। তখন ওঁর শরীর অসুস্থ, তা সত্ত্বেও তিনি বিশ্রাম না ক'রে অনবরত লোকের সঙ্গে দেখা করছিলেন। একজন ভক্ত মহিলা ও ভদ্রলোক এসে ওঁকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য খুব ধরেছেন। তাঁদের বাড়ী ভবানীপুরে, তাঁরা ঠাকুরের ভক্ত। এই ভদ্রলোকের বাবা ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন। মহারাজ যতই বলছেন, ওঁর দেহ সুস্থ নেই, উনি যেতে পারবেন না, ভদ্রলোক কিছুতেই সেকথা মেনে নিচ্ছেন না। তখন মহারাজ করুণস্বরে মহিলাটিকে বলছেন, 'তোমরা হ'লে মা, কোথায় বলবে, মহারাজ আপনার শরীর খারাপ, এখন নড়াচড়া ক'রে কাজ নেই, বিশ্রাম করুন, তা নয়—তোমরাই জোর ক'রছ, এই অসুস্থ দেহ নিয়ে ভবানীপুর যেতে ব'লছ।' এই কথা শুনে মহিলাটি আর কিছু বলতে পারলেন না। তাদের নিরস্ত হ'তে হ'ল। আমরা কিছুক্ষণ ঘরে থেকে, মহারাজের কথা শুনে সন্ধ্যা হ'লে তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিলাম। উনি বার বার ক'রে ব'লে দিলেন, 'সারগাছি আশ্রমে বেড়াতে যেও, আর নিয়ম-মত চিঠি দিও।' আমার সঙ্গে এই ওঁর শেষ কথা বলা।

সারগাছিতে আমি চিঠি দিতাম, মহারাজও আমাকে চিঠি দিতেন। অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তখন আর আমার সারগাছি যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি, অনেক পরে গিয়েছি। শায়িত অবস্থায় মহারাজকে বেলুড় মঠে আনা হয়, সেখানেই তাকে শেষ দর্শন করি। আজ তিনি দেহে নেই, কিন্তু তাঁর সীমাহীন কৃপা ও স্নেহই জীবনের পাথেয় হ'য়ে রয়েছে।

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

যাচ্ঞাদৈন্যদূষণম্

বিষয়ই যাচ্ঞাজনিত দীনতার হেতু। অতএব বিষয়-পরিত্যাগবিড়ম্বনা বর্ণনানন্তর পরবর্তী দশটি শ্লোকে ভর্তৃহরি 'যাচ্ঞাদৈন্য' নিন্দা করিতেছেন :

দীনা দীনমুখৈঃ সদৈব শিশুকৈরাকৃষ্টজীর্ণাম্বরা
ক্রোশদ্ভিঃ ক্ষুধিতৈর্নিরন্নবিধুরা দৃশ্যা ন চেদ্‌গেহিনী।
যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদ্‌গদগলৎ ত্রুট্যদ্বিলীনাক্ষরং
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী পুমান্ ॥২১॥

করুণ শুষ্কমুখ ক্ষুধাতুর রোরুদ্যমান শিশুবৃন্দ জীর্ণ বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতেছে—এমন দরিদ্র নিরন্ন দুঃখবিহ্বল গৃহিণী যদি দৃষ্টিগোচর না হইত, তবে কেবল আপন দগ্ধোদর পূরণ করিবার জন্য কোন্ মনস্বী ব্যক্তি যাচ্ঞা প্রত্যাখ্যানের ভয় থাকা সত্ত্বেও জড়ীভূত কণ্ঠনির্গত গদ্‌গদবাক্যে খণ্ডিত ও অনুচ্চারিত-প্রায় 'দেহি' (দাও) এই শব্দ উচ্চারণ করিতে স্বীকৃত হইতেন? অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রের জন্য সব কিছুই করিতে হয় ও বলিতে হয়, অতএব উহাই বন্ধন।২১

অভিমতমহামানগ্রন্থিপ্রভেদপটীয়সী
গুরুতরগুণগ্রামাম্ভোজস্ফুটোজ্জ্বলচন্দ্রিকা।
বিপুলবিলসল্লজ্জাবল্লীবিতানকুঠারিকা
জঠরপিঠরী দুষ্পূরেয়ং করোতি বিড়ম্বনম্ ॥২২॥

কবি এখন সর্ব অনর্থের মূল জঠরের নিন্দা করিতেছেন: এই দুষ্পূরণীয় জঠর-পাত্রই সর্বপ্রকার বিড়ম্বনার কারণ, ইহা আমাদের অতি প্রিয় আত্মসম্মান নষ্ট করে। চন্দ্রালোকে যেমন পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, যাচ্ঞা করিলে সেইরূপ আমাদের গুণগুলি সঙ্কুচিত হয়, আমাদের লজ্জারূপ লতার কুঠার সদৃশ এই যাচ্ঞা। ২২

পুণ্যে গ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছন্নপালিং কপালিম্
হ্যাদায় ন্যায়গর্ভ-দ্বিজহুতহুতভুগ্-ধূমধূম্রোপকণ্ঠে।
দ্বারং দ্বারং প্রবিষ্টো বরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্তো
মানী প্রাণৈঃ সনাথো ন পুনরনুদিনং তুল্যকুল্যেষু দীনঃ ॥২৩॥

অখিল শাস্ত্রে বিশারদ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আহুত যজ্ঞাগ্নির ধূমে যাঁহাদের দ্বারপ্রান্ত মলিন হইয়া থাকে, এমন সব ব্রাহ্মণের পবিত্র গ্রামে বা বানপ্রস্থীর বনাশ্রমে প্রতি কুটীরের দ্বারে দ্বারে ক্ষুধার্ত হইয়া উদরগহ্বর পূরণ করিবার জন্য যে মানী পুরুষ শুভ্রবস্ত্রখণ্ডাবৃত ভিক্ষাপাত্রহস্তে প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাশনে প্রাণরক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিও বরং ভাল; কিন্তু তথাপি স্বজনগণের নিকট হীন হওয়া (দীনতা প্রকাশ করা) উচিত নহে। ২৩

আয়াসলভ্য পরপিণ্ড ভোজন দ্বারা জীবন ধারণ করা অপেক্ষা তপোভূমি হিমাচলের অরণ্যে বাসও শ্রেয়:—ইহাই এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে :

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি বিদ্যাধরাধ্যুষিত-চারুশিলাতলানি।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি যৎ সাবমানপরপিণ্ডরতা মনুষ্যাঃ ॥২৪॥

গঙ্গাতরঙ্গবিক্ষিপ্ত স্থূল সূক্ষ্ম বারিকণা দ্বারা সুশীতল ও বিদ্যাধরগণ কর্তৃক অধ্যুষিত (অধিষ্ঠিত) মনোহর শিলাপৃষ্ঠযুক্ত হিমাচলের শান্ত সুপবিত্র স্থানসকল কি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে? (অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করিবার এমন বহু রমণীয় স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে); তবে কেন মানুষ শত অপমান সহ্য করিয়াও পরপ্রদত্ত অন্নের জন্য সচেষ্ট হয়?২৪

অনায়াসলভ্য কন্দ-ফল-মূলাদি বিদ্যমান থাকিতে কেবল জীবনধারণের নিমিত্ত খল ব্যক্তিগণের আরাধনা করা কখনই উচিত নহে, তাই কথিত হইতেছে:

কিং কন্দাঃ কন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা নির্ঝরা বা গিরিভ্যঃ
প্রধ্বস্তা বা তরুভ্যঃ সরসফলভৃতো বল্কলিন্যশ্চ শাখাঃ।
বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং
দুঃখাপ্তস্বল্পবিত্তস্ময়-পবনবশানর্তিতভ্রূতলানি ॥২৫॥

গিরিকন্দরসমূহ হইতে কন্দমূলাদি কি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে? স্বচ্ছসলিলা পার্বত্য নির্ঝরিণী সকলও কি অন্তর্হিত হইয়াছে? অথবা বৃক্ষসমূহ হইতে মধুর ফলভারনত ও বল্কলবিশিষ্ট শাখাগণও কি একান্ত অলভ্য হইয়াছে? অর্থাৎ হয় নাই। তাহা হইলে (ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির এবং পরিধেয় প্রাপ্তির জন্য প্রকৃতি-প্রদত্ত এমন সুযোগ যখন বিদ্যমান অর্থাৎ অনায়াসলভ্য এমন ব্যবস্থা থাকিতে) স্বার্থান্ধ মানব একান্ত দুর্বিনীত খলব্যক্তিগণের দুঃখলব্ধ-স্বল্পধনজনিত অহঙ্কাররূপ পবনচালিত কুঞ্চিতভ্রূ মুখমণ্ডল দর্শন করে কেন অর্থাৎ তাহাদের মুখাপেক্ষী হয় কেন?২৫

পুণ্যৈর্মূলফলৈস্তথা প্রণয়িনীং বৃত্তিং কুরুষ্বাধুনা
ভূশয্যাং নবপল্লবৈরকৃপণৈরুত্তিষ্ঠ যাবো বনম্।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকমূঢ়মনসাং যত্রেশ্বরাণাং সদা
বিত্তব্যাধিবিকারবিহ্বলগিরাং নামাপি ন শ্রূয়তে ॥২৬॥

দীর্ঘকাল দুর্বিনীত-খলসেবায় খেদযুক্ত কোন ব্যক্তির নির্বেদ-বচন অভিনয়পূর্বক বিবৃত হইতেছে: (হে প্রিয় সখে!) এখন পবিত্র ফলমূলের দ্বারা পরমসুখাবহ জীবিকা অবলম্বন কর ও অম্লান নবপল্লবরচিত ভূশয্যা রচনা কর। ওঠ, আর বিলম্ব করিও না; চল, আমরা সেই বনে যাই, যেখানে কর্তব্যাকর্তব্য বিচারহীন মূঢ়চিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও বিত্তরূপব্যাধিজনিত বিকারবশতঃ প্রলাপভাষী রাজাদিগের ও ধনবান্‌গণের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।২৬

ফলং স্বেচ্ছালভ্যং প্রতিবনমখেদং ক্ষিতিরুহাং
পয়ঃ স্থানে স্থানে শিশিরমধুরং পুণ্যসরিতাম্।
মৃদুস্পর্শা শয্যা সুললিতলতাপল্লবময়ী
সহন্তে সন্তাপং তদপি ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ ॥২৭॥

প্রতিবনে বিনাক্লেশে স্বচ্ছন্দলভ্য (উদর-পূরণের জন্য পর্যাপ্ত) বৃক্ষফল বিদ্যমান, (তৃষ্ণা নিবারণার্থ) স্থানে স্থানে গঙ্গাসিন্ধু-আদি পবিত্র নদীসমূহের সুমধুর ও সুশীতল জলেরও অভাব

নাই, এবং মনোহর লতাপল্লববিরচিত কোমল শয্যাও সর্বত্রই সুলভ; কিন্তু অহো! কি আশ্চর্য, তথাপি ধনলিপ্সু ব্যক্তিগণ ধনীদিগের গৃহদ্বারে ধনলোভে সমাগত হইয়া কতই না লাঞ্ছনা ও সন্তাপ সহ্য করিয়া থাকে।২৭

যে বর্তন্তে ধনপতিপুরঃ প্রার্থনাদুঃখভাজো
যে চাল্পত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্যাপ্তবুদ্ধেঃ।
তেষামন্তঃস্ফুরিতহসিতং বাসরাণি স্মরেয়ম্
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ ॥২৮॥

খলজনের সেবা ও তাহাদের নিকট যাচ্ঞাপ্রসূত দৈন্যযুক্ত এবং বিষয়াসক্ত জনগণের নিন্দা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বকীয় ভাবী শ্রেয়োদশার সূচনা করিতেছেন: ধনবান্‌দিগের সমীপে যাচ্ঞাদুঃখ-ভোগীদের যে দিনগুলি অতিবাহিত হয়, ভোগ্যসংগ্রহে পর্যবসিতচিত্ত পুরুষগণ বহু নীচতা স্বীকার করিয়া যে দিনগুলি নষ্ট করে, ধ্যানাবসানে গিরিগহ্বরে পাষাণ-শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ কালে অন্তরুদ্ভূত উপেক্ষাপ্রসূত হাস্যসহকারে তাহাদের সেই দিনগুলি আমি স্মরণ করিব।২৮

যে সন্তোষনিরন্তরপ্রমুদিতাস্তেষাং ন ভিন্না মুদো
যে ত্বন্যে ধনলুব্ধসংকুলধিয়স্তেষাং ন তৃষ্ণা হতা।
ইত্থং কস্য কৃতে কৃতঃ স বিধিনা কীদৃক্ পদং সম্পদাং
স্বাত্মন্যেব সমাপ্তহেমমহিমা মেরুর্ন মে রোচতে ॥২৯॥

তৃষ্ণার নিবৃত্তি হওয়া কঠিন সুতরাং বৃথা যাচ্ঞাদৈন্যের কি প্রয়োজন? ইহাই অগ্রে কথিত হইতেছে: যথাপ্রাপ্ত বস্তুতেই যাহাদের সন্তোষ সদা বিদ্যমান এমন পুরুষগণের আনন্দ কখনই নষ্ট হয় না (সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), পুনঃ ধনলোভে ব্যাকুলচিত্ত পুরুষগণের ভোগতৃষ্ণারও কখন নিবৃত্তি হয় না (বরং দিন দিন অধিকই হয়)। এরূপ অবস্থায় অপরিমিত ধনসম্পদের আস্পদরূপে প্রসিদ্ধ যে কাঞ্চনময় মেরুপর্বত, যাহাতে সুবর্ণের গৌরব পর্যবসিত হইয়াছে, তাহাকে ব্রহ্মা কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? (কারণ সন্তোষী পুরুষের মনে আনন্দলাভ বা লোভী ব্যক্তির তৃষ্ণাক্ষয়, ইহার কোনটিই উহা দ্বারা সাধিত হয় না)। এরূপ মেরুপর্বত আমার নিকট রুচিকর মনে হয় না।২৯

ভিক্ষাহারমদৈন্যমপ্রতিসুখং ভীতিচ্ছিদং সর্বতো
দুর্মাৎসর্যমদাভিমানমথনং দুঃখৌঘবিধ্বংসনম্।
সর্বত্রান্বহমপ্রযত্নসুলভং সাধুপ্রিয়ং পাবনং
শম্ভোঃ সত্রমবার্যমক্ষয়নিধিং শংসন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৩০॥

তাহা হইলে জীবনধারণ কি প্রকারে হইবে, ইহার উত্তরে তদুপায় নিরূপণ করত বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করা হইতেছে: ভিক্ষা করায় দৈন্য নাই; ভিক্ষান্নভোজন নিরতিশয় সুখের জনক, সর্বপ্রকার ভীতিশূন্য, দুষ্টমাৎসর্যগর্বাদি বিলয়কারী, সর্ব সংসার-দুঃখের নিবর্তক, সর্বত্র সর্বদা সুখলভ্য, সাধুগণের প্রিয় এবং পবিত্র; ইহা শিবের অক্ষয় অনিবার্য ভাণ্ডার ও তাঁহার পরমপ্রিয় সদাব্রত—পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মহাযোগীশ্বরগণ ভিক্ষান্নকে এইরূপে স্তুতি করিয়া থাকেন।৩০

প্রাচীন ভারতের প্রতিভা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

১৯৫৬ খৃঃ চীন দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখক লিন্ যুটাং (Lin Yutang) ইংরেজীতে 'The Wisdom of India' শীর্ষক একখানি পুস্তক সংকলন করিয়াছেন। উহাতে ঋগ্বেদ, উপনিষদ্, পাতঞ্জল যোগসূত্র, রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্র, ধর্মপদ, বুদ্ধের বাণী, গল্প, পৌরাণিকী কথা, সুরঙ্গম-সূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুস্তকের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করিতেছেন :

আমি খুবই সন্দেহ করি যে সাধারণ পাঠকশ্রেণী হয়তো জানেন না যে ভারতবর্ষও চীন দেশের মতো কি সংস্কৃতিতে, কি কল্পনাপ্রসূত সুবৃহৎ সাহিত্যে, কি হাস্যরসসম্বলিত কাহিনীতে অতিশয় সমৃদ্ধ। ধর্ম এবং কল্পনাপ্রসূত সাহিত্যে ভারতবর্ষ চীন দেশের গুরু। ত্রিকোণমিতি, দ্বিঘাতসমীকরণ, ব্যাকরণ, ছন্দ, উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, অক্ষক্রীড়া এবং দর্শনে সমগ্র পৃথিবীর গুরু। শুধু তাই নয়, বোকাচিও (Boccaccio), গ্যেটে (Goethe), হার্ডার (Harder), শোপেনহর (Schopenhauer), এমার্সন (Emerson) এবং সম্ভবতঃ বৃদ্ধ ঈশপ (Æsop)-কেও জ্ঞানের প্রেরণা দিয়াছে ভারতবর্ষ।[১]

ভূমিকায় গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন যে ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে ধর্ম ও দর্শনে ভেদ নাই। চীন দেশে দর্শন ও ব্যাবহারিক নীতিতে যেমন অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে, ভারতে সেইরূপ ধর্ম ও ঈশ্বরানুভূতিতে সুদৃঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। এই প্রসঙ্গে লিন্ যুটাং বলেন যে ভারতবর্ষ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। ভারতবর্ষে ধর্মের চর্চা খুব বেশী, সেই অনুপাতে চীন দেশে খুব কম। ভারত হইতে আগত সামান্যমাত্র আধ্যাত্মিকতা চীনকে ভাসাইয়া সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে প্লাবিত করিয়াছে।[২]

ঋগ্বেদ হইতে কিছু মন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিবার পূর্বে উপক্রমণিকায় লিন্ যুটাং বলেন যে হিন্দুরা স্বভাবতই ঈশ্বরপরায়ণ এবং ভারতবাসী ঈশ্বর লইয়া উন্মত্ত। কেহ যদি ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পড়িয়া উপনিষদ্গুলি অধ্যয়ন করে এবং (৫৬৩ খৃঃ পূঃ অব্দে) ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাব পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থগুলির অনুধাবন করে, তাহারই এই ধারণা হইবে।[৩]

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের প্রতিভার কথা আলোচনা করা যাক। বহু শিক্ষিত ভারতবাসীর স্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়া এই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা প্রয়োজন।

১ I strongly suspect that the average reader does not know that India has as rich a culture, as creative an imagination and wit and humour as any China has to offer, and that India was China's teacher in religion and imaginative literature.
—The Wisdom of India, Page 11

২ But it is evident that India is a land overflowing with religion and with the religious spirit. India produced too much of religion, and China too little. A trickle of Indian religious spirit overflowed to China and inundated the whole of Eastern Asia.—Ibid Page 14.

৩ India is a land.........intoxicated with God. This is the impression of anyone who reads through the Hymns from the Rigveda, and follows through the Upanishads to the arrival of Buddha in 568 B.C.—Ibid Page 19.

হিন্দুগণ ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Theory of Evolution) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম চিন্তা করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক হাক্সলি (Huxley) বলেন, পলের (Paul of Tarsus) জন্মের বহু পূর্বে হিন্দু ঋষিগণ ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ধারণা পাকা করিয়াছিলেন।

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া স্যর মনিয়ার উইলিয়ামস্ (Sir M. Monier Williams) বলেন যে ডারউইন (Darwin) জন্মিবার বহু শত বৎসর পূর্বে হিন্দুরা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে স্পিনোজা (Spinoza)র জন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বেই হিন্দুরা তাঁহার নামে প্রচলিত দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। চেম্বারলেন (Houston Chamberlain) পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম প্রচার করেন যে পাণিনি পৃথিবীর প্রথম বৈয়াকরণ।

পতঞ্জলি যোগসূত্র প্রণয়ন করিয়া পৃথিবীতে এক অভিনব সাধনার পথ প্রদর্শন করেন, বর্তমান যুগ পর্যন্ত সেগুলি আদরণীয় বস্তু হইয়া আছে।

প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলিতে গিয়া সিস্টার নিবেদিতা বলিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতে নির্জন স্থানে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝখানে আশ্রমবিদ্যালয়গুলিতে ঋষিগণ যে যোগসাধনার গবেষণা করেন, বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহার অপূর্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পতঞ্জলির যোগসূত্র সেই প্রাচীন বিদ্যার অন্যতম অত্যাশ্চর্য প্রমাণস্বরূপ হইয়া আছে। গুপ্তদের সুবর্ণযুগের কথা, যাহা আমরা ৩০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসে পাই—তাহার অধিকাংশই এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানাভ্যাসেরই ফল। প্রাচীন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি আমাদের চিন্তা করা দরকার। ভারতীয় জ্ঞান-বারি পান করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য শুধু যে ফাহিয়ান (৪০০ খৃঃ) এবং হিউয়েন সাং (৬৫০ খৃঃ) ভারতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে বর্ণিত হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই জন্যই আমরা পূর্ব এশিয়ার এই দুইটি ছাত্রের নাম পাই। তাঁহাদের সঙ্গে, পূর্বে বা পরে নানা স্থান হইতে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে ভারতে আসিয়াছিলেন।[৪]

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে গিয়া ভূমিকাতে বলিয়াছিলেন: প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু প্রতিভার বিকাশ নানাদিক দিয়া হইয়াছিল। সব দিক দিয়া বিচার করিলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতে কোন দেশ অতটা উন্নত ছিল না।

খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট্ট সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন, পৃথিবীর আবর্তনই দিবারাত্রির কারণ; খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য নিউটনের (১৭শ শতাব্দী) পূর্বে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির জন্য ঊর্ধ্ব হইতে বস্তুসকল নিম্নে পতিত হয়, ইহা আবিষ্কার করেন। হিন্দুগণ ১-হইতে ৯ পর্যন্ত গণনা এবং শূন্যের ব্যবহার সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। দশমিক পদ্ধতি (Decimal system) হিন্দুরা আবিষ্কার করেন। পাটীগণিত (Arithmetic) এবং বীজগণিত (Algebra) হিন্দুদের নিকট আরবেরা শিক্ষা করেন। তারপর এগুলি পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হয়। ভাস্করাচার্য নিউটনের পূর্বে ব্যাসকলনের (Differential Calculus) মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। জ্যামিতির (Geometry) চর্চা বৈজ্ঞানিক ভাবে হিন্দুরাই সর্বপ্রথম করেন। অবশ্য পরে

[৪] Footfalls of Indian History, Page 84

গ্রীকরা ইহার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ডক্টর ঘোষ বলেন : আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত (৭ম শতাব্দী) ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, যেগুলি ইওরোপে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দুরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও সূত্রপাত করেন। প্রাচীনকালে হিন্দু চিকিৎসকেরা সমস্ত এশিয়া খণ্ডে এবং মিশরেও চিকিৎসা করিতে যাইতেন। হিন্দুরা সর্বপ্রথম সোনা আবিষ্কার করেন। লোহা এবং ইস্পাত তৈরী বিষয়ে হিন্দুরা সব চেয়ে উন্নতি লাভ করেন। ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny, ১ম শতাব্দী) বলেন যে ভারতবর্ষেই ভাল কাচ তৈরী হইত। ভূগর্ভ হইতে হিন্দুরা রত্নাদি সংগ্রহ করিতেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য তাঁহারা জাহাজে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের নানা দেশে যাইতেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্‌ডোনেল (Macdonell) সাহেব তাঁহার বিখ্যাত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' স্পষ্টই লিখিয়াছেন : সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা মৌলিক চিন্তা-রাশিতে পূর্ণ। যখন গ্রীকরা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন, তাহার বহু পূর্বে ভারতীয়েরা তাঁহাদের জাতীয় কৃষ্টি সুগঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত কৃষ্টিতে কোন বৈদেশিক প্রভাব লক্ষিত হয় নাই। তারপর পারসিকেরা, গ্রীকরা, সিথিয়ানরা, মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করে। পরাধীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় আর্যদের জীবন ও সাহিত্যের গতি বৃটিশরাজ্য স্থাপনের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইন্দো-ইওরোপীয় জাতির কোন শাখা এই ভাবে পৃথক্ সত্তা বজায় রাখিয়া বিকাশ লাভ করে নাই। একমাত্র চীন দেশ ছাড়া কোন দেশ তিন সহস্রাধিক বৎসর অবাধ গতিতে তাহার ভাষা এবং সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপ্রথা, নাটকীয় এবং সামাজিক রীতিনীতি অব্যাহত রাখিতে পারে নাই।[৫]

পাশ্চাত্য দার্শনিক শোপেনহর (Schopenhauer) উপনিষদ্ পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন : জীবিতকালে উপনিষদ্ আমায় স্বস্তি দান করিয়াছে এবং মৃত্যুর সময়ও ইহা আমাকে শান্তি দান করিবে। এই কথার উপর মোক্ষমূলর (Maxmuller) মন্তব্য করিয়াছেন : শোপেন-হরের মতো দার্শনিক যা তা লিখিবার লোক নহেন এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বাণীতে একেবারে নিজেকে পরিপ্লুত করিবার ব্যক্তিও নহেন। আমি তাঁহার বাণীতে যে উৎসাহ দেখি, ইহার অংশ গ্রহণ করিয়া বলিতে চাই যে আমি বেদান্তের কাছে জীবনের অনেক সহায়তা পাইয়াছি বলিয়া ইহার নিকট ঋণী। আমি বেদান্তের পুস্তক পাঠ করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সুখে কাল কাটাই। আমি বেদান্তের বাণী প্রভাতের স্নিগ্ধ রশ্মির মতো, পর্বত-প্রদেশের পবিত্র বায়ুর মতো উপভোগ করি। একবার হৃদয়ঙ্গম করিলে উহা এত সহজ ও এত সত্য বলিয়া মনে হয়।[৬]

বিশ্বের বিরাট ইতিহাস ও নানা জাতির নানা সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে ভারতীয়গণের অমৃত-ধারা জগতের কৃষ্টিতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অবদান। এক আত্মা, এক সত্তার মহিমময়ী বাণী ভারতকে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য বহু সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছে। বর্তমান জগতে যে সমস্যাগুলি মানুষের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন, দলিত মথিত এবং ব্যথিত করিতেছে, সেগুলির সমাধান ঐ অমৃতধারায় সিক্ত করিলে বর্তমান মানুষ যে শান্তির সন্ধান পাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[৫] History of Sanskrit Literature—Macdonell

[৬] I spend my happiest hours in reading Vedanta books. They are to me like the light of the morning, like the pure air of the mountains—so simple, so true, if once understood. —Maxmuller

মধ্যভারত-পরিক্রমা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসাক

চিত্রকূটের কাছে বিদায় নিয়ে চললাম 'পেণ্ড্রা' অভিমুখে, ওখান থেকেই 'অমর-কণ্টক' যেতে হবে। 'পেণ্ড্রা' পৌছে ধর্মশালায় মালপত্র রেখে বাসের খোঁজ করতে গিয়ে তো চক্ষুস্থির! অমরকণ্টকে যাবার বাস চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ। উপায়? আশানৈরাশ্যে মন তোলপাড় হ'য়ে গেল। অবশেষে দৈব বুঝি সহায় হ'ল। জনৈক ঘোড়াওলা দুটি ঘোড়ায় মালপত্র সমেত আমাদের নিয়ে যেতে রাজী হ'ল অমরকণ্টক পর্যন্ত। যাতায়াতের ভাড়া ঠিক হ'ল ২৪৲। তাতেই রাজী হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সকালবেলা দুটি ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে তারই ওপর চ'ড়ে আমরা রওনা হলাম। টাঙ্গার ঘোড়া মানুষ বা মালের ভার বইতে অভ্যস্ত নয়। তারা চলতেই চায় না। ঘোড়াওলা যদিও ঘোড়া হাঁকাবার জন্য পাশে পাশে চলছিল এবং মুখে নানাপ্রকার ইঙ্গিত ক'রে ঘোড়া-দুটিকে বেত্রাঘাত করছিল, কিন্তু বৃথা। তারা ঠিক নিজেদের খেয়ালে ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগল। এইভাবে দীর্ঘ ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে! খানিক বাদেই শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থিতে বেদনা শুরু হ'ল। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা দায় হ'য়ে উঠল। আমার বন্ধু সে কষ্ট থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ঘোড়া থেকে নেবে হাঁটতে শুরু ক'রে দিয়েছেন।

যতদূর চোখ যায় বরাবর সোজা রাস্তা, দিগন্তপ্রসারী পাহাড়েই দৃষ্টি ব্যাহত হয়। রাস্তার দুপাশে নানাপ্রকারের গাছ; তার মধ্যে হরীতকী, আমলকী গাছের আধিক্য। বিশেষ ক'রে আমলকী গাছগুলিতে থোলো থোলো আঙুরের মতো অজস্র আমলকী ধ'রে রয়েছে। আর কামরাঙা গাছে গুচ্ছ গুচ্ছ কামরাঙা শোভা পাচ্ছে। ফলগুলি এখনও পাকেনি, হাতের বাহিরে থাকায় মানসিক রসাস্বাদনেই তৃপ্ত থাকতে হ'ল। যেতে যেতে কয়েকটি খরস্রোতা ঝরনা পার হ'তে হ'ল। ঘোটকের পদক্ষেপের ফলে জলের ছিটে লেগে বিছানার কিছুটা ভিজে গেল। আরও অগ্রসর হবার পর আরম্ভ হয় দুপাশে গভীর জঙ্গল—লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। জনমানবের বসতি দেখা যায় না—কদাচিৎ দু-একটি রাখালকে গো-মহিষের পাল নিয়ে যেতে দেখা যায়। জন-বিরল এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে বেশ ভয় হচ্ছিল। কোন বন্য জন্তুর আকস্মিক আবির্ভাবের আশঙ্কায় গা ছম্‌ছম্ করে।

সোজা রাস্তা ছেড়ে পাকদণ্ডীর রাস্তা ধরল ঘোড়াওলা। পাহাড়ের গা দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথ সরীসৃপের মতো এঁকে বেঁকে চলেছে। ভীষণ পিছল এই পথ, কারণ পর্বতগাত্রে নিঃসৃত জলের ধারা এই পথের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। এ হেন বিপৎসঙ্কুল পথে আনবার জন্য ঘোড়া-ওলাদের ভর্ৎসনা করলাম। চারিদিকে ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গল—দু-হাত তফাতের মানুষকে দেখা যায় না। দিনের আলো ভাল ক'রে প্রবেশ করে না, এমন স্থান দিয়ে যেতে হচ্ছে। সঙ্কীর্ণ রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁটাগাছও রয়েছে। প্রতিপদে গায়ে কাঁটা বিদ্ধ হবার সম্ভাবনা। কোথাও পাথরের বড় বড় চাঁই পথের দুপাশ থেকে পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করেছে। একবার এর ভেতর দিয়ে যেতে বিছানা আটকে রয়ে গেল—ঘোড়া এগিয়ে গেল। আবার বিছানাটিকে তুলে

ঘোড়ার পিঠে বসানো হ'ল। পাথরের ঘর্ষণে বিছানার হোল্ডলটি ছিঁড়ে গেল। বলা বাহুল্য, অনেক আগেই ঘোড়া থেকে নেবে পড়েছি। খাড়া চড়াইপথে আসতে আসতে এরই মধ্যে ঘেমে উঠেছি। উপরন্তু, এই পিছল পথে অসংলগ্ন পাথরের ওপর ভারসাম্য বজায় রেখে চলা খুবই দুরূহ। বহু কষ্ট সহ্য ক'রে পরিশ্রান্ত দেহে যখন অমরকণ্টকে পৌঁছাই, তখন বেলা প্রায় বারোটা। নর্মদার হিমশীতল জলে স্নান সেরেই নর্মদাদেবীর মন্দিরে গিয়ে দেখি, দ্বার রুদ্ধ। বিকালে মন্দির খুললে দর্শন হবে। রমাবাঈ-এর ধর্মশালায় আশ্রয় নিই।

বিকালে নর্মদাদেবীর দর্শন হ'ল। দেবীর মন্দিরের সম্মুখেই শিবমন্দির। চত্বরে আরও কয়েকটি মন্দির রয়েছে—লক্ষ্মী, নারায়ণ, সূর্যদেব, হর-পার্বতী প্রভৃতির মূর্তি। প্রধান মন্দিরের পাশেই নর্মদাকুণ্ড। বড় পবিত্র এই কুণ্ড। এখানে শুধু স্নান করতে দেওয়া হয়; বস্ত্রাদি ধৌত করার জন্য অন্য স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে।

নর্মদার উৎস এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, শোন-মুড়া নামক স্থানে। দু-পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। 'শোন-মুডায়' পৌঁছে ক্ষীণকায়া একটি পার্বত্য ঝরনা দেখা যায়। ঝরনাটি হাজার ফুট নীচে নেমে এসে, নর্মদা নামে দেশ-দেশান্তরে প্রবাহিত।

রাত্রিটা ধর্মশালায় কাটিয়ে পরদিন ফেরার পালা। পাকদণ্ডী রাস্তা ধ'রে আর যাবার ইচ্ছে নেই। বড় রাস্তা ধ'রে যাব, দেরি হয় হ'ক। ঘোড়াওলা কিন্তু কিছুতেই রাজী নয়। বড় রাস্তা ধ'রে গেলে, অনেক ঘুরে যেতে হবে—সে আপত্তি জানায়। অবশেষে আবার সেই সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ ধরেই ফিরতে হ'ল। আবার সেই ভয়াবহ পথ—প্রতিটি পা সন্তর্পণে ফেলতে হচ্ছে। ঘোড়া-দুটির একটি পিছলে পড়ে যাওয়ায় পায়ে বেশ চোট লাগে। ঘোড়াওলা টেনে তোলে তাকে, তারপরেই শুরু হয় অশ্রাব্য গালিবর্ষণ। এক অসতর্ক মুহূর্তে আমার বন্ধুবরের ঘোড়াটি পাথরে হোঁচট গেল। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে হোল্ডল ছিঁড়ে গেল। সে তো রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে ঘোড়াওলাকে সম্বোধন ক'রে বললে, 'বেকুব ঘোড়সওয়ার!' বন্ধুর হিন্দীজ্ঞান টনটনে। কথাটির প্রকৃত অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে তো হেসে খুন। ঘোড়া-দুটিকে পেটাতে পেটাতে যখন স্টেশনে (পেণ্ড্রা) এসে পৌঁছলাম, তখন ট্রেন আসবার সময় হ'য়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নিতে নিতেই ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেনে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

রাত দশটায় জব্বলপুর পৌঁছে আধুনিক রুচিসম্মত একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। সকালে উঠেই মার্বেল-রক দেখতে যাব মনে ক'রে বাসের খোঁজ করতে গিয়ে জানলাম, 'ভেড়াঘাট' পর্যন্ত বাস যাবে। বাসে ঘণ্টাখানেক লাগলো। সেখান থেকে অনতিদূরেই নর্মদা ও মার্বেল-রক। বহুদিন থেকেই শুনে এসেছি মার্বেল-রকের কথা—মানসচক্ষে ছিল এর প্রতিচ্ছবি। কিন্তু চাক্ষুষ যখন দেখলাম, তখন বুঝলাম যে মনের ছবির চেয়ে বাস্তব অনেক বেশী সুন্দর। কি অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য!

নর্মদার দু-পাশে জল থেকে খাড়া উঠে গেছে অমল ধবল মর্মর পর্বতশ্রেণী। তার উপর সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত হ'য়ে এক অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। সৌন্দর্যপিয়াসী মন নানাভাবে সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করতে চায়। তাই মার্বেল-রকের চূড়ার উপর থেকে দু-পাশের শুভ্র পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নর্মদার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে পাহাড় থেকে নেবে একটি নৌকা ক'রে নর্মদার শান্ত বক্ষে ভেসে যাই।

দু-পাশে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র পর্বত-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে নৌকা চলেছে; উপরে নীল নভোমণ্ডল—খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ ভেসে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে মার্বেল-রকেরই এক একটি মায়াময় টুকুরো; সবকিছু নিয়ে এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। নৌকায় বেড়ানোর পর নর্মদার তীর ধ'রে হেঁটে চলি নর্মদা-ফল্‌স্ (প্রপাত) দেখতে। এই জায়গায় নদীর জলরাশি অনেকটা উঁচু থেকে নীচে সবেগে প'ড়ে গভীর আবর্তের সৃষ্টি করেছে। বিক্ষুব্ধ জলরাশি বহুধা বিভক্ত হ'য়ে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর সেই আবর্তের মধ্যে জল পড়ার ফলে উর্ধ্বে উত্থিত ফেনপুঞ্জ দূর থেকে 'ধূম' ব'লে প্রতীতি হয়। এরই জন্য এর নাম 'ধূমধারা'; এরই গর্জন বহুদূর থেকে শ্রুতিগোচর হয়।

প্রপাত দেখে 'বাঙ্গালী হোটেলে' এসে বিশ্রাম ক'রে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করলাম। এই হোটেলের মালিকের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হ'তে হয়। যাত্রীদের খাতায় (Visitors' Book) দেখি বহু বঙ্গনরনারীর নর্মদা-দর্শনের পর ভাবময় উচ্ছ্বাস। সকলেই হোটেলের মালিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির স্বাক্ষর দেখতে পেলাম এই খাতাটিতে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের হস্তাক্ষর দেখে বিস্মিত হলাম। খাতার পাতাটি জীর্ণ হ'য়ে গেছে, কিন্তু স্বাক্ষরটি আজও জলজল করছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের নামটিও মালিক সাগ্রহে দেখায়।

সন্ধ্যার বাসে জব্বলপুরে ফিরে পরদিন বিকালের ট্রেনে ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। রাত্রি তিনটা আন্দাজ স্টেশনে পৌঁছে গাড়ী বদল ক'রে ভোরের দিকে ওঁকারেশ্বর রোড পৌঁছলাম। মালপত্র স্টেশনের কাছে একটি ধর্মশালায় রেখে বাসে 'মান্ধাতা' নামক গ্রামে পৌঁছই। একটু হাঁটবার পর নদীর ধারে এলাম।

আবার সেই নর্মদা। তবে এখানে নর্মদা গভীর ও বিস্তৃত। দূরে দেখা যায়—পাহাড় ও জঙ্গল। নদীর অপর পারে পরম পবিত্র ওঁকারেশ্বরের মন্দির। পাশেই রয়েছে একটি সুবৃহৎ ধর্মশালা। নৌকায় নর্মদা পার হ'য়ে স্নানাদি শেষ ক'রে মন্দিরে এলাম। স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের সামনে প্রাণের সমস্ত শ্রদ্ধা উজাড় ক'রে দিয়ে প্রণতি জানাই। কোন পাণ্ডার হট্টগোল নেই। শিবলিঙ্গের সামনে উপবিষ্ট জনৈক পুরোহিত; ভক্তদের পূজা দেবার সময় সাহায্য করে, কোন দাবীদাওয়া নেই।

স্বয়ম্ভুলিঙ্গের সামনে জ্বলে পিলসুজের উপর একটি প্রদীপ। নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখা মন্দিরের নীরবতা যেন আরও বাড়িয়ে তোলে, একটা আধ্যাত্মিক ভাব যেন জমাট বেঁধে রয়েছে ব'লে অনুভব করা যায়। প্রাণ ভরে পূজা করলাম; পূজার উপচার নর্মদার জল আর বিল্বপত্র। পূজা সমাপনান্তে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়াই। সামনেই একটি দোকানে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে এপারে ফিরে এলাম।

ইন্দোর অভিমুখে একটি বাস অবিলম্বে ছাড়বে শুনেই উঠে পড়লাম। যাবার পথে ধর্মশালায় রাখা মালপত্র তুলে নিই। বিকালের দিকে ইন্দোর এসে পৌঁছই।

ইন্দোরের প্রধান দ্রষ্টব্য—কাঁচমহল বা 'শীসমহল'। জৈন সম্প্রদায়ের অভিনব এই অট্টালিকার ভেতরের অংশ সমস্তই কাঁচ দিয়ে তৈরী। মেজে, দেওয়াল, ঘরের ছাত, স্তম্ভ প্রভৃতি সকলের উপর নানা রঙের কাঁচ বসানো, আর সেই কাঁচের ওপর নানা কারুকার্য। মহাভারতের আখ্যায়িকা, জৈন সম্প্রদায়ের প্রচলিত ধর্মের কাহিনী প্রভৃতি কাঁচগুলির উপর সুন্দররূপে অঙ্কিত। শীসমহলের প্রবেশদ্বারে জুতা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।

সমস্ত ঘরে কাঁচের মেজের ওপর বিচরণ ক'রে চতুর্দিকে নিজের প্রতিবিম্ব বহুভাবে প্রতিফলিত দেখে চমৎকৃত হ'তে হয়। দ্বিতলে উঠেও সেই কাঁচের রাজ্য। পৃথক একটি কক্ষে জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। ব্রঞ্জ-নির্মিত মূর্তিগুলি আয়নায় বহুধা প্রতিফলিত।

কাঁচমহলের অনতিদূরে প্রাচীন হোলকার রাজাদের কয়েকটি স্মৃতিমন্দির রয়েছে 'ছত্রীবাগ' নামক স্থানে। এই মন্দিরগুলির ভিতর তদানীন্তন হোলকার রাজাদের মূর্তি ও সেই সঙ্গে একটি ক'রে শিবলিঙ্গ বর্তমান। রাণী অহল্যাবাঈ-এর মূর্তিও রয়েছে। আজ ছত্রীবাগ জঙ্গলে পূর্ণ, মন্দিরগুলি উপেক্ষিত, মূষিক ও আরশোলার বাসস্থানে পরিণত। দেখলেই মনে হয়, বহুদিন পরিষ্কারের কোন চেষ্টাই করা হয়নি। মানুষের 'অমর' হ'য়ে থাকবার ইচ্ছা ও চেষ্টা অনাদিকাল থেকে; স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি তারই জন্যে; কিন্তু কালের দুর্বার গতি রোধ করে, কার সাধ্য!

শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে মানিকবাগ, লালবাগ নামকস্থানে মহারাজার প্রাসাদ। প্রাসাদের ভিতর সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। লালবাগের প্রশস্ত বাগানের মধ্য দিয়ে যাওয়া চলে, তবে কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে দূর থেকে রাজপ্রাসাদ দেখেই ফিরে যেতে হয়।

সকালের বাসে ইন্দোর ছেড়ে বেলা ১১টা আন্দাজ উজ্জয়িনী পৌঁছই। একটি গুজরাটি হোটেলে মালপত্র রেখে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ি। অতি প্রাচীন এই শহর—লোকের ঘন বসতি ও সরু সরু গলি বা রাস্তার আধিক্য দেখেই তা বোঝা যায়। শক্তি-উপাসনা এক সময় এখানে প্রাধান্য লাভ করেছিল—নানা শক্তিমূর্তি তার সাক্ষ্য প্রদান করে। তন্মধ্যে রাজা ভর্তৃহরির আরাধ্যাদেবী গড়-কালিকা ও রাজা বিক্রমাদিত্যের পূজিতা হরসিদ্ধি দেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ভূগর্ভ হ'তে প্রাচীন উজ্জয়িনীর বহু কিছু আজ আবিষ্কৃত হচ্ছে। বর্তমান নগরের কিছু দূরে খনন ক'রে পুরাকালের বসতির নিদর্শন-স্বরূপ বহু তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। সারনাথের মতো এখানেও ঘরবাড়ীর চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক উজ্জয়িনী আসল উজ্জয়িনী নয়, সে লুকিয়ে আছে ভূগর্ভে।

'ভতরোজীকি গুঁফা' মধ্যযুগের আর একটি কীর্তিচিহ্ন। কথিত আছে রাজা ভর্তৃহরি এই গুহায় ব'সে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। মাটির নীচে অনেকদূর নেবে যেতে হয়; অন্ধকার স্বল্পপরিসর কক্ষে মাথা নীচু ক'রে প্রবেশ করতে হয়। অসাধারণ তপস্যার স্থানও অসাধারণ!

উজ্জয়িনীর ইতিহাসের প্রাচীনতম কথা বোধ হয়, সন্দীপন মুনির আশ্রম। বর্তমান লোকালয় থেকে বহু দূরে অবস্থিত। কথিত আছে—এখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সুদাম পাঠচর্চা করেছিলেন। মুনিবরের একটি মূর্তি রয়েছে এই আশ্রমে, আর তারই সামনে ছোট্ট একটু স্থান চিহ্নিত করা আছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরুর কাছে পাঠাভ্যাস করতেন।

ভক্তদের কাছে উজ্জয়িনী তপস্যাক্ষেত্র। এখানে রয়েছে জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ম্ভূ শিব—মহাকালের মন্দির। পাশেই প্রবাহিত ক্ষিপ্রা (বা সিপ্রা) নদীর ধারে বহু ঘাট দেখে বারাণসীর কথাই মনে পড়ে। শহরতলীর মধ্যস্থলে গোপালজীর মন্দির অন্যতম আকর্ষণ, ভক্ত-সমাগম সব সময় লেগে আছে। রৌপ্য-নির্মিত গোপালমূর্তিটি সকলের মন হরণ করে।

শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে মানমন্দির ও কালীদহ প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহের সময়ে নির্মিত এই মানমন্দির 'যন্তর-

মহল' নামে খ্যাত। সূর্যের ছায়া অনুসরণ ক'রে সৌরজগতের নানা তথ্য সংগ্রহের বিধিব্যবস্থা রয়েছে। অজ্ঞাত জগতের তথ্য উদ্‌ঘাটনে মানুষের কৌতূহলী মন যে আবহমান কাল থেকে নিযুক্ত, তারই সাক্ষ্য পাওয়া যায় এই সব স্থানে।

ক্ষিপ্রানদীর এক প্রান্তে নির্মিত কালীদহ প্রাসাদ সুলতানদের বিলাস-ভবনের নিদর্শন-স্বরূপ আজও দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। দ্বাররক্ষীর কাছে শুনি—কয়েকটি আসবাব ব্যতীত ভিতরে দর্শনীয় আর কিছুই নেই। নীরব পরিত্যক্ত প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক ভাবে অতীতের কথা। পাশেই প্রবাহিত ক্ষিপ্রার কলধ্বনিতে ভেসে আছে বহু পুরানো দিনের হাসিকান্নার কলগান, তারই কিছু কি ধরা পড়েছে কালিদাসের মহাকাব্যে ?

পরদিন ভূপাল। এখানকার সুন্দর বড় বড় হ্রদগুলি রাজস্থানের উদয়পুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাত্রে শহরের আলো হ্রদের জলে প্রতি-বিম্বিত হ'য়ে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। কমলাপার্ক, আয়েসবাগ প্রভৃতি রমণীয় উদ্যান-গুলি দর্শককে আকর্ষণ করে।

২৪ মাইল দূরে অবস্থিত ভোজপুর গ্রামের শিব-মন্দির অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। মুণ্ডীদ্বীপ বাসে এসে হাঁটা পথ ধরলাম। আলক্ষেতের উপর দিয়ে বহু ক্ষেতখামার ডিঙিয়ে ছোট ছোট গ্রামের মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। ঘণ্টা দুই হাঁটবার পর ১৪ মাইল দূরে এসে পৌছই ভোজপুর গ্রামে। এখানে এই বিখ্যাত শিবমন্দিরটি বহু দূর থেকেই দেখা যায়। মন্দিরের উপরিভাগের অংশটি ভেঙে পড়েছে। নীচে অতি বিশালাকার কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। লিঙ্গটি উচ্চতায় ৭´৪´´; আর তার পরিধি ১৭´৪´´। পাথরের মসৃণতা আজও অক্ষুণ্ণ। শিবলিঙ্গের গায়ে লাগানো একটি মই; তাই দিয়ে উঠে পূজার ফুল নিবেদন করতে হয়। আমরা আর মই বেয়ে উঠলাম না। বড় বিসদৃশ লাগল। নীচে থেকেই অন্তরের প্রণতি জানিয়ে মানসপূজা করলাম।

মুণ্ডীদ্বীপে ফিরে বহুক্ষণ প্রতীক্ষার পর একটি বাস পেয়ে ভূপাল পৌছলাম। রাত ১০টার গাড়ীতে রওনা হ'য়ে রাত ১॥টায় সাঁচী পৌছই। স্টেশনের বিশ্রামাগার (Retiring room) খালি থাকায়, সেখানেই থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

সকালে সাঁচী-স্তূপগুলি দেখব মনে ক'রে বেরিয়ে পড়ি। মিনিট দশ হেঁটেই পৌছে গেলাম। ৩০০ ফুট্ উঁচু একটি পাহাড়ের উপর স্তূপগুলি ছড়িয়ে আছে। প্রধান বড় স্তূপটির ৪টি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত তোরণদ্বার। তোরণদ্বারগুলি পাথরের স্তম্ভের উপর অবস্থিত। স্তম্ভগুলির উপর বহু জাতকের গল্প, বৌদ্ধযুগের ধর্মের ইতিহাসের আখ্যায়িকা অতি নিপুণভাবে খোদিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে শিল্পীর কীর্তি দেখে তদানীন্তন স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষের কথা মনে করি। ধন্য সেই শিল্পিবর্গ, যারা পাথরের উপর রূপ দিয়েছে মনের ভাষাকে, প্রাণবন্ত করেছে অতীতের ঘটনাবলীকে।

স্তম্ভের বন্ধনীর কোণে দেখতে পাই যৌবন-দৃপ্তা যক্ষিণী। কালের প্রকোপে মূর্তিগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুটা ভেঙে গেছে, কিন্তু যেটুকু রয়েছে, সেটুকুই শিল্পজগতে অনবদ্য। প্রতিটি স্তম্ভের উপর হস্তী ও বামনের মূর্তি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে স্থাপিত। অপূর্ব তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। প্রতিটি অঙ্গে যেন সজীবতা প্রকাশ পাচ্ছে। তোরণদ্বারের শীর্ষে শোভমান— বৌদ্ধ-যুগের প্রতীক ধর্মচক্র।

স্তূপের দুদিকে দুটি সিঁড়ি রয়েছে—স্তূপের মধ্যভাগে ওঠবার জন্যে। মধ্যভাগে গোলাকার সমতলভূমি—স্তূপের চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করা যায়; শীর্ষদেশে ওঠা যায় না।

প্রধান স্তূপ ছাড়াও আরও ছোট ছোট কয়েকটি স্তূপ রয়েছে। অনতিদূরে দীর্ঘ অশোক-স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখি। স্তম্ভশীর্ষ (capital) স্বতন্ত্রভাবে মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। তাতে সিংহচতুষ্টয়ের মূর্তিগুলি দর্শকের বিস্ময়ের বস্তু—বলদৃপ্ত সিংহের বিক্রম অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে প্রতিটি কুঞ্চিত কেশরদামে, গ্রীবার প্রতিটি পেশীতে।

নিকটেই বহু বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে। সারনাথের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ব্যবহৃত ঘরগুলি বিস্মৃতির গর্ভ থেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলেছে। সমস্ত জায়গাটিই একদিন বৌদ্ধ শ্রমণদের তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে পূত হ'য়ে উঠেছিল,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ তার নিদর্শন।

একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত বাটি (পাত্র) ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। কথিত আছে, এর মধ্য থেকে আহার্য ভাগ ক'রে দেওয়া হ'ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের।

সারিপুত্ত ও মহামোদ্গলায়নের দেহাস্থি-সংরক্ষণের স্মৃতিসৌধ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি মহাসমারোহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উক্ত স্মৃতিসৌধের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

সাঁচীর অনতিদূরে অবস্থিত বিদিশা (অধুনা ভিল্‌সা) নামক স্থানে আসি। এখানে উদয়গিরিতে জৈন ও হিন্দুদের কয়েকটি গুহা আছে। অধিকাংশ গুহা শূন্য, ভিতরে কোন মূর্তি নেই। গুহাগুলির প্রায় সবই ভগ্নপ্রায়। পাথরে খোদিত তদানীন্তন প্রচলিত সংস্কৃত-ভাষায় কিছু কিছু লেখার পাঠোদ্ধার ক'রে পাওয়া গেছে : সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধজয়ের পর এই গুহা পর্যটনে আসেন। একটি গুহায় প্রস্তরে দেওয়ালে খোদিত বিষ্ণুর বিরাট বরাহাবতার মূর্তি প্রাণবন্ত হ'য়ে রয়েছে।

কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তিও গুহাগাত্রে খোদিত। জৈন মন্দিরগুলির মাত্র একটিতে দিগম্বর মহাবীরের মূর্তি, বাকিগুলি শূন্য।

বহু প্রাচীন 'খাম্বাওয়া' স্মৃতিস্তম্ভ আজও সযত্নে রক্ষিত। বিদিশা সভাগৃহের তদানীন্তন গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস্ উত্তরজীবনে বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে এই স্তম্ভ নির্মাণ করান।

বিকালে ফিরে আসি সাঁচী; সেখান থেকে ঝাঁসী হ'য়ে কানপুর। এইভাবেই মধ্যভারত পরিক্রমা শেষ হ'ল। তারপর ফিরে আসি কলকাতা, সেখানে শুরু হ'ল গতানুগতিক জীবন।

প্রত্যাবর্তন

স্বামী চিদ্‌রসানন্দ

প্রথম প্রভাত হ'তে চলিয়াছি অনন্তের পানে,
মাঝে মাঝে থামিয়াছি বিশ্রামের তরে স্থানে স্থানে।
আবার চলেছি একা, কোন দিন নহি কোথা স্থির,
ঘুরেছি সংসার-চক্রে চিরদিন চঞ্চল অধীর।

পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পথে যদি পান্থশালা পাই,
পথকষ্ট, মনোব্যথা—ক্ষণেকেই সব ভুলে যাই।
পান্থশালে পাথেয় সঞ্চয় করি, দিই পথকর;
অদম্য উদ্যমে পুন যাত্রাপথে হই অগ্রসর।

পান্থশালে কখন বা নিদ্রাঘোরে হ'য়ে অচেতন
সুখ-দুঃখ স্বপ্ন দেখি, ভুলে যাই নিজ-নিকেতন।
চলেছি কোথায় কেন, বারে বারে অজানার দেশে
পুরাতন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যজি নব নব বেশে।

কত না বিচিত্র চিত্র পথিপার্শ্বে হেরি অবিরত,
কখন উল্লাসে চলি, কভু প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত।
কত বৃক্ষলতা পুষ্প, পদ্মপূর্ণ কত সরোবর,
অপরূপ বর্ণচ্ছটা, নীলাকাশ শোভিছে সুন্দর!

চলেছি অবশ হ'য়ে ছায়াময় অনন্তের পানে
চকিতে উঠিনু জাগি, চেনা স্বর আসিল যে কানে,
ধীরে আরো কাছে আসি মুখপানে আঁখি দুটি রাখি
অনন্ত আনন্দময় গুরুমূর্তি কহে স্নেহে ডাকি :

'যে পথে চলেছ তুমি অন্তহীন উদ্দেশ্যবিহীন,
ভ্রমে ভ্রমিতেছ খুঁজি প্রেয় প্রিয় হ'য়ে দেহাধীন,
ও পথের শেষ নাই, ও পথে তো নাহিক বিশ্রাম
বার বার যাওয়া আসা, ঘুরে মরা শুধু অবিরাম।
জানিবারে ইচ্ছা যদি শ্রেয় তব স্বরূপ আপন,
প্রাণপণ কর যত্ন—অন্তরেতে অরূপ রতন!
অসংখ্য বন্ধন-রজ্জু চারিদিকে বেঁধেছে তোমারে
সবলে সেগুলি কাটি ফিরে এস আপনার ঘরে।'

সমালোচনা

Yoga Psychology: Swami Abhedananda, Published by Ramakrishna Vedanta Math, 19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta, Pp. 408+xxiv (demy) Price Rs 10.

১৯২০ খৃঃ মার্কিন দেশের বুধমণ্ডলীর সমক্ষে পতঞ্জলির যোগসূত্রের উপর স্বামী অভেদানন্দ যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বর্তমান পুস্তক সেইগুলির একটি সুন্দর সঙ্কলন। পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্য এবং বাচস্পতির মিশ্রের টীকা বহু স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

সম্পাদক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একটি মূল্যবান্ ভূমিকায় 'যোগ' শব্দের অর্থ, যোগ ও বেদান্তের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝাইয়া দিয়া পাঠকদের বিষয়-প্রবেশে সাহায্য করিয়াছেন।

বিভিন্ন অধ্যায়ে (১) যোগসাধনার সোপান, (২) যোগসাধনার ধারা, (৩) বিঘ্নের প্রতিকার এবং যোগ, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রাণ ও ষট্চক্র এবং কুণ্ডলিনী, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি, (৯) ক্রিয়াযোগ, (১০) অবিদ্যা ও জগৎ, (১১) জ্ঞান ও অজ্ঞান-দূরীকরণ, (১২) রাগ ও দ্বেষ, (১৩) বন্ধন ও মুক্তি, (১৪) কর্ম ও ধ্যান, (১৫) ঈশ্বর-প্রণিধান ও সমাধি (১৬) ওঁকার ও ঈশ্বরভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিশিষ্ট-অধ্যায়ে 'অহংতত্ত্ব ও অহঙ্কারে'র বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না বা যাঁহারা ব্যাসভাষ্য এবং বাচস্পতি মিশ্রের টীকা পড়িতে বা বুঝিতে পারিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই পুস্তকখানি অমূল্য। গ্রন্থকার স্বয়ং পরম যোগী ছিলেন বলিয়া যোগসাধনার সব দিক্ সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানির মৌলিকত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। —মৈথিল্যানন্দ

City of Calcutta (a Socio-economic Survey) by S. N. Sen, Univ. Prof. of Economics, Univ. of Cal. (issued under the auspices of the Dept. of Econ. Cal. Univ.) Published by Bookland Private Ltd. Pp. Royal 271+iv. Price Rs 30/- only.

ভারত-সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের রিসার্চ প্রোগ্রাম কমিটির নির্দেশে ও সহায়তায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি (Economics) ও পরিসংখ্যান (Statistics) বিভাগের যুক্ত উদ্যোগে চার বৎসর (1954-55 to 1957-58) ধরিয়া কলিকাতা মহানগরীতে সমাজনীতি ও অর্থনীতিমূলক পর্যবেক্ষণ-কার্য পরিচালিত হয়, তাহাতে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া গিয়াছে, বর্তমান মূল্যবান্ গ্রন্থখানি তাহারই বিশ্লেষণমূলক বিবৃতি।

১৯৫১ খৃঃ জনসংখ্যা গণনা (Census)-র উপর ভিত্তি করিয়া বয়স, নরনারী-সংখ্যা বিভিন্ন ভাষাভাষী-সংখ্যা, বিবাহ, গৃহপরিবেশ, সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থা, কর্মসংস্থান, বেকার প্রভৃতি বিবেচিত হইয়াছে। বর্তমান লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, তাহার হার ও তজ্জনিত সমস্যার বিষয়ও পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কলিকাতার নব নব রূপ অনাবৃত হইয়াছে, যাহা আমাদের জানা ছিল না, অথচ জানা উচিত ছিল।

তুলনামূলক বহু তালিকা এবং গ্রাফ পাঠকদিগকে কোন বিশেষ বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধি বুঝিতে

সহায়তা করিবে। পুস্তকটির বিস্তৃত সমালোচনা বিশেষজ্ঞেরাই করিবেন। সাধারণ পাঠক ও সমাজসেবিগণ ব্যক্তিগতভাবে এই পুস্তক ক্রয় করিতে না পারেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদেরও অবশ্য পাঠ্য। প্রত্যেক স্কুল কলেজ ও প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ইহা একখানি অবশ্য সংযোজনীয় গ্রন্থ। এরূপ একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন ও রচনার জন্য লেখক দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা আরও আশা করি—দেশের উন্নয়ন-ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত, তাঁহারা যেন এই গ্রন্থ হইতে লব্ধ তথ্যগুলি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক অনূদিত; ৫২, সার্পেন্টাইন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা-২৬১, মূল্য টাকা ১.৫০।

আলোচ্য পুস্তকখানি গীতার একটি পকেট সংস্করণ। ইহাতে পূর্বের পৃষ্ঠায় গীতার মূলশ্লোক এবং পরপৃষ্ঠায় বাংলা পয়ার ছন্দে শ্লোকানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদ সর্বত্র সুললিত হইয়াছে—বলা চলে না, তবে ভাষা সরল হওয়ায় গীতার কঠিন শ্লোকগুলিরও অর্থ সহজবোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা গীতা কণ্ঠস্থ করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে পুস্তকটি বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৬০)—দশম বার্ষিক সংখ্যা, সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী অভেদ চৈতন্য প্রভৃতি, প্রকাশক স্বামী তেজসানন্দ, অধ্যক্ষ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। রয়াল সাইজ—১৬০ পৃষ্ঠা।

অন্যান্য বৎসরের মতো রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক কলেজের এই সুন্দর সুমুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকাখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়া আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়াছে। বাংলায় ২১টি ও ইংরেজীতে ১০টি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত প্রবন্ধ সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টার চিত্রগুলিতে, আমাদের কথায়, কার্যবিবরণীতে ও সর্বশেষ অধ্যক্ষ মহারাজের Annual Report-এ বিদ্যামন্দিরেব সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৬৬)**:** শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, ১০৭, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৬২।

পত্রিকাটিতে প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা—প্রায় সব লেখাই ছাত্রদিগের। বিষয়-নির্বাচন ও মুদ্রণ-পারিপাট্য সুরুচির পরিচায়ক। 'আমাদের কথায়' বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট। 'পরিবর্তন' রসরচনাটি ভাল লাগিল। 'একটি অসমাপ্ত কাহিনী' নামক ছোটগল্পটি হৃদয় স্পর্শ করে। পত্রিকাটির পূর্ব-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে।

আবেদন

আসাম দুর্গত জনগণের সেবা

আসাম হইতে দুর্গতদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ জলপাইগুড়ি জেলার ফালকাটায় একটি সেবা-শিবির খুলিয়াছেন। নূতন কাপড়, বাসনপত্র, দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্যান্য দ্রব্যাদি দাঙ্গাপীড়িতদের নিকট যথাসম্ভব পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে। আসামেও সেবাকেন্দ্র খুলিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সহৃদয় দেশবাসীদের নিকট আবেদন জানানো হইতেছে, তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য পাঠান। সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী সদাশিবানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই জুলাই পূর্বাহ্ণ ১০-১৫ মিঃ সময়ে স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ) ৮২ বৎসর বয়সে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুআরি তিনি হঠাৎ কেদারঘাটে পড়িয়া যান এবং তাঁহার উরুর অস্থি ভাঙিয়া যায়। সেবাশ্রমে ভরতি হইয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু আমাশয়ের পর তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। মণিকর্ণিকায় তাঁহার দেহ সলিলসমাধি দেওয়া হয়।

পূর্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল হরিনাথ (ওহদেদার)। হরিনাথ লখনউএ ইংরেজী, ফার্সি ও উর্দু শিক্ষা করেন এবং কিছুকাল এলাহাবাদে বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে চারুবাবু (শুভানন্দ), কেদারনাথ (অচলানন্দ) প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং তাঁহাদের সঙ্গে কাশী সেবাশ্রমের আরম্ভ হইতে সেবাকার্যে ব্রতী হন।

স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য হরিনাথ 'ভক্তরাজ মহারাজ' নামেই সুপরিচিত ছিলেন; ১৯২০ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দীর্ঘকাল এলাহাবাদে ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যাপন করেন। ঐ সকল স্থানের বহু ভক্ত তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে ভাবান্বিত হন। দেহমুক্ত সন্ন্যাসীর আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে মিলিত হইয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বামী নরোত্তমানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৩রা আগস্ট রাত্রিশেষে স্বামী নরোত্তমানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া কাশী মণিকর্ণিকা ঘাটের সন্নিকটস্থ কালীবাড়ীতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

১৯১৩ খৃঃ ২৭ বৎসর বয়সে তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২০ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হন। বারাণসী সেবাশ্রমে থাকাকালে তিনি আশ্রমের সর্ববিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার রচিত 'রাজা মহারাজ' স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে একখানি সুখপাঠ্য জীবনী পুস্তক। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কার্যবিবরণী

পাটনাঃ ১৯২২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে গীতা, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষৎ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে মোট ৩৩১টি আলোচনা হইয়াছিল। পূজা ও উৎসবাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮৯ ছাত্র অধ্যয়ন করে, ইহাদের অধিকাংশই অনুন্নত শ্রেণীর। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে নির্মিত ছাত্রাবাসে নূতন দ্বিতল ভবনে ২৬ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১৫ জনের খরচ আশ্রম হইতে বহন করা হয়। আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাস হইতে ২ জন আই. এস. সি, ১ জন বি. এ এবং ১ জন এম. এ পাস করিয়াছে।

তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরির ৫,৫৩২ পুস্তকের মধ্যে ৪৯০ খানি নূতন সংযোজন। পাঠাগারে ৬টি দৈনিক ও ৭২টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত আসিয়াছে।

গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান :	দৈনন্দিন পাঠক :	গৃহীত পুস্তক
১৯৫৮	১১,৮৭৬	৫,৭৬১
১৯৫৯	১৬,০৮২	৮,৬০৬

গ্রন্থাগার-ভবনের দ্বিতলে প্রশস্ত হলে, সাধারণের উপযোগী ধর্ম ও কৃষ্টিবিষয়ক বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। এবারে বক্তাদের মধ্যে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আশ্রমের হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক বিভাগে যথাক্রমে ৭১,৮৮৭ ও ৪৮,৪৬৪ রোগী চিকিৎসিত হয়।

রাঁচি : রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা-আরোগ্য ভবনে ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বর্তমানে এখানকার শয্যাসংখ্যা ১৮৯, ইহার মধ্যে সাধারণ ওআর্ডে ১৫৪। আলোচ্য বর্ষে আরোগ্যভবনে মোট ৩৮৮ জন রোগী ছিল। ২১৪জন আরোগ্য লাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে চলিয়া যায়। ৮৩ জন রোগী ফ্রি এবং ২৫ জন আংশিক ব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ২৬ জন রোগীর জন্য একটি নূতন ওআর্ডের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছে। যক্ষ্মারোগের কবল হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত সুস্থ কয়েকজন ব্যক্তিকে স্যানাটোরিয়ামেরই বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সেবাপ্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি পূর্ণাঙ্গ আরোগ্য-ভবনে পরিণত হইয়াছে, ইহা ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট যক্ষ্মা-চিকিৎসাকেন্দ্র। কলোনী নির্মাণ ও আরও ফ্রি বেডের জন্য সরকার ও বদান্য ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহৃদয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (৯৯, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২৬) : এই কেন্দ্রের ১৯৫৮-৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ২৭ বৎসর পূর্বে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান নামে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৮ খৃঃ কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া নাম পরিবর্তিত হয়। দক্ষিণ কলিকাতায় প্রায় ৫ বিঘা জমির উপর সেবাপ্রতিষ্ঠানের এই কয়টি বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে : স্ত্রী পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, পরিচর্যা ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা কেন্দ্র। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি-সমন্বিত লেবরেটরি, এক্স-রে প্ল্যাণ্ট, বৈদ্যুতিক লনড্রি, সার্জিক্যাল ইউনিট প্রভৃতি এখানে আছে। বর্তমানে হাসপাতালের মোট শয্যা-সংখ্যা ২১০ ; আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে ৫,৮৫৭ রোগী ভরতি হয়, তাহার মধ্যে ৪৮% ফ্রি চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক ১২৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

উৎসব-সংবাদ

সোনার গাঁ (ঢাকা) : গত ৫ই আষাঢ় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দলে দলে লোক আশ্রম-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। প্রায় তিন হাজার নরনারী আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ এক শোভাযাত্রা রাজপথ পরিভ্রমণ করে এবং অপরাহ্ণে এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। উৎসবের দুই দিন পরে স্বামী সদ্‌বুদ্ধানন্দ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনে উৎসবের জের আরও কয়েক দিন চলে। প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যায় আশ্রমের আম্রবৃক্ষতলায় তিনি গভীর এবং সুললিত ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আলোচনা করেন।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ঃ গত এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ তমলুক, কাঁথি, মেদিনীপুর ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে চণ্ডীপুর, আনন্দপুর, হেঁড়িয়া, কল্যাচক, দশগ্রাম, কাঁথি, কলমিছাবড়ে, খেজুরী, অজানবাড়ী, বনমালীচট্টা, ভদ্রকালী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর, লালগড়, বলরামপুর, ঘাটাল, গড়বেতা, হিজলী, সারেঙ্গা, রাইপুর, খাতড়া, কাঁকড়াদাড়া, চন্দ্রকোণা, কেশিয়াড়ী, সুখাডোর, শালবনী, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, জগদ্দল, রামবাগান, এলাচি, গোবরডাঙ্গা, হাটুয়াথুবা, কৃষ্ণনগর, শিকডাকুলীন-গ্রাম, ধান্তকুড়িয়া, ভাদুরিয়া, চাঁপাপুকুর, বসিরহাট, বারাসত ইত্যাদি অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদাদেবী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে মোট ৬৬টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫৭টি আলোকচিত্র সহযোগে।

স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ ঃ বন্ধুবর্গ ও ভক্তবৃন্দের অনুরোধে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ সম্প্রতি মালয়, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েটনাম ও ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ঐ সকল স্থানে রোটারি ক্লাব, থিওজফিক্যাল সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ২৫টি বক্তৃতা করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্টলুই ঃ বেদান্ত সোসাইটি—১৯৫৯-খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী ঃ কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা ঃ সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সারা বৎসর রবিবারে সর্বসমেত ৪৬টি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হইতে ছাত্রগণ যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন ঃ প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দিয়াছেন এবং উপনিষৎ ও ভাগবতের অধ্যাপনা ও ব্যক্তিগত প্রশ্নের সমাধানমূলক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। মঙ্গলবারের ক্লাসের মোট সংখ্যা ৪৩।

(৩) সাময়িক বক্তৃতা ও আলোচনা ঃ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ আহূত হইয়া নিম্নলিখিত স্থান-সমূহে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ঃ

সেণ্টলুই-স্থিত মেথডিস্ট চার্চ; কার্কউড চার্চ, হিব্রু টেম্পল, এতদ্ব্যতীত সেণ্টলুই ও ওয়েবস্টারে আয়োজিত সাধারণ ধর্মসভায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সমাগত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৪) অতিরিক্ত সভা ঃ কার্কউড হাইস্কুলের এবং ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও সভ্য-বৃন্দের সমাবেশে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ হিন্দুধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

(৫) উৎসব ঃ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, শংকরাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মদিবসে এবং অন্যান্য উৎসব-দিনে (দুর্গাপূজা, বড়দিন, গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি) বিশেষ ধ্যান, ভজন, শাস্ত্রপাঠ ও জীবনী আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথি উপলক্ষে সমবেত সকলকে ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

(৬) নানাস্থানে প্রচার ঃ উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া-স্থিত বেদান্ত কেন্দ্র-সমূহে এবং ক্যান্সাস শহরে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

(৭) অবকাশ ঃ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দের ক্যালিফর্নিয়া পরিভ্রমণকালে বেদান্তানুরাগী

ভক্তবৃন্দ রবিবার সকালের ও মঙ্গলবারের সান্ধ্য প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছেন।

(৮) অতিথি ও পরিদর্শকবৃন্দ : এই বৎসর ৭৫ জন বিশিষ্ট অতিথি সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৯) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রাধ্যক্ষ ১০০ জনকে সাধন-নির্দেশ দেন।

(১০) সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

স্যানফ্রান্সিস্কোঃ বেদান্ত সোসাইটি : নূতন মন্দিরে : প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং প্রতি বুধবার রাত্রি ৮টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয় : (রবিবারের বক্তা: স্বামী অশোকানন্দ; বুধবারের বক্তা পর্যায়ক্রমে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)।

ফেব্রুআরি : অবচেতন মনকে কিরূপে সংযত করিতে হয়; মৃত্যুর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য; 'যোগ' কি? মধ্য ও দক্ষিণ মার্কিনে বৈদান্ত প্রচার (স্বামী বিজয়ানন্দ) 'ঈশ্বর-দর্শন' বলিতে কি বুঝায়? ধ্যান—মন ও আত্মার উপর তাহার ক্রিয়া; প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে বিচরণ।

মার্চ : মানুষের সার সত্তা ভগবান; নবীনতম অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ; ঈশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা; ভগবানকে কিরূপে ঠিক ঠিক ভালবাসা যায়; পাপী—যিনি পরে সাধু হন; নূতন ধর্ম—আত্মার দ্বারা আত্মার পূজা; বিশ্ব-দৃষ্টি; মন কি অত্যাবশ্যক? শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ।

এপ্রিল : কর্মবাদ ও ঈশ্বরানুগ্রহ; মায়িক সত্তা ও প্রকৃত সত্তা; আত্মা-রূপে নিজেকে ভাবনা কর; দৈনন্দিন জীবনে 'যোগ'; 'আমিই পুনরুত্থান ও অমর-জীবন'; কোন্ শক্তি আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করে, আমাদের 'অহং' কি? উপনিষদ্সমূহ কি শিক্ষা দেয়?

পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে রবিবার বক্তৃতার পর স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। বেদীতে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পূজা হয়, এবং সম্মুখস্থ হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান ধারণা করিতে পারেন।

পুরাতন মন্দিরেঃ প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় শ্রেণীবদ্ধ ধ্যানের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ আলোচনা করেন। রবিবার ব্যতীত অন্যদিন পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। রবিবার বেলা ১১টা হইতে ১২টা শিশুদের সময়।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলিকাতাঃ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ জনকল্যাণে রূপায়িত করিবার জন্য ১৯০২ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত সর্বজন-পরিচিত এই সমিতির ১৯৫৯ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার কর্মধারা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত : প্রচার, শিক্ষা ও সেবা।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক ধর্মসভায় গীতা, চণ্ডী, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি আলোচিত হইয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করা হয়। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতির জন্মদিনে তাঁহাদের জীবনী আলোচনা হয়। সমিতি-ভবনে সভ্যগণ কর্তৃক শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সোসাইটির হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ১০,৯২২ জন রোগীকে ঔষধ এবং

ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ৮ জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে ১৭০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগারে নির্বাচিত ৪,৬৮১ বই আছে, পাঠাগারে ২০টি পত্র-পত্রিকা নিয়মিত আসে।

গত ২৫. ৯. ৫৯ তারিখে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী সমিতি রেজিস্ট্রী করা হয়—ইহাই আলোচ্য বর্ষের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উৎসব-সংবাদ

সিঁথি ঃ (কলিকাতা-২) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৩ই হইতে ১৮ই এপ্রিল ছয়দিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব সিঁথি ডি. গুপ্ত লেনে অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নিরাময়ানন্দ উৎসবটির উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন দিবসে স্বামী সংশুদ্ধানন্দ, স্বামী দেবানন্দ ও স্বামী শান্তিনাথানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, শ্রীবিনয়কুমার সেন, পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এবং শ্রীজীবন-কৃষ্ণ মাইতি ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব-দিবসে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ও শ্রীমতী সত্যবতী রায়চৌধুরাণী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের প্রতিকৃতি সহ পল্লীপরিক্রমায় এক হাজার ভক্ত যোগদান করেন। শেষের দিন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন। বিভিন্ন দিনে ভজন কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়াছিল। তিন হাজার ভক্তকে একদিন বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়।

দেউলপুর (হাওড়া) ঃ গত ২৯শে, ৩০শে এপ্রিল এবং ১লা মে শক্তিপীঠের উদ্যোগে এক যুব কর্মশিবির বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। শিবিরে বিভিন্ন গ্রাম ও প্রতিষ্ঠান হইতে ৬৫ জন ছাত্র ও যুবক যোগদান করেন। শিবিরবাসীরা ঐ তিন দিনে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ পথের সংস্কার করেন। এই শিবিরে বিভিন্ন দিনে সমাজশিক্ষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শেষদিন বিবেকানন্দ-উৎসব-সভায় বলেন বেলুড় মঠ হইতে আগত স্বামী অজানন্দ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিকী

গত ২রা আগস্ট কলিকাতা, বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করিয়া বলেন, বাঙালীর আজ প্রফুল্লচন্দ্রের স্বাবলম্বনের আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানতপস্বী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আদর্শ দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ্‌ ও ছাত্র-দরদী। আচার্যের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ছাত্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারাও আলোচনায় যোগদান করেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহাকে 'সত্যিকারের মানুষ' বলিয়া বর্ণনা করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পুরাতনের পরিবর্তে নূতন রোগ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'ক্ষুদিরামবসু বক্তৃতা' দিতে গিয়া গত ১৯শে জুলাই বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত বলেন ঃ

ভেষজ-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন উন্নত দেশসমূহে মৃত্যুর সাধারণ কারণ স্বরূপ ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, সেপ্সিস্‌ প্রভৃতি রোগ আয়ত্তাধীন হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ আজকাল হৃদ্রোগ, রক্তচাপ, ক্যান্সার, মোটর-দুর্ঘটনা; শেষেরটি শীঘ্রই প্রথম স্থান অধিকার করিবে।

অনেকের মতে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেশী প্রোটিন এবং স্নেহপদার্থ প্রয়োজন, কিন্তু হৃদযন্ত্রের এবং রক্তচলাচলের উপর এগুলির প্রভাব মোটেই স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নয়। এই সকল খাদ্যে ধ্বংসক্রিয়া ত্বরান্বিত করিয়া উচ্চ রক্তচাপ ও থ্রম্বোসিস ডাকিয়া আনে।

ভিয়েনার ডাক্তার ক্রনার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সামান্য প্রোটিন ও স্নেহসংযুক্ত শ্বেতসার (Starch) খাদ্য—ডায়াবিটিস এবং রক্তচাপ দুইই ঠেকাইয়া রাখে।

পরিশেষে ডক্টর সেনগুপ্ত বলেন, এগুলি 'সভ্য' দেশের রোগ, সেখানেও কৃষক শ্রমিকদের এ রোগ বড় একটা হয় না। ভাবাবেগ, মোটর চালানো, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ওঠা বা গাড়ী ধরা, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে এ রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।



তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥

—ঋগ্বেদ

শিল্পী : নন্দলাল বসু

উদ্বোধন

কল্যাণশক্তি কল্যাণী

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥

[দেবীসূক্ত—৭ম শ্লোক]

দম্ভদর্প-অভিমানমাত্রসম্বল নির্দয় ও ক্রূরস্বভাব ত্রিপুরাসুর যখন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল উৎপীড়িত করিতেছিল, ত্রিভুবনের অধিবাসিগণ—দেবতা, মানব ও অন্যান্য প্রাণিগণ যখন অতিষ্ঠ হইয়া পরিত্রাণের জন্য মঙ্গলময় শিবের শরণাপন্ন হয়, শিবও প্রাণিগণের দুঃখদুর্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া অসুর-নিধনে কৃত-সংকল্প, তখন মহামায়া মহাদেবের বাহুতে দিব্য মহাশক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যশক্তি নির্জিত করেন।

সেই কথা স্মরণ করিয়া দেবীর সহিত অভিন্নভাবা অম্ভৃণ ঋষির দুহিতা মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বাক্ বলিতেছেন: জীবদুঃখাসহিষ্ণু রুদ্রের বাহুতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমিই ধনুর জ্যা বিস্তারিত করি, যাহাতে শিব সহজে ও নিশ্চিন্তভাবে বেদবিদ্বেষী—অর্থাৎ সর্ব-প্রকার সদাচার- ও সদ্‌ধর্মবিরোধী অসুরকে নিহত করিতে পারেন। সমষ্টি-কল্যাণের জন্য, অকল্যাণকে ধ্বংস করিবার জন্য, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তিকে জাগ্রত করিয়া জনগণের জন্য আমিই যুদ্ধ করিয়া থাকি। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়া, ত্রিভুবনে সকল প্রাণীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলের অন্তর্যামিনী-রূপে আমিই অধিষ্ঠিত রহিয়াছি।

কথাপ্রসঙ্গে

'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং—'

'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা'······এই শ্লোকার্ধে 'মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যে'র দ্বিতীয় চরিত্র আরম্ভ। দেবাসুরের সংগ্রাম-বর্ণনায় প্রায় সকল পুরাণই মুখরিত! এই দেবাসুর-সংগ্রাম কি প্রাগৈতিহাসিক অর্থে পৌরাণিক? —না গল্পের মতো কাল্পনিক? না কি ইহার মধ্যে কোন গূঢ় আধ্যাত্মিক অথবা মনস্তাত্ত্বিক রহস্য নিহিত আছে? আধুনিক মনের উপযুক্ত কোন সামাজিক সমস্যার স্বরূপ ও তাহার সমাধানের ইঙ্গিত কি ইহার মধ্যে আছে?—যাঁহারা বর্তমান বাস্তববাদী যুগেও চণ্ডীপাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনে এই জাতীয় প্রশ্ন মাঝে মাঝে উঠিয়া থাকে।

এইগুলির একটি মাত্র উত্তর: দেবাসুর-সংগ্রাম নিত্যই হইতেছে—আজ এখানে, কাল ওখানে—কখন ভিতরে, কখন বাহিরে এই সংগ্রাম সর্বদা চলিতেছে। বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন রূপে হইলেও সংগ্রামের প্রকৃতি সর্বত্র প্রায় অপরিবর্তিত। সামাজিক স্তরে, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক রণাঙ্গনে,—সংখ্যাধিক্য, অধিকারবোধ, 'আছে ও নেই'-এর সংগ্রাম (haves and have-nots), সত্য ও ন্যায়ের (truth and justice) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা নামে ইহা দেখা দেয়। সর্বত্র দেখা যায় পরস্পর-বিরোধী সংগ্রামশীল দুইটি দল। পুরাণকার ইহাদের বলিয়াছেন দেবতা-শক্তি ও দানব শক্তি। নীতিশাস্ত্রকার বলিবেন—শুভশক্তি ও অশুভশক্তি। সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিক বলিবেন—ন্যায়ের পক্ষ ও অন্যায়ের পক্ষ। তত্ত্বদর্শিগণ দেখিয়াছেন, বিপরীতমুখী দুই শক্তির মূলে রহিয়াছে একই শক্তি। সেই মহাশক্তিকে ভুলিলেই সত্ত্বরজোগুণাপন্ন দেবতাশক্তি রজস্তমোগুণাপন্ন দানব-শক্তির নিকট পরাজিত হয়।

অসুর বা দানব-শক্তি—দম্ভদর্প, লোভমোহ, কামক্রোধ ও ভোগের প্রতিমূর্তি। অন্যায় উদ্দেশ্যে স্বার্থের আহ্বানে পশুশক্তি সহজেই অন্ধভাবে যূথবদ্ধ হয়, দেবশক্তি জ্ঞানস্বভাব—ন্যায়, নীতি ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত, সহসা অন্যায় করিতে পারে না; সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির বিভিন্নতার জন্য প্রয়োজনকালে সত্বর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতেও পারে না। ফলে অতি সহজেই আসুরিক শক্তি-সংঘাতের নিকট দেবতাশক্তি পরাভূত হয়, এবং সাময়িক ভাবে আসুরিক শক্তিরই বিজয়-পতাকা উড়িতে থাকে।

দেবতাশক্তি কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। উচ্চতর শক্তির সন্ধানে দেবতারা উচ্চতর মনীষা ও পরম জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষে সর্ব শুভশক্তি যখন ঐক্য প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমন্বিত মহা-শক্তির দুর্বার বেগ অসুর-শক্তি সহ্য করিতে পারে না। ঐ মহাশক্তি শুভ ও অশুভ সকল শক্তিরই উৎস, সকল ভাবেরই জননীস্বরূপা; তাই উহা মাতৃপ্রতীকে উপাসিত। মাতৃশক্তির মধ্যেই দুই বিপরীতমুখী শক্তি ও ভাবের সামঞ্জস্য সম্ভব! ঐক্যমুখী শক্তি দ্বারাই সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত হয়। কিছুকাল শান্তি ও সামঞ্জস্য বিরাজ করে, আবার 'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধম্'! এ যুদ্ধ নিত্য নিয়ত চলিতেছে, চলিবে; ইহা পুরাণ বলিয়া পুরাতন নয়, ইহা শাশ্বত সত্য—চিরন্তন।

এই দেবাসুর যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়াই আমরা মহাশক্তিকে স্মরণ করিব, মায়ের পূজায় মিলিত হইব।

মাতৃভাবে উপাসনা

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রত্যেক ধর্মেই মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী-দেবতার ভাব হইতে তাহাদের সমষ্টি পরমেশ্বর-ভাবে উপনীত হইয়াছে, একমাত্র কন্‌ফিউসিয়াস চিরন্তন একটি নীতির কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। মনুদেবতা আহরিমানে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ভারতে পুরাণের গল্প চাপা পড়িয়াছে, তাহার ভাব রহিয়া গিয়াছে। ঋগ্‌বেদেই একটি মন্ত্র পাওয়া যায়, 'অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাম্—'।

মাতৃ-উপাসনা একটি স্বতন্ত্র দর্শন। আমাদের অনুভূত বিবিধ ধারণার মধ্যে শক্তির স্থান সর্বপ্রথম। প্রতি পদক্ষেপে ইহা অনুভূত হয়। অন্তরে অনুভূত শক্তি—আত্মা, বাহিরে অনুভূত শক্তি—প্রকৃতি। এই দুই-এর সংগ্রামই মানুষের জীবন। আমরা যাহা কিছু জানি বা অনুভব করি, তাহা এই দুই শক্তির সংযুক্ত ফল। মানুষ দেখিয়াছিল, ভাল এবং মন্দ—উভয়ের উপর সূর্যের আলো সমভাবে পড়িতেছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ এক নূতন ধারণা—এক সার্বভৌম শক্তি সব কিছুর পশ্চাতে। এই ভাবেই মাতৃভাব উদ্ভূত হইল।

সাংখ্য-মতে ক্রিয়া প্রকৃতির ধর্ম; আত্মা বা পুরুষের নয়। ভারতে নারীর সর্ববিধ রূপের মধ্যে মাতৃমূর্তি সবার উপরে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের পাশে পাশে থাকেন। স্ত্রী-পুত্র মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে, মা কিন্তু কখন সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না। আবার মাতৃশক্তিই পক্ষপাতশূন্য মহাশক্তি। মায়ের স্বচ্ছ স্নেহ প্রতিদানে কিছু চায় না, কিছু কামনা করে না, সন্তানের দোষগুলি গ্রাহ্য করে না—সে জন্য বরং তাহাকে আরও বেশী ভালবাসে। বর্তমানে মাতৃ-উপাসনা উচ্চস্তরের হিন্দুদিগের সাধনার প্রধান অঙ্গ।

যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই 'লক্ষ্য' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। মাতৃ-সাধনায় লক্ষ্য বলিয়া কিছু নাই। সব কিছু মায়ের খেলা, কিন্তু ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। স্বার্থবোধ না থাকিলে দুঃখও আনন্দের অনুভূতি আনিতে পারে, যদি আমরা আমাদের জীবনের সাক্ষী-রূপে পরিণত হই। জগৎ-ব্যাপারের পিছনে একটি শক্তি ক্রিয়াশীল, এই ধারণাই এই ভাবের সাধককে বিস্মিত করে। আমাদের ধারণা—ঈশ্বর মানুষের মতো সসীম ও ব্যক্তিত্বযুক্ত। শক্তির সঙ্গে এক বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার ধারণা আসে। শক্তি বলিতেছেন, 'আমি রুদ্রের জন্য ধনু বিস্তৃত করি, যাহাতে তিনি ব্রহ্মদ্বেষীকে ধ্বংস করিতে পারেন'। উপনিষদে এই ভাবের চিন্তা নাই, বেদান্ত এই

বিষয়ে বেশী অগ্রসর হন নাই—ঈশ্বরতত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি : 'সদসচ্চাহমর্জুন'—আমি ব্যক্ত, আমিই অব্যক্ত ; ভাল মন্দ সবই আমার সৃষ্টি।

এই ভাব কিছু কাল সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে আবার দেখা দেয় নূতন দর্শন। এই জগৎ সৎ ও অসতের সংমিশ্রণ—উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বিশ্বজগতের আংশিক অনুভূতি হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহাও আংশিক মাত্র। সহানুভূতির অভাবে এই ধারণা মানুষকে পশুভাবাপন্ন ও হিংস্র করিয়া ফেলে। এই ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতি পশুর ধর্ম।

সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাপীর বিদ্রোহ পুণ্যবানের বিরুদ্ধে। এই ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিষ্পিষ্ট হইয়া দুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়—তখন আমরা জাগিয়া উঠি এবং মায়ের সত্তা অনুভব করি।

মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাস—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালবাস, কারণ তুমি তাঁহার সন্তান। ভালোয় মন্দে, সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপে অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতদিন এই অনুভূতি না হয়, ততদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।

[নিউইয়র্ক—১৯০০, জুনে প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত লিপির অনুবাদ—C.W.VIII. pp. 252-3

চরৈবেতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার চরণপদ্মে লগ্ন থাক মন
অহোরাত্র। অগ্নিকুণ্ডে ইস্পাত যেমন
হারায় মালিন্য তার—রক্তবর্ণ হয়,
তোমার চিন্তায় যেন আমার হৃদয়
তেমনি ডুবিয়া গিয়া নবজন্ম পায় !
জড়তা চলিয়া গিয়া তোমার কৃপায়
আসুক উৎসাহ-বন্যা। বৃক্ষ-সম আর
কোন্ দুঃখে আঁকড়িয়া রবো এ সংসার ?

ভাসাও জীবনতরী এবার অকূলে !
দিক্‌চক্রবাল পানে যাবো পাল তুলে
কণ্ঠে নিয়ে তব নাম। অজানার জয় !
বন্দরে নির্জীব শান্তি আর নয়, নয় !
তোমারে না পাই যদি, মৃত্যুর ছায়ায়
কেমনে কাটাবো দিন হাসি ও খেলায় ?

'শ্রীশ্রীচণ্ডী'র পটভূমিকা

শ্রী'জ্ঞান'

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥'

চণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ। পূজায় মায়ের মঙ্গলঘট স্থাপনের পরই চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। উহা কোথাও কৃষ্ণপক্ষের নবমী হইতে, কোথাও অমাবস্যা হইতে, আবার কোথাও বা শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিতে হয়। বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও বিবিধ অনুষ্ঠান-সহ মায়ের প্রতিমা পূজার চলন নাই। কিন্তু এই চণ্ডীপাঠ ও চণ্ডীপূজা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। ইহাকে নবরাত্রি-পূজা বলে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের আবির্ভাব কল্পনা করিয়া অমাবস্যা হইতে শুক্লা নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন যে ৺চণ্ডীর পূজা ও পাঠ হয়, উহাকেই নবরাত্রি-পূজা বলে।

চণ্ডী পাঠ ও পূজার ফল দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। যিনি যেরূপভাবে উহা পাঠ করেন, তাঁহার সেইরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। চণ্ডীর আখ্যায়িকা হইতে আমরা উহা বুঝিতে পারি।

চণ্ডীর পটভূমিকার দুইজন নায়ক—সমাধি বৈশ্য ও নৃপতি সুরথ। উভয়েই সর্বস্ব হারাইয়া গভীর অরণ্যে মেধস ঋষির আশ্রমে উপস্থিত। মন কিছুতেই শান্ত হইতেছে না; থাকিয়া থাকিয়া নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির ও বিষয়াদির কথা মনে উঠিতেছে। উহা হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া কি করিয়া শান্তি লাভ করা যায়, ইহাই তাঁহাদের প্রশ্ন। আবার তাঁহারা নিজদিগকে জ্ঞানী বলিয়াও মনে করেন। বৈশ্য তাঁহার বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত সুরথও বহুদিন পর্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিয়াছেন। সংসারে জ্ঞানবান্ বিচক্ষণ পুরুষগণ কি করিয়া মোহগ্রস্ত হন, ইহাও তাঁহাদের অন্যতম প্রশ্ন।

ঋষি ধৈর্যসহকারে তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, তাঁহারা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছেন তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে জ্ঞান বলিলে উহা সকল পশু-পক্ষীতেই সমভাবে বিদ্যমান। উহাদের কেহ কেহ রাত্রে দেখিতে পায়, কেহ বা দিনে, আবার উহাদেরই কেহ কেহ দিনে-রাত্রে সমানভাবে দেখিয়া থাকে। বিচার করিতে গেলে শেষোক্ত প্রাণী মনুষ্য অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান্। পুত্রাদির জন্য সঞ্চয় করিলে যদি জ্ঞানী আখ্যা পাওয়া যায়, তবে পশুপক্ষী প্রভৃতিও এই বিষয়ে মনুষ্য হইতে অধিকতর জ্ঞানবান্। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতামাতার সেবা করিয়া পিতৃমাতৃ-ঋণ শোধ করিবে—এইরূপ সুপ্ত ইচ্ছা মানুষের হৃদয়ে রহিয়াছে। পশুপক্ষী কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, একেবারে স্বার্থরহিত। ভবিষ্যতে তাহাদের শাবকগণ তাহাদিগকে পালন করিবে কি না করিবে, এরূপ কোন চিন্তাই তাহাদের মনে আসে না। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও অতিকষ্টে সংগৃহীত খাদ্য তাহারা শাবককে দিয়া তাহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করে। এ বিষয়েও তাহারা মনুষ্য হইতে অধিক জ্ঞানী।

কিন্তু এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। যথার্থ জ্ঞান মহামায়ার কৃপা ব্যতীত কখনই লাভ করা যায় না। মহামায়াই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, আবার প্রয়োজন হইলে সর্বজগৎ নিজের ভিতর সংহরণ করিয়া তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। তিনিই অজ্ঞানীকে সংসার-বন্ধনে ফেলেন; আবার

শরণাগত সাধকের সকল অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া তিনি জ্ঞানের জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় উদ্ভাসিত করেন। মানুষের কি কথা, দেবতারাও বহুবার এই অজ্ঞানে পড়িয়াছেন, এবং যখনই কায়মনোবাক্যে একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছেন, তখনই তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের সর্ববিধ অভাব দূর করিয়া দিয়াছেন। এই মহামায়ার উৎপত্তি বা বিনাশ কিছুই নাই। তিনি শাশ্বত, নিত্য। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি উৎপন্না হইয়াছেন, বলা হয়।

তিনি এইরূপে বহুবার আবির্ভূতা হইয়াছেন—কখন সাত্ত্বিকী মূর্তিতে, কখন বা রাজসী, আবার কখনও তামসী মূর্তিতে। সৃষ্টির প্রাক্কালে মধু-কৈটভ দৈত্য-সংহারের পূর্বে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা-রূপে তামসী মহাকালীরূপে তিনি বিরাজমানা। সৃষ্টির মধ্যমে মহালক্ষ্মী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, দেব-মানব-পীড়ক মদোন্মত্ত মহিষাসুরকে বধ করিয়া তিনিই জগৎপালন করেন। আবার কল্পান্তে যখন শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি অসংখ্য দৈত্য সমস্ত জগৎ ছাইয়া ফেলে, তখন দেবতাদের প্রার্থনায় দৈত্যদিগকে দমন করিয়া দেবতা এবং দৈত্যগণকেও তিনি পরম জ্ঞান প্রদান করেন।

মা তাহাদিগকে দেখাইলেন যে জগতে একমাত্র তিনিই রহিয়াছেন, আর দ্বিতীয় কেহই নাই। যে সকল শক্তিমূর্তি তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া এতক্ষণ শুম্ভ নিশুম্ভ বা তাহাদের অনুচরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাতে প্রবেশ করিলেন। মা বলিলেন, তোমাদের রক্ষার জন্য আমি বিভূতি-সমন্বিত হইয়া যে সকল মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, যখন তোমাদেরই জ্ঞানের জন্য সেগুলি আমার ভিতরে সংগ্রহ করিলাম। আমি এক হইয়াও লীলার্থে এইরূপে বহু রূপ গ্রহণ করি—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

এইরূপে তিনি দেবগণের প্রার্থনায় পুনঃ পুনঃ এই সংসারে আবির্ভূতা হইয়া দেবতা ও মর্ত্যগণের সকল বাধা দূর করিয়া তাহাদের অভীষ্ট প্রদান করিয়াছেন।

এইভাবে চণ্ডীর বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিলেন, হে বৈশ্য, হে রাজন্, তোমরাও তাঁহাকে একান্তভাবে আহ্বান কর। তোমাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া অচিরে তিনি তোমাদিগকেও তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করিবেন।

ঋষির কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা উভয়ে নির্জন নদীতীরে যাইয়া সংযতচিত্তে দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজার্চনা করিলেন। তিন বৎসরান্তে মা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীপ্সিত বর চাহিতে বলিলেন। রাজা সুরথ তখন তাঁহার ভ্রষ্ট রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু বৈশ্যের তখন পরম নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আর তিনি দ্বেষবুদ্ধিপূর্ণ সংসারে ফিরিতে চান না, যে মমত্ব-বুদ্ধির জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সংসারে আসিতে হইতেছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যাহাতে তিনি বিমল জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহাই শ্রীশ্রীমহামায়ার নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করিলেন।

সর্বসিদ্ধিদাত্রী মাতা 'তথাস্তু' বলিয়া উভয়কে নিজ নিজ ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

এইরূপে সুরথ ও সমাধি সকাম ও নিষ্কাম ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিলেন। যে কোন মনুষ্য শরৎকালে তাঁহার মহাপূজা করিবেন ও ভক্তি-সমন্বিত হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তাঁহারও সকল বাধা তিনি নিজ হস্তে অপসারিত করিয়া নিজ নিজ অভীষ্টানুযায়ী ধন-ধান্যাদি সম্পদ প্রদান করিবেন,—চণ্ডীতে ইহাও তাঁহার মহা আশ্বাস-বাণী।

চলার পথে

'যাত্রী'

মা আসছেন। কে মা? যিনি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রাণ-সত্তাকে জাগ্রত ক'রে দিয়েছেন—সেই মা! যাঁর স্নেহে আমরা জগতের এই সৌন্দর্য-মেলায় চোখ মেলতে পেরেছি, যাঁর কল্যাণস্পর্শে আমরা উন্মুখ হ'তে পেরেছি সত্যের সন্ধানে, যিনি তাঁর পীযূষ-ধারায় সঞ্জীবিত করেছেন আমাদের অন্তরাত্মার চৈতন্যসত্তাকে—সেই মা!

কিন্তু তা বুঝি না কেন? সেটুকু বুঝবার আগে এই বিশ্বমাতৃত্ব শুধু নয়, এই জীব-মাতৃত্বের অপূর্বতাটুকুও কি ঠিক ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছি? লক্ষ্য করেছি কি—এই জীব-মাতৃত্ব তাঁর নিজস্ব-সত্তার নিছক অভিব্যক্তি নয়—ঈশ্বরীয় সত্তার প্রতিভূ? ঈশ্বর বোধ হয় তাঁর করুণাঘন, কল্যাণ- ও কৃপা-শক্তির সবখানিই নিখিল মাতৃহৃদয়ের অমৃত-ভাণ্ডে নিঃশেষে সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন। তাইতো প্রতিটি মাতৃমূর্তিতে এত করুণা, এত কৃপা, এত কল্যাণ! এই কল্যাণের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে—সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা, নিষ্কামতা। তাই নিদ্রার মাঝেও বাহুবেষ্টনীর স্নেহ-পরশ দিয়ে জননী তনয়কে আগলে রাখেন। মায়ের সুষুপ্তিতেও বোধ হয় সন্তানের মঙ্গল-কামনা ব্যাহত হয় না!

ইতর প্রাণীর মধ্যেও ঐশ্বর্যহীন মাতৃত্বের যে মধুর প্রকাশ দেখতে পাই, তারই বা তুলনা কোথায়? ঐ দূরে যে গাভীটি তার বৎসকে পরমস্নেহে কাছে টেনে এনে তার গাত্রলেহন করছে, ঐ যে গাছের ওপরে জীর্ণ বাসায় কাকটা পরম আদরে তার শাবকের মুখে কি সব খাদ্য পুরে দিয়ে গেল, ঐ যে চিল আসছে ব'লে নীলকণ্ঠ পাখিটা তার ছানাটিকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও চিলের পেছনে আর্তস্বরে তাকে তাড়া করতে ছুটল, ঐ যে বিড়ালটি অতি সন্তর্পণে তার বাচ্চাটিকে নিভৃত ও নিরাপদ কোণে লুকিয়ে রাখতে চলেছে, ঐ যে পিপীলিকার শ্রেণী ডিম মুখে ক'রে চলেছে তাদের ভাবী সন্তানদের কোন নিরুপদ্রব আবাস সন্ধানে—এ সবের পেছনেও তো নিরাভরণ মাতৃত্বের অকুণ্ঠ স্নেহ সদাই ক্ষরিত হচ্ছে—দেখতে পাই। তাই মা হচ্ছেন আমাদের ভয়ের মাঝারে অভয়, আঁধারের মাঝে আলো, জীবনের কুহেলিময় দিগ্‌বিভ্রমে সঠিক পথের দিশারী।

এই ব্যষ্টি-মাতৃত্বের সমষ্টি রূপ নিয়ে বিশ্বমাতৃরূপী ঐ মা আসছেন। আমাদের সবাকার মাতৃচিন্তার প্রতীক,আমাদের সমগ্র মাতৃত্বানুভূতির প্রকাশময়ী শিখা, আমাদের সকল শক্তি-তত্ত্বের স্পন্দনময় শিল্প-রূপকেই তো আমরা ধরেছি আমাদের গড়া ঐ আপাত-স্থিতিশীল মাটির রূপটিতে। আবার এঁরই মাঝে আমাদের মহাজ্ঞানের একীভূত ভাব-তন্ময়তার তদ্‌গত মাতৃ-মূর্তিও ধরা পড়েছে। এই মাকে অবলম্বন করেই তো আমাদের প্রত্যক্ষোপলব্ধির চিন্ময়রূপ বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে। তাইতো এই মৃন্ময় আধারে সেই চিন্ময়ের অসীম বিশ্বময় ঘনীভূত শক্তিকে আমরা মাতৃরূপে আহ্বান করতে এসেছি। নিখিল বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির মাঝেই তো মায়ের দৃষ্টি অতন্দ্ররূপে জাগ্রত। তাঁর সেই সৃষ্টির একটুখানি মাটি সংগ্রহ করেই তো আমরা আমাদের মাকে গড়েছি।

মাকে ধরেই আমরা সকল ছেলে এক। মাতৃত্বের নামেই আমাদের সমতা। তাইতো মায়ের নামে আমাদের মধ্যে স্বতই আসে উদার মনোভাব। আমরা তাঁর আহ্বানেই নশ্বর জীবনের ভূমি ছেড়ে ভূমার কল্পনায় মাততে পারি। মাকে মর্যাদা-দানের মাধ্যমেই আমাদের মনে

স্বকীয় মর্যাদা ভাস্বর হ'য়ে ওঠে। ঋগ্‌বেদের সেই "কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্" (বিশ্বমানবকে আর্য-ভাবে ভাবিত কর) মায়ের প্রভাবেই আমাদের মাঝে বাণী রূপ পায়। মাতৃত্বের মধুর সম্বন্ধ ধরেই তো আমরা আমাদের খণ্ডতার সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার আনন্দ-ঘন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে মিলিত হ'তে ছুটি। যে মিলনে কোন ভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই, বিবাদ নেই, বিসম্বাদ নেই—নেই কোন তামসিক শাসনও। সকল দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে এক আশ্চর্য বিশ্ববোধে তখন আমরা একই সঙ্গে মাতৃপ্রেমে অবগাহন করি।

সমন্বয়ের প্রজ্ঞা-চক্ষু তো আমরা মাতৃহৃদয়ের সমতার মধ্য থেকেই পেয়েছি। তাইতো এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্বে আমরা মাকে স্মরণ ক'রে গাইতে পারি—'সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি'—সকলের মন এক হোক্‌, সমান সমিতি হোক্‌, সকলেই এক উদ্দেশ্যে সমবেত হোক্‌। মাতৃমন্ত্রের পরিপূর্ণতার ভাগীরথী-প্রবাহে অভিস্নান করেই তো আমরা একে অন্যকে সুসংহত ঐক্যে আলিঙ্গন ক'রব—মরণহীন জীবনের রস-চেতনার আনন্দ দিয়ে ও আস্বাদন নিয়ে। বিশ্বাত্মবোধের এই সর্ব-সম্ভাষণের মাঝেই তো মাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলতে পারি: এই ত্রিভুবনে তোমার সমানই আর কেউ নেই, মা! তোমার চেয়ে অধিক আর কে থাকবে?

মাতৃরূপ সকল রূপের সেরা। তাইতো সাধক 'মা, মা' ক'রে পাগল। এই মাতৃরূপের সবখানিই পারমার্থিক, সবটুকুই চিন্ময়; জড় প্রকৃতির বিকার এখানে নেই। এখানে যা আছে তা দিব্য, উজ্জ্বল, ভাস্বর। মাতৃত্বে রজস্তমোগুণের কোন আবরণ নেই, আছে শুদ্ধ সত্ত্বময়তার দীপ্তি। তাই এই মাতৃরূপ অনন্ত, অলৌকিক, অপরিচ্ছিন্ন। মায়ের এই আশ্চর্যরূপ আবার 'বিশ্বতোমুখ' অর্থাৎ যে দিক দিয়েই দেখি না কেন, সব সময়েই মায়ের পূর্ণরূপ প্রতিভাসিত, পরমজ্যোতিতে সমুদ্বেলিত দেখতে পাবো।

মা তাঁর মহাজ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে সাধকদের অনেককেই দেখা দিয়েছেন। মাতৃ-অঙ্গের এই কান্তিতেই তো কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত—'যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিঃ' তাঁর আগ্নেয় সত্তার দ্যুতিতেই বিশ্বজগৎ পরিপ্লুত, তাঁর আলোতেই সব কিছু আলোময়—'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। মাতৃমূর্তির এই বিশ্বরূপ ধ্যানগম্য। 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'—একে ব'লে বোঝানো যায় না; নিজস্ব অনুভবের প্রতীক্ষা করে। বিশ্বের আলোক-ধারার এই একীভূত বহ্নি-বীজ—এই মাতৃমূর্তি—সত্যই অমৃত-খনি। এঁকে দর্শন করলে আর কিছু দর্শন করবার থাকে না। সেই শ্রেষ্ঠ দর্শনের উদ্দেশ্যে আজ কোটি কোটি প্রণাম।

চল, পথিক। শরতের এই রৌদ্রোদ্ভাসিত শীতোষ্ণ সমীরণে মনের সকল চাহিদা মেটাতে মায়ের কাছে যাই চল। চল, মায়ের পূজানুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় আমাদের নীচ প্রবৃত্তিগুলোর অগ্নিসংস্কার ক'রে নিই। চল, বৎসরের এই শুভদিনে আমাদের অন্তরের আনন্দঘন হৃৎ-পদ্মটিকে উর্ধ্বায়িত ভাবধারার মাঙ্গলিক সৌরভে ফুটিয়ে নিই। চল এই পথে, এই মাতৃ-আহ্বানের পথে—যে পথে অস্বাভাবিকতা নেই, কুণ্ঠা নেই, জড়তা নেই—নিয়ম-নিগড়ে নিষ্পেষিত আত্মার দীর্ঘশ্বাস নেই—যেখানে মানব-মনের চিরন্তন আকৃতি ভারমুক্ত হ'য়ে গেছে। তাই বলি, চল পথিক, মায়ের আরাধনায় নিজস্ব জীবন প্রতিষ্ঠা ক'রে নিতে চল। চল, চল মা যে ডাকছেন। আর দেরী নয়, চল।

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

সোমপায়ীর গান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(ঋগ্‌বেদ, ১০ম মণ্ডল—১১৯ সোমসূক্ত পাঠের অনুসরণে)

মনে হয় অরিজনে করি আজ ক্ষমা,
ভুলে গিয়ে রাগ-রোষ ক্ষোভ-দ্বেষ জমা।
মনে হয় উঁচু নীচু সবাই সমান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় আজ মোর সকলেই ভাই।
কারো সাথে মোর আর দ্বেষা-দ্বেষি নাই।
মনে হয় মোর সবই ক'রে দিই দান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে পড়ে যত কিছু করিয়াছি পাপ,
সে সবের তরে মোর হয় অনুতাপ।
করিয়াছি আমি যেন অমৃতে সিনান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় মোর ঠাঁই সকলের নীচে,
আমি কবি এ কথাটা আগাগোড়া মিছে।
বড় ভুল করিয়াছি পুষি অভিমান,
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় এ জগতে সুত মিত জায়া
যাহাদের মোহে মজি, সবি তারা মায়া।
মনে হয় কে আমারে করিছে আহ্বান।
আমি কি করেছি সোম পান?

মনে হয় আমি যেন এ ধরার নই,
কার অভিশাপে যেন হেথা আমি রই।
হ'ল কি আমার আজ শাপ অবসান?
আমি কি করেছি সোম পান?

অথর্ববেদে পৃথিবী-স্তুতি

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

[পৃথিবীস্তুতি অথর্ববেদের দ্বাদশ খণ্ডের প্রথম সূক্ত। ইহাতে ৬৩টি মন্ত্র আছে। ভাবগৌরবে, এবং অর্থমাধুর্যে ইহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক ইহার সাবলীল অনুবাদ করিয়াছেন। লেখকের রচিত ঋগ্‌বেদ (প্রথম অষ্টক)-এর অনুবাদ সমালোচকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। উঃ সঃ]

১। পৃথিবীকে ধারণ করে সত্য, বৃহৎ, ঋত, শক্তি, দীক্ষা, তপস্যা, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ। ভূত কালের তিনি সম্রাজ্ঞী—ভাবী কালেরও তিনি অধীশ্বরী। সেই বরণীয়া জননী আমাদিগের জন্য বিস্তীর্ণ লোক প্রকাশিত করুন।

২। পৃথিবীতে রয়েছে বহু উচ্চাবচ ভূমি, রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল, পৃথিবী বীর্যদ নানা ওষধীকে পোষণ করে—মানুষের মাঝে যে বাধা, সে বাধা তাকে পীড়ন করে না, সেই পৃথিবী প্রশস্ততরা হ'ক, প্রিয়তরা হ'ক।

৩। যেখানে রয়েছে সমুদ্র, নদনদীর জলধারা, যেখানে নানাবিধ অন্ন বিরাজমান, যেখানে নব নব সভ্যতার পত্তন, যেখানে প্রাণের চঞ্চল লীলাবিলাস, সেই ভূমি আমাদিগকে দিন প্রচুর পানীয়।

৪। যে পৃথিবীর চারিটি দিক্, যেখানে অন্ন ও সভ্যতার নব নব বিস্তার, যিনি বহুবিধ প্রাণীকে পালন করেন, সেই পৃথিবী আমাদিগকে দিন গোধন এবং অন্যান্য সম্পদ্।

৫। যে পৃথিবীতে চলেছে পূর্বজদের জীবনলীলা, যেখানে দেবতারা অসুরদের করেছেন পরাজিত, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বিধান করুন গো, অশ্ব এবং পক্ষিকুল; দান করুন সৌভাগ্য এবং প্রজ্ঞার জ্যোতি।

৬। যে বসুধা বিশ্বম্ভরা, ধনদাত্রী, সর্বপ্রতিষ্ঠা, যাঁর বক্ষে হিরণ্য, সর্ব জীবজগতের নিবাসভূমি, অগ্নিবৈশ্বানরের ধারিণী—যিনি ঋষভ ইন্দ্রের সঙ্গিনী সেই ভূ-জননী আমাদিগকে দিন সকল ঐশ্বর্য।

৭। যাঁকে অতন্দ্র দেবগণ অ-প্রমাদের সঙ্গে সর্বদা রক্ষা করেন, সেই পৃথিবী আমাদের জন্য প্রিয় মধু দোহন করুন, আর আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যার জ্যোতিতে ভাস্বর করুন।

৮। যে পৃথিবী অগ্রে অর্ণব সলিলে মগ্ন ছিলেন, যাঁকে মনীষীরা মায়ার সহায়ে আবিষ্কার করেছিলেন, পরম ব্যোমে রয়েছে যাঁর হৃদয়, যা সত্যে আবৃত, অমৃতময়, সেই পৃথিবীভূমি দিন আমাদের লাবণ্য এবং বীর্য, দিন আমাদের উত্তম রাষ্ট্র।

৯। যেখানে অহোরাত্র বিবিধ সলিলধারা নিরন্তর ক্ষরিত হচ্ছে, সেই ভূমি দোহন করুন আমাদের জন্য ভূরি পয়োধারা, অভিষিক্ত করুন মস্তক বিদ্যার বিমল জ্যোতি দ্বারা।

১০। অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাঁকে পরিমাপ করেছিলেন, বিষ্ণু যেখানে বিচরণ করেছিলেন, শচীপতি ইন্দ্র যাঁকে পরম আত্মীয় ব'লে মেনেছিলেন, সেই ভূমিমাতা আমার জন্য বর্ষণ করুন ক্ষীরধারা।

১১। তোমার তুষারমৌলি পর্বত-শ্রেণী, তোমার গভীর অরণ্য হ'ক আমাদের বন্ধু, তোমার নানা বর্ণ—কোথাও কৃষ্ণ, কোথাও ধূসর, কোথাও লোহিত—ইন্দ্ররক্ষিতা সেই ধ্রুবা পৃথিবীতে অজিত, অক্ষত, অহত হ'য়ে আমি অধিষ্ঠান ক'রব।

১২। তোমার যা মধ্য, তোমার যা নাভি, সেখানে আমাদের স্থাপন কর; তোমার শরীরে যে মহৎ বীর্য, তা দিয়ে আমাদের সবল কর;

আমাদের জন্য তুমি পবিত্র হও। হে ভূমি, তুমি আমাদের মাতা, আমরা তোমার পুত্র; পর্জন্য আমাদের পিতা—তিনিও আমাদের রক্ষা করুন।

১৩। যে ভূমিতে পুরোহিত বেদী রচনা করেন, যেখানে বিশ্বকর্মা সাধকেরা যজ্ঞ বিস্তার করেন, যেখানে আহুতির পুরোভাগে উন্নত এবং উজ্জ্বল যজ্ঞকাষ্ঠ বিরাজমান থাকে, সেই ভূমি বর্ধমান হ'য়ে আমাদের বিবর্ধিত করুন।

১৪। যে আমাদের দ্বেষ করে, যে আমাদের সাথে যুদ্ধ করে, যে মনে মনে আমাদের হিংসা করে, আমাদের মনের প্রার্থনা জেনে হে পৃথিবী, তাকে তুমি আমাদের অধীন কর।

১৫। মর্ত্য জীব তোমাতে জাত হ'য়ে তোমার উপর বাস করে, দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ—উভয়কেই তুমি পালন কর, হে পৃথিবী! মানুষের পঞ্চ জাতি তোমারই সন্তান, যাদের উপর উদীয়মান অরুণ আপন কিরণজালে অমৃত জ্যোতি বর্ষণ করে।

১৬। সমগ্র মানব-জাতি—আমাদের জন্য বর্ষিত হ'ক প্রীতির ক্ষীরধারা, হে পৃথিবী, তুমি আমার বাক্যে দাও গভীর মধুরতা।

১৭। এই বিপুলা পৃথ্বী সকল ওষধীর মাতা, ধ্রুবা এবং ধর্মে ধৃতা—কল্যাণী এবং শান্তিময়ী ধরণীর মাঝে আমরা যেন চিরজীবন আনন্দে বাস করি।

১৮। মহামিলনভূমি, তুমি মহীয়সী, মহান্‌-বেগে তুমি চঞ্চল, চিরকম্পিত তোমার অঞ্চল, ইন্দ্র তোমার চিরন্তন রক্ষাকারী, হে ধরিত্রী! হিরণ্যের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের দীপ্ত কর, কেউ যেন আমাদের ঘৃণা না করে।

১৯। অগ্নি আছেন ভূমিতে, আছেন ওষধীতে, সলিলে অনল-দ্যুতি, প্রস্তরে অগ্নির বিভূতি, অগ্নি পুরুষের অন্তরে, গো এবং অশ্বের মাঝেও দেখি হুতাশনকে।

২০। অগ্নি আকাশ থেকে দেন উত্তাপ, দিব্যহুতাশনে পরিব্যাপ্ত বিরাট অন্তরীক্ষ, হব্যবাহন ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে মর্ত্য মানুষ প্রতিদিন জ্বালেন ইন্ধনে।

২১। কৃষ্ণজানু অগ্নিবাস ধরাতল আমাকে করুন উজ্জ্বলদী এবং সতর্কচক্ষু।

২২। পৃথিবীর বুকেই চলে মানুষের যজ্ঞায়োজন, সেখানেই মানুষ ঢালে তার হব্য, মর্ত্য মানুষ এই ভূমিতেই অন্ন এবং সেবার দ্বারা বেঁচে থাকে।

২৩। তোমার রয়েছে যে সৌরভ—ওষধী এবং জলে যার জন্ম, গন্ধর্ব এবং অপ্সরারা যা উপভোগ করে, সেই গন্ধে আমায় সুরভিত কর, কেউ যেন আমায় হেলা না করে।

২৪। পদ্মে লুকানো তোমার যে সৌরভ, সূর্যার বিবাহে দেবতারা যে সৌরভ সংগ্রহ করেছিলেন, তোমার সেই গন্ধে আমায় সুগন্ধি কর, কেউ যেন আমায় হেলা না করে।

২৫। তোমার যে গন্ধ পুরুষে, তোমার যে রুচি এবং লাবণ্য স্ত্রী-পুরুষে, অশ্বে এবং বীরপুরুষে, মৃগে এবং হস্তীতে, কন্যায় যে সুষমা, সে সব দিয়ে এই পৃথিবীতে আমাদের সমৃদ্ধ কর।

২৬। শিলা, প্রস্তর ও ধূলিতে গড়া ভূমি, তাদের সম্মেলনে ধৃতা ধরিত্রী। হিরণ্যবক্ষা সেই পৃথিবীকে করি নমস্কার।

২৭। যেখানে বিপুল বনস্পতি ধ্রুব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই বিশ্বপালিকা ধরণীকে জানাই গভীর আহ্বান।

২৮। উঠতে গিয়ে, বসে পড়তে, দাঁড়িয়ে থাকতে কিংবা চলতে গিয়ে আমরা যেন ডান কি বাঁ পায়ে না পাই কোন ব্যথা।

২৯। পবিত্রা পৃথিবীর সাথে বলি কথা, তপস্যায় বর্ধমান ভূমিকে জানাই প্রাণের ব্যথা,

জননী তোমার কোলে বাঁধব অক্ষয় বাসা, তুমি যে দাও উর্জ্জ, পুষ্টি, দাও ঘৃত এবং অন্নের আশা।

৩০। শুদ্ধ সলিলধারা আমাদের তনুকে করুক মালিন্যমুক্ত, অপ্রিয় জনের দেহ আমাদের গাত্রমলে হ'ক লিপ্ত, হে পৃথিবী! পবিত্র সলিলে নিজেকে ক'রব শুচি এবং পবিত্র।

৩১। যখন চলব তোমার বুকে তখন যেন হে জননী! তোমার প্রাচী ও প্রতীচী, তোমার উদীচী ও অবাচী হয় প্রিয় ও রমণীয়, তোমার ভুবনে বেঁধেছি বাসা, না থাকে যেন মা, পতনের আশা।

৩২। পশ্চাৎ হ'তে কিংবা পুরোভাগ হ'তে, উত্তর থেকে কিংবা অধঃ থেকে যেন না হয় নির্বাসন, হে ভূমি, তুমি দাও পরম স্বস্তি, শত্রু যেন না পায় দর্শন—দূরে রাখ তাদের বধাস্ত্রের স্পর্শন।

৩৩। যতদিন দেখি তোমার মধুর মূর্তি, সূর্য যতদিন দেয় স্ফূর্তি, ততদিন যেন থাকে প্রখর দৃষ্টি, বর্ষের পর বর্ষ যত হয় সৃষ্টি।

৩৪। যখন শুয়ে থাকি, যখন ডাইনে বাঁয়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করি, উত্তান অবস্থায় যখন আমরা আমাদের পঞ্জরে তোমার উপর চাপ দিই, তখন যেন হে পৃথিবী, তুমি আমাদের অতি নিকটে থেকে আমাদের হিংসা না কর।

৩৫। যা খনন করি তা যেন ক্ষিপ্র আহরণ করি, যেন খননে তোমার হৃদয় এবং মর্ম বিদারণ না করি।

৩৬। হে ভূমি জননী, তোমার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত ঋতুসকল তোমার বিহিত বর্ষসকল, তোমার দিনরাত্রি আমাদের জন্য ক্ষীরধারা আনুক।

৩৭। পবিত্র মহী, সর্পভয়ে ভীতা, যাহার সলিলে বাড়বানল, যিনি নিন্দুক দস্যুকে বিনাশের জন্য অর্পণ করেন, যিনি বৃত্রের বিরোধী এবং ইন্দ্রের সহায়, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নেন।

৩৮। যাঁর উপর হবির্ধান শকট, যাঁর বুকে যূপকাষ্ঠ প্রোথিত, ঋক্ যজুঃ সামে যেখানে দেবতার অর্চনা চলে, ইন্দ্রকে সোম পান করাবার জন্য যেখানে ঋত্বিকেরা আমন্ত্রিত হয়,

৩৯। প্রজাপতি ঋষিরা যেখানে গানে গানে আলোকের উৎসারণ করেন, সপ্ত ঋষি যেখানে সত্র অনুষ্ঠান করেন, যেখানে যজ্ঞ ও তপস্যার সমারোহ,

৪০। সেই পৃথিবী—যে ধন আমরা কামনা করি তাই আমাদের দিন, ভগ আমাদের সৌভাগ্য বর্ধন করুন। ইন্দ্র আমাদের পুরোধা হউন।

৪১। যেখানে মানুষেরা নাচে এবং গায়, যেখানে চলে সংগ্রাম, বাজে দুন্দুভি, সেই পৃথিবী শত্রু নিধন ক'রে আমাদের অসপত্ন করুন।

৪২। যেখানে অন্ন, ব্রীহি এবং যব, যেখানে পঞ্চ জাতির বাস, পর্জন্যপত্নী বৃষ্টিপরিপুষ্টা সেই পৃথিবীকে নমস্কার।

৪৩। দেবতারা যাঁর বুকে বিচিত্র পুর নির্মাণ করেছেন, প্রজাপতি বিশ্বগর্ভা তাঁর প্রত্যেক প্রদেশকে আমাদের প্রিয় ক'রে তুলুন।

৪৪। যাঁর গুহায় রয়েছে বহু নিধি, সেই পৃথিবী আমাদের দিন হিরণ্য, মণি এবং বসু, বসুধা বসুদা, দয়াবতী তিনি সুপ্রসন্ন হ'য়ে দিন আমাদের ধনসম্পদ্।

৪৫। পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষাভাষী মানুষের বাসা, তাদের নানা ধর্ম, নানা আচার, সেই পৃথিবী সহস্রধারায় অফুরন্ত দুগ্ধবতী গাভীর মতো আমাদের জন্য ধন দোহন করুন।

৪৬। সর্প ও বৃশ্চিক তৃষিত দংষ্ট্রায় শীতে অসাড় হ'য়ে গুহায় থাকে ঘুমিয়ে, প্রাবৃট্ কালে ক্রিমি ইত্যাদি যা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, সেই সব সরীসৃপ যেন আমাদের উপর যাতায়াত না

করে—মঙ্গল যাহা, কল্যাণ যাহা, তাই দিয়ে তুমি প্রসন্ন হও।

৪৭। তোমার যে-সব বহুবিচিত্র পন্থা, রথ ও শকটের মার্গ, সেই পথ দিয়ে চলে ভদ্র এবং পাপী, সেই পথ যেন আমরা জয় করতে পারি—শত্রুহীন ও তস্করহীন করতে পারি। যা শিবময় তাই দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ কর।

৪৮। পৃথিবী ভদ্রকে আশ্রয় দেয়, অভদ্রকেও করে পালন, পাপ ও পুণ্যের নিবাসকে মেনে নেয়—পৃথিবী বরাহের সঙ্গিনী হ'য়ে বরাহাবতারকে করে আলিঙ্গন।

৪৯। হে পৃথিবী, আমাদের কাছ থেকে দূর কর তোমার আরণ্য পশু—বনবাসী জন্তু, নরখাদক সিংহ ও ব্যাঘ্র, দূর কর উল এবং বৃক, দূর কর দুর্ঘটনা এবং অনিষ্ট, পরাভূত কর রাক্ষস।

৫০। গন্ধর্ব, অপ্সরা, পিশাচ এবং রাক্ষস—প্রভৃতির উৎপাত থেকে বাঁচাও আমাদের হে পৃথিবী!

৫১। যার উপর দ্বিপদ পক্ষীরা সমবেত হ'য়ে উড়ে পড়ে, হংস সুপর্ণ শকুন এবং বায়স বিচরণ করে, সেখানে মাতরিশ্বা ধূলায় ঝড় উড়ায়, তরু-শির কাঁপায়, বাতাস যেমন এদিক ওদিক চলে, আগুন জ্বলে তেমনই।

৫২। যে পৃথিবীতে শুক্ল দিবস এবং কৃষ্ণ রাত্রি বিহিত হয়েছে, বারিবর্ষণে যে পৃথিবী পরিপ্লাবিত, সে পৃথিবী তার প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমাদিগকে প্রিয়তম ধামে ধামে রাখুন।

৫৩। দ্যৌ, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ আমাকে দিয়েছেন বিশাল বিস্তার; অগ্নি, সূর্য, অপ্ এবং বিশ্বদেবগণ আমাকে দিয়েছেন বিপুল মেধা।

৫৪। আমি পরাক্রান্ত, এই পৃথিবীতে সর্বোত্তর আমার নাম, বিজয়ী আমি বিশ্বজয়ী, সমস্ত দিক্ বিজয় ক'রে আমি দিগ্বিজয়ী।

৫৫। হে দেবি, দেবতারা যখন প্রথমানা তোমাকে 'পৃথিবী' নাম দিয়েছিলেন, তখন তুমি তোমার মহিমা বিস্তার করেছিলে—তখন ভূতি ঐশ্বর্য তোমায় ঘিরেছিল এবং তুমি চারিদিক্ কম্পিত করেছিলে।

৫৬। গ্রামে এবং অরণ্যে, সভায় এবং সমিতিতে যা রয়েছে, পৃথিবীর বুকে সেখানে যেন আমরা তোমায় অভিনন্দন করি।

৫৭। অশ্ব যেমন ধূলি উড়ায়, পৃথিবী তেমনই অধিবাসী জনগণকে বিপর্যস্ত করে (মাঝে মাঝে)—পৃথিবী সুন্দরী নেত্রী, বনস্পতি এবং ওষধীর ধারিণী।

৫৮। যে কথা বলছি তা মধুময় ক'রে বলছি, যা দেখছি তা আমায় সমাদর করছে, দ্যুতিমান্ আমি, ধীমান্ আমি, যারা আমায় প্রতিহত করে, তাদের আমি বধ করি।

৫৯। শান্ত সুগন্ধি, প্রসন্না, ক্ষীরধারাময়ী পয়স্বতী পৃথিবী আমাকে বীর্যবান্ ও সাহসী করুন।

৬০। বিশ্বকর্মা যাকে হবির্দানে অন্বেষণ করেছিলেন, যখন পৃথিবী অন্তরীক্ষের অর্ণবে প্রবেশ করেছিল, সব ভোগদায়িনী গুহানিহিতা সেই পৃথিবী দেবগণ এবং মাতৃগণের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

৬১। তুমি মানুষকে দিকে দেশান্তরে ছড়িয়ে দাও, তুমিই কামদুঘা অদিতির মতো বিস্তারিত হ'য়ে চলেছ, ঋতের প্রথমজাত পুত্র প্রজাপতি—তোমার যা কিছু অভাব দূর ক'রে দেবেন।

৬২। রোগহীন, ব্যাধিহীন ক'রে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দাও হে জননী! আমাদের দাও দীর্ঘ আয়ু, আমরা যেন প্রতিবোধদীপ্ত হ'য়ে চিরজীবন তোমার বলি আহরণ করি।

৬৩। ভদ্র এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ভূমিতে আমায় স্থাপন কর হে পৃথিবী! পিতা দ্যুলোকের অনুকম্পায়—হে জ্ঞানময়ী মাতা! দাও তুমি আমাকে পরমা শ্রী এবং অবিচলা ভূতি।

ভক্তিপ্রসঙ্গে*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দিন নয়, যেদিন আমরা হরিকে ভুলে থাকি সেই দিনই আসল দুর্দিন।

উপনিষদে আছে—শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে জানলে সব জানা যায়? গুরু বললেন, আত্মা বা ব্রহ্মকে জানলেই সব জানা যায়। এ একটু একটু ক'রে জানা নয়, পূর্ণ জ্ঞান এবং তার সঙ্গে শান্তি ও আনন্দ।

বেদে দুইটি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র সবই তো অপরা, যদি তাঁকে না জানা যায়। শাস্ত্র পড়ে যাঁরা শুধু পণ্ডিত হয়েছেন, তাঁরা অপরা বিদ্যাই লাভ করেছেন। পরা বিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়।

ঠাকুর অপরা বিদ্যা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বড় ভাই তাঁকে টোলে নিয়ে গিয়ে শাস্ত্র শেখাতে চাইলেন, কিন্তু ঠাকুর চালকলা-বাঁধা বিদ্যা শিক্ষা করলেন না—অর্থাৎ অপরা বিদ্যা গ্রহণ করলেন না। কিন্তু তাই ব'লে কি তিনি মূর্খ ছিলেন? তা নয়; তিনি যা লাভ করলেন, *সেইটিই* আসল জ্ঞান, পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা। ঠাকুর এই পরাবিদ্যা লাভ ক'রে জ্ঞানের খনিতে—আনন্দের খনিতে ডুবে গেলেন, সেই গভীর সমাধি থেকে কত রত্ন উঠিয়ে এনে চারদিকে বিলিয়ে দিলেন।

তাঁর তো লেখাপড়া ছিল না, কিন্তু 'কথামৃত' পড়ে দেখবে, গীতার সার, ভাগবতের সার, সব শাস্ত্রের সার তাতে আছে। ঠাকুর কি ক'রে জানলেন এ-সব? মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার—মা রাশ ঠেলে দিতেন ঠাকুরকে—তাই তাঁর বাণী শুনে পণ্ডিত ধনী বৈজ্ঞানিক সব স্তব্ধ হ'য়ে থাকতেন। কত সহজ ভাষায় ঠাকুর সর্বসাধারণকে বিলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর অনুভূতি-লব্ধ গভীর জ্ঞান। জগৎ তা পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

আসল জিনিস ভেতরে, বাইরে নয়—ভেতর পূর্ণ ক'রে রয়েছেন তিনি, তাই তাঁকে জানলেই সব জানা হ'য়ে যায়—সব পূর্ণ হ'য়ে যায়।

গীতা সর্বশাস্ত্রের সার, স্বয়ং পদ্মনাভের মুখ থেকে গীতা কথিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগ-যুক্ত অবস্থায়, অর্জুনকে এই গীতা বলেছিলেন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর অর্জুন আর একবার গীতা শুনতে চাইলে ভগবান বলেছিলেন, 'অর্জুন কুরুক্ষেত্রে আমি যে যোগযুক্ত অবস্থায় ছিলুম—সে অবস্থা তো এখন আমার নেই—এখন কি ক'রে সেভাবে তোমায় গীতা ব'লব?'

বাস্তবিক অবতারপুরুষেরা যেন channel (প্রণালী), ব্রহ্মের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই তাঁদের মধ্য দিয়েই আসে ব্রহ্মবাণী। ঠাকুর সমাধির গভীর সমুদ্রতল থেকে 'রত্ন' তুলে এনে সকলকে বিলিয়ে দিতেন।

স্বামীজী বলতেন, ঠাকুরকে না জানলে শাস্ত্র বোঝা যায় না—আবার 'কথামৃত' না পড়লে ঠাকুরকে জানা যায় না। এই কথামৃত-লেখক মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

দু-তিন দিন ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসার পরেই তিনি ঠাকুরকে ঐশ্বরিক পুরুষ ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ঠাকুরকে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন। গীতা যেমন শুধু অর্জুনের জন্য নয়—মাস্টার মহাশয়ের এই প্রশ্নোত্তরও শুধু তাঁর একার জন্যে নয়; এই প্রশ্ন চিরন্তন, এ প্রশ্ন সকলের।

*করিমগঞ্জে ২৫.৪.৫৭ তারিখে প্রদত্ত ধর্মপ্রসঙ্গ হইতে শ্রীমতী সুধা সেন কর্তৃক অনুলিখিত।

১ম প্রশ্ন—ঈশ্বরে কি ক'রে ভক্তি হয় ?

২য় „—সংসারে কি রকম ক'রে থাকতে হয় ?

৩য় „—ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ?

৪র্থ „—মনের কি অবস্থা হ'লে ঈশ্বর দর্শন হয় ?

কি ক'রে ভক্তি লাভ হয়—এইটি প্রথম প্রশ্ন। ঠাকুর বলতেন ভক্তি আট রকম :

(১) জ্ঞান-ভক্তি—ঈশ্বর আছেন এইটি জেনে বিশ্বাস।

(২) বৈধী ভক্তি—এত জপ করতে হবে, পুরশ্চরণ করতে হবে, তীর্থে গমন করতে হবে—ইত্যাদি।

(৩) রাগ-ভক্তি—এইটি প্রেমাভক্তি, এইটি লাভ করবার জন্যেই বিধি-অনুষ্ঠান সব। পাখার হাওয়া কতক্ষণ দরকার? যতক্ষণ বাতাস না বয়। প্রেমাভক্তি এলে আর কোন বিধির দরকার হয় না। মাঠের ধান কাটা হ'য়ে গেলে যেমন আল ঘুরে যেতে হয় না, সব সোজা পথ; তেমনি এই রাগাত্মিকা ভক্তি এলে সব সোজা হ'য়ে যায়। এ অতি উচ্চ স্তরের ভক্তি, এই ভক্তি দিয়ে তাঁকে বাঁধা যায়।

(৪) বিজ্ঞান-ভক্তি—ভগবানকে জানবার পর এই ভক্তি হয়।

(৫) শুদ্ধা নিষ্কাম ভক্তি—এই ভক্তিতে কোন কামনা নেই—শুদ্ধা অমলা ভক্তি; বৃন্দাবনের গোপীদের এই ভক্তি হয়েছিল।

(৬) অহৈতুকী ভক্তি—ভালো না বেসে থাকতে পারে না ব'লে ভালোবাসে—যেমন প্রহ্লাদের হয়েছিল।

(৭) উর্জিতা ভক্তি—এ ভক্তি অনেক উর্ধ্বস্তরের, যেমন মহাপ্রভুর—বন দেখে বৃন্দাবন-বোধ; সমুদ্র দেখে তাঁর যমুনা-বোধ হ'ত।

(৮) মধুর ভক্তি,—এ ভক্তি শুধু শ্রীমতীর হয়েছিল। দাস্য-সখ্যাদি সর্বভাবের সমন্বয় এই ভাবে। অশ্রু স্তম্ভ পুলক প্রভৃতি এবং সে দিব্যোন্মাদ অবস্থা শ্রীমতীর হয়েছিল—জীবের এই ভাব হয় না। এই ভক্তিই চরম।

ঠাকুর এই আটরকম ভক্তির কথা বলেছেন। কি ক'রে ভক্তি লাভ হয়? কায়মনোবাক্যে উপাসনা করতে হবে—বলতেন ঠাকুর। পায়ে-হেঁটে তাঁর স্থানে যাওয়া, হাতে ফুল তোলা প্রভৃতি সেবার কাজ করা, কানে তাঁর গুণানু-কীর্তন শোনা, মুখে তাঁর কীর্তন করা, সর্বদা তাঁর চিন্তা করা—এই সবই কায়মনোবাক্যে উপাসনা।

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ—এই তিনটি আসল জিনিস। তবে এর সঙ্গে আর একটি জিনিস চাই—সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ না হ'লে শুধু শ্রবণ-কীর্তনে কিছু হবে না। ঠাকুর বলতেন, সাধু-সঙ্গ হ'ল ঘড়ি-মেলানো, সংসারের দিকে কতটা 'ফাস্ট' চলেছে আর ঈশ্বরের দিকে কতটা 'স্লো'; সেইটেই 'রেগুলেট' করা।

সাধুসঙ্গে আর সাধুমুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে তবে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধার পরে হয় নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পরে ভক্তি।

ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা—
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।

ক্ষণমাত্র সজ্জনের সঙ্গই তরণী-স্বরূপ হ'য়ে ভবার্ণব পার ক'রে দেয়।

কুলীন-গ্রামবাসী রামানন্দ জানতে চাইলেন, 'বৈষ্ণব কে ?' উত্তরে মহাপ্রভু বলেছিলেন :

যাঁহারে দেখিলে হৃদে স্ফুরে কৃষ্ণনাম,
তাঁহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান।

বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধু—যিনি প্রকৃত সাধু তিনি শুধু তাঁর উপস্থিতি দ্বারাই লোকের মনে বিশ্বাস ও ভক্তি জাগিয়ে দিতে পারেন।

মিনতি

'বনফুল'

হেথায় মোরা থাকব না কেউ
যেতে হবে নূতন দেশে
কিছুক্ষণের জন্যে কেবল
মিলেছি ভাই হেথায় এসে।

পাঠিয়েছিল কে আমারে ভবের হাটে
কিছুক্ষণের স্বপন-ঘোরে জীবন কাটে ;

টুটবে স্বপন ভাঙবে মেলা
ফুরিয়ে যাবে মায়ার খেলা
অচিন দেশের বন্ধু যখন
ডাক দেবে রে মরণ বেশে।

কিছুক্ষণের মোহের দোলায়
দুলছি তবু—
দোলাও, দোলাও, আরও দোলাও
দোলাও প্রভু।

তোমার দোলা, তোমার আমি
এই কথাটি জীবনস্বামি,
ভুলিয়ে যেন দিও না কো
এই মিনতি করি শেষে।

যে রাতে এল ঝড়

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সে রাতে তুমি বাহিরে ছিলে, যে রাতে এলো ঝড়।
অর্থহীন প্রলাপ যেন, শঙ্কাহীন প্রতাপ সম,
অরণ্যের উর্ধ্ববাহু দোলায় নিরন্তর।

কাঁপায় শাখা, ঝরায় পাতা, জাগায় শিহরণ,
নৃত্যময় ছন্দে তার তাণ্ডবের কী ঝঙ্কার!
বর্ষণের বিন্দুপাতে কাঁদায় সারা বন।

আকাশ-ভরা মেঘের জটা ছড়ায় থরে থরে,
লক্ষফণা বিদ্যুতের, নিদ্রাহীন অশান্তের
বক্ষোপরে বঞ্চনার চমক তুলে ধরে।

মাঠের 'পরে বনের শিরে জলের ধারাপাত,
কর্ণিকার গুচ্ছতলে একটি দুটি জোনাক জ্বলে,
সহসা শুনি হৃদয়দ্বারে তোমার করাঘাত।

দুয়ার খুলে বাহিরে চেয়ে দেখছি শুধু ছায়া,
মল্লারের কাঁপন লেগে, বৃষ্টিধারা ঝরিছে মেঘে,
স্পন্দমান অন্ধকারে ঘনায় সুর-মায়া।

যে রাতে তুমি বাহিরে ছিলে, সে রাতে এলো ঝড়।
ব্যাকুলপ্রাণ অরণ্যের বাঁধিতে চায় অনন্তের
বিরামহীন সঙ্গীতের নিরন্ত নির্ঝর।
কখন তুমি নীরবে এসে ভরেছ অন্তর।

তুমি বরাভয়া !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী কাব্যশ্রী

অনেক বেদনা আছে এ হৃদয় ছেয়ে,
অনেক নিরাশা জাগে মথিয়া অন্তর,
অনেক অশ্রুর ধারা ঝরে গণ্ড বেয়ে,
তারি লাগি এ জীবন কত না কাতর !

দুর্গতি ও অভাবের নেই পরিশেষ,
চলার পথের মাঝে নামে শ্রান্তি-ভার,
দেহে মনে জাগে কত দুর্বিষহ ক্লেশ,
তাই চিত্ত অশান্তিতে জলে অনিবার !

সকল দুঃখের শান্তি লভিতে জীবনে,
জননি, তোমারে আমি করেছি স্মরণ ;
কেঁদেছি বিরলে বসি অঝোর নয়নে
শুনেছ কি সে আকূতি—সে মোর ক্রন্দন ?

করুণানিলয়া তুমি, তাই গো তোমারে—
ডেকেছি আকুলকণ্ঠে আশ্রয়ের তরে,
তুমি কি এসেছ কভু বুকের দুয়ারে—
প্রাণের পরশ তব জাগাতে অন্তরে ?

কই মা প্রাণের শান্তি তব নাম-গানে ?
কই মা বুকের তৃপ্তি তব স্নেহাঞ্চলে ?
কই মা আনন্দ-স্বাদ তব রূপ-ধ্যানে ?
কই মা জীবন-গতি তব পদ-তলে ?

যেন কোন্ বাধা এসে মোর অভিমুখে—
তোমার আমার মাঝে রচে ব্যবধান !
প্রসন্ন হাসির ছটা তব স্মিত-মুখে
ঝরিছে যা নিত্য দিন—পাই না সন্ধান !

জননি, তোমার কাছে এসেছি আবার,
তোমার দুয়ার-পাশে রয়েছি দাঁড়ায়ে !
একটু পরশ তব চির-করুণার—
দেবে না বুকের 'পরে চরণ বাড়ায়ে ?

দেবে না স্নেহের সুধা বিশুষ্ক অধরে ?
চিন্ময়ী জ্যোতিতে মম মর্মের আঁধার—
দেবে না ঘুচায়ে তুমি ? মোর আঁখি 'পরে
ফুটাবে না স্নেহ-ঘন রূপ অমরার ?

তুমি দুর্গা দুঃখ-হরা, দুর্গতি-নাশিনী,
কল্যাণী জননী তুমি—তুমি বরাভয়া !
তুমি মম ত্রাণ-কর্ত্রী—নিখিল-তারিণী,
তুমি মা পরমা গতি, তুমি সর্বাশ্রয়া !

আমার জীবনখানি দেবে না জাগায়ে ?
শুভ-ক্ষণে করিবে না তোমার বোধন ?
দূর হ'তে কাছে এসে দু-কর বাড়ায়ে—
অঙ্কে ধরি করিবে না ধন্য এ জীবন ?

হৃদয়-দেবতা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বাহির যখন হয়েছে বিমুখ
গৃহ যবে বিদ্রোহী,
গ্রহ-নিগ্রহে সবাকার গালি
মাথা পেতে যবে সহি,
বন্ধু বলিতে সামনে যখন
কাউকে পাইনে খুঁজি,
অন্তরে যবে শান্তি হারায়ে
ধরারে অসহ বুঝি,—

সেই দুর্দিনে—সে আঘাত সয়ে
তোমারে পড়িল মনে,
হৃদয়-দেবতা তুমি যে রয়েছ
হৃদয়ে সংগোপনে !

শ্রীদুর্গা

স্বামী মৈথিল্যানন্দ

নমো নমো দুর্গে সুখকরণী।
নমো নমো অম্বে দুখহরণী॥

—দুর্গাচালীসা

বাল্মীকি-রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। দেবীভাগবতের ৩।৩০ অধ্যায়ে, কালিকা-পুরাণে ৬০তম অধ্যায়ে, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের পূর্বখণ্ডে ২১।২২ অধ্যায়ে এবং মহাভাগবতে ৩৬।৪৮ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গাপূজার কথা বর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যায় যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে নবরাত্র ব্রতানুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি দেবীর কৃপালাভ করিয়া রাবণ-বধ এবং সীতার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন। দেবী প্রসন্না হইয়া মহাষ্টমীর নিশীথে দর্শন দিয়া বলিলেন, 'হে রাঘব! তুমি লঙ্কায় বসন্তকালে পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার আরাধনা করিও, পরে পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া যথাসুখে রাজ্য করিও।' —(দেবীভাগবতম্ ৩।৩০)

বসন্তে সেবনং কার্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া।
হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৬৬তম অধ্যায়ে লিখিত আছে: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে চৈত্র মাসে রাসমণ্ডলে শ্রীদুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। মধু ও কৈটভের ভয়ে ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিবার জন্য দুর্গার স্তুতি করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রাণসঙ্কটে দেবীর আরাধনা করিয়া বৃত্রাসুর বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মর্ত্যে সর্বপ্রথম সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শ্রীদুর্গার পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার আশায় একমাস কাত্যায়নীর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য শ্রীদুর্গার উপাসনা করিয়াছিলেন। গোস্বামী তুলসীদাস-কৃত 'রামচরিতমানসে' আছে যে শ্রীসীতা খুব অনুরাগের সহিত গৌরীপূজা করিয়াছিলেন এবং মনোমত পতিলাভের জন্য তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহাভারতে বিরাট-পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের জন্য যখন পাণ্ডবেরা বিরাট রাজার পুরীতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তখন যুধিষ্ঠির ঋষিদের উপদেশ-মত অজ্ঞাতবাস যাহাতে সফল হয়, তজ্জন্য শ্রীদুর্গার স্তুতি করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্ম-পর্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে আছে, অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-মত দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে রাত্রিসূক্ত-পরিশিষ্টে আছে: দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ॥

—দুর্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে ত্রাণকারিণি, সংসারসাগর পার হইবার জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নবম অনুবাকে আছে: কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারি ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।

—আমরা দেবী কাত্যায়নীকে জানি, কন্যা-কুমারীকে ধ্যান করি, সেই দুর্গাদেবী যেন আমাদের বুদ্ধি তাঁহার দিকে চালিত করেন।

শ্রীদেব্যথর্বশীর্ষে আছে :

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণং প্রপদ্যামহে-
ঽসুরান্নাশয়িত্র্যৈ তে নমঃ॥

—হে অসুর-ধ্বংসকারিণি দুর্গে দেবি! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি অগ্নিবর্ণা, জ্ঞানের প্রভায় সমুজ্জ্বলা, তুমি দীপ্তিমতী, এবং কর্মফল পাইবার জন্য লোকে তোমার উপাসনা করিয়া থাকে। তোমার শরণাপন্ন হইতেছি।

অথর্ববেদ ইহাও বলেন যে যাঁহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই, তিনিই 'দুর্গা' নামে প্রসিদ্ধা। দেবী-উপনিষদে আছে যে তিনি দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন বলিয়া 'দুর্গা' নামে অভিহিতা। দেবীপুরাণে আছে যে স্মরণমাত্রেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে দুর্গম শত্রুসঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাম 'দুর্গা'। শ্রীচণ্ডীতে আছে যে দেবী শাকম্ভরী অবতারকালে 'দুর্গ'নামক মহাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'দুর্গা' হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডে (৭২।৭১) দেবী-মুখে বর্ণিত আছে: আজ হইতে আমার নাম 'দুর্গা' বলিয়া বিখ্যাত হইবে। যেহেতু যুদ্ধে দুর্গ দৈত্যকে অতি সঙ্কটে বধ করিয়াছিলাম। যাহারা আমার অর্থাৎ দুর্গার শরণাগত হইয়া থাকে তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না।

'অদ্য প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্যতি।
দুর্গদৈত্যস্য সমরে পাতনাদতিদুর্গমাৎ।
যে মাং দুর্গাং শরণগতা ন তেষাং দুর্গতিঃ কচিৎ॥'

পরমানন্দ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যার মা আনন্দময়ী—
সে কি নিরানন্দে থাকে?
ঘিরে রয় আনন্দ তারে,
সুধার ভোজে সদাই ডাকে।
দুখের উড়ো মেঘ আসে যায়,
নীলাকাশ নীল থাকেই তো তায়,
মন যে তাহার চন্দন-বন,
সুরভি বয় ঝাঁকে ঝাঁকে।

ব্যথা-বেদন, বিপদ-আপদ
ছুটে আসে খুব দাপটে,
আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে
তাহার পায়ের সন্নিকটে।
ভয়াল ব্যাঘ্র হয় যে নত,
যেন মেষ-শাবকের মত
সর্প—হ'য়ে দর্পহারা—
তার চরণের ধূলা মাখে।

আনন্দের গোমুখী-ধারার
সঙ্গে তাহার যোগ যে আছে
অফুরন্ত রসের ধারা—
দুখ কি ঘেঁষে তাহার কাছে?
মায়ের পদ্মহস্ত শিরে,
পদ্ম ফোটে নয়ন নীরে,
সুধা-তরঙ্গিণীকে সে
বন্দী ক'রে বুকে রাখে।

মায়ের কনক-কেশরী যে
কেশর বুলায় তাহার গায়ে।
অভয়ার সে কোলের ছেলে
ভয় কারুকে করে না হে।
আনন্দের আর নাইকো সীমা
মহামায়ার কি মহিমা।
ত্রিনয়নার তনয় সে যে—
আলোর মানুষ বলি তাকে।

জন্মান্তর-রহস্য

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

জন্মান্তর লইয়া অনাদি কাল হইতেই বহু বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলে, জীব মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না; কারণ শরীরটাই আত্মা, যে শরীর মরিয়া যায়, সেই শরীর কোন দিন উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না বলিয়া পুনর্জন্ম অসম্ভব। আবার কেহ কেহ বলে, শরীরটা আত্মা নয়; আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন। সেইহেতু জীব কর্মবশে যেমন বর্তমান শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ পাপ-পুণ্য কর্মবশে মৃত্যুর পরও পুনরায় নূতন দেহ পায় বা জন্মগ্রহণ করে। অথচ এই জন্মান্তর আছে কি নাই—এই বিশ্বাসের উপর ধর্মের অনুষ্ঠান, অধর্মের বর্জন এবং ধর্মানুষ্ঠানের অনাবশ্যকতা বা ধর্মাধর্মের সত্যাসত্য নির্ভর করে। যেমন, যদি জন্মান্তর না থাকে, তাহা হইলে এই জন্মে যাহাতে সুখ হয়, সর্বপ্রকারে তাহার চেষ্টা করাই মানুষের ঐকান্তিক কাম্য হইয়া পড়িবে। বর্তমান জন্ম ব্যতিরিক্ত পরজন্ম যখন নাই, তখন এই জন্মেই যে কোন প্রকারে—চৌর্য, মিথ্যা, প্রতারণা ইত্যাদি দ্বারাও সুখলাভের চেষ্টা করায় কোন ক্ষতি নাই। যদি চৌর্য, মিথ্যা, প্রতারণার দ্বারা সমষ্টিভাবে সমাজের ক্ষতি হওয়ায় নিজেরও ক্ষতি হয় অর্থাৎ জীবনে সুখলাভ ব্যাহত হইয়া দুঃখই উৎপন্ন হয়, অতএব চৌর্যাদি বিধেয় নয়—এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলেও যাগ, হোম, ব্রত, উপবাস, দেবপূজা, ঈশ্বরের উপাসনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্ম-জ্ঞানলাভের চেষ্টা প্রভৃতি করার কোন সার্থকতা থাকে না; পরন্তু ঐগুলি অনর্থক নিজের কষ্টেরই কারণ হইয়া পড়ে বলিয়া উহাদের অনুষ্ঠান কেহই করিবে না। আর যদি জন্মান্তর থাকে, তাহা হইলে এই জন্মে ধর্মের অনুষ্ঠান ও অধর্ম বর্জনের অবশ্য-কর্তব্যতা স্বীকার্য হইয়া পড়ে। যেহেতু ধর্মের দ্বারা পরজন্মে সুখ আর অধর্মের দ্বারা পরজন্মে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ধর্মের সম্পাদন ও অধর্ম ত্যাগের অবকাশ থাকে। এইজন্য জন্মান্তর আছে কি নাই, ইহা নিশ্চয় করা সকল লোকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন—এ বিষয়টি তো নিশ্চিত। কারণ বেদের কোথাও জন্মান্তরের কথা বলা হয় নাই। যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই যে 'বেদের কোথাও জন্মান্তর উক্ত হয় নাই' ইহার অর্থ কি? 'জন্মান্তরমস্তি, জন্মান্তরমাসীৎ, জন্মান্তরং ভবিষ্যতি' এইরূপ স্পষ্টভাবে কোন বাক্য নাই। অথবা বেদের অর্থ পর্যালোচনা করিলে জন্মান্তর সিদ্ধ হয় না। এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষটি বক্তার অভিপ্রেত?

যদি বলা যায়, প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ 'জন্মান্তর আছে' ইত্যাদিরূপে স্পষ্টভাবে জন্মান্তরের কথা বেদে পাওয়া যায় না। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, সত্যই ঐরূপ শব্দপ্রয়োগ নাই। কিন্তু ঐরূপ শব্দ না থাকিলেই যদি জন্মান্তর অসিদ্ধ হইয়া যায়; তাহা হইলে পুরাণে উল্লিখিত কার্তবীর্যার্জুনকে সংক্ষেপে 'অর্জুন' বলিয়া কোথাও কোথাও বর্ণনা করায়, তিনি যে অর্জুনান্তর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি ইহা না বলিয়া দিলেও লোকে যেমন বুঝিয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্য শুভাশুভ কর্মের ফলে স্বর্গে বা নরকে জন্মগ্রহণ করে বলিলে লোকান্তরে জন্ম যে জন্মান্তর

অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম হইতে ভিন্ন জন্ম তাহা কি বুঝিতে বাকি থাকে ?

শ্রুতিতে আছে 'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্ [কঃ উঃ ২।২।৭] অর্থাৎ দেহীরা কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কেহ কেহ শরীর-ধারণের জন্য যোনি প্রাপ্ত হয়, অপরে বৃক্ষাদি জন্ম প্রাপ্ত হয়। 'ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে' [মুঃ উঃ ১।২।৯] 'ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি' [মুঃ উঃ ১।২।১০] অর্থাৎ কর্মফলভোগে কর্মক্ষয় হইয়া গেলে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। (স্বর্গভোগান্তে) এই লোকে অথবা এতদপেক্ষা হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হয়। ইত্যাদি শত শত শ্রুতিবাক্যে স্বর্গে বা নরকে জন্ম যে জন্মান্তর অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম ভিন্ন জন্ম তাহা নিশ্চয় হইবে না কেন ? এই ভাবে বক্তাকে দ্বিতীয়-পক্ষ অর্থাৎ বেদ পর্যালোচনা করিলে যে জন্মান্তর সিদ্ধ হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বেদ যাঁহারা মানেন না, যুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষের দ্বারা যাঁহারা সব কিছু বুঝিতে চান বা চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের দ্বারা জন্মান্তরের অস্তিত্ব বুঝানো যাইবে না ; সেই জন্য জন্মান্তর-সিদ্ধির বহু যুক্তি থাকিলেও অতি সংক্ষেপে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা যাইতেছে।

(১)

প্রশ্ন : বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত ; পূর্বজন্ম বা পরজন্ম কেহ কোন দিন প্রত্যক্ষ করে না। সুতরাং কিরূপে জন্মান্তর সিদ্ধ হয় ?

উত্তর : বর্তমান জন্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া যখন সর্ববাদিসম্মত, তখন তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ বিনা কারণে কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বর্তমান জন্মরূপ কার্যের কারণ অন-স্বীকার্য। পিতা, মাতা, দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি একমাত্র দৃষ্টকারণগুলিই জন্মের কারণ—ইহা বলা যায় না। যেহেতু একই পিতা ও মাতা হইতে একই কালে যমজ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটির মৃত্যু ও অপরটির বাঁচিয়া থাকা বা দুইটি পুত্র বাঁচিয়া থাকিলেও একই দেশে, এক পরিবেশে লালন-পালন করা সত্ত্বেও সমান শক্তি, সমান বুদ্ধি, সমান বিদ্যা প্রভৃতি কখনও দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের শরীর, শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, সুখদুঃখ প্রভৃতির প্রভেদের জন্য অন্য কোন কারণ অবশ্য স্বীকার্য। তাহা অদৃষ্টরূপ কর্ম। আর ঐ কর্ম বর্তমান জন্মে সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাহার জন্য বর্তমান জন্মের পূর্বে অন্য জন্ম অনুমানসিদ্ধ হইয়া যায়। উক্ত দুইটি পুত্রের দৃষ্ট কারণগুলির বৈষম্য না থাকিলেও অদৃষ্ট কারণের বৈষম্যবশতঃ তাহাদের শরীর, শক্তি, মেধা, বিদ্যা, সুখদুঃখ প্রভৃতির বৈষম্য দেখা যায়। সুতরাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায় বর্তমান জন্মের কর্ম দেখিয়া পরজন্মও সিদ্ধ হইবে।

(২)

প্রশ্ন : পূর্বজন্ম স্বীকার করিয়া লইলেও পরজন্ম সিদ্ধ হয় না। যেহেতু এই জন্মে যে যেরূপ কর্ম করিতেছে, তাহাদের সেই সমস্ত কর্মের দ্রষ্টা ঈশ্বর সবই জানিয়া রাখিতেছেন। যখন সকলে মরিয়া যাইবে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের পর একদিন সকল আত্মার বিচার হইবে। প্রত্যেকেই মৃত্যুর পর কবর বা শ্মশান বা অন্য কোন স্থানে জমা হইতেছে। ঈশ্বর শেষ বিচারের দিন সকলকে ডাকাইয়া সকলের পাপ ও পুণ্য-হিসাব করিয়া যাহাদের পুণ্যবান্ বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাদের অনন্ত স্বর্গের বিধান করিবেন, আর যাহারা পাপী বলিয়া সাব্যস্ত

হইবে তাহাদিগকে অনন্ত নরকে পাঠাইয়া দিবেন। অথবা পূর্বজন্মও নাই, এই বর্তমান জন্মই একমাত্র জন্ম, এর পর স্বর্গ ও নরকে স্থিতি। আর কোন জন্ম নাই। অতএব জন্মান্তর কোথায়?

উত্তর: পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিতেই বেশ, কিন্তু উহার ভিতর বিশেষ যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রথম কথা এই যে কতকগুলি লোক পুণ্যকর্ম করে, আবার কতকগুলি লোক পাপ কর্ম করে—ইহার কারণ কি? নানা রকম বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কতকগুলি লোক সহজেই পুণ্য কর্ম করে। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকের পুণ্যকর্ম করার বা পাপকর্ম ত্যাগ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বা পাপকর্ম ত্যাগ করিতে পারে না—ইহারই বা কারণ কি? কোন দৃষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য অগত্যা পূর্বজন্মের সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হওয়ায়, বর্তমান জন্মের সমস্ত কর্মের ফল ইহজন্মে সকলে ভোগ করে না, ইহা দেখা যায় বলিয়া, কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় পরজন্মও সিদ্ধ হয়। আর ঈশ্বর পরিমিত পাপের অনুষ্ঠানকারীকে অনন্তকালের জন্য নরকে পাঠান—ইহা স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে ন্যায়-বিচারহীন শয়তান বলিতে হয়। যেহেতু ঈশ্বর সকলের পিতা, সকলের প্রতিই তাঁহার সমান কৃপা আছে। পাপীকে তিনি তাহার পাপের জন্য কিছুকাল শাস্তি দিয়া তারপর তাহাকে সংসার হইতে পুণ্যাদি কর্ম করাইয়া যদি উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইবে? আরও কথা এই যে জগতে এমন কোন লোক নাই, যে সারা জীবনে একটিও পুণ্যকর্ম করে না বা একটিও পাপকর্ম করে না। কতকগুলি লোক কেবল পুণ্য করে আর কতকগুলি লোক কেবল পাপ করে, এইরূপ দেখা যায় না। যাহারা পাপী বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে তাহারাও কোন না কোন পুণ্যকর্ম করিয়াছে। আর যাহারা পুণ্যবান্, তাহারাও সারা জীবনে অন্ততঃ অজ্ঞাতসারেও দুটা একটা পাপ করিয়া থাকেন। অথচ ঈশ্বর পাপীদের কেবল পাপেরই বিচার করেন, পুণ্যটার কোন বিচার করেন না অর্থাৎ পাপী তাহার পুণ্যের ফল কিছুমাত্র পাইবে না, এবং পুণ্যবান ব্যক্তি তাহার পাপের ফলে কিছুমাত্রও দুঃখ ভোগ করিবে না—এইরূপ উক্তি যুক্তিহীন। আরও কথা এই যে শরীর না থাকিলে সুখ দুঃখ ভোগ হয় না বলিয়া অনন্ত স্বর্গে সুখ ভোগ ও অনন্ত নরকে দুঃখ ভোগ করিতে হইলে স্বর্গে বা নরকে শরীরধারণ বা জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

(৩)

প্রশ্ন: বর্তমান জন্মের প্রতি পিতা মাতা কারণ, জন্মদানকালীন তাঁহাদের বিভিন্ন শারীরিক অবস্থা, চিন্তা প্রভৃতি মনের অবস্থাও কারণ বলিয়া একই পিতা ও মাতার সন্তানগণের মধ্যে, স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ভেদ হইতে পারে। তা ছাড়া দেশ, কাল, পরিবেশ, অবস্থা, শিক্ষক প্রভৃতির সঙ্গ, সাহায্য এবং বর্তমান জন্মের কর্মবশতঃও এক পিতা ও মাতার সন্তানগণের মধ্যে বৈষম্য থাকা কিছু বিচিত্র নয়। আর জন্মমাত্রেই শিশু-সন্তানের স্তন্যপানে প্রবৃত্তি, শোক, হর্ষ, মৃত্যুভয় প্রভৃতি দেখিয়া পূর্বজন্মের সংস্কার অনুমান করিবার কোন হেতু নাই। যেহেতু মাতা-পিতার শরীরধারণের প্রবৃত্তি, শোক, হর্ষ, ভয়, প্রভৃতির সংস্কারই সন্তানে সংক্রমিত হওয়ায় ঐ সকল প্রবৃত্তি জাতমাত্র সন্তানে সম্ভব হয়।

বানরের শিশু বানর মাতাপিতা হইতেই সংস্কার লাভ করিয়া জন্মমাত্রে বৃক্ষশাখা ধারণ করে বা মাতার উদর ধরিয়া অবস্থানের কৌশল আয়ত্ত করে ইত্যাদি। এই ভাবেই এই জন্মের কার্য-সকল সম্ভব হওয়ায় পূর্বজন্ম ও তজ্জনিত সংস্কার কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি ?

উত্তর : মাতাপিতার সংস্কার যদি সন্তানে সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে মাতাপিতা সন্তানের জন্মের পূর্বে বা অন্ততঃ জন্মকালে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছেন, সন্তান তাহা স্মরণ করুক। মাতাপিতার বাল্যকালীন স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি, ক্রীড়া, কৌতুক, যৌবন ও বার্ধক্যে বিষয় চিন্তাদির প্রবৃত্তি এবং সর্বকালীন শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির সংস্কার সংক্রমিত হইয়া যদি সন্তানে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে মাতাপিতার দেখা, শোনা, বলা ইত্যাদি অনুভবসকলের সংস্কার সন্তানে সংক্রমিত হইবে না—ইহার প্রতি একপক্ষপাতী যুক্তি কি আছে ? আর যদি মাতাপিতার সমস্ত সংস্কার সন্তানে সংক্রমিত হয় না, কিন্তু কতকগুলি হয় একথা বল, তাহা হইলে যে যে সংস্কার, মাতা-পিতা হইতে সন্তান পায় না, অথচ তাহার কার্য সন্তানে দেখা যায়, সেই সকল সংস্কারের উপ-পত্তির জন্য জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। সুতরাং জন্মান্তর অবশ্য স্বীকার্য।

(৪)

প্রশ্ন : আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম, জন্মান্তর আছে। কিন্তু তাহার জন্য দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি ? স্থূল দেহের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করা যায় বলিয়া স্থূল দেহ আত্মা নয়, ইহা মানিলাম। কিন্তু ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন হইতে অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করিবার যুক্তি কি ? অন্ততঃ মনকে আত্মা বলিলে সমস্তই উপপন্ন হওয়ায় মন-অতিরিক্ত আত্মা কল্পনা করিবার হেতু কি ?

উত্তর : ইন্দ্রিয়ের পটুতা, অপটুতা, বৈকল্য প্রাণের হ্রাসবৃদ্ধি, বাল্যে প্রাণের স্ফূর্তির প্রাচুর্য, যৌবনে বলবৃদ্ধি, বার্ধক্যে প্রাণের শক্তির হ্রাস, মনের বিকার, সুষুপ্তিতে মনের চেতনার অভাব ইত্যাদি অনুভবের দ্বারা ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতির বিকারিত্ববশতঃ সাবয়বত্ব ও বিনাশ প্রভৃতি অনুমিত হয়। মনেরও বিকার থাকায় বিনাশ সিদ্ধ হওয়ায় তাহার বিনাশের কারণ-রূপে কোন বস্তুর সত্তা অনুমানসিদ্ধ এবং বিকারী পদার্থের উৎপত্তি অবশ্যসিদ্ধ বলিয়া মনের উৎপত্তিরও কারণীভূত কোন পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য। বিকারী পদার্থ জড়, অথচ আত্মা যে চেতন তাহা সকলের অনুভবসিদ্ধ বলিয়া প্রাণ মন হইতে অতিরিক্ত মন প্রভৃতির কারণ চেতন আত্মাই সিদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত দেহাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বহু সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর যুক্তি শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে জন্মান্তর-প্রসঙ্গ

পরলোকের কথা বলছ ? গীতার মত—মৃত্যুকালে যা ভাববে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ হরিণ' ক'রে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হ'য়ে জন্মাতে হ'ল। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এ সব রাতদিন অভ্যাস করতে হয় ;—তাহলে মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা আসে—অভ্যাসের গুণে। এরূপে মৃত্যু হ'লে ঈশ্বরের স্বরূপ পায়। কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকে বললুম, এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার ? তারপর আবার বললুম, যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয় ; ছাগল-গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙে দেয়, তাহলে তৈরী লাল হাঁড়িগুলা ফেলে দেয় ; কাঁচাগুলা কিন্তু আবার নিয়ে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

ভগ্নী নিবেদিতা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

সরস্বতীর শ্বেত তনুশোভা
অতি মনোলোভা,
তোমাতেই রূপ ধরেছিল,
হে অনন্যা, মহীয়সী
ভগ্নী নিবেদিতা।

পরম সত্যের তরে যে-তপস্যা তব
অতি অভিনব,
চিরদিন ছিল অব্যাহত,—
তাহে তুমি শুচি শোভান্বিতা,
সর্বত্র বন্দিতা ;
ভগ্নী নিবেদিতা।

দূরদেশে, কোন্ লগ্নে, কোন্ সে ভূমিতে,
অতি আচম্বিতে—
ঘটেছিল জন্ম তব, কোন্ শুভক্ষণে
নাহি জানি মোরা। নাহি বিবরণ
কোন লেখনীতে।

(মোরা) শুধু দেখিলাম অগ্নিবর্ণ-লিখা,
যেন হোমশিখা,
ভারত-ঋষির বাণী শুনিবার তরে
ভক্তিনম্রা, প্রথম আগতা,
তুমি শুচিস্মিতা।

মোরা শুধু জানিলাম উত্তর জীবনে
অতি সঙ্গোপনে,
সে-বাণীর মর্ম লাগি, সর্বত্যাগ
করিয়া বরণ, সর্ব-রিক্ত তুমি
তপস্যা-নিরতা।

সে-দিন এক দিবসের শেষে
শীতের প্রদোষে,
সন্ধ্যারবি অস্তে গেলা চলি,
ফেলি স্বর্ণ সহস্র কিরণ
সন্ত চারিভিতে।

তুমি সবিস্ময়, দেখিলে আচার্যে
তব ; বসি পদ্মাসনে অপূর্ব মূরতি
সমাহিত চিতে।
ধ্যানশান্ত নেত্র হ'তে ঝরিছে করুণা,
অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

কণ্ঠ হ'তে উঠিতেছে 'হর হর' ধ্বনি,
মর্ত্যভূমে অমৃতের বাণী—
দিব্য উন্মাদনা।
তোমার হৃদয় তাহে ফুটিল চকিতে
প্রদীপ্ত জ্যোতিতে।

শ্বেত বস্ত্র অঙ্গে নিলে তুমি,
ভারতেরে কৈলে নিজ ভূমি
প্রেমের মন্ত্রেতে।
(তাই) তার ভাষা, ধর্ম, অধ্যাত্ম জীবন
স্নিগ্ধ অনুপম,
তোমার ধেয়ানে আসি সঞ্জীবিত হ'ল,
নবযুগে অপরূপ নব অর্থ নিল,
মর্যাদা লভিল।

মোরা তব স্নেহধন্য উত্তর-সাধক
আজ ধরণীতে,
সর্ব-গ্লানি, সর্ব-ভীতি-হরা—
তব শুভ্র আশীষের ধারা,
আকাঙ্ক্ষি লভিতে।

তব নাম সর্ব দেশে তুলনাবিহীন—
অতি অমলিন,
তোমার মহতী কীর্তি অম্লান অক্ষয়,
মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো দীপ্ত আভাময়
রবে চিরদিন।
বিবেক-আনন্দ-সুতা, তুমি
দেবী নিবেদিতা ;
নিত্য শুচি সর্বত্র-বন্দিতা,
চির অনিন্দিতা।
কবিগুরু 'সতী' নাম দিয়েছিল তোমা,
শিল্পাচার্য অতঃপর কহে 'মহাশ্বেতা',—
দেবের বন্দিতা।
ত্যাগের প্রতিমা তুমি, হে ভগিনী
সান্ধ্য দীপশিখা,
তোমার উন্নত ভালে দিব্য ললাটিকা
স্বস্তিকের রেখা।
আমি দীন সেবক তোমার
অপূর্ণ লিপিতে,
কালান্তর অতিক্রমি আজি,
তব দিব্য আদর্শ জীবন
প্রয়াসী পূজিতে,
অক্ষম ভঙ্গীতে।
তুমি দেবী সুকল্যাণী দানিও আশীষ
অমৃতের ধারা ;
তমসার পরপার হ'তে,
আনন্দের সুধা স্নিগ্ধ পথে—
পাঠাইও বাণী তব দিব্য মধুক্ষরা,
প্রসন্ন প্রখরা।

ভারত-সেবায় বিদেশিনী

শ্রীমতী বেলা দে

উদ্যানে প্রতিনিয়ত কত সহস্র ফুল ফুটছে, কিন্তু সব ফুলেরই ভগবৎ-পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হবার সৌভাগ্য হয় না। মাত্র কয়েকটি ফুলই দেবতার শ্রীচরণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হ'য়ে ধন্য হয়। তেমনি আমাদের এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে প্রতিদিন কত সহস্র নরনারী জন্মগ্রহণ করছেন, কিন্তু সবারই জীবন কি সার্থকতায় পূর্ণ হ'য়ে উঠেছে? না, এই কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মানুষই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পেরেছেন। যাঁরা নিজ চরিত্রগুণে জীবনের এই চরম সাফল্য লাভ করেছেন, তাঁদের কথা অনন্তকাল ধ'রে মানুষের শ্রদ্ধার সামগ্রীরূপে পরিণত হ'য়ে থাকে—ভারতের সেবায় উৎসর্গীকৃত এমনি কয়েকজন বিদেশিনীর কথা স্মরণ করছি।

ভগিনী নিবেদিতা

ভারতের ইতিহাসে সে এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণ, জাতীয় প্রতিভা তখন ম্লান হ'য়ে পড়েছে! কর্মজীবনে জাতি তখন অবসাদগ্রস্ত, প্রবলতর পাশ্চাত্য সভ্যতার ও জীবনাদর্শের সংঘাতে ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল তখন বার বার কেঁপে উঠছিল। সংশয়-সন্দেহে জাতি তখন আকুল, ঠিক সেই সময়ে আত্মবিশ্বাসহীন অনুকরণ-পরায়ণ জাতিকে আশার বাণী শুনিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ এনেছিলেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, স্বদেশের নারীগণের কল্যাণকল্পে আমার কতকগুলি সংকল্প আছে, আমার মনে হয় সেগুলিকে কার্যে পরিণত করতে তুমি বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারো। সমস্ত মন দিয়ে নিবেদিতা

স্বামীজীর প্রতি কথা, প্রতি আচরণ অনুধাবন করবার চেষ্টা করতেন। নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের উপযুক্ত শিষ্যা। তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি, ভারতপ্রীতি, ভারতসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শিল্পজ্ঞান—সবকিছুই আমাদের কাছে শ্রদ্ধার জিনিস। তাঁকে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিতেন, 'আমি শিক্ষয়িত্রী'। সত্যিই তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষয়িত্রী। তিনি বলতেন: হায়, শিক্ষাই তো ভারতের সমস্যা। কেমন ক'রে প্রকৃত শিক্ষা—জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, য়ুরোপের নিকৃষ্ট অনুকরণের পরিবর্তে ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্তানরূপে তোমাদের গঠন করতে পারা যায়, তাই সমস্যা। তোমাদের শিক্ষা হবে হৃদয়ের, আত্মার এবং মস্তিষ্কের উন্নতি-সাধন। তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরস্পরের মধ্যে এবং অতীত ও বর্তমান জগতের মধ্যে সাক্ষাৎ যোগসূত্র-স্থাপন।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে স্ত্রীশিক্ষা-আন্দোলনের প্রথম যুগে যে সব সমস্যা ছিল, সেই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য, ভগিনী নিবেদিতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কলকাতায় বাগবাজার বোসপাড়া লেনে অবস্থিত নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়টি তিনি প্রতিষ্ঠা ক'রে যান।

নিজেকে শিক্ষয়িত্রী ব'লে পরিচয় দিলেও ভারতবর্ষে নিবেদিতার যথার্থ পরিচয় দেশ-সেবিকারূপে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে—বিদেশী যাঁরা ভালবেসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে উঁচুতে।

এ দেশের পারিবারিক জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতার যে ভালবাসা, তা সাধারণ দেশপ্রীতির ঊর্ধ্বে। ভারতের মুক্তি-সাধনায় তাঁর আত্মত্যাগ অতুলনীয়। ভারতবর্ষে নিবেদিতার নবজন্ম। তাঁর জীবন সেবা- ও আত্মদান-মূলক তপস্যার জীবন।

যেটুকু সত্য, তাই তাঁর পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল। তাকে আকারে বড় ক'রে দেখাবার লেশমাত্র প্রয়োজন তিনি বোধ করতেন না এবং তেমন ক'রে বড় ক'রে দেখাতে হ'লে যে সব মিথ্যা মেশাতে হয়, তা তিনি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করতেন। এইজন্যেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল: যাঁর অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা, তিনি কলকাতার এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন, যা পৃথিবীতে লোকের চোখে পড়বার মতো নয়।

'নিবেদিতা' নামটি স্বামী বিবেকানন্দের এক অনবদ্য সৃষ্টি, যে ভাবেই হ'ক নামের এমন সার্থকতা দেখা যায় না। নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ উৎসর্গ করেছিলেন ভারতের সেবায়, তাই নিজেকে সর্বপ্রকারে ভারতের কল্যাণে নিবেদন ক'রে তিনি গুরুদত্ত নাম সফল ক'রে গেছেন।

মিস কুক্

নিবেদিতার আগে আর একজন বিদেশিনীর দানের কথাও আমাদের মনে পড়ে, তিনিও সেই অন্ধকারময় যুগে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

১৮২৪ খৃঃ লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, চার্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে। এর মধ্যে মিস্ কুক (Mary Anne Cooke) ১৮২১ খৃঃ নভেম্বর মাসে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রচলনের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন। এক বছরের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঠনঠনিয়া স্কুল খোলা হয় মাত্র বারো জন ছাত্রী নিয়ে, পরে ছাত্রীসংখ্যা

পঁচিশ জন হয়। মির্জাপুর অঞ্চলে স্থানীয় ব্যক্তিরা ২২টি বালিকার নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মিস্ কুকের কাছে আবেদন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই এখানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় খোলা হয়। এমনি ক'রে শোভাবাজারে, শ্যামবাজারে, মল্লিকবাজারে স্কুল খোলা হয়।

১৮২৪ খৃঃ লেডিস সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর চার্চ মিশনের পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব মিস্ কুক নিজে গ্রহণ করেন। রেভারেণ্ড উইলসনকে বিবাহ ক'রে মিস্ কুক মিসেস উইলসন নামে পরিচিত হলেন। কুকের স্কুলগুলি শহরের চারদিকে দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিল ব'লে একটি কেন্দ্রীয় সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য চার্চ মিশন উদ্যোগী হলেন। স্বভাবতই মিসেস উইলসনের উপর লেডিস সোসাইটি ও সেণ্ট্রাল স্কুল গঠনের সমস্ত দায়িত্ব চার্চ মিশন দিয়ে দেন। ১৮২৬ খৃঃ ১৮ই মে কর্নওয়ালিস স্কয়ারের পূর্বদিকে এই কেন্দ্রীয় বালিকা-বিদ্যালয়টির ভিত্তি স্থাপন করা হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায় এই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮২৮ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয় ৫৮ জন ছাত্রী নিয়ে। মিস্টার ও মিসেস উইলসনের ঐকান্তিক চেষ্টায় ছাত্রীসংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগলো। এমনি ক'রে মিশনারীদের উদ্যোগে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার শুরু হয়।

লেডিস সোসাইটির পর ১৮২৫ খৃঃ লেডিস অ্যাসোসিয়েশনের নামে আর একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই সমিতির সভানেত্রী হলেন শ্রীমতী উইলম্যান। যেখানে এটি স্থাপিত হ'ল, সে অঞ্চলটি প্রধানতঃ মুসলমান প্রধান (এণ্টালী ও জানবাজার) হওয়ায় স্থানীয় মুসলমানরাই উৎসাহ নিয়ে বালিকা-বিদ্যালয়-গুলির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন এবং অনেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। একজন মুসলমান মহিলা এই কাজে শ্রীমতী উইলম্যানকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

শ্রীমতী কুকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় হিন্দু-সমাজের মধ্যে যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমেই তাঁরা সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী কুক বা উইলম্যানের আন্তরিকতা ও খৃষ্টান পাদ্রীদের উৎসাহ সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের দুর্ভেদ্য অন্তঃপুরে বিশেষ কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। তার কারণ, হিন্দুসমাজের উচ্চ ও মধ্য স্তর যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তা নয়। প্রধান কারণ হ'ল মিশনারীদের উৎসাহকে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখতেন। তাঁদের ধারণা ছিল—শিক্ষার প্রসারের চেয়ে খৃষ্টধর্মের প্রচারই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং স্ত্রীশিক্ষার সূত্র ধ'রে খৃষ্টান মহিলারা যদি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন, তাহলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় ঘটতে পারে। এই কারণে সেই যুগে মিশনারীদের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজের অবহেলিত অসহায় স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তবু একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁরা যেটুকু সাড়া জাগিয়েছিলেন, তাতে পরবর্তীকালে কিছুটা সুফল ফলেছিল।

শ্রীমতী কার্পেণ্টার

ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই এই সময় স্ত্রীশিক্ষার পরিবর্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত। সেই যুগে এই পরিবর্তন কি ভাবে হবে, তাই ছিল

প্রশ্ন। আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; বিদেশী শিক্ষার অনুকরণ দ্বারা শিক্ষার যথার্থ ফললাভ অসম্ভব; সুতরাং ভারতীয় নারীদের জন্য এমন এক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন, যার লক্ষ্য হবে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির পরস্পরের সহযোগিতায় বিকাশ-সাধন।

তাই দেখি, সুদূর ব্রিস্টল শহরে রাজা রামমোহনের সঙ্গে যখন শ্রীমতী কার্পেন্টারের দেখা হ'ল, সেদিনও তিনি ভারতের হিত-সাধনের কথা তাঁকে শোনালেন। শ্রীমতী কার্পেন্টার বলতেন, রামমোহনই তাঁকে একাজে উৎসাহিত করেন। এদেশীয় শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্যে শ্রীমতী কার্পেন্টার বেথুন স্কুলে এক নর্মাল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে এই উদ্দেশ্যে একটি সভার আয়োজন করা হ'ল। সভায় বিদ্যাসাগর আমন্ত্রিত হলেন। এই সভায় যে কমিটি গঠিত হ'ল, বিদ্যাসাগর তার সভ্য নিযুক্ত হলেন। 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্রলেখক লিখলেন, 'মিস্ মেরি কার্পেন্টার এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনার্থ বৃদ্ধবয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয় এবং আমরা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি।'

শ্রীমতী কার্পেন্টার বাংলাদেশের বালিকা-বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হননি, তার কারণ—বিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষিকার স্থলে তিনি দেখলেন পুরুষ শিক্ষক। অথচ মেয়েদের মনের গতি পুরুষরা সম্যক্‌রূপে বুঝতে পারেন না এবং স্ত্রী-শিক্ষিকার দ্বারা মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে, পুরুষদের দ্বারা তা সম্ভব নয়। অথচ দুঃখের বিষয়, সেই অন্ধকারময় যুগে মেয়েরা যে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষকতা করবেন, এমন মেয়ের সংখ্যা খুবই কম ছিল। নারীসমাজে তখন শিক্ষা ও সংস্কারকর্মে অগ্রণী ছিলেন একমাত্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিতা ও খৃষ্টান মহিলারা। কিন্তু ব্রাহ্মিকারা যে বাইরের মেয়ে-স্কুলে শিক্ষিকাবৃত্তি গ্রহণের জন্য দলে দলে যোগদান করবেন, এ-রকম অবস্থা তখনও তাঁদের হয়নি। হিন্দুরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাকেও অনেকটা 'ধর্মান্তর' ব'লে মনে করতেন। আবার খৃষ্টানদের কাছে তাঁরা যেমন ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাইতেন না, তেমনি ব্রাহ্মিকাদের কাছেও একই কারণে মেয়েদের শিক্ষা দিতে তাঁদের আপত্তি ছিল। কাজেই এ এক মহাসমস্যার ব্যাপার হ'য়ে উঠল! শ্রীমতী কার্পেন্টার কিন্তু তাঁর মনের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন না। তিনি নানা উপায় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ হাতে ক'রে তিনি শুধু আলোর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

অ্যানি বেসাণ্ট

আর একজন মহীয়সী বিদেশিনীকে স্মরণ করি, তিনিও বিদেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষকে আন্তরিক ভালবেসেছিলেন ও ভারতবর্ষকে নিজের দেশ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট। সাধারণ মানুষ শুধু নিজের সুখদুঃখ নিয়েই কাটায়—তাই যখন মাঝে মাঝে এমন মানুষ দেখতে পাই, যিনি নিজের সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য না রেখে, অপরের সেবায় নিজের জীবন ব্যয় করেন, তখন আমাদের মন তাঁর প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধায় নত হয়।

শ্রীমতী বেসাণ্ট ছিলেন এমনি এক পরহিত-ব্রতী মহিলা। তিনি ভারতবর্ষের নরনারীর কল্যাণ-সাধনে নিজ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

তাই ভারতবন্ধুরূপে ভারতবাসী চিরদিনই তাঁর নাম মনে রাখবে। তিনি আজীবন ছিলেন অক্লান্তকর্মী মহিলা। সারা জীবন ধরে তিনি যুদ্ধ করেছেন অজ্ঞানতা অন্ধসংস্কার ও সামাজিক দুর্গতির বিরুদ্ধে। ১৮৪৭ খৃঃ ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়; পৈতৃক পদবী উড। তার প্রপিতামহ স্যর ম্যাথু উড ছিলেন লণ্ডনের লর্ড মেয়র। শ্রীমতী বেসাণ্টের প্রথম জীবন ইংলণ্ডেই কাটে, নানা মতবাদ ও কাজের মধ্যে দিয়েই ইংলণ্ডের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ হ'য়ে ওঠেন। একদিন তিনি সমস্ত ত্যাগ ক'রে থিওসফি-আন্দোলনে যোগদান করলেন। এই থিওসফিই তাঁকে নিয়ে আসে ভারতবর্ষে ১৮৯৩ খৃঃ। সেইদিন থেকে ১৯৩৩ খৃঃ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই দেশেই বাস করেন। ভারতবর্ষের পুনরুত্থানে শ্রীমতী বেসাণ্টের একটি বিশেষ স্থান আছে। প্রাচীন ভারতের সাধনায় আধুনিক ভারতবাসীর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে তিনি যথার্থ সাহায্য করেছেন।

শ্রীমতী বেসাণ্ট ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেও যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৯১৬ খৃঃ লখনউ কংগ্রেসে তাঁকে প্রথম দেখি—রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেত্রীমূর্তিতে। ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অগ্রণী। এজন্য তিনি 'হোমরুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। বিদেশী সরকার বিপদ গণলেন; শ্রীমতী বেসাণ্টকে কারারুদ্ধ করা হ'ল। সারাদেশে দেখা দিল তুমুল বিক্ষোভ। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত হলেন, তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধে। সরকার বেসাণ্টকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন। ১৯১৭ খৃঃ তিনি কলকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন। কাজে ও কথায় ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁর লেখা বহু পুস্তকের মধ্যে তিনি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ক'রে গেছেন।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। বিপদে পড়ে যে কেউ তাঁর কাছে গেছে—পরিচিত হ'ক, অপরিচিত হ'ক, প্রাণপণে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। তাতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। শ্রীমতী বেসাণ্ট ভক্তের মতো ভারতবর্ষের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর যেদিন সেই কর্মবহুল জীবনের অবসান হ'ল, সেদিনও তিনি আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। মৃত্যুকালেও তিনি ভারতবাসীর জন্য চিন্তা করেছেন। ভারতবাসী চিরদিনই এঁদের মতো মহীয়সী মেয়েদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে বলবে, 'মরণ-সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।'

বেদান্ত ও সূফীমতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সকল দেশের দর্শন-শাস্ত্রেরই একটি মূলীভূত সমস্যা হ'ল—সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ দর্শন ও ধর্মতত্ত্বে ঈশ্বরকে গ্রহণ করা হয় একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যমুক্ত সত্তা, সত্য বা তত্ত্বরূপে। তাহলে তাঁর পক্ষে কোনরূপ কর্ম করা সম্ভব হয় কিরূপে? কারণ, সাধারণ কর্মের মূলে থাকে একটি অভাব-বোধ, একটি অপ্রাপ্ত বস্তুলাভের আকাঙ্ক্ষা, একটি অপূর্ণ ইচ্ছা-পূরণের আশা, একটি অসিদ্ধ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণা। কিন্তু পরমেশ্বরের ক্ষেত্রে কোনরূপ অভাব, অপ্রাপ্ত বস্তু, অপূর্ণ ইচ্ছা বা অসিদ্ধ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব তো অসম্ভব। সেজন্য সৃষ্টিরূপ কর্ম তাঁর ক্ষেত্রে সম্ভবপর হবে কিরূপে—এই হ'ল দর্শনের একটি দুরূহতম প্রশ্ন।

সূফী ও বেদান্ত দর্শনে কিভাবে এই সুকঠিন সমস্যার সমাধান করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে সূফীগণ একটি সুবিখ্যাত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেন। সেটি হ'ল এই:

ডেভিড প্রশ্ন করলেন, 'হে প্রভু! আপনি কি কারণে মানবজাতি সৃষ্টি করেছেন?' ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'আমি একটি গুপ্ত ধনতুল্য এবং আমি জ্ঞাত হ'তে ইচ্ছা করি।'

সূফীদের মতে, এই সুন্দর বাক্যটি থেকেই সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য কিছু স্পষ্ট হয়। এরূপে, এই মতানুসারে পরমেশ্বর এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে-ছেন এবং শেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তার কাছে জ্ঞাত হ'তে পারেন। বিশ্বাত্মবাদী সূফীদের মতে, এর অর্থ হ'ল এই যে, মানবের ঈশ্বরকে জানাই ঈশ্বরের নিজেকে জানা। এইভাবে ঈশ্বর নিজের সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে জানতে ইচ্ছুক হন, নিজের স্বরূপকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত করতে উদ্‌গ্রীব হন। সেইজন্যই তিনি তাঁর নিগুর্ণ, নির্বিশেষ, 'কেবল' অবস্থা পরিত্যাগ ক'রে, সগুণ, সবিশেষ রূপ ধারণ ক'রে এই বৈচিত্র্যময় জগতে আত্মপ্রকাশ করেন, এবং স্বীয় স্বরূপের শ্রেষ্ঠ বিকাশরূপে পরিশেষে মানব সৃষ্টি করেন। এই মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পান, মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে জানতে পারেন, এই মানবের মধ্যেই তিনি নিজেকে পূর্ণ করেন। এইভাবে এই সম্প্রদায়ের সূফীদের মতে, এই বিশ্ব পরমেশ্বরের দর্পণস্বরূপ। কিন্তু আমরা জানি যে, কেবল দর্পণ থাকলেই হয় না, সেই দর্পণটি বস্তু-প্রতি-ফলনের যোগ্য হওয়া চাই। অর্থাৎ তাকে হ'তে হবে পরিষ্কৃত, যেহেতু অপরিষ্কৃত দর্পণের সম্মুখে কোন বস্তু থাকলেও তা তাতে প্রতিফলিত হ'তে পারে না। সেইজন্যই সমগ্র জগৎই পরমেশ্বরের দর্পণ হলেও তাতে তাঁর পূর্ণ রূপটি প্রতিফলিত হ'তে পারে না, যেহেতু তা একটি মলিন-দর্পণ-তুল্য মাত্র। এই কারণে জগতে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ প্রকাশিত হ'তে পারে না, কেবল কয়েকটি মাত্র গুণই প্রকাশিত হয়।

মানবেই পরমেশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, মানবের মধ্যেও স্তরভেদ আছে, এবং সেজন্য মানবে ঈশ্বরের প্রকাশও সকল ক্ষেত্রে সমান নয়। শ্রেষ্ঠ মানব হলেন 'পূর্ণ মানব' বা জীবন্মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষ, যিনি স্বীয় সাধনবলে এই জগতেই,

এই জীবনেই ঈশ্বরের সঙ্গে স্বীয় অভিন্নতা উপলব্ধি ক'রে ধন্য হয়েছেন। ইনিই হলেন ঈশ্বরের শুদ্ধতম সুন্দরতম উজ্জ্বলতম দর্পণ, যাতে তাঁর শুদ্ধতম, সুন্দরতম, উজ্জ্বলতম রূপটি শুদ্ধতম সুন্দরতম উজ্জ্বলতম ভাবে প্রতিফলিত হয় এক অপরূপ মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে।

এইভাবে এরূপ 'পূর্ণ মানবের' মধ্যেই পরমেশ্বর নিজেকে পূর্ণভাবে জানেন, এবং সেজন্য নিজেকে জানবার এই ইচ্ছা থেকেই জগতের সৃষ্টি। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়ে তিনি যেন নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, এবং একাধারে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, প্রেমিক ও প্রিয় হন। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি ক'রে পরমজ্ঞানঘন, পরমপ্রেমময় পরমেশ্বর নিজেকেই নিজে জানছেন, নিজেকেই নিজে ভালবাসছেন। এই স্ব জ্ঞান, এই স্ব-প্রেমই হ'ল জগৎসৃষ্টির মূল রহস্য।

এস্থলে কয়েকটি মূলীভূত, দার্শনিক-প্রশ্নের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ, ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপ কার্যটি কি অভাবমূলক? দ্বিতীয়তঃ, জীবের দিক্ থেকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

প্রথম প্রশ্নের কথা ধরা যাক। এস্থলে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর নিজেকে নিজে জানবার জন্য, নিজেকে নিজে ভালবাসবার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেন। সেক্ষেত্রে একথাও স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, পূর্বে পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমের অভাব ছিল, অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণভাবে জানতেন না বা ভালবাসতেন না। পরে এই জ্ঞানাভাব ও প্রেমাভাবের দ্বারা চালিত হ'য়ে তিনি জগৎসৃষ্টিরূপ-কার্যে প্রবৃত্ত হন, এবং জগৎসৃষ্টি-দ্বারা সেই অভাব দূর ক'রে তৃপ্ত হন। তাহলে তাঁকে 'নিত্যতৃপ্ত' ও 'আপ্তকাম' বলা যায় কি ক'রে?

এর উত্তরে সূফীরা বলেছেন যে, সৃষ্টিরূপ কার্যটি অভাবমূলক নয়, স্বভাবমূলক। পরমেশ্বর নিশ্চয়ই শাশ্বতকাল সর্বজ্ঞ ও অনন্তপ্রেমস্বরূপ, এবং জগৎ সৃষ্টি ক'রে যে তিনি নূতন কিছু লাভ করেন, নূতন কোন জ্ঞান ও প্রেম প্রাপ্ত হন, তা নয়। সর্বজ্ঞরূপে ও অনন্তপ্রেমস্বরূপে তিনি সর্বদাই পূর্ণভাবে নিজেকে জানেন, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পুনরায় নিজেকে জানতে চান অন্যের মাধ্যমে, মানবের মাধ্যমে, 'পূর্ণ মানবে'র মাধ্যমে। কেন জানতে চান? তাঁর স্বভাবের জন্য। কি সেই স্বভাব? এ প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর আমরা পাই না সূফী-দর্শন থেকে। তার জন্য আমাদের যেতে হয় বেদান্ত-দর্শনের নিকট।

বেদান্ত-দর্শনে এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ অবতারণা করা হয়েছে সেই সুবিখ্যাত 'লীলা বাদে'র। 'লীলা' কি? 'লীলা' একটি অদ্ভুত অতুলনীয় কর্ম। কারণ পূর্বেই যা বলা হয়েছে, প্রত্যেক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধিজাত কর্মের পশ্চাতেই থাকে একটি উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রেরণা। কিন্তু 'লীলা' স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধিজাত কর্ম হলেও তাতে কোনরূপ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির বা অভাব পূর্ণ করবার তাগিদ নেই। উপরন্তু সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে, সকল অভাব পূর্ণ হ'লে যে আনন্দের উদ্ভব হয়, সেই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশমাত্র 'লীলা'। এরূপে 'লীলা' অভাব বা অপূর্ণতার দ্যোতক নয়; উপরন্তু পরিপূর্ণতারই প্রমাণ।

একই ভাবে বেদান্ত মতে, সৃষ্টিরূপ কর্মটিও শ্রীভগবানের 'লীলা' বা খেলা মাত্র। পরিপূর্ণ আনন্দরসঘন পরমেশ্বরের কোনরূপ অভাব নেই, অপ্রাপ্ত লক্ষ্য নেই, অতৃপ্ত কামনা নেই, আছে কেবল অনন্ত অসীম অতুলনীয় আনন্দ, অমৃত, রস ও সুধা। সেজন্যই তিনি লীলাভরে খেলাচ্ছলে সেই আনন্দ, অমৃত, রস ও সুধা প্রকাশ করছেন নিত্য নিয়ত; এবং এই

প্রকাশই জগৎ। এই কারণে উপনিষদ্ অতি সুন্দরভাবে বলছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিবিশন্তীতি। —আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়।

এইভাবে, আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বর লীলা-স্বরূপ, এবং লীলা স্বভাবতই দ্বৈতমূলক, যেহেতু একাকী খেলা হয় না, খেলার জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ দুজন। এই কারণেই পরম লীলাময় শ্রীভগবানকেও নিজের খেলার সঙ্গী অনুসন্ধান ক'রে নিতে হয় নিজেরই মধ্যে—তিনি তো সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, তাঁর বাহিরে দ্বিতীয় আর কে আছে? এরূপে পরমানন্দময়, পরমলীলাময় স্বভাববশেই এক শাশ্বত খেলায় মত্ত হ'য়ে রয়েছেন নিজের সঙ্গেই নিজে। এই খেলাকেই আমরা বলি 'সৃষ্টি' এবং সেজন্য 'সৃষ্টি' অভাবমূলক নয়, স্বভাবমূলক।

এই হ'ল বৈদান্তিক লীলাবাদের মূল কথা, এবং অদ্বৈতবাদিগণও ব্যাবহারিক দিক্ থেকে মায়াবাদ গ্রহণ করেছেন।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নটি ধরা যাক। জীবের দিক্ থেকে 'সৃষ্টির' উদ্দেশ্য কি? উপরে যে সূফী-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মতে, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হ'ল—ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত বা প্রতিফলিত করা। কিন্তু তাতে এরূপ অসংখ্য বৈচিত্র্য ও বিভেদ দৃষ্ট হয় কেন? অর্থাৎ এরূপ বিভিন্ন স্বরূপগুণশক্তি-বিশিষ্ট জীব সংসারে সৃষ্টি হয় কেন? এই বিষয়েরও কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূফী-দর্শনে নেই; এবং পূর্বের ন্যায় এস্থলেও আমাদের বেদান্তেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

এই প্রসঙ্গেই আমরা পাই বেদান্তের, তথা ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব 'কর্মবাদ'। কর্মবাদানুসারে, সকাম কর্মের যথোপযুক্ত ফল কর্মকর্তাকে ভোগ করতেই হয়—আজ না হয় কাল, এজন্মে না হয় পরজন্মে। সেজন্য পূর্ব জন্মের সঞ্চিত সকাম-কর্মের ফলানুসারেই হয় পরজন্মে বিভিন্ন জীবের সৃষ্টি; এবং ঈশ্বরকে সেজন্য কোনক্রমেই 'বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য-দোষে' অভি-যুক্ত করা চলে না। অর্থাৎ, জীবের কর্মানু-সারেই সৃষ্টি করেন ব'লে তিনি পক্ষপাতদোষহীন, এবং জীবের কর্মানুসারেই তার সুখদুঃখ হয় ব'লে ঈশ্বর নিষ্ঠুরতা-বর্জিত। এইভাবে বেদান্ত-মতে, কর্মবাদ ন্যায়ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। কারণ ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই কৃত সকামকর্মের ফলভোগ কর্মকর্তাকে করতেই হবে, না হ'লে বিচার ক'রে, স্বেচ্ছায় কর্ম করেও তার যথাযোগ্য ফলভোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারলে তাতে ন্যায়ের মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে নিশ্চয়ই, মহিমাও ক্ষুণ্ণ হবে অনিবার্য ভাবেই। সেজন্য বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্বে, 'লীলা' ও 'ন্যায়' চলেছে একই সঙ্গে, একই তানে লয়ে ছন্দে। এইভাবে ঈশ্বরের দিক্ থেকে যা 'লীলা' (Play), জীবের দিক্ থেকে তা 'ন্যায়' (justice)।

কিন্তু 'লীলা' তো স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দোদ্বেল, স্বভাবজ ক্রিয়া; 'ন্যায়ের' বন্ধন তাতে থাকতে পারে কিরূপে? অর্থাৎ সৃষ্টি যদি ভগব-ল্লীলাই হয়, তাহলে তা পুনরায় জীবকর্মানুসারী হবে কিরূপে? সেজন্য লীলাবাদ ও কর্মবাদ কি পরস্পরবিরোধী নয়?

না, তা নয়, যেহেতু দুটিই হ'ল ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব। বস্তুতঃ লীলা বা খেলার একটি প্রধান লক্ষণ যেমন হ'ল স্বতঃস্ফূর্ততা, অন্য দুটি প্রধান লক্ষণও হ'ল তেমনি বিচিত্ররূপতা ও নিয়মানুবর্তিতা। লীলা হয় নানাভাবের, লীলারও আছে নিয়ম ও

শৃঙ্খলা, প্রকৃত লীলা উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল নয়। সেজন্য ঈশ্বরও নানাভাবে লীলা করেন, নিয়মানুসারেই লীলা করেন; এবং এর থেকেই হয় নানা জীবের সৃষ্টি, তাদের স্ব-স্ব কর্মের নিয়মানুসারে।

ভারতীয় লীলাবাদ সম্বন্ধে আরও বহু আলোচনা করা চলে। এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সে সবের স্থান নেই। তবে একটি বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা হচ্ছে। উপরে বলা হয়েছে যে লীলা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, বিচারজাত কর্ম, অথচ স্বভাবজাত। কিন্তু যা স্বভাবজাত, তার ক্ষেত্রে ইচ্ছারই বা অবকাশ কোথায়, আর বিচার-বিবেচনারই বা প্রসঙ্গ কই? তা তো কেবল একটি জ্ঞান- ও ইচ্ছা-বিহীন প্রাকৃতিক কর্ম মাত্র। যেমন—বীজ স্বভাববশে অঙ্কুরে পরিণত হয়—এ তার স্বভাব ব'লে এর অন্যথা হ'তে পারে না, এবং সেক্ষেত্রে ইচ্ছা, বিচার, বিবেচনা প্রভৃতির প্রশ্নই ওঠে না। একই ভাবে—ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিরূপ কর্মটিও জ্ঞান- ও ইচ্ছা-বিহীন, প্রাকৃতিক কর্ম মাত্র।

কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা চলে যে, ঈশ্বরের কর্ম প্রাকৃতিক কর্ম বা পশুজগতের বুদ্ধিবিবেচনাহীন কর্ম কোনক্রমেই নয়। এটি স্বভাবজ এই অর্থে যে, স্বভাবের পূর্ণ বিকাশ এতে। এই স্বভাব কি বা ঈশ্বরের স্বভাব কি? স্বভাব কেবল আনন্দ নয়, সেই সঙ্গে জ্ঞান শক্তি প্রভৃতি অসংখ্য লক্ষণও সমভাবে স্বভাব। সেজন্য স্বভাবের যখন প্রকাশ হয়, তখন আনন্দের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও প্রকাশ হয়, ইচ্ছারও প্রকাশ হয় বা শক্তিরও প্রকাশ হয়। এই কারণে পরমেশ্বরের এই সৃষ্টিরূপ কার্য একাধারে তাঁর অপরিসীম আনন্দ, অতুলনীয় জ্ঞান, অচিন্তনীয় শক্তি প্রভৃতির একটি সুন্দর, সুষ্ঠু সমাহার মাত্র।

দর্শনশাস্ত্রের প্রধান জিনিস নিশ্চয়ই বিচার, আলোচনা, যুক্তি, তর্ক। কিন্তু প্রধানতম জিনিস এই সকলের অপেক্ষা আরও অনেক বেশী, আরও অনেক বড়—তা হ'ল স্থির ধীর সাক্ষাৎ উপলব্ধি। সেজন্য সকল বিচারালোচনা অতিক্রম ক'রে সুফী-প্রেমতত্ত্ব ও বেদান্ত-লীলাতত্ত্বের প্রকৃত মহিমা ও মাহাত্ম্য যেন আমরা উপলব্ধি ক'রে ধন্য হ'তে পারি। এই মহিমা, এই মাহাত্ম্য হ'ল এই যে, আপাতদৃষ্টিতে যাই হ'ক না কেন, প্রকৃতপক্ষে জগৎ প্রেম ও আনন্দের মূর্ত প্রতীক; কারণ পরমপ্রেমময়ের প্রেমের প্রকাশ এই জগৎ, পরমানন্দময়ের আনন্দের বিলাস এই জগৎ। তা কি কখনও হিংসা-দ্বেষ-দূষিত হ'তে পারে, ক্লেশ-ক্লেদ-কলুষিত হ'তে পারে? না, কদাপি নয়। সেজন্য ভগবৎ-সুধাপানে ধন্য সুফী মরমিয়া ভক্তগণ ও বৈদান্তিক পথপ্রদর্শক আচার্যগণ একবাক্যে বলেছেন যে, এই ধরণীরই ধূলিতে ধূলিতে, এই মর্ত্যেরই মাটিতে মাটিতে, এই সংসারেরই সংসরণশীল বস্তুতে বস্তুতে লুকিয়ে আছেন সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রীভগবান তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে, মাধুর্যে, ঐশ্বর্যে। তাঁকেই আমাদের খুঁজে নিতে হবে, চিনে নিতে হবে, মেনে নিতে হবে, টেনে নিতে হবে মোহাবরণ ভেদ ক'রে—দেখতে হবে যে, সংসার মায়া নয়, তাঁরই কায়া; মোহ নয়, তাঁরই স্নেহ; পাপ নয়, তাঁরই ছাপ; শোক নয়, তাঁরই আলোক। এই 'খোঁজাই' তো পরমা সাধনা, এই 'দেখাই' ত পরমা সিদ্ধি। সুফী প্রেমবাদ ও বেদান্ত-লীলাবাদের মধ্যে এই মধুর-মোহন, নিত্য-নূতন মহাসত্যের আভাস পেয়ে আমরা পরম ধন্য।

ছাত্র-সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা

স্বামী তেজসানন্দ

উচ্ছৃঙ্খলতা আজ কেবল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই, উচ্চ পদাধিকারী সরকারী কর্মচারী হইতে নিরক্ষর পথচারী পর্যন্ত সকলের জীবনেই ঘোর অরাজকতা নামিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ সমাজের এমন একটি কর্মকেন্দ্র নাই, যাহা এই দুষ্ট ব্যাধির কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, সত্যাগ্রহ, গুণ্ডামি, ট্রেন-ট্রাম-বাস পোড়ানো, স্কুল-কলেজের চেয়ার-টেবিল ভাঙা, বিধানসভায় পরস্পরের প্রতি পাদুকা-নিক্ষেপ প্রভৃতি নানা কদর্য আকারে এই ব্যাধির লক্ষণগুলি আজ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। দেশব্যাপী এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ যাহাই হউক না কেন, জাতীয় জীবনের দিকচক্রবালে আজ উহা এক ঘন কালো মেঘরূপে দেখা দিয়াছে। ভাবপ্রবণ এবং তরলমতি ছাত্রসমাজ যে এই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে, ইহা আশা করা যায় না।

যে সকল বিদ্যায়তনে একদিন ছাত্রসমাজ কল্যাণকর শিক্ষার সাধনায় নিযুক্ত থাকিত, সে সকলই বর্তমানে দুর্নীতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতা ক্রমশঃ এমন একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে যে কালক্রমে সমস্ত সমাজসৌধই শিথিলভিত্তি হইয়া তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িবে। দেশের যুবসমাজ এই দুষ্ট বিশৃঙ্খলা-ব্যাধি হইতে অব্যাহতি না পাইলে বা অদূর ভবিষ্যতে সমাজজীবনে স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে সদ্যোজাগ্রত জাতির অপমৃত্যু যে আসন্ন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

অভিভাবকের দায়িত্ব

নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া আমরা যদি কারণগুলি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখা যাইবে যে এই দুঃখকর পরিস্থিতির জন্য ছাত্রগণের সহিত অভিভাবকগণও কম দায়ী নহেন। বর্তমান অধিকাংশ স্কুলকলেজের ছাত্রই পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রবাহ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে একান্ত অক্ষম, ইহার কারণ শিক্ষকগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবিকা অর্জনে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন এবং অভিভাবকগণও তাঁহাদের সামাজিক ও পারিবারিক বহুতর সমস্যায় সর্বদাই বিব্রত। একটি ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলিকে ঠিক ঠিক ভাবে সমন্বিত করিবার জন্য যে সময় এবং সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা অভিভাবকগণের অধিকাংশেরই আয়ত্তের বাহিরে। বলিতে কি বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজজীবনে ইহা একটি মারাত্মক ত্রুটি।

ছাত্রের চরিত্রগঠনে পারিবারিক জীবনের প্রভাব

অনেক অভিভাবককে আজকাল সমালোচনা করিতে শোনা যায় যে ইদানীংকালে শিক্ষকগণ ছাত্রের মানসিক উন্নতি-বিধানে ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ছাত্রের মানসিক শিক্ষায় তথা চরিত্রগঠনে তাঁহাদের নিজেদেরও দায়িত্ব কোন অংশে কম নহে। পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে সদাচার, মহত্ব, ধীরত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলির অনুশীলন দ্বারা কোন অভিভাবকই আজ আর তাঁহার সন্তান-সন্ততির নিকট আদর্শ-স্বরূপ নহেন। অধিকন্তু বর্তমানের পারিবারিক জীবনে পুরাতনকালের সেই পবিত্র পরিবেশ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা-

পদ্ধতির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা যেন আজকাল মরুভূমির মধ্যে পুষ্পোদ্যান রচনা করিবার এক অলস কল্পনায় মাতিয়া আছি। প্রকৃতির মধ্যে যে নিয়ম, মনুষ্যসমাজও সেই একই নিয়মের অধীন। একটি বালকের জীবন ও চরিত্রগঠনের পক্ষে তাই পারিবারিক জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই বিশৃঙ্খলার দিনে শিক্ষকদের আদর্শচ্যুতি ও কর্তব্যচ্যুতির জন্য অভিভাবকগণ যদি জনমতের বিচারালয়ে উপস্থিত না হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা-রক্ষায় সচেতন হইয়া উঠিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, বিশৃঙ্খলা-দমনের প্রচেষ্টা বেশী ফলপ্রসূ হইত।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণের সমবেত প্রচেষ্টার আবশ্যকতা

একটি পাখীকে মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে হইলে তাহার পক্ষে একজোড়া ডানাই যথেষ্ট নহে, উহার অগ্রভাগ অর্থাৎ মস্তক এবং পশ্চাদ্ভাগ অর্থাৎ পুচ্ছ—এই দুটিও সমভাবে প্রয়োজনীয়। মুক্ত আকাশ-বিহারে পাখীর এই মাথা, পুচ্ছ ও ডানা—এই তিনের সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়। একটি বালকের শিক্ষার জন্যও প্রয়োজন অনুরূপ সমন্বয়ের। শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিকতার দ্বারা যদি একটি বালকের জীবনকে বিকশিত করিতে হয় তবে প্রয়োজন হয় অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী—এই তিনজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার। শুধু তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রয়োজন হয় একটি শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ও শান্ত পরিবেশ-বিশিষ্ট শিক্ষায়তনের। এই উপাদানগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটিলে আশানুরূপ ফললাভ অসম্ভব হইয়া উঠে।

অবসর-সময়ের অপব্যবহার

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় ত্রুটি এই যে, স্কুল বা কলেজের সময়ের পূর্বে বা পরে শিক্ষার্থীর মনকে সৃষ্টিধর্মী ও গঠনমূলক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখার মতো বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। ইহার স্বাভাবিক ফল এই যে শিক্ষার্থী উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধার অভাবে এমন সব অবাঞ্ছিত চিন্তায় ও কাজে জড়াইয়া পড়ে যাহা সুশৃঙ্খল জীবনের একান্ত পরিপন্থী। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শতকরা নব্বই জন শিক্ষার্থী স্কুল ও কলেজের শিক্ষালাভের পূর্বে ও পরে দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য কোনরূপ ক্ষেত্র বা সুযোগ পায় না। বয়ঃসন্ধিসময়ে শিক্ষার্থীর তরুণমনকে উপযুক্ত গঠনমূলক কাযে নিযুক্ত না করিয়া কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে বদ্ধ করিয়া রাখা বিশেষ ক্ষতিকর।

ছাত্রসংসদগুলির উপর রাজনৈতিক প্রভাব

অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ছাত্রপরিষদগুলি রাজনৈতিক চিন্তাধারার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। সব সময় না হইলেও অধিক সময়েই এই ছাত্রসংস্থা-সমূহ এমনই সব সুচতুর রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কবলে পতিত হয়, যাহারা অল্পকালের মধ্যেই ছাত্রদের সহায়তায় ঐসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ফেলে। ইহা বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত ছাত্রসংগঠনগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক। শুধু তাহাই নহে, এই ছাত্রসংগঠনগুলির স্থিতি ও স্থায়িত্বের মূল্য বিচারে উহাদের সাংস্কৃতিক অবদান কতখানি উহাই বিবেচ্য হওয়া উচিত। এই ছাত্রপরিষদগুলি পুনর্গঠিত হইয়া যত শীঘ্র উন্নততর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া উঠিবে, ছাত্র-সমাজের শৃঙ্খলাও তত ত্বরান্বিত হইবে।

শিক্ষকগণের দায়িত্ব

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ সম্পর্কে বলিতে গিয়া ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী মন্তব্য করিয়াছেন :

বর্তমান পরিস্থিতির চূড়ান্ত বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে ইহার জন্য একদিকে যথাযথ কর্তব্য সাধনে পিতামাতার যেমন অক্ষমতা রহিয়াছে, অন্যদিকে ছাত্রের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণে শিক্ষকের অক্ষমতাও তেমনি বর্তমান। ইহা সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক যে বহুক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিজেরাই ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া বহু রাজনৈতিক নেতাও আছেন, যাঁহারা এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া ছাত্রগণকে স্ব স্ব রাজনৈতিক মতের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সমাজবিরোধী কাজে ছাত্রগণকে নিযুক্ত করিতে শিক্ষকের উৎসাহ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনে ছাত্রদের নিয়োগ করিতে নেতাদের আগ্রহ—এই দুইটি ঘটনার মতো ঘৃণ্য অপরাধ আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যথার্থই বলা হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহাই অনুকরণ করিয়া থাকেন। কালাকাল বিবেচনা না করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক শ্লোগান সহকারে বিভ্রান্ত রাজনৈতিকগণের মতো, শিক্ষকগণও পথে পথে এই যে ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা প্রভৃতি পরিচালনা করেন, এইগুলি শিক্ষকের মহৎ জীবনব্রতকে বিদ্রূপ করে। স্কুল-কলেজে শিক্ষকগণকে এই সব কার্যে ইন্ধন যোগাইতে দেখিয়াও ছাত্রগণ নীরব দর্শক হইয়া থাকিবে, ইহা আশা করা একান্ত অসমীচীন।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসমস্যার জরুরী আলোচনার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ত্রিগুণা সেন ১৯৫৯ খৃঃ ৬ই নভেম্বর কলিকাতার শিক্ষাবিদ্‌দের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে যাঁহারা যোগদান করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং কলিকাতার কয়েকটি কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষগণ। এই সম্মেলন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে অতঃপর কলেজ-শিক্ষকদের কোন রাজনৈতিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা কলেজের ছাত্রদের সমক্ষে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। পরন্তু শৃঙ্খলা-রক্ষায় এবং বিশৃঙ্খলা দমনে তাঁহাদের ভূমিকা সক্রিয় হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক অথবা অন্য কোন অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে ছাত্রেরা লিপ্ত হইয়া পড়িলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে তাঁহাদের ঐ গুলির প্রতিবিধান করা উচিত। কলেজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কেবলমাত্র অধ্যক্ষেরই দায়িত্ব, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। এ-বিষয়ে শিক্ষকগণ অধ্যক্ষের সহিত সমভাবে জড়িত। কেন না, ছাত্রগণকে উপযুক্ত নৈতিক শিক্ষা দিবার দায়িত্ব তাঁহাদেরও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য

ইহা একটি গুরুতর পরিস্থিতি যে অনেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের দুরূহতার (কল্পিত অথবা প্রকৃত) অজুহাতে পরীক্ষাগ্রহণকালে ছাত্রেরা হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া ক্ষণিকের মধ্যেই চরম তাণ্ডবলীলার অবতারণা করে। বলা বাহুল্য, পাঠ্যতালিকাগুলির সহিত সুপরিচিত সুযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রশ্নপত্র রচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং অভিজ্ঞ প্রশ্ন-নিয়ন্ত্রণকারীদের (moderator) দ্বারা ঐ প্রশ্নপত্রের মান এমন ভাবে নিয়মিত হওয়া সঙ্গত, যাহাতে এই বিষয়ে ছাত্রদের কোন প্রকার ক্ষোভ বা অভিযোগের

অবকাশ না থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্রদের অভিযোগ যুক্তিযুক্ত হইলে তাহার তদন্ত করা উচিত। কিন্তু ছাত্রগণের আইনশৃঙ্খলাভঙ্গের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের স্বাভাবিক কর্মধারা বিঘ্নিত হইবে—ইহা কোন মতেই বরদাস্ত করা উচিত নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট ইহা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়, কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচিত হইয়াছে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহার উত্তর দেওয়া অসম্ভব, বা প্রশ্নপত্রসমূহ পাঠ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত নহে, বা পরীক্ষাবিধির সহিত উহার কোন সামঞ্জস্য নাই, বা প্রশ্নপত্রের মান নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে বা অন্য কোন কারণে ছাত্রদের প্রতি অবিচার হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে সিণ্ডিকেট ঐ সমস্ত বিষয়গুলির সংশোধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই নিয়মের ভিত্তিতে পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার ও যথাসময়ে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষার্থীদিগকে জানাইয়া থাকেন: প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিলে তাহারা পরীক্ষাগ্রহণকালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বা দলবদ্ধভাবে পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ না করিয়া পরীক্ষাশেষে লিখিতভাবে ঐ বিষয়ে অভিযোগ পেশ করিবে। বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টির দ্বারা কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থী এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে সে উহা নিজ দায়িত্বেই করিবে। এই সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার্থীগণ যদি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ অবশ্যই চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই ব্যবস্থা-গ্রহণে সামান্যতম কুণ্ঠা ও দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য। যে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্গিরণ করিতেছে, তাহার মুখে কয়েক ফোঁটা জল দিলে উহার অগ্ন্যুদ্গার নিবৃত্ত হইবে না। তাই চরমতম বিশৃঙ্খলা-দমনে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য।

প্রাইভেট ও নন কলেজিয়েট পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতাবিচার

পরীক্ষাকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলাকারীদের মধ্যে এমন সব ছাত্র থাকে যাহারা নির্বাচনী (test) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া পরীক্ষাদানের অনুমতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ফি প্রভৃতি জমা দিয়া এবং কাগজপত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক কর্তব্যগুলি শেষ করিয়া অত্যন্ত অযোগ্য পরীক্ষার্থীও পরীক্ষাদানের অনুমতি লাভ করিয়া থাকে। এই সব পরীক্ষার্থীরা যখন পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার পায় তখন পরীক্ষাগ্রহণের গাম্ভীর্য ও তাৎপর্য যে অনেকাংশেই ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ-কথা অনস্বীকার্য যে ক্ষেত্রবিশেষে নিয়মের শিথিলতা অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু নন-কলেজিয়েট বা প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ পরীক্ষার্থীদের মতো সময়, অর্থ ও শক্তি ব্যয়ের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, সেখানে নিয়মের এই আত্যন্তিক শিথিলতার অর্থ কী, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পরীক্ষাগ্রহণকালে পরীক্ষার্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য এই নিয়মশৈথিল্য বহুলাংশেই দায়ী।

সহশিক্ষা

সহশিক্ষা-ব্যবস্থা ছাত্রসমাজের সাম্প্রতিক শিক্ষাজীবনের ভারসাম্যকে বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। এই বিষয়ে মতভেদ

থাকিলেও স্কুল বা কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা যে তরুণদের নৈতিক স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি ঘটাইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পাশ্চাত্য দেশীয় এই সহশিক্ষা ভারতীয় জীবনের একান্ত প্রতিকূল। এই বিজাতীয় শিক্ষাদর্শকে পরিবর্তিত করিয়া ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষাদানের যে প্রাচীন ঐতিহ্যসম্মত ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার পুনঃপ্রবর্তন একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তৎপরতা জাতির বিশেষ কল্যাণকর হইবে।

ভারতের সনাতন শিক্ষাদর্শ

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনের মোহে পড়িয়া জীবনের যথার্থ মূল্যমান আমরা ত্যাগ করিয়াছি। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক নীটশের (Nietsche) ভাষায়, 'জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তগুলি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সর্বাপেক্ষা নীরব ও শান্ত; কোলাহল ও চাঞ্চল্যের মুহূর্তগুলি নহে। জীবনের মূল্যায়নে ও গতি-নির্ণয়ে যাহাদের নূতনতর দৃষ্টি আছে, জগৎ তাহাদেরই অনুবর্তী হয়; কর্মকোলাহলের পথে যাহাদের গতি, তাহাদের নহে।'

কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে গঠিত আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার্থীদের অসহিষ্ণুতা ও কোলাহলপ্রিয়তার পোষকতা করিতেছে, যেন শিক্ষায় ও কর্মে নিভৃত ও নীরব অনুশীলনের পরিবর্তে কোলাহল ও অরাজকতা দ্বারাই আমাদের জীবনের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করা সম্ভব। ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয় যে জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া ছাত্র-সমাজ দিন দিন জাতীয় ঐতিহ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে 'সংস্কৃত সাহিত্য', তাহাই আজ বর্তমান ছাত্রসমাজ কর্তৃক সম্পূর্ণ অবহেলিত। আমরা বিপজ্জনক পথে চলিয়াছি। এই ভ্রান্তির নিরাকরণ যত দ্রুত হয়, ততই মঙ্গল। পাঠ্য ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তনের ফলে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোটি শোচনীয় ভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে আমাদের শাস্ত্রসমূহে তরুণ-শিক্ষার্থীর মনে নীতিশিক্ষাকে স্থায়ী ও গভীর করিবার জন্য শিশুকাল হইতেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইত:

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। 'জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্।' 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।' 'মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।' 'যান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।'

—শাস্ত্র ও আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়।…আমাদের জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক। কর্ণদ্বয়ে যেন বহু (ব্রহ্মকথা) শুনিতে পাই। …সত্য ও ধর্ম হইতে যেন কখনও বিচ্যুত না হই। মঙ্গলজনক কার্যে যেন ভ্রান্তি (শৈথিল্য) উপস্থিত না হয়। মাতা, পিতা, আচার্য ও অতিথিকে সর্বদা দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে।—আচার্যগণের অনিন্দিত কর্ম সকলই অনুষ্ঠেয়—অপরগুলি নহে। যাহা তাঁহাদের সদাচার, তাহাই অনুকরণীয়,—অপরগুলি নহে।

বস্তুতঃ যদি আমরা ছাত্রসমাজের বিশৃঙ্খলা-দমনে আগ্রহী হই, তবে শিক্ষা-পরিকল্পনায় এই অনুশাসনগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করিয়া রাখিয়া আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা কোনদিনই সম্ভব নহে।

বিদ্যায়তনে ছাত্রসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ

কলেজগুলিতে ছাত্রস্ফীতি সাম্প্রতিক কালের অপর একটি বৃহৎ সমস্যা। এই অবস্থার

অবসান ঘটাইতে হইলে বড় কলেজগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিকেন্দ্রীকৃত করা বিশেষ প্রয়োজন। ছাত্রগণকে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আনিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য, হয়তো ইহার ফলে কয়েকটি কলেজের পক্ষে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে এবং সরকারকেও একটি বড় রকমের আর্থিক ঝুঁকি লইতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ইহাকে জাতির উন্নতির জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন বলিয়াই বলিব। কেননা, দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলার মুখে ছাত্রসমাজকে সংহত করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। জাতির হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই যদি তরুণসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী না হন, তবে জাতির দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মশিক্ষা-প্রবর্তনের বিষয়ে আজকাল একটি মতবিরোধ বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পুরাতন জীর্ণ মতবাদ হিসাবে ইহা সর্বথা পরিত্যাজ্য। এইরূপ চিন্তাধারা যে সমাজের চরম অকল্যাণকর মনোবিকার মাত্র, এ বিষয়ে স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিমাত্রই একমত হইবেন। ইহা ভুলিলে চলিবে না যে ভারতের সুদৃঢ় জাতীয় জীবন ভারতীয় মনীষিগণের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকেই ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যে-ধর্ম আমাদের জীবনকে এত কাল অব্যাহত গতি দিয়াছে, তাহাকে বিসর্জন দিলে আমরা আমাদের ঐতিহ্যময় অতীত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব, ইহা বলাই বাহুল্য। স্বামী বিবেকানন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যথার্থই বলিয়াছেন, 'ধর্ম—কেবল ধর্মই ভারতের জীবনের একমাত্র ভিত্তি। রাজনীতি, সমাজনীতিতে উন্নতি—এমন কি কুবেরের ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারত যদি ধর্মকে ত্যাগ করে, তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।' শিক্ষাকে তিনি এমনভাবে সমন্বিত করিতে চাহিয়াছিলেন যে উহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ—তাহাকেই কেবল গ্রহণ করিবে না, সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ নীতি ও জ্ঞানের আদর্শকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে। প্রকৃত শিক্ষা বলিতে তিনি সেই শিক্ষাকেই বলিয়াছিলেন যাহা মস্তিষ্ক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদয়ের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত হইতে সাহায্য করে।

শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বিভিন্ন শিক্ষা-কমিশনের মন্তব্য

১৯৪৮-৪৯ খৃঃ নিযুক্ত 'রাধাকৃষ্ণন শিক্ষা কমিশন'-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় যাহা উল্লিখিত তাহার মর্ম :

ভৌগোলিক বিস্তৃতি, উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা, ধনসম্পদের প্রাচুর্য বা জাতীয় সম্পদের সমবণ্টন-ব্যবস্থা—এইগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইলেও কোন দেশের মহত্ত্ব বা উন্নতির প্রকৃত মান নহে। আমরা আমাদের সমাজে আজ যদি আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া কেবল যন্ত্রশিক্ষাকেই প্রাধান্য দিই, তবে আমরা বর্বর রাক্ষসগণের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিব। এই পথে আমরা সৃষ্টি করিব কয়েকজন বিবেকবিহীন বৈজ্ঞানিক ও কয়েকজন কুরুচিসম্পন্ন যন্ত্রবিদ্, যাহারা জীবনের শূন্যতাকে দূর করিবার জন্য বেপরোয়া হইয়া উঠিবে। তাই, যদি আমরা সুসভ্য বলিয়া দাবি করিতে চাই, তবে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি, মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, মানবভ্রাতৃত্বে আস্থা, শান্তি ও স্বাধীনতার আগ্রহ এবং ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ—এই গুণগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে। মানুষ যত দিন পৃথিবীতে জ্ঞানের পূজা করিবে, ততদিন এই গুণগুলি সমাজে সমাদৃত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই গুণগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

১৯৫২-৫৩ খৃঃ মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে নিযুক্ত 'মুদালিয়র কমিশন' এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ঃ

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কী, তাহা বিশ্লেষণ করিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয় যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে সুগঠিত করা, যাহার ফলে শিক্ষার্থী নিজশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া স্বদেশ-কল্যাণে নিযুক্ত হইবে।'

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত ধর্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ক কমিটির রিপোর্টের কিয়দংশ উল্লেখ করা সময়োপযোগী হইবে। কমিটি দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন, 'সাম্প্রতিক শিক্ষাসমস্যা এবং সমাজসমস্যার অন্যতম কারণ হইল মানুষের জীবনে ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত ধর্ম-প্রভাব।' কমিটির মতে এই ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক হইল বাল্যকাল হইতেই আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করা। ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার (4. 2. 60) সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হইয়াছে ঃ

ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষাকে কার্যকরী করিতে হইলে উহার একমাত্র উপায় বড় বড় শহরগুলি হইতে দূরে রামকৃষ্ণ মিশন বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান-পরিচালিত আবাসিক শিক্ষায়তনগুলির মতো বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করা, এইরূপ পরিবেশেই নৈতিক শিক্ষা অধিকতর শক্তিপ্রদ হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাসিক শিক্ষায়তনে যেখানে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, যেখানে প্রার্থনা পাঠ দৈহিক শিক্ষা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি খেলাধূলা এবং আমোদপ্রমোদের মধ্য দিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে বিশৃঙ্খলা নাই বলিলেই চলে। চারিত্রিক দৃঢ়তা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হইলেই প্রতি শিক্ষায়তনে নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। কেন না, ছাত্রের জীবনকে প্রভাবিত করিতে প্রাণহীন শুষ্ক নিয়মাবলী অপেক্ষা চারিত্রিক দৃঢ়তা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জীবনই বেশী সক্ষম। এইরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পরস্পরকে প্রীতি ও শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে এবং উহার ফলে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা বিরল হইয়া উঠে।

নব্যভারত-গঠনে রাষ্ট্রনায়কগণের দায়িত্ব

উপসংহারে আমরা এই কথাই বলিব যে এই ছাত্রবিশৃঙ্খলাকে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেরই সমস্যা-মাত্র বিবেচনা করিলে আমরা একটি বড় ভুল করিব। দেশের বহুমুখী সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলির অঙ্গ হিসাবেই ইহাকে বিচার করিতে হইবে। দেশব্যাপী গঠনমূলক প্রচেষ্টা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে শিক্ষা শেষ করিয়া যে সমস্ত ছাত্র প্রতিবৎসর বাহিরে আসিতেছে, তাহাদের সকলের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান করিতে শাসন কর্তৃপক্ষ সক্ষম হইয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না। একথা ঠিক যে দীর্ঘকালের পরাধীনতার পর আমরা হঠাৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। এই স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমাদের উপযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাই। তাই এই উপযুক্ততার অভাবে কিছু কিছু জটিলতা আসা অস্বাভাবিক নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বেকার সমস্যা সম্বন্ধেও শিক্ষিত যুবকগণের প্রতিভার যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় সংগঠনকারীদের আরও সচেতন হওয়া কর্তব্য।

হতাশ হইবার হেতু কিছুই নাই। কেন না, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষিত সমাজেরই দায়িত্ব দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তাঁহাদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পুনর্গঠিত করা। আমরা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে ছাত্র-গণের অন্তরে দেশপ্রীতির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি ও শক্তির সুপরিচালনা ও নিয়োগের সম্যক্ ব্যবস্থা হইলে তাহারা অদূর ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের মর্যাদা লাভ করিবে এবং শিক্ষাশেষে জন্মভূমির পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিবার প্রেরণা পাইবে।

বিদেশীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ*

অধ্যাপক শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে একটা বড় কথা হ'ল যে বাংলা দেশ বা ভারতে তাঁর জন্ম হলেও তিনি এসেছিলেন সারা জগতের জন্য। সমস্ত জাতি, সমস্ত দেশ, সব ধর্ম, সারা জগতের মানুষের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ভাব আনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের প্রধান উদ্দেশ্য—ব'লে মনে হয়। 'সর্বধর্মস্বরূপিণে' কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ঠিকই বলা হ'য়ে থাকে। এই ভাবটি বিদেশীদের মুগ্ধ না ক'রে পারে না।

আমেরিকার দর্শন-পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি জে. বি. প্র্যাট (J. B. Pratt) লিখেছেন রামকৃষ্ণের বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। আমাদের মন সসীম, অসীম নয়। ভগবান সম্বন্ধে ধারণাও তাই সব মনে এক রকম হ'তে পারে না। একই ভগবান সম্বন্ধে বিভিন্ন মনে বিভিন্ন প্রকার অনুভূতি জাগতে পারে। এ সম্বন্ধে প্র্যাট শ্রীরামকৃষ্ণেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: ভগবান এক, কিন্তু তাঁর প্রকাশ বিভিন্ন। যেমন, বাড়ীর কর্তার বিভিন্ন রূপ আছে। তিনি কারো পিতা, কারো ভাই এবং কারো স্বামী। তেমনি ভগবানও নানা রূপে প্রকাশমান। যিনি যে রূপে তাঁকে দেখেন, ভগবান তাঁর কাছে সেই রূপেই প্রকাশিত।

ম্যাক্স্ মুলার (Max Muller)ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বলেছেন; এই যে সর্বসময়ে ঈশ্বর-অনুভূতি, এরই উপর অদূর ভবিষ্যতে মহান্ মন্দির নির্মিত হবে, যেখানে হিন্দু ও অহিন্দু হাতে হাত মিলিয়ে একই পরমাত্মার অর্চনা করতে পারবে।

অধ্যাপক রোরিক (Nicholas de Roerich) তাঁর ডায়েরীর এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে লিখেছেন: সর্ব ধর্মের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ ভাবটি যেন আমরা মনে রাখতে পারি। এই উদার ভাব পাষাণ হৃদয়কেও নাড়া দেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু বিদেশী মনীষীই উচ্চ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তাঁরই সমসাময়িক বাংলার তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা টনি সাহেব (Charles Tawney) লিখেছেন: এমনই তাঁর বাণীগুলি যে তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক না হ'য়ে যায় না। কেসারলিং (Keyserling) লিখেছেন: দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কথা ভাবলে আমার একটু বিশেষ শ্রদ্ধা না হ'য়ে পারে না। তিনি একটি শাশ্বতভাবের প্রতীক। বাংলার গভর্ণর লর্ড রোনাল্ড্সে (Lord Ronaldshay) লিখেছেন: রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ—বাংলার মনে এ দুজনের চেয়ে বেশী দাগ দিয়েছেন, এমন লোক খুব কম আছে।

ক্রিষ্টোফার ইসারউড্ (Christopher Isherwood) লিখেছেন: গত দুই শতাব্দীতে মানবজাতির মধ্যে রামকৃষ্ণ হলেন সব চেয়ে বড় আধ্যাত্মিক নেতা। রামকৃষ্ণের উপদেশ আমাদের আধুনিক 'গস্পেল'। তিনি এসেছিলেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরই জন্যে, দু-হাজার বছর আগেকার মানুষের জন্যে নয়। রোবিক আর এক জায়গায় লিখেছেন: আমরা জানি বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তা চলেছে। আমরা জানি সত্যিকারের উৎসুক লোক কি রকম অযাচিতভাবে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখা বই-এর সংস্পর্শে এসে পড়ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ভারত-আত্মার মূর্ত প্রতীক ছিলেন, একথা বহু বিদেশী মনীষী স্বীকার

*শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে ১০.৩.৫৯ তারিখে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রদত্ত ভাষণ। (আকাশ-বাণীর সৌজন্যে)।

করেছেন। রোমা রলাঁ (Romain Rolland) তাঁর বিখ্যাত বইএর ভূমিকায় লিখেছেন: আমি ইওরোপের জন্যে আত্মার এক নতুন বাণী আনছি, —এ এক নতুন ফসল, ভারতের ঐকতান, যার নাম 'রামকৃষ্ণ'। যার কথা আমি বলতে চলেছি, তিনি তিরিশ কোটি লোকের দু-হাজার বছরের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ রূপ। যদিও বহু বছর হ'ল তিনি দেহত্যাগ ক'রেছেন, তাঁর আত্মা আধুনিক ভারতকে উজ্জীবিত করে।

যে দেশে রামকৃষ্ণের জন্ম, সে দেশ সম্বন্ধে গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন ম্যাক্স্ মূলার। তিনি বলেছেন: যদি আমরা মনে রাখি যে এই কথাগুলি শুধু রামকৃষ্ণের নয়, লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাস ও আশার বাণী, তাহলে সেই দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সত্যই আশান্বিত হ'তে পারি। সেখানে মানুষের মধ্যে দেবত্বের চেতনা রয়েছে সবার মধ্যে—যারা আপাতদৃষ্টিতে পৌত্তলিক, তাদের মধ্যেও।

লর্ড রোনাল্ডসে বলেছেন: যে সময়ে পাশ্চাত্যের ভাব ও ধরন-ধারণের জন্যে একটা নেশা এসেছিল, সেই সময় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রাচ্যের প্রাচীন আদর্শ তুলে ধরেছিলেন।··· ত্যাগের আদর্শ, যান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে জীবন যখন জটিল হ'য়ে উঠেছিল, সে সময় সহজের আহ্বান। রোরিক লিখেছেন: সদ্ভাব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ এত কথা বলেছেন যে, এগুলি মানুষের হৃদয়ের সুন্দর দিকটা উদ্ঘাটিত করবেই। তিনি ছিলেন যা কিছু ভাল, তারই নির্মাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণাটা ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম হয়, বিদেশে রামকৃষ্ণ সংঘের প্রসার দেখে। বিশেষ ক'রে যাঁরা আমেরিকায় গেছেন, তাঁরা জানেন—আমেরিকার অনেকগুলি প্রধান শহরে বেদান্ত-সমিতি কাজ ক'রে চলেছে। সেখানে প্রতি রবিবার স্বামীজীরা যে ভাষণ দেন, তাতে এবং অন্যান্য ক্লাসগুলিতে অনেক ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হ'য়ে থাকে। হলিউডের মতন জায়গায় রবিবার বেদান্ত-সমিতির ভাষণ শুনতে আধ ঘণ্টা আগেই হল ভর্তি হ'য়ে যায়। দেখেছি বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময় ১১টায় গিয়ে পৌছলে মন্দিরের রাস্তা আইভার এভেন্যুতে গাড়ী পার্ক করার জায়গা পাওয়া যায় না। ভাষণের আগে এবং পরে অনেক নরনারীকে ধ্যানমগ্ন হ'য়ে ব'সে থাকতে দেখেছি। মেয়েরা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে প্রণাম করছে—শাড়ীর আঁচলের অভাবে স্কার্ফটিকে আমাদের মেয়েদের মতো গলায় দিয়ে নতজানু হ'য়ে। স্বামীজীরা তাঁদের ভাষণে একটি কথা বলেন, যেটি বিশেষ মূল্যবান্ এবং কার্যকরী; তাঁরা কাউকে খৃষ্টানধর্ম ত্যাগ ক'রে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বলেন না। তাঁরা বলেন: যে হিন্দু আছ, সে আরো ভাল হিন্দু হও। যে খৃষ্টান আছ, সে আরো ভাল খৃষ্টান হও। এই উদার আহ্বান অনেকের মনকে নাড়া দেয়। এক দম্পতি আমায় বলেছিলেন, এই উদার কথাগুলিই তাঁদের শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে আকৃষ্ট করেছে। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে তাঁরা প্রতি রবিবার বেদান্ত-সমিতিতে আসেন।

আমেরিকার ভূমি স্পর্শ করার আগেই এই রামকৃষ্ণ-ভক্তির পরিচয় পেয়েছিলাম। আমাদের জাহাজ তখন সবে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বন্দরে পৌছেছে। জাহাজের ভিতরেই ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র দেখা হবে। এই সময় দেখলাম একজন আমেরিকান মহিলা জাহাজে উঠে এলেন আমাদের—ভারতীয় ছাত্রদের- খোঁজে। বললেন, তিনি একবার ভারতে গিয়েছিলেন, সে সময় একটা দর্শনীয় স্থান হিসাবে বেলুড় মঠ দেখতে গিয়েছিলেন। তার পর উৎসাহভরে বলতে লাগলেন তাঁর সেই আশ্চর্য অনুভূতির কথা। মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর মনে হ'ল, যেন তাঁর বাইরের অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, আর যতই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, ততই যেন মন অন্তঃস্থলে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি মনকে ছেয়ে ফেলেছে। সেদিন থেকেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিতা। সেই সুবাদে আজ একদল ভারতীয় ছাত্র আসছে জেনে তিনি ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

পুস্তক-পুস্তিকায় পত্রপত্রিকায় লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে, রামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বেদান্ত-সমিতিগুলির ভক্তগণের মধ্যে, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-স্বীকৃতি উত্তরোত্তর প্রকাশ পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কথাটি বলেই শেষ করি:

দেশবিদেশের প্রণাম আনিলে টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

পাষাণ, প্রপাত, পাদপ

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

এবার গ্রীষ্মকালে আমেরিকার একটি বড় ন্যাশনাল পার্ক দেখবার সুযোগ হয়েছিল। মধ্য ক্যালিফর্নিয়ার ১১৮৩ বর্গমাইল জুড়ে এই পার্কটি। পার্কের মধ্যে যেমন রয়েছে দশ থেকে বার হাজার ফুট উচ্চতার প্রায় কুড়িটি তুষারশৃঙ্গ এবং মাইলের পর মাইলব্যাপী নানা জাতীয় পাইন ফার ও সিডার গাছের বন—তেমনি আছে সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ (সাব্-অ্যালপাইন মেডোজ) এবং ছোট বড় কয়েক ডজন মনোরম হ্রদ। কিন্তু যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হ'ল 'যোসেমিটি ভ্যালি'—৭ বর্গমাইল আয়তনের একটি উপত্যকা এবং 'ম্যারিপোসা গ্রোভ'—পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বৃক্ষ 'সেকুইয়া' গাছের কুঞ্জ। উপত্যকাটির উচ্চতা হ'ল ৪ হাজার ফুট। মাঝখান দিয়ে বিচিত্র বঙ্কিম গতিতে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছতোয়া মার্সেড নদী। সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে রেখেছে তিন থেকে চার হাজার ফুট উঁচু গ্র্যানিট পাহাড়ের শ্রেণী, আর ছয় জায়গায় এই পাষাণপ্রাচীরের গা বেয়ে নেমে আসছে ৬টি আশ্চর্য সুন্দর জলপ্রপাত। বৃহত্তম প্রপাতটির দৈর্ঘ্য ২৪২৫ ফুট। এর নাম যোসেমিটি জলপ্রপাত। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ৮৪টি জলপ্রপাতের মধ্যে এর স্থান তৃতীয়। প্রথম হলেন দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা রাজ্যের এঞ্জেল প্রপাত; উচ্চতা ৩৩০০ ফুট। আমাদের দেশের মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত জেরসাপ্পা প্রপাতের স্থান সপ্তদশ।

আমেরিকায় বর্তমানে মোট ৩০টি ন্যাশনাল পার্ক আছে, এই 'জাতীয় উদ্যান'গুলির সংরক্ষক কেন্দ্রীয় সরকার। কর্মজীবনের শ্রান্তি এবং একঘেয়েমি থেকে বিযুক্ত হ'য়ে অল্প সময়ের জন্য ও যাতে মানুষ প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য, সাম্য ও স্তব্ধতার সংস্পর্শে আসতে পারে এবং সেই সংস্পর্শ লাভ ক'রে শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছতা ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয়ে বহু বর্গমাইল আয়তনের এই পার্কগুলির সৃষ্টি। আয়তনে ভারতবর্ষের প্রায় আড়াই গুণ বড় একত্রিশ লক্ষ বর্গমাইলের বিরাট দেশ আমেরিকায় প্রকৃতির বহু বৈচিত্র্য ছেয়ে আছে। যেখানেই প্রকৃতির কোন বিশিষ্ট অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই গভর্নমেণ্ট সর্বসাধারণের জন্য একটি পার্ক স্থাপন করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন। ন্যাশনাল পার্ক ছাড়া আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের প্রাদেশিক সরকারও তাঁদের অর্থে ও দায়িত্বে শত শত ঐরূপ পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলিকে বলে স্টেট পার্ক। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন ন্যাশনাল পার্কের তুলনায় এগুলির আকার অনেক ছোট। ন্যাশনাল পার্ক এবং স্টেট পার্ক দুইই শহর থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির সহজ পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। শহরের গোলমাল, যান্ত্রিকতা, বাণিজ্য ও কলকব্জার সমারোহ সেই পরিবেষ্টনীতে নেই।

দুই শ্রেণীর পার্কই আমেরিকান চরিত্রের একটা স্বাভাবিক চাহিদার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সে চাহিদা হ'ল প্রাত্যহিক জীবনের তীব্র ব্যস্ততা এবং খাওয়া-পরা-টাকা-রোজগারের তথা সামাজিক লেন-দেনের গতানুগতিকতা থেকে খানিকটা মুক্তির ইচ্ছা। পারিবারিক ও

সামাজিক জীবনের স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রাখতে গিয়ে আমেরিকানকে প্রচুর রোজগার করতে হয়, রোজগার করতে গিয়ে ভীষণ পরিশ্রম করতে হয় এবং অনিয়মিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রতিক্রিয়ায় স্নায়বিক এবং মানসিক অবসাদের সম্মুখীন হ'তে হয়।

নিষ্কৃতির উপায়? ঔষধ-পথ্য সে অনেক ব্যবহার ক'রে দেখেছে, বেশী ফল পাওয়া যায় না। শহরের আমোদ-প্রমোদ নেশার সাময়িক বিস্মৃতিও খুব কার্যকরী নয়। কিন্তু এই একটি জিনিস—যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোসগুলি সব খুলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির কোলে সহজভাবে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা—এর অবশ্যম্ভাবী সুফল আমেরিকান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। তাই সারা বৎসর সে উন্মুখ হ'য়ে থাকে গ্রীষ্মকালে 'ভেকেশন' (ছুটি)-এর সপ্তাহগুলির অপেক্ষায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হ'তে আরম্ভ ক'রে রাস্তার শ্রমিকটি পর্যন্ত—প্রত্যেকেরই এই প্রতীক্ষা অত্যন্ত প্রখর। 'ভেকেশন' কথাটি এরা উচ্চারণই করে একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ হৃদয়াবেগের সঙ্গে। আর 'ভেকেশন' এরা বাড়িতে কাটায় না। (ভারতবর্ষের মতো তীর্থদর্শনের বালাই এদের নেই। ধর্মকর্ম বলতে গীর্জাতে এক বা দু' ঘণ্টা কাটিয়ে আসার বেশী ধারণা নেই।) চলে যায় প্রকৃতির দরবারে। পাঁচ দশ কুড়ি—যে ক'দিন পারে, কাটিয়ে আসে। ন্যাশনাল এবং স্টেট পার্কগুলিতে গ্রীষ্মকালে হাজার হাজার লোকের ভিড়।

আমার কর্মকেন্দ্র স্যানফ্রান্সিস্‌কো শহর হ'তে সকাল ৮৷৷টায় মোটরে বেরিয়ে আমি এবং সঙ্গী জনৈক আমেরিকান যুবক বেলা ১৷৷টায় যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের এক মাইল আগে পূর্বনির্দিষ্ট আমাদের দুদিনের আস্তানা পার্ক-লাইন মোটেলে হাজির হলাম। 'মোটেল' কথাটি মোটর ও হোটেল এই দুটি শব্দের সংযোজনে উৎপন্ন। এটি নিছক আমেরিকান ব্যবহার। যে হোটেলে যাত্রীর মোটর গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে তার নাম 'মোটেল'। আমেরিকায় মোটর গাড়ির সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দিন দিন এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে সর্বত্রই পার্কিং একটি মহাসমস্যা। আমরা দুপুরের খাওয়া রাস্তায় একটি রেস্টরাণ্টে সেরে এসেছিলাম। তাই সুটকেস ও ব্যাগ মোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে রেখে সিধা পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতমালায় ঘেরা ১১৮৩ বর্গমাইলের এই বিরাট পার্কের মাত্র চারটি প্রবেশ-পথ, পূর্ব থেকে একটি, দক্ষিণ থেকে একটি এবং পশ্চিম দিক থেকে দুটি। আমরা পশ্চিমের একটি দরজা দিয়ে ঢুকলাম। পাহাড়ের গা দিয়ে মোটর রাস্তা উপরে উঠছে আর ডানদিকে পাহাড়ের খাদে মার্সেড নদী প্রবাহিতা। কালিম্পংএর রাস্তায় তিস্তা নদীর দৃশ্য মনে পড়লো। ভগবান যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তিনি নিশ্চিতই প্রকৃতির গায়ে দেশ-বিভাগের ছাপ মেরে দেননি—এটা আমেরিকান নদী, ওটা আফ্রিকার বন, এটা ভারতবর্ষের পাহাড়। কি আমেরিকা, কি আফ্রিকা, কি ভারতবর্ষ সর্বত্রই প্রকৃতির মূর্তিতে এক নৈর্ব্যক্তিক মহিমা প্রকট হ'য়ে রয়েছে। ভাষা, বর্ণ, আকার, আচার-ব্যবহারে মানুষ মানুষ থেকে পৃথক—এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মূল প্রকৃতির গিরি-নদী-বন-উপত্যকায় আমরা এরূপ কোনও বিভেদ কল্পনা করতে পারি না। তাই মার্সেড নদী দেখে মনে হ'ল যেন আমার বহু-পরিচিত এক বন্ধুর দেখা পেলাম—আমার বাংলা দেশের পার্বত্য স্রোতস্বতী তিস্তা।

যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের গাইড বুক্-এ লেখা ছিল, 'যাত্রী, পার্কে ঢুকে দৃষ্টি সজাগ

রেখো, দৃশ্যের পরিবর্তন লক্ষ্য কোরো, তার পরে প্রস্তুত থেকো হঠাৎ এক মুহূর্তে চোখ-জুড়ানো প্রাণ-মাতানো অভিনব বিস্ময়ের জন্যে।' মোটর যত উপরে উঠছে গাইড্-বুকের এই কথাটি ততই মনে পড়ছে আর কৌতূহলও বাড়ছে। দৃশ্যের পরিবর্তন স্পষ্টই লক্ষ্য করছিলাম। মার্সেড নদীর স্রোতের বেগ এবং গর্জন কমে আসছে, পাহাড়ে গাছপালার চেহারাও বদলাচ্ছে, পর্বত-প্রাচীরগুলির আকৃতিতেও নূতনত্ব দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ সকল হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা কি সেই অত্যাশ্চর্য অপরূপ দৃশ্য, যা এক মুহূর্তে চোখে প'ড়ে অন্তরকে বিস্ময়-বিমূঢ় ক'রে দেবে? কোথায়, কত দূরে অপেক্ষমাণ সেই যাদুমায়া?

ইতিমধ্যে রাস্তার খাড়াই বেশ কমে এসেছে, প্রায় সমতল ভূমির কাছাকাছি। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি মার্সেড নদী আর নেই, পরিবর্তে একটি লম্বা জলাশয়, অতি স্থির তার জল, আর জলে নানা রকমের লিলি ফুটে রয়েছে। সঙ্গী ফিলিপ ওয়ারেনকে জিজ্ঞাসা করলাম নদী কোথায় লুকিয়ে পড়লো? সে যোসেমিটিতে আগে একবার এসেছে। হেসে বললো, 'ঐ তো নদী—যাকে শান্ত জলাশয় মনে করেছেন। এবার যোসেমিটি উপত্যকা আসছে কিনা, তাই নদীর তর্জন গর্জন নেই, নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এর পরে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আবার প্রবাহিণীর রূপ নেবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি দুপাশের পাহাড় দূরে সরে যাচ্ছে আর রাস্তা সমতল জমির উপর দিয়ে চলেছে। সামনে প্রায় দু'শ গজ দূরে রাস্তার পাশে একটি প্রশস্ত জায়গায় অনেকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর মোটরের যাত্রীরা গাড়ি থেকে বেরিয়ে স্তব্ধভাবে কি যেন দেখছে। আমারাও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওখানে এসে গেলাম এবং গাড়ি থামিয়ে বাইরে এলাম। হাঁ, আমরাও স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যোসেমিটি উপত্যকা!

চারিপাশে পাহাড়ের পর পাহাড় ও পাইন বনের পরিবর্তমান দৃশ্য দেখতে দেখতে এবং পর্বতখাদে প্রবহমানা তটিনীর গর্জন শুনতে শুনতে এতক্ষণ এসেছি; ভাল লেগেছে, স্নিগ্ধ আনন্দে প্রাণ ভরে আছে। কিন্তু এখন যে ছবিটি চোখে পড়লো, এ যে একেবারেই অকল্পনীয়। দুর্গম পর্বতমালার অভ্যন্তরে এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য-রাজ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, পাহাড় বেয়ে আসতে আসতে ওর দৃশ্যটি চোখে পড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তা ভাবতে পারা যায়নি। সৌন্দর্য জিনিসটি অনেক সময়ে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড জিনিসের একটি সুসমঞ্জস সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। গ্র্যানিট পাহাড় অনেক জায়গায় অনেক আছে, পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে আসা জলস্রোত কত স্থানে কত রয়েছে, প্রশস্ত প্রান্তর, নানারঙের ফুল, গাছ লতা গুল্ম, মাঠের বুক চিরে ছুটে চলা নদী—এদেরও কি অভাব আছে ভগবানের বিশ্বে? কিন্তু এই সবগুলিকে এক জায়গায় টেনে এনে, যেখানে যেটি মানায় সেখানে সেটিকে বিশিষ্ট সন্নিবেশে বসিয়ে একটা নয়নাভিরাম সৌন্দর্যসৃষ্টি—এটি ভগবান অজস্র করেন-নি। এখানে তিনি কার্পণ্য বজায় রেখেছেন। ভালই করেছেন। নইলে সেই মনোহর সৃষ্টির মর্যাদা মানুষ উপলব্ধি করতে পারতো না। ভারতবর্ষে কাশ্মীর শুধু একটিই, গঙ্গার উৎপত্তিস্থান গোমুখও একটি। যোশেমিটি উপত্যকা—মাত্র সাত বর্গমাইলের এই সৌন্দর্যক্ষেত্র সমগ্র আমেরিকায় একটা স্বকীয় দুর্লভতার দাবি নিয়ে যে প্রতি বৎসর দেশ-বিদেশের দশ লক্ষ মুসাফির নরনারীকে আকর্ষণ

করে, এরও কারণ প্রকৃতির কতকগুলি খণ্ড উপাদানের আশ্চর্য সামঞ্জস্যে এখানে একত্র সন্নিবেশ।

পর পর অবস্থিত কতকগুলি খাড়া গ্র্যানিট পাহাড় সমগ্র উপত্যকাটিকে ঘিরে রয়েছে। ওদের গগনচুম্বী চূড়া ঠিক মন্দিরশীর্ষের মতো দেখতে। এই পাষাণ-প্রাচীরের গম্ভীর রূপ হৃদয়কে স্তব্ধ করে। একটি চূড়ার নাম 'এল্ ক্যাপিটান'—স্প্যানিস শব্দ, অর্থ—'সেনাপতি মশাই'। এই চূড়ার উচ্চতা উপত্যকার মেঝে থেকে ৩৬০০ ফুট। উপত্যকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে ৪০০০ ফুট পূর্বেই বলেছি। কাজেই 'সেনাপতি মশাই'এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে প্রায় ৮ হাজার ফুট। 'এল্ ক্যাপিটানে'র পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। পাষাণকেও যেন জীবন্ত বোধ হ'ল। হাজার হাজার শতাব্দীর কত অগণিত ঘটনার অভিঘাত ওর বিরাট বুকে যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে। এই সৌন্দর্যক্ষেত্র বিধাতা ওরই চোখের সামনে গড়েছেন। ওরই চোখের সামনে পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে, মানুষের সভ্যতা জন্ম নিয়েছে, সবল মানুষ দুর্বল মানুষকে ধ্বংস করেছে। ও দেখেছে মানুষের জ্ঞানস্পৃহা, উদ্যম, তার সংহতি, তার দয়া, প্রেম—আবার দেখেছে তার বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, ঘৃণা, কাম, লোভ, দম্ভ। সব দেখে ও এখন স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে সকল অভিজ্ঞতার পারে অচঞ্চল অক্ষোভ্য প্রশান্তিতে ও তদ্গত হ'য়ে রয়েছে। ও এখন উদাসীন যোগী।

আর একটি গ্র্যানিট শৃঙ্গের নাম 'হাফ ডোম্'—অর্ধ গম্বুজাকৃতি, তাই ঐ নাম। এর উচ্চতা উপত্যকা থেকে ৪৮০০ ফুট, সমুদ্রবক্ষ হ'তে প্রায় ৯ হাজার ফুট। অপর একটি চূড়ার নাম 'সেন্টিনেল রক'—ইনি যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে উপত্যকাকে পাহারা দিচ্ছেন। 'এল্' ক্যাপিটানে'র অনতিদূরে 'থ্রি ব্রাদার্স'—তিন ভাই—তিনটি পরস্পর-সংলগ্ন পর্বত-শিখর। 'ক্যাথিড্রাল স্পায়ারস্' হ'ল দুটি চূড়া—দেখতে ঠিক গির্জার চূড়ার মতো। এই সব গ্র্যানিট শৃঙ্গ সূর্যালোক ও চন্দ্রালোকের বিভিন্ন সংস্থানে বিভিন্ন চেহারা ধারণ করে। তাই লোকে এক সময়ে দেখে তৃপ্ত হয় না। বিভিন্ন সময়ে এদের দৃশ্য উপভোগ করতে চায়। আমরাও 'এল্ ক্যাপিটান'কে অস্তগামী সূর্যের আলোতে আর একবার দেখে নিয়েছিলাম। পাষাণের সে দীপ্তি কখনও ভুলতে পারবো না। আবার শীতকালে এই সব শৃঙ্গ যখন তুষারাবৃত হ'য়ে যায় তখন আর এক রকমের দৃশ্য। ফটোতে 'এল ক্যাপিটান'এর সে শ্বেত মূর্তি দেখেছি। জানি না ভবিষ্যতে চাক্ষুষ কখনো দেখার সুযোগ হবে কি না।

পাষাণের সঙ্গ ও সান্নিধ্য লাভের পর এবার চললাম প্রপাতের উদ্দেশে। সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতটির উল্লেখ আগেই করেছি—যোসেমিটি জলপ্রপাত, তিন ধাপে উপর থেকে নীচে পড়ছে। প্রথম ধাপের দৈর্ঘ্য ১৪৩০ ফুট, মাঝখানের অংশের নাম 'কাসকেড'—দৈর্ঘ্য ৬৭৫ ফুট, নীচের ধাপের দৈর্ঘ্য ৩২০ ফুট। সমগ্র প্রপাতটির দৈর্ঘ্য ২৪২৫ ফুট। আমরা গিয়েছি জুলাইএর গোড়ায়, জলের পরিমাণ বর্ষার তুলনায় অনেক কম। তবুও দৃশ্য অতি চমৎকার। অন্য কয়েকটি বড় প্রপাত: রিবন ফল্—১৬১২ ফুট; 'ব্রাইডাল ভেল' ফল্—৬২০ ফুট; নেভাডা ফল্—৫৯৪ ফুট; ভার্নাল ফল্—৩১৭ ফুট; ইলিলুয়েট ফল্—৩৭০ ফুট। প্রপাতগুলির মাথায় যাবার জন্যে 'ট্রেল' বা পায়ে হাঁটা রাস্তা আছে। হাইকিং বুট পরে ঐ পথে পাহাড় চড়াই করছে, এমন অনেক-

গুলি দল দেখলাম। ইচ্ছা থাকলেও সময়াভাবে আমরা কোন প্রপাতের মাথায় উঠতে পারিনি। 'ব্রাইডাল ভেল' কথাটির তাৎপর্য এই যে ঐ প্রপাতের জলকণা চারদিকে এমন ভাবে ছিটিয়ে পড়ছে যে জলধারার সমগ্র রূপটি যেন বিবাহকালীন বধূর ঘোমটার মতো দেখতে। যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের ভিতর মোট মোটর-রাস্তার দৈর্ঘ্য ২১৭ মাইল। পার্কের মধ্যে জলপ্রপাত, হ্রদ, 'ক্যানিয়ন' (খাদ) এবং নানা বন উপবনে যাবার ঘোড়া-চলা ও পায়ে-হাঁটার রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য হ'ল ৭৫০ মাইল।

যোসেমিটি উপত্যকার সমতল ভূমির শ্যামলশ্রী অবর্ণনীয়। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিতা মার্সেড নদীর বঙ্কিম গতি দেখবার মতো। জায়গায় জায়গায় যাত্রীরা বসে চুপ ক'রে নদীর দৃশ্য দেখছে। তটে নানা রঙের অজস্র বনফুলের সম্ভার। সমস্ত উপত্যকাটিতে বহুজাতীয় গাছ এবং লতা গুল্মের সংস্থান একটা স্বপ্নমায়া বিস্তার করেছে। কত রকমের পাখীই না দেখতে পেলাম! উপত্যকায় পার্কের হেড কোয়ার্টার্স এবং মিউজিয়াম রয়েছে। পার্কের গাছপালা, ফুল, পশু ও পাখীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ রঙীন চিত্র-সম্বলিত ছোট বড় অনেকগুলি পৃথক পৃথক বই বিক্রয়ার্থ দেখতে পেলাম। হেড কোয়ার্টার্স থেকে প্রতি সন্ধ্যায় ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ্ ও পশুপক্ষীদের সম্বন্ধে চলচ্চিত্রে সর্বসাধারণের উপযোগী বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। লোকেরা খুব আগ্রহ ক'রে শোনে। যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কে দুই শত জাতির ভিন্ন ভিন্ন পাখী আছে। আর ৭৮ রকমের স্তন্যপায়ী জন্তুর বসতি এখানে।

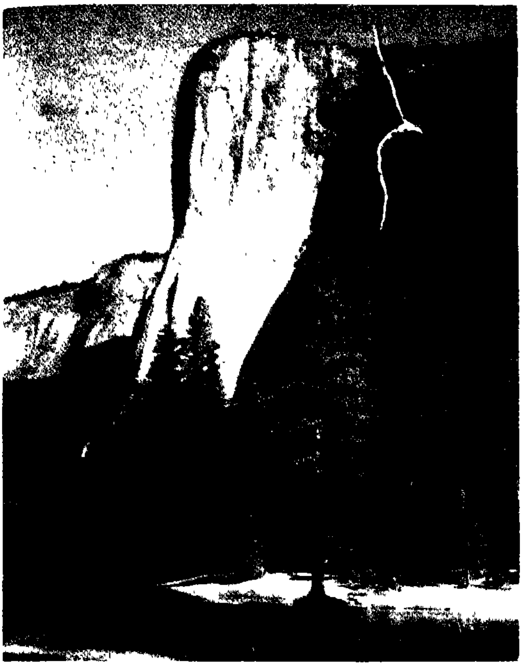
যোসেমিটি উপত্যকায় তিনটি বড় হোটেল আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি 'ক্যাম্প'ও রয়েছে। ক্যাম্পে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হোটেলের মতো আরামপ্রদ নয়; তাঁবুতে থাকতে হয়, নিজেরা রেঁধে খেতে হয়। তবুও যাত্রীদের অনেকে ক্যাম্পে থাকাই পছন্দ করে। বাড়ীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই যদি খুঁজবো, তাহলে কিসের 'ভেকেশন' করতে আসা?—এই যেন তাদের মনোভাব, অনেকে আবার তাঁবুর মধ্যে শোওয়া পছন্দ করে না। 'স্লিপিং ব্যাগ'-এ উন্মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটায়। হাজার হাজার লোক বেড়াতে এসেছে, রাত কাটাচ্ছে, কিন্তু শহরের মনোভাব এখানে ওরা বর্জন ক'রে এসেছে। কৃত্রিম জীবনের বিরুদ্ধে ওরা জেহাদ ঘোষণা ক'রে এসেছে। হৈ-হট্টগোল নেই, উত্তেজনা নেই, উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, প্রকৃতির গম্ভীর প্রশান্তি ওদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ওরা নিজেরাই আশ্চর্য হ'য়ে গেছে ওদের নিজেদের পরিবর্তনে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার আমার চোখে পড়লো, এত লোকের আনাগোনা থাকা-খাওয়া চলা-ফেরা, কিন্তু কোথাও মানুষের অমনোযোগ বা অবহেলা-কৃত নোংরা একটু পড়ে নেই। না, এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। কেউ কোন গাছের পাতা বা ডালে হাত দেবে না—সহস্র সহস্র রঙ-বেরঙের বনফুল ফুটে আছে, কিন্তু কারুর ইচ্ছা হবে না, একটা ছিঁড়ে নিই—এই ওদের 'সিভিক্ সেন্স'। আর কিছু না শিখি, পাশ্চাত্য জাতির নিকট এই জিনিসটি ভারতবাসী আমাদের শেখা কর্তব্য।

যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের দ্বিতীয় বড় আকর্ষণ 'ম্যারিপোসা গ্রোভ'টি যোসেমিটি ভ্যালি থেকে ত্রিশ মাইল দূরে—পার্কের দক্ষিণ দ্বারের কাছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গাছ 'সেকুইয়া'র দুটি জাতি এখনও বেঁচে আছে। একটির নাম 'সেকুইয়া সেমপারভিরেন্‌স্' বা চলতি নাম রেড উড। অপরটির

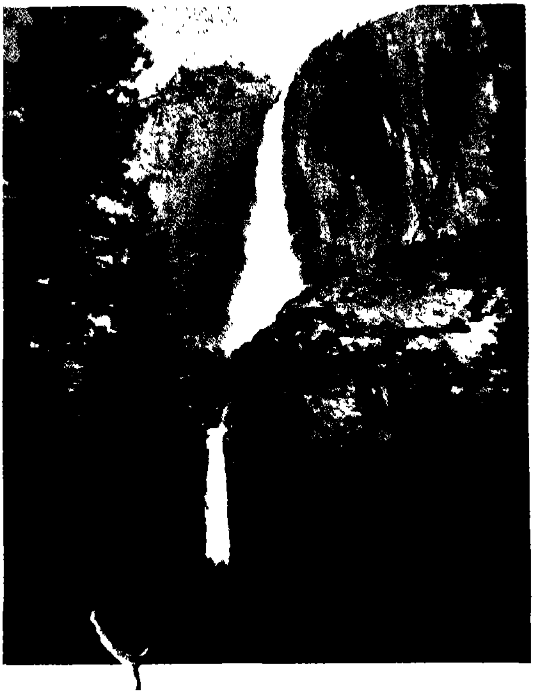
নাম 'সেকুইয়া জাইগ্যানটিয়া'—চলতি নাম বিগ্‌ট্রীজ্‌ (বৃহৎগাছ)। প্রথম জাতের সেকুইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তটে ক্যালিফর্নিয়া ও ওরিগন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় জাতের সেকুইয়ার অনেকগুলি যোসেমিটি ন্যাশনাল পার্কের এই ম্যারিপোসা গ্রোভে ছড়ানো। যোসেমিটির দক্ষিণে ক্যালিফর্নিয়ার আর একটি ন্যাশনাল পার্কের নাম সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্ক। এখানেই বহুসংখ্যক বিগ্‌ট্রীজ্‌ আছে। দুই জাতের সেকুইয়ারই বৈশিষ্ট্য হ'ল কীটপতঙ্গ এবং আগুন থেকে এদের অদ্ভুত প্রতিরোধ শক্তি। কেবল দুটি শত্রু এদের অক্ষয় প্রাণশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে, প্রথম শত্রু বজ্রপাত, দ্বিতীয়—মানুষ।

ম্যারিপোসা গ্রোভে এই প্রাচীন মহীরুহদের দেখে একটা আশ্চর্য বিস্ময়-স্তব্ধতা অনুভব করলাম। এখানকার সবচেয়ে বড় গাছটির নাম দেওয়া হয়েছে—গ্রিজ্‌লি জায়েণ্ট। 'গ্রিজ্‌লি' পশ্চিম আমেরিকার বাদামী রঙের একজাতীয় হিংস্র ভল্লুকের নাম। এই সেকুইয়া গাছের রঙ গ্রিজ্‌লি ভালুকের গায়ের রঙের মতো বলেই বোধ করি আবিষ্কারক গাছটিকে গ্রিজ্‌লি জায়েণ্ট নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু এই নাম শুনে আমার চিত্ত পীড়িত হ'ল। হিংস্র একটি বন্য জন্তুর সঙ্গে এই ৩৮০০ বৎসরের ২০৯ ফুট উঁচু অত্যুন্নত বৃক্ষরাজকে সম্পৃক্ত করা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। কী বিরাট গম্ভীর প্রশান্ত মূর্তি। গাছটির গুঁড়ির ব্যাস নীচের দিকে ৩৯.৭ ফুট। আমাদের দেশে প্রাচীন বট ও অশ্বত্থের বিরাটত্ব আমরা উপলব্ধি করি। ভগবান গীতাতে বলেছেন—'অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্‌' আমি সবগাছের মধ্যে অশ্বত্থ। ভারতবর্ষে বৃক্ষকে একটা অধ্যাত্ম দৃষ্টি নিয়ে আমরা পূজা করতে অভ্যস্ত। এই প্রাচীন সেকুইয়া গাছটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে প্রাণে সেই ভারতীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হ'ল। মনে মনে বললাম, 'হাজার হাজার বৎসরের মানব-ইতিহাসের মূক সাক্ষী হে মহান্‌ পাদপ, নমস্কার, তোমায় শত-বার নমস্কার। ভারত হ'লে তোমার নাম দিতাম—'মহেশ্বর' ।'

সেকুইয়া ন্যাশনাল পার্কে একটি বিগ্‌ট্রী আছে যার উচ্চতা ২৭২.৪ ফুট। তার নাম দেওয়া হয়েছে 'জেনারেল শেরম্যান'। ম্যারিপোসা গ্রোভের 'গ্রিজলি' পৃথিবীর বর্তমান জীবিত সেকুইয়াদের মধ্যে উচ্চতায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ম্যারিপোসা গ্রোভে সব শুদ্ধ প্রায় ১০০ সেকুইয়া আছে। একটি গাছের মধ্য দিয়ে মোটর রাস্তা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের মোটরটিও ঐ গাছের শূন্য গহ্বর অতিক্রম করলো। সঙ্গী ফিলিপ ওয়ারেন অপর যাত্রীদের দেখাদেখি গাছ থেকে বেরুবার পর অবশিষ্ট যাত্রীসহ মোটরটির একটি ফটো তুলে নিল।



এল ক্যাপিটান



যোসেমিটি জলপ্রপাত



গোমুখের যাত্রা





যমুনোত্রীর পথে

গঙ্গা-যমুনার আকর্ষণে

স্বামী জীবানন্দ

বহু দিনের বাসনা প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র হিমাদ্রি দর্শন ক'রে জীবন ধন্য ক'রব।

গত ৮ই মে, রবিবার সকালে শুনলাম, চার-জনের একটি দল আজই রাত্রে হাওড়া-হরিদ্বার জনতা এক্সপ্রেসে রওনা হচ্ছে। শুনেই গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনের সুপ্ত বাসনা জেগে উঠল।

দুটি কম্বল, সোয়েটার, গরম টুপি, জলের পাত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি যোগাড় হ'য়ে গেল। যাত্রার প্রাক্কালে একজন প্রবীণ সাধু পর্বত-ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি উপদেশ দিলেন: 'খুব সকাল সকাল বেরুবে, হাঁটা পথ খুব সাবধানে চলবে, কিছু না খেয়ে ভ্রমণ শুরু করবে না, সব সময় সাবধানে থাকবে, সকালের দিকেই বেশী হাঁটবে, রৌদ্র উঠলে হাঁটা বন্ধ করবে, জল খিতিয়ে খাবে।' কথাগুলি মনের মালায় গেঁথে নিলাম। ভগবৎকৃপায় একদিনের মধ্যেই সব যোগাযোগ হ'য়ে গেল ব'লে খুব আনন্দ হ'তে লাগল।

যথাসময়ে ১০ই মে বেলা ১০টায় হরিদ্বারে পৌঁছে কনখল সেবাশ্রমে গিয়ে শুনলাম, আমাদের একজন সাধুও যাচ্ছেন তীর্থদর্শনে।

সন্ধ্যার পূর্বে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ড দর্শনে গেলাম। হরিদ্বার মহাতীর্থ। হরি বা হরের দ্বার এই পুণ্য তীর্থই উত্তরাখণ্ডের দ্বার-স্বরূপ। সন্ধ্যায় ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাদেবীর সন্ধ্যারতি দর্শনীয় বস্তু। ভক্ত যাত্রীরা ফুলের নৌকা কিনে তাতে কর্পূরের আলো জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়, নৌকাও চঞ্চল স্রোতের তালে তালে আনন্দের লহরী তুলে ভেসে চলে।

পরদিন বুদ্ধপূর্ণিমা। সকালের বাসে হৃষীকেশে পৌঁছে কালী কম্বলীর ছত্রে উঠে সদাব্রতের টিকিট যোগাড় ক'রে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

হরিদ্বার ও হৃষীকেশ সাধুদের তপস্যার স্থান, কত সম্প্রদায়ের সাধু এখানে তপস্যা করেন; কত মঠ, আখড়া, ছত্র, ক্ষেত্র, ধর্মশালা, কুঠিয়া! এখন কিন্তু পূর্বের ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে; দেশবিভাগের পর বহু পাঞ্জাবী এখানে বসবাস করছে, নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্যের পত্তন হয়েছে। লোকে লোকারণ্য!

বৈকালে লছমনঝোলার পথে স্বর্গাশ্রমে গেলাম। মোটর-বোটে গঙ্গা পার হ'য়ে গীতা-ভবনে গিয়ে সন্ধ্যাকালটি অতিবাহিত করলাম।

পরদিন ভোরে বেরুতে হবে, কুলি ঠিক হ'য়ে গেছে। রাত তিনটেয় উঠে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে গেলাম।

আমাদের দলে এখন সাতজন, তার মধ্যে দুজন সন্ন্যাসী, নতুন একজন প্রৌঢ় যোগদান করেছেন—অমায়িক দিলখোলা মানুষ, ভদ্রলোক দেশে ও বিদেশে নানাস্থানে ঘুরে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন।

ভোর ৫টায় বাস ছাড়ল। যাত্রীদল সমস্বরে 'জয় যমুনা মাঈ, জয় গঙ্গা মাঈ, জয় কেদার, জয় বদরীবিশাল' ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত ক'রে তুলল। বাস আঁকা বাঁকা পথে কখন উঁচুতে উঠছে, কখন নীচে নামছে, কখন জঙ্গল, কখন পাহাড়ী-গ্রাম ভেদ ক'রে চলেছে কল-নাদিনী স্রোতস্বতীর পাশ দিয়ে। একটির পর একটি নব নব দৃশ্যপটের আবির্ভাব হচ্ছে।

পথে নরেন্দ্রনগর ও ধরাসু—দুটি জংশন অতিক্রম ক'রে বেলা ৫৷৷টায় আমাদের বাস ডিণ্ডেলগাঁও উপস্থিত হ'ল। এখান থেকে যমুনোত্রী হাঁটা পথে ২৭ মাইল। সূর্যদেব অস্ত যাবার উদ্যোগ করছেন, পশ্চিম গগন রক্ত-

রাগে রঞ্জিত, পাহাড়ের উপর কে যেন আবির ঢেলে দিয়েছে!

পদব্রজে ২ মাইল অতিক্রম ক'রে গঙ্গানী-চটিতে গিয়ে আমরা আহার ও রাত্রিবাস করলাম। পরদিন ভোরে ঠিক ঠিক যাত্রা শুরু। কলকলনাদিনী যমুনার তীরে তীরে পথ। এই পথে চলতে চলতে কখন উচ্চ পর্বতের প্রায় শিখরে আরোহণ করছি, কখন নীচে যমুনার তীরবর্তী হচ্ছি, এইরূপে কত চড়াই উৎরাই যে অতিক্রম করতে হ'ল, তার সংখ্যা নেই!

একা একা হাঁটছি, সঙ্গীদের কেউ আগে, কেউ বা পিছনে। আকর্ষণ ক'রে কে যেন সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে!

চীর পাইন ও দেবদারু গাছের ঘন বন নিয়ে শৈলশ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতি যেন নিপুণহস্তে একটি একটি ক'রে সারিবদ্ধভাবে গাছগুলি রোপণ করেছেন।

যমুনা-চটিতে রাত্রিবাস ক'রে আবার ভোর হ'তে না হ'তে 'ওঠ ওঠ' রব—বিছানা-পত্র বাঁধো, তৈরী হ'য়ে নাও, যত শীঘ্র পারো যাত্রা শুরু কর।

আরও দুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হ'ল। পথে অনেকগুলি চটি পড়েছিল, তার মধ্যে সোনা-চটি, হনুমান-চটি ও ফুল-চটির কথা ভুলব না; এই সব চটিতে বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। পাহাড়িয়া লোকদের সারল্য দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়, বিশেষ ক'রে তাদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও সন্তোষের ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদিকের চটিতে বিশুদ্ধ ঘি পাওয়া যায়, বনস্পতি বা ডালডা এখনও ঢোকেনি; দুধও খাঁটি পাওয়া যায়, দাম অপেক্ষাকৃত কম।

পথে এগিয়ে চলেছি, শিশুর দল ছুটে ছুটে সামনে এসেছে এক একটি পয়সা পাবার আশায়, তাদের সঙ্গে কথা ব'লে খুব আনন্দ পেয়েছি; একটি লজেন্স, কি একটি ছোট পয়সা পেয়ে তাদের কী আনন্দ! বয়স্ক পাহাড়ী লোকেরা 'সুই-তাগা' (সূচসূতা) পাবার আশায় ছুটে এসেছে। কোথাও ছেলের দল প্রায় ১ফার্লং দূর পর্যন্ত সঙ্গ নিয়েছে।

যমুনোত্রীর পথে শেষের দিকে কঠিন চড়াই, যাত্রীরা বলে, যমুনোত্রীর চড়াই ওঠা না 'যম-যাতনা' ভোগ করা। চড়াই কঠিন হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব, চারদিকে ফুলে-ভরা গাছপালা; রডোডেন্ড্রন গাছ—চলেছে তো চলেছেই, যেন শেষ নেই; কোথাও বা আবার অন্য গাছের বন। কত অজানা ফুলের গাছ লতা আর বন্য গোলাপ যেন তাদের পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে বিরাটের উপাসনায় রত! ঐ দূরে দেখা যায় তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী। পাহাড়ের পর পাহাড়—যেন শেষ নেই! এই সৌন্দর্য-খনির মাঝখানে এসে কে না মুগ্ধ হয়? সাধকের মন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে চলে যেতে চায়, কবির মনে স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দ ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে, শিল্পী তার মানসপটে ছবি এঁকে নিতে চায়!

কঠিন চড়াই অনায়াসে না হলেও সানন্দে অতিক্রম ক'রে চলেছি। ১৫ই মে রবিবার সকালে ফুল-চটি থেকে যাত্রা ক'রে বেলা ১০॥ টায় যমুনোত্রী পৌঁছই, পথে বৃষ্টি পেয়েছিলাম, অল্প অল্প শিলও পড়েছিল, ভিজতে ভিজতে 'জয় যমুনা মাঈ' বলতে বলতে যমুনাদেবীর পদতলে উপস্থিত হই।

যমুনোত্রী স্থানটি অপ্রশস্ত, কিন্তু অতি সুন্দর, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ-পরিবেষ্টিত, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফুট। চার-দিকের নয়নলোভন দৃশ্য দেখে যেন মুহূর্ত মধ্যে ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেল!

যমুনোত্রীর উষ্ণ প্রস্রবণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার তপ্ত কুণ্ডের জল বেশ গরম, এত গরম যে অল্প সময়ে চাল ডাল সিদ্ধ হ'য়ে যায়। ভক্ত যাত্রীরা চাল সিদ্ধ ক'রে সেই ভাত যমুনা-মায়ের প্রসাদরূপে নিয়ে যান। একটি ব্যাপার দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। অনেকে আটা মেখে গুটি তৈরি ক'রে হাতে চাপড়ে চাপড়ে রুটির মতো ক'রে গরম জলে ছেড়ে দিচ্ছে, আর ৭।৮ মিনিটের মধ্যে সেইটি ফুলে জলের ওপরে ভেসে উঠছে, ঠিক যেমন ঘিয়ে লুচি ভাজা হয়।

উষ্ণ কুণ্ডে স্নান ক'রে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। বাইরে এত ঠাণ্ডা যে গায়ের সোয়েটার চাদর খোলা যায় না, কিন্তু খালি গায়ে কুণ্ডে নেবে মনে হ'ল, গা পুড়ে যাচ্ছে, ফোস্কা পড়বে। কিছুক্ষণ পরে বেশ আরাম বোধ হ'তে লাগল।

স্নানের পর পূজা। যাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় এত কষ্ট ক'রে এত দূরে এসেছি, এইবার তাঁর পূজা, মনে কি আনন্দ! মন্দিরে সালঙ্কারা যমুনা-মাতা বিরাজ করছেন, যমুনার পার্শ্বে ও সামনে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি। পাণ্ডা আমাদের অনেকক্ষণ ধ'রে পূজা করালেন। পূজার পর কর্পূরের আরতি, তারপর পরিক্রমা ও প্রণাম।

পূজাশেষে মন্দিরের বাইরে এসে একটি উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর বসে বেশ কিছুক্ষণ কাটলো। নীচে যমুনা কলকল ছলছল ক'রে বয়ে চলেছেন; মনে হয়, পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল ভেদ ক'রে যমুনার এই অবিশ্রান্ত গতি যেন প্রয়াগে গঙ্গার সঙ্গে মিলনের আশায়।

উষ্ণ কুণ্ডের কিছুদূরে একটি উষ্ণ গুহায় একজন বৈষ্ণব সাধু থাকেন—নাম 'বাবা ঠন ঠন গোপাল', অতি অমায়িক সাধু। সাধুর গুহায় ১২ ঘণ্টা ধ'রে অনেক কথা হ'ল। একটি কথা ভোলবার নয়:

হরিকা নাম মিঠী বোলী, ঔর্ গরীবী বেশ
ইন লেকে জঁহা যাওগে তঁহা তুমারা দেশ।

তাঁর অপূর্ব ভগবন্নির্ভরতা, নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন ও কঠোরতা দেখে মুগ্ধ হলাম। যমুনোত্রী ছমাস বরফে ঢাকা থাকে; দেওয়ালীর পর লোকজন পাণ্ডারা সব নীচের গ্রামে চলে যায়। আবার অক্ষয় তৃতীয়ার সময় যমুনোত্রীর মন্দির খুললে সকলে আসে। যখন কেউ থাকে না, তখনও সাধু এই গুহাতেই থাকেন, তবে তাঁর সুবিধা এই যে গুহাটি গরম ব'লে কষ্ট হয় না; তিনি ছ-মাসের আটা কাঠ ইত্যাদি যোগাড় ক'রে গুহার মধ্যে রেখে দেন।

যে সব যাত্রী যমুনোত্রী-তীর্থ দর্শনে আসেন, তাঁদের অধিকাংশই স্নান ও পূজা সেরে ঐ দিনই চলে যান, এখানে থাকার তেমন সুবিধা নেই, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা।

আমরা এখানে রাত্রিবাস করলাম কালী কম্বলীর ধর্মশালায়। পরদিন ভোরে উঠে উষ্ণ কুণ্ডে স্নান সেরে নিয়ে যমুনা-মাতাকে প্রণাম ক'রে ফেরবার পালা। যে পথে এসেছি, সেই পথেই ফিরতে হবে। আসার সময় যেটি চড়াই ছিল, ফেরার পথে সেটি উৎরাই। শক্ত চড়াই উঠতে হাঁফ ধরে। উৎরাই অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও হাঁটুতে ব্যথা লাগে। যা হোক উৎরাই-পথে বিশেষ কষ্ট হয়নি।

তিন দিনে ২৭ মাইল অতিক্রম ক'রে ডিণ্ডেলগাঁও-এ বাস ধ'রে ধরাসু হ'য়ে উত্তর-কাশী পৌঁছই সন্ধ্যায়। সেখানে থাকার সমস্যা। বিড়লা ও কালী কম্বলী ধর্মশালায় স্থানাভাব। এদিকে বাসে আসার সময় পথে বৃষ্টি নামায় বিছানাপত্র সব ভিজে গেছে। শঙ্কর-মঠেও স্থান

মিলল না, শেষে গঙ্গাতীরে কেদার-ঘাটের কাছে দণ্ডী ধর্মশালায় ভাল স্থানই পাওয়া গেল।

উত্তরকাশী প্রসিদ্ধ তীর্থ; এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী, বহু সাধুসন্ন্যাসী এখানে তপস্যা করেন। এখন উত্তরকাশী শহরে পরিণত হয়েছে; কলেজ, কোর্ট, পোস্ট-অফিস, বাজার সব কিছুই আছে।

সকালে উঠে গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরে বিশ্বনাথের পূজা সেরে নিয়ে এখানকার দর্শনীয় যা আছে দর্শন করি। একদিন উত্তরকাশীতেই কাটে।

এখান থেকে গঙ্গোত্রী হাঁটা পথে ৫৬ মাইল। ভোরে রওনা হ'য়ে ৯ মাইল দূরে মনেরী-চটিতে দ্বিপ্রহরের আহারের পর আরও ৯ মাইল হেঁটে ভাটোয়ারী চটিতে রাত্রিবাস করি। ভাটোয়ারী পর্যন্ত মোটরের রাস্তা প্রায় তৈরী হ'য়ে গেছে, আগামী বছর এই রাস্তায় মোটর চালু হবে শুনলাম।

স্থানে স্থানে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটাচ্ছে রাস্তা করবে ব'লে—ভীষণ শব্দে কানে তালা ধ'রে যায়।

২১শে গঙ্গানানী ধর্মশালায় কাটে। এখান থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের ওপর উষ্ণ জলের ৩টি কুণ্ড আছে—ব্যাস-কুণ্ড, বশিষ্ঠ-কুণ্ড, নারদ-কুণ্ড। কুণ্ডে স্নান ক'রে ও মন্দিরে দেবদর্শন ক'রে দিনটি কেটে যায়।

আরও ৩ দিন লাগে গঙ্গোত্রী পৌছতে। পথে কোথাও বৃষ্টি নেমেছে, কখন আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হয়েছে, কখন মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যদেব প্রখর হ'য়ে উঠেছেন। যেখানে গাছপালা নেই সেখানে কষ্ট হয়েছে। ছায়াঘেরা সুদৃশ্য বনপথে হাঁটতে হাঁটতে যাত্রীদের কেউ আনন্দে গীতা-উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করেছে, কেউ বা ভজন গেয়েছে, কেউ বা শিব বিষ্ণু বা গঙ্গার স্তব করেছে।

পথে হরসিল জায়গাটি বেশ ভাল লেগেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট উচ্চে সমতল ভূমি। এখানে অনেক স্রোতস্বতী এদিক ওদিক বয়ে যাচ্ছে, এই জলধারাসমূহের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। এখানকার আপেলের বাগান দেখবার মতো, গাছে গাছে ছোট ছোট আপেল ধরেছে, এখনও পাকতে অনেক দেরি। হরসিল কৃষি ও পশুচারণ কেন্দ্র। ভাল ফসল হয় এখানে। পার্বত্য প্রদেশে এমন উর্বর ভূমি সাধারণতঃ বিরল। পশুর মধ্যে দেখলাম ঘোড়া, বড় বড় ছাগল ও ভেড়া—সব দলে দলে চরছে। ভেড়ার পালে বড় বড় কুকুর পাহারা দিচ্ছে।

জাহ্নবী-সঙ্গম পার হ'য়ে ভৈরবঘাটীর চড়াই উঠতে খুব কষ্ট হয়েছিল, তার উপর বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। ভৈরবঘাটীর কাছ দিয়ে তিব্বতের সীমান্ত বেশী দূর নয়, পাহাড় কেটে নতুন পথ তৈরী হয়েছে। সৈন্যদল এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে।

ভৈরবঘাটীর মন্দিরে ভৈরবের মূর্তি দর্শনীয়। ঐ খানেই রাত্রিবাস ক'রে ২৫শে মে যাত্রা ক'রে সকাল আটটার মধ্যে গঙ্গোত্রী পৌছই। তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের ওপর সূর্যোদয় দেখলে মনে হয় হিমাদ্রি যেন সোনার মুকুট পরে সূর্যবন্দনায় রত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০,৩০০ ফুট উচ্চে হিমালয়ের বুকে গঙ্গোত্রী মহাতীর্থ—ভগীরথের তপঃক্ষেত্র। কত বৎসর ধরে কঠোর তপস্যা ক'রে কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষের উদ্ধারের জন্য বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে তিনি ধরাতলে এনেছিলেন—পুরাণের কাহিনী সব মনে পড়ে। যমুনোত্রীর মতো গঙ্গোত্রীও ছমাস বরফে আচ্ছাদিত থাকে।

সুদৃশ্য বিশাল মন্দিরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্নপূর্ণার মূর্তি, সম্মুখে ভগীরথ

যুক্তকরে দণ্ডায়মান। কিছুদূরে ভাগীরথী বয়ে চলেছেন। তুষারগলা জলে স্নান ক'রে আমরা মন্দিরে পূজা দিলাম। গঙ্গামাতার ধ্যানেই আমাদের এই দিনটি কেটে গেল। রাত্রেই গোমুখ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে হ'ল, আকাশ পরিষ্কার ও আবহাওয়া ভাল না থাকলে গোমুখে যাওয়া যায় না। দুর্গম ব'লে খুব কম যাত্রীই এ পথে পা বাড়ায়।

পরদিন সকাল ৮টায় যাত্রা ক'রে প্রায় ৯ মাইল অতি দুর্গম পথ অতিকষ্টে অতিক্রম ক'রে চীরবাসায় পৌছই বেলা ৪টায়। গোমুখ যাবার কোন তৈরী রাস্তা নেই। গঙ্গার ধারে ধারে পাথরের উপর পা দিয়ে দিয়ে যেতে হয়, প্রতি মুহূর্তে পতনের সম্ভাবনা ; মনে হয় মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। একস্থানে গঙ্গার উপরিভাগ সব বরফে ঢেকে গেছে, বরফের পুল, তার উপর দিয়ে যেতে খুবই ভয় হয়েছিল।

চীরবাসায় কোন বসতি নেই, জনমানবশূন্য। শুধু একটি ধর্মশালা—চতুর্দিকে তুষারাবৃত পর্বত-শ্রেণী। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, তার উপর ভালুকের ভয়। রাত্রে আমরা আগুন জেলে ধর্মশালায় কাটাই।

২৬শে বৃহস্পতি বার সকাল ৬টায় চীরবাসা থেকে গোমুখী তীর্থে পৌছই বেলা ১১টায়—প্রায় ৮ মাইল বিপদসঙ্কুল পথ হেঁটে। এই ৮ মাইল যে কিভাবে হেঁটেছি, তা এখন চিন্তা করতেও ভয় হয়! এক জায়গায় পাথরের উপর তরল তুষার থাকায় পা পিছলে পড়ে যাই, ভাগ্যক্রমে বিশেষ লাগেনি। অনেক জায়গায় ঝুরঝুরে পাহাড় পার হ'তে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি, মনে হয়েছে এই বুঝি পড়লাম। পর-ক্ষণেই মনের বল নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

চারদিকে সৌন্দর্যের সম্ভার, কিন্তু প্রকৃতির এই অপূর্ব সৌন্দর্য উপভোগ করবার সময় কই? এদিক ওদিক তাকালে তো পড়ে গিয়ে একেবারে নীচে চলে যেতে হবে! পুরুষকার উদ্যম, সাহস, সব যেন উবে গেল। এখন শুধু শরণাগতি। মা, তুমি রক্ষা করো, হাত ধ'রে নিয়ে চল, বাঁচাও, আমি তোমার শরণাগত। প্রাণের আর্তি বোধহয় মায়ের কানে পৌছল। মনে হ'ল কে যেন আমায় হাত ধ'রে নিয়ে চলেছে। সংসারের কল-কোলাহল যেন কোথায় লুপ্ত হ'য়ে গেছে!

হঠাৎ শুনতে পেলাম গাইড্ বলছে 'এই গোমুখ-তীর্থ, স্নান-পূজাদি সেরে নিন।' গঙ্গার মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড পাথরের উপর বসে পড়লাম। দূরে দেখা যাচ্ছে বরফ আর বরফ! ঐ যে বরফের চাঁই ভেদ ক'রে পতিতপাবনী মা আমার উচ্ছল গতিতে ছুটে আসছেন! আপনা থেকেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল:

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্॥

সর্বালঙ্কারভূষিতা মা গঙ্গার মূর্তি মানসপটে ভেসে উঠল!

গোমুখে মানুষের নির্মিত কোন মন্দির নেই। ১২,০০০ ফুট উচ্চে এই দুর্গম তীর্থের দৃশ্য অতি মনোরম, চারদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতে কেবল হিমরাশি। প্রকৃতির মন্দিরে এই অকৃপণ সৌন্দর্য দেখলে অভিভূত না হ'য়ে পারা যায় না। গোমুখে স্নান-পূজা, জপ-ধ্যান ক'রে যাত্রীরা অফুরন্ত আনন্দলাভ করে।

শীঘ্র ফিরতে হবে, নইলে বেলা বাড়লে বরফগলা জলও বাড়ে, তখন ফেরা মুস্কিল! তাড়াতাড়ি ফেরার উদ্যোগ করতে হ'ল। পথে কয়েকজন সাধুর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ আনন্দ পাই। চীরবাসায় রাত্রিবাস ক'রে পরদিন গঙ্গোত্রীতে প্রত্যাবর্তন। ফেরার পথে আর কষ্ট হয়নি, পথ পরিচিত। গঙ্গোত্রী থেকে উত্তরকাশী ফিরতে ৪দিন লাগে। এখানে এসে কেদারনাথ ও বদরীনাথের আকর্ষণ অনুভব করি।

গুহ-চরিত্র চিত্রণে বাল্মীকি ও তুলসীদাস

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

নিষাদরাজ গুহকে বাল্মীকি রামের 'আত্মসম' সখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২।৫০।৩২)। গুহও বলেন যে রামের চেয়ে প্রিয়তর তাঁহার আর কেহ নাই (২।৫১।৪) কিন্তু রাম ও গুহের মধ্যে বয়সের তফাৎ অনেক। একজন যুবক, অন্যজন বৃদ্ধ।

যুবকের সহিত বৃদ্ধের বন্ধুত্ব অসম্ভব না হইলেও কিছুটা অস্বাভাবিক। আমার মনে হয়, নিষাদরাজ গুহ অযোধ্যার রাজার মিত্র-নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল শৃঙ্গবের-পুর। তুলসীদাস ঐ স্থানকে সিঙ্গরোর নামে অভিহিত করিয়াছেন (অযোধ্যাকাণ্ড—১৫১)। কানিংহাম শৃঙ্গবেরপুরকে আধুনিক সিঙ্গরোরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। ঐ স্থান এলাহাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

গঙ্গার তীরে ঘন ও নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। ভরত যখন রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাইতেছিলেন, তখন গুহের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তিনি বলেন 'গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ' অর্থাৎ গঙ্গাতীরে দুষ্প্রবেশ্য জলাভূমি, সুতরাং ভরত গঙ্গা অতিক্রম করিবার জন্য গুহের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন (২।৮৫।৪)। বস্তুতঃ গুহ তাঁহার সৈন্যদল-সহ গঙ্গা পার হইবার পথ নিজের অধিকারে রাখিতেন। তিনি বেতনভুক্ সৈন্য রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জ্ঞাতিরাই তাঁহার সৈন্য—কেননা ভরত যখন তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন গুহ তাঁহার জ্ঞাতিজনকে বলিলেন (২।৮৯।৮), 'তোমরা নৌকা আন, ভরতের সৈন্যদিগকে পার করিতে হইবে।' গুহের রাজ্য এমন সুরক্ষিত ছিল যে তিনি লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করিলেও তিনি সহজে উহার প্রতিরোধ করিতে পারিবেন।

গুহের রাজ্যকে অর্থশাস্ত্রের ভাষায় 'আটবিক রাজ্য'ও বলা যায়। সেকালে রাজাদের বল বা সৈন্যের মধ্যে আটবিক বল গৌণ বা অধম স্থান অধিকার করিত। 'মানসোল্লাস' নামক গ্রন্থে আছে, আটবিক সৈন্য নিষাদ, ম্লেচ্ছ ও তদনুরূপ জাতিদের দ্বারা গঠিত; তাহারা পাহাড়ের নিকট বাস করে (২।৬।৫৫২)। নিষাদেরা চণ্ডাল নহে, যদিও বাংলা রামায়ণে গুহকে চণ্ডাল বলা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য (১।৯১) বলেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে নিষাদের জন্ম, আর ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে চণ্ডালের জন্ম। শাস্ত্রকারদের মতে নিষাদেরা অনুলোম বিবাহের ফল আর চণ্ডালেরা প্রতিলোম বিবাহের ফল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষাদেরা একটি প্রাক্-আর্য জাতি। তাহারা ধনুর্বাণের দ্বারা জীবিকা অর্জন করিত। তুলসীদাস তাহাদিগকে স্বভাবতঃ চৌর্যপ্রবণ জাতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভরত যখন চিত্রকূট যাইবার পথে তাহাদের রাজ্যে রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তখন তাহারা ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল :

যহ হামারি অতি বড়ি সেবকাঈ।
লেহি ন বাসন-বসন চোরাঈ ॥ (অযোধ্যা—২৪৯)

—আপনাদের বাসনপত্র ও কাপড়চোপড় আমরা যে চুরি করিয়া লই নাই, এই তো আমাদের বড় সেবা।

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণে এই ধরনের কোন ইঙ্গিত নাই। বাল্মীকির রামায়ণ পড়িলে মনে হয় না যে গুহ অস্পৃশ্য ছিলেন। রামের সহিত দেখা হইতেই গুহ তাঁহাকে প্রথমে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, (২।৫০।৩৫) 'যথাহযোধ্যা তথেয়ং তে রাম কিং করবাণি তে'—তুমি আমার রাজধানীকে অযোধ্যার মতন তোমার নিজের বলিয়াই মনে করিও; বল, এখন তোমার কি কাজ করিব? এই বলিয়া গুহ রামকে ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় ও লেহ্য প্রভৃতি প্রদান করিলেন (২।৫০।৩৯)। গুহের যদি ধারণা থাকিত যে তিনি অস্পৃশ্য, তাহা হইলে নিজেই প্রথমে অগ্রসর হইয়া তিনি রামকে আলিঙ্গন করিতেন না এবং অন্নব্যঞ্জনাদি খাদ্যদ্রব্যও উপহার দিতেন না। রামচন্দ্র তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া (২।৫০।৪১) বলিলেন, 'আমি এখন চীর ও চর্ম ধারণ করিয়াছি; ফলমূল খাইয়া তাপস-ব্রত উদ্‌যাপন করিব; সুতরাং তোমার দেওয়া জিনিসের মধ্যে কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্য ঘাস লইতেছি, উহা সুমন্ত্রের রথের অশ্বেরা খাইবে।'

ভরত যখন নিষাদরাজ্যে আসিয়াছিলেন, তখন গুহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি রামের আহারের জন্য অনেক রকম ফলমূল, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুর উপহার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া সে সবই আমাকে ফেরত দিয়াছিলেন, এবং আমাকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন, সখে, সর্বদা দানই আমাদের কর্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ গঙ্গা হইতে জল আনিলে তিনি তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন, লক্ষ্মণও অবশিষ্ট জল পান করিয়া রহিলেন'(২।৮৭।১৫-১৮)।

বাল্মীকি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া গুহের প্রদত্ত ভোজ্যাদি প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ দুই জায়গায় দুই ভাবে দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা মিত্র বা সামন্ত রাজাদের উপহার গ্রহণে কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

তুলসীদাস বলেন যে রামচন্দ্র সুমন্ত্র, সীতা ও লক্ষ্মণসহ গুহ-প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিয়াছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড—৮৯)। বাল্মীকির বর্ণনায় দেখা যায় যে গুহ ভরতকেও বলিয়াছেন, 'নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে; আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্যে পাওয়া যায়—এমন অন্যান্য খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। সেই জন্য প্রার্থনা করি, তোমার সৈন্যেরা আজ রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কাল প্রভাতে যাত্রা করুক' (২।৮৪।১৭-১৮)। ভরত তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি নিজে কিছু খাইলেন কিনা, সে কথা বাল্মীকি বলেন নাই। কিন্তু নিষাদেরা যদি অস্পৃশ্যই হইত, তাহা হইলে ভরতের সৈন্যেরা—যাঁহারা ক্ষত্রিয়বংশজাত ছিলেন, তাঁহারাও উহা খাইতেন না। পিতৃবিয়োগের পরই ভরত চিত্রকূট অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে সময়ে হয়তো অপরের প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ছিল, তাই বাল্মীকি ভরতের খাওয়া সম্বন্ধে নীরব। তুলসীদাস গুহের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, নিষাদেরা এমন অধম ও অস্পৃশ্য যে তাহাদের ছায়া ছুঁইলেও লোক অপবিত্র হয়, স্নান করিতে হয়—

লোক বেদ সব ভাঁতিহি নীচা।
জাসু ছাঁহ ছুই লেইঅ সীঁচা ॥ (অযোধ্যা – ১৯৫)

বাল্মীকি বলেন, লক্ষ্মণকে রাত্রি জাগিয়া রাম-সীতাকে পাহারা দিতে দেখিয়া গুহ তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলেন এবং নিজে নিষাদদের সহিত শরাসন লইয়া তাঁহার প্রিয়সখা

রাম ও তাঁহার পত্নীকে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'ইঁহার প্রসাদে ধর্ম, অর্থ এবং ইহলোকে মহদ্ যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার প্রার্থনা, (২।৫১।৫)। এখানে গুহ পরলোকের কথা কিছুই বলিলেন না; রামের কৃপায় মোক্ষলাভ বা ভক্তিলাভ—এমন কথারও ইঙ্গিত করিলেন না। ধর্মের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে হইতেছে সার্বভৌম রাজা ও বন্ধুর প্রতি কর্তব্যপালনরূপ ধর্ম।

বাল্মীকি বলেন, সেই রাত্রিতে লক্ষ্মণ গুহের নিকট রামসীতার দুঃখ, কৌশল্যা-সুমিত্রার মন্দভাগ্য ও দশরথের কথা বলিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিলেন। তুলসীদাস এইস্থানে লক্ষ্মণের মুখ দিয়া গুহের প্রতি মায়া, কর্মবাদ প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাইয়াছেন, এইসব দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবার পর লক্ষ্মণ গুহকে বলিলেন :

রাম ব্রহ্ম পরমারথরূপা।
অবিগত অলখ অনাদি অনুপা॥
সকল বিকার-রহিত গতভেদা।
কহিনিত নেতি নিরূপহিঁ বেদা॥

—সুতরাং মোহ পরিত্যাগ করিয়া 'সিয় রঘুবীর চরণরত হোঁউ'।

তুলসীদাস রামচন্দ্রকে পরমব্রহ্ম ভগবান-রূপেই সব সময়ে দেখিয়াছেন ও আঁকিয়াছেন। তাই গুহের অনুচর এক কেবট (নাবিক) রামচন্দ্রকে নৌকায় চড়াইবার পূর্বে জেদ ধরিলেন যে তিনি আগে শ্রীরামের পা ধোয়াইয়া দিবেন, তারপর নৌকায় তাঁহাকে পা ফেলিতে দিবেন। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে রামচন্দ্রের পায়ের স্পর্শ পাইয়া এক পাষাণ নারী হইয়া গিয়াছে; সেই জন্য তাঁহার ভয় যে তাঁহার নৌকারও বুঝি বা নারীত্ব প্রাপ্তি ঘটে। ঐ নৌকাই তাহার পরিবার প্রতিপালনের একমাত্র উপায়। তাই কেবট রামচন্দ্রের পা ধোয়াইয়া তাহার স্পর্শ-গুণকে নষ্ট করিতে চাহেন। রামচন্দ্র হাসিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন।

বাল্মীকির অনুসরণ করিয়া তুলসীদাস লিখিয়াছেন : ভরতকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে দেখিয়া গুহ ভাবিলেন যে বোধ হয় রামলক্ষ্মণকে মারিয়া ফেলিয়া ভরত নিষ্কণ্টক হইতে চাহেন। তিনি রামচন্দ্রের মিত্র, কাজেই ভরতের এই দুষ্ট অভিপ্রায় সংসাধনে বাধা দিবার জন্য তিনি লোকজনকে সব ঘাট সুরক্ষিত রাখিতে আদেশ দিলেন, যাহাতে ভরত গঙ্গা পার হইয়া অগ্রসর হইতে না পারেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অনুচরগণকে ভরতের সহিত মরণপণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইল।

এমন সময়ে এক বৃদ্ধ নিষাদ গণিয়া বলিলেন যে ভরতের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইবে না, কেননা ভরত রামকে ফিরাইয়া আনিতে চলিয়াছেন। এই গণকের চরিত্র অবশ্য তুলসীদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। যাহা হউক, দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া গুহ একটু ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, 'ভাল কথা, আমি ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মতলব কি আগে বুঝিয়া লই।' ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রামের সখা বলিয়া ভরত গুহকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। গুহের সন্দেহ দূরীভূত হইল।

বাল্মীকি ও তুলসীদাস উভয়েই লিখিয়াছেন যে গুহ ভরতের সহিত চিত্রকূট পর্যন্ত পথ দেখা-ইতে দেখাইতে গেলেন। বাল্মীকি বলেন, ভরত গুহকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন রামচন্দ্রের কুটীর খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বনের মধ্যে চারিদিকে ছোট ছোট নিষাদ-দল

প্রেরণ করেন (২।৯৮)। গুহ অবশ্য এ কাজের ভার আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন।

বাল্মীকির রামচন্দ্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার সময় হনুমানকে আদেশ দেন—যেন তিনি শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া গুহকে তাঁহার ফেরার খবর দেন (৬.১২৮।৩-৪)। তুলসীদাসের রাম গুহের প্রতি আরও স্নেহাসক্ত। তিনি পুষ্পকরথ হইতে নামিয়া গুহের সঙ্গে দেখা করেন, এবং লক্ষ্মণকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি ভালবাসার সহিত গুহকে আলিঙ্গন করিলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের সময় গুহ উপস্থিত ছিলেন কিনা, তাহা বাল্মীকির বর্ণনা হইতে জানা যায় না। কিন্তু তুলসীদাস বলেন, গুহ সে সময় সেখানে ছিলেন এবং রামচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার বসন-ভূষণ উপহার দেন। তাঁহাকে তিনি 'ভরতসম ভ্রাতা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং সব সময়ে অযোধ্যায় যাতায়াত রাখিতে অনুরোধ করেন। গুহ শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনিয়া চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন।

বাল্মীকির গুহ রামচন্দ্রের মিত্র অথবা করদ রাজা। তাঁহার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ। তুলসীদাসের গুহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি গভীর ভক্তিভাব পোষণ করেন। তাঁহার মধ্যে সখ্য অপেক্ষা দাস্য-ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়।

বিশ শতকের ভূমিকা : সংস্কৃতি ও সাহিত্যে

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খৃঃ বিশ শতকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদেশী সংস্পর্শের ফলে বাঙালীর ভাবজীবনে যে প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, শতাব্দী-শেষে কয়েকজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষের চিন্তায় ও কর্মে সেই ভাবসংঘাত সমন্বয়াশ্রয়ী উদার সংস্কৃতি-নির্মাণের পথ খুঁজছিল। আচার্য কেশবচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত। এই সমন্বয়-সাধকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান একটু স্বতন্ত্র—তাঁর সাধনা মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়েছিল ভাব-জীবনকে আশ্রয় ক'রে, আর মনীষীদের সংস্কৃতি-চর্চা উদার মুক্তির পথ খুঁজছিল জ্ঞান, কর্ম, প্রেম এবং সৌন্দর্যানুভূতিকে কেন্দ্র ক'রে। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে প্রাচ্য জীবনাদর্শের সমন্বয়ে একটা মহৎ জীবনবোধের স্বপ্ন তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসকে জাগ্রত করেছিল। তাঁদের সকলেরই মানবতা-বোধের প্রেরণা মুখ্যতঃ ধর্মাশ্রয়ী।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আর একটি প্রবল ভাবপ্রেরণা শিক্ষিত বাঙালী চিত্তকে সবলে আকর্ষণ করেছিল, সে হ'ল একটা উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধের প্রেরণা। এই জাতীয়তা-বোধের ভিত্তিতে ছিল য়ুরোপীয় পলিটিক্স্। নবজাগ্রত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ফলে শিক্ষিত বাঙালী-মন ক্রমশঃ আকৃষ্ট হ'ল সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে জীবনের বাস্তব পরিবেশের দিকে। ধর্মচিন্তার স্থান গ্রহণ ক'রল রাষ্ট্রচিন্তা। এই রাষ্ট্রচিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল বাঙালীর স্বাজাত্য-বোধ ও স্বাধিকারের চেতনা। কেশব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের মতো মনীষী যেখানে চেয়েছিলেন

জাতির সাংস্কৃতিক মুক্তি, সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের মতো চিন্তা- ও কর্ম-বীর সেখানে চাইলেন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি। জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্যে পূর্বযুগের চিন্তানায়কেরা শাসক ইংরেজ-জাতির সাহচর্য অপরিহার্য মনে করেছিলেন। আর নব্যতন্ত্রী নায়কেরা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকেই লক্ষ্যে পৌঁছবার অন্যতম উপায় ব'লে উপলব্ধি করলেন। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে অত্যাচারী বিদেশী শাসকজাতির সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতবাসীর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অনিবার্য হ'য়ে উঠল। শক্তিমান্ শাসকজাতিও ন্যায়নীতি-বিরোধী আইন প্রয়োগের দ্বারা জাগ্রত জাতির এই বিদ্রোহ-চেতনাকে খর্ব করতে উদ্যত হলেন। আঘাত যতই কঠোর থেকে কঠোরতর হ'ল, বাঙালী জাতীয়তাবোধও ততই গভীর ও অন্তঃস্পর্শী হ'য়ে উঠল।

এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের দুটো দিক খুবই লক্ষণীয়। একদিকে সেই জাতীয়তার প্রেরণা সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতির বাঞ্ছিত মুক্তি খুঁজছিল; আর একদিকে জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং সম্প্রসারণই ছিল সেই চিন্তাশ্রয়ী জাতীয়তাবোধের প্রধান লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ্য ক'রে বাঙালীর উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবোধ তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলনের আবেদন এতটা ভাবাবেগপূর্ণ ছিল যে রবীন্দ্রনাথের মতো সূক্ষ্ম ভাব-সচেতন কবি এই সময় স্বদেশী গান লিখে এবং গেয়েই শুধু ক্ষান্ত হননি, সক্রিয় আন্দোলনে অংশও গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাস-পাঠক জানেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সে যুগের আরও কোন কোন মনীষীর সক্রিয় সহযোগিতায় এবং জাতীয় অভ্যুত্থানের ফলে কৌশলী ইংরেজরাজের এই অভিসন্ধিপরায়ণ বঙ্গবিভাগ-পরিকল্পনা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়, যার ফলে বাঙালীর আত্মপ্রত্যয় গিয়েছিল পূর্বের থেকে শতগুণ বেড়ে।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি- ও সাহিত্য-প্রসারে বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের ভাবাত্মক দিকটাই বিশেষ ক'রে স্মরণীয়। এই ভাবধর্মী জাতীয়তাবোধ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যে। এই কর্মের ধারা দ্বিবিধঃ একদিকে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার ক'রে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি পাশ্চাত্য-ভাব-প্রভাবিত বাঙালীর শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় বৃদ্ধির প্রয়াস, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণার সাহায্যে জীবনের ব্যাবহারিক দিককে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা এবং বাঙালী মনীষার উৎকর্ষ-সাধন। প্রথম পর্যায়ের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ এবং দর্শনে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বিজ্ঞান-চর্চায় সার্থকতা লাভ ক'রে যাঁরা বাঙালীর মনে আত্মপ্রত্যয় এনেছিলেন এবং বাঙালীর সংস্কৃতিকে দিগন্ত-প্রসারিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাম। আচার্য বসু ও আচার্য রায় শুধুমাত্র মনীষী বিজ্ঞানী নন, তাঁদের বিজ্ঞান-চর্চা ও গবেষণা ছিল সুগভীর জাতীয়তাবোধ দ্বারা প্রভাবিত। তাঁদের মূল্যবান্ গবেষণা বাঙালী-মনকে যুক্ত করেছে বিশ্ব-মনের সঙ্গে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে বলা চলে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এই যুগের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মনীষা ও প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের

বিদগ্ধ সমাজে। উগ্র জাতীয়তাবোধের ফলে ধর্মচেতনা স্তিমিত হ'য়ে এলেও যে নিঃশেষে তা অবলুপ্ত হ'য়ে যায়নি, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গভীর ভক্তিরসাত্মক কাব্য ও প্রার্থনা-বক্তৃতা-গুলি। বস্তুতঃ এই অধ্যাত্ম চেতনাগভীর লিরিক কবিতার জন্যই সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশবাসী রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেছিলেন 'নোবেল পুরস্কার' দিয়ে। জগদীশচন্দ্রের মৌলিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তিও শুধু যে বাঙালীর মর্যাদা বাড়িয়েছে তা নয়, সে যুগের বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়কে বাড়িয়ে দিয়েছিল সহস্রগুণ। আর একথাও স্মরণযোগ্য, এই আত্মপ্রত্যয়ই সব রকম সৃষ্টির মৌল প্রেরণা। এই কাল-বৃত্তের মধ্যে বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চা লোকাশ্রয়ী রূপ না পেলেও শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টিকে বিশ্বমুখী ও তীক্ষ্ণ যুক্তবাদী ক'রে তুলেছিল।

কিন্তু আলোচ্য কালের মধ্যে বাঙালী-সংস্কৃতির একটা অর্থপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পর্শে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রদর্শিত ধারায় উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু বিশ শতকের প্রারম্ভকালেই নতুন উপন্যাস রচনা ক'রে তিনি এ-শতাব্দীর লেখকদের সামনে নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। অতঃপর বাংলা উপন্যাস মুখ্যতঃ আবর্তিত হয়েছে এই বাস্তবধর্মী ধারায়। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সমৃদ্ধি ও সার্থকতার মূলেও এই বাস্তবতা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ বিভাগ ছোটগল্পেরও আবির্ভাব ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে এ-কালে। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুবর্তীদের হাতে ললিতমাধুর্যময় লিরিক কাব্যের প্রসারও ঘটে এই যুগে। রবীন্দ্রকাব্যের সুরেলা অভিব্যক্তি আধুনিক কাব্যের জনপ্রিয়তার মূলে। গত শতাব্দীর আদর্শপ্রধান মহাকাব্যগুলি পাঠক-সমাজে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি, যেমন পেরেছিল রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাবানু-সারী কবিদের গীতোচ্ছ্বাসপূর্ণ লিরিক কবিতা। বাংলা প্রবন্ধ এবং নাটকও নতুন রূপ পেল রবীন্দ্র-নাথের অভিনব শিল্পদৃষ্টির স্পর্শে। সমালোচনাকে সৃজনধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত ক'রে একটা সম্ভাবনাময় নতুন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করলেন তিনি। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে বিস্তৃত এবং গভীর চিন্তার সংযোগে প্রতিভাবান্ রবীন্দ্রনাথ শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভারই বাড়াননি, সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার সাহায্যে সে সাহিত্যের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য বৃদ্ধি ক'রে সমকালীন লেখক এবং পাঠকের সাহিত্যরুচিকেও উন্নত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সাহিত্যে যে বিদগ্ধরুচির স্রষ্টা তা নয়, আধুনিক জীবনেরও রুচিবোধকে উন্নত করেছেন তিনি ভাবধর্মী সঙ্গীত এবং জীবনধর্মী নৃত্যের সাহায্যে। যে অর্থে সংস্কৃতির অর্থ শালীনতা (urbanity), রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালী জীবনে সেই শালীনতার স্রষ্টা। রূপানুরাগ, সূক্ষ্ম রসবোধ, গভীর জীবনপ্রীতি—এই শালীনতাবোধের মর্মমূলে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রসাহিত্যের অবসরবিলাস-পুষ্ট সূক্ষ্ম-ভাবধর্ম এবং ললিতমাধুর্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-বিদ্রোহীরাও রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং রবীন্দ্র-পরিকল্পিত নৃত্যশিল্পের উৎকর্ষ স্বীকার না ক'রে পারেননি। এক কথায় আধুনিক বাঙালী বিদগ্ধমন রবীন্দ্র-শিল্পের অজস্র ধারায় স্নান ক'রে নবজন্ম লাভ করেছে।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের অমর অবদানও বিশ-শতকীয় বাঙালী-সংস্কৃতি বিকাশ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এর কারণ তাঁর অভিনব শিল্পোদ্যম পূর্বযুগের অনুকরণপ্রিয়তার স্তর অতিক্রম ক'রে বাঙালী শিল্পীর দৃষ্টি ও

মনকে সবলে আকর্ষণ করেছিল ভারতীয় জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও মহত্ত্বের প্রতি। যে সুগভীর সৌন্দর্যবোধ এবং জাতীয়তার প্রেরণা এ-যুগের রবীন্দ্রসাহিত্যকে মূল্যসমৃদ্ধ করেছে, সেই একই প্রেরণা অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথও বাঙালী সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নতুন যুগের স্রষ্টা।

আলোচ্য যুগে রবীন্দ্রনাথের ললিতমাধুর্যময় সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে একটি প্রবল শক্তির অভ্যুদয় বিশ-শতকীয় সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্য ঘটনা। এই শক্তি হলেন 'বীরবল'-ছদ্মনামে খ্যাত প্রমথ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের মনোজগতের থেকে প্রমথ চৌধুরীর মানসিক জগতের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ অধ্যাত্মজগৎসচেতন, ভাববাদী, আর প্রমথ চৌধুরী প্রচণ্ডভাবে ইহবাদী এবং যুক্তিনির্ভর। রবীন্দ্রনাথের মানস জগৎ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত; আর প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বর্তমানের দিকে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির উৎসে মুখ্যতঃ শিল্পীর আবেগ, আর প্রমথ চৌধুরীর রচনার প্রেরণায় নৈয়ায়িকের যুক্তি। এই যুক্তি-প্রকাশের ভাষা ক্ষুরধার, শাণিত, কখনও বা ব্যঙ্গপরায়ণ। ফরাসী সাহিত্যশিল্পী এবং মনীষীর ভাবানুষঙ্গে এসে একটা নতুন সাহিত্য-রীতির সৃষ্টি করলেন এই প্রতিভাবান্ লেখক। শক্তিমান্ এবং শক্তিহীন বহু লেখক যুক্তিধর্মী এবং ভঙ্গীপ্রধান রচনায় প্রমথ চৌধুরীর অনুবর্তী হলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রভাবিত হলেন এই নতুন সাহিত্যাদর্শের দ্বারা। বস্তুতঃপক্ষে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-প্রয়াসের মধ্য দিয়েই বিশ শতকের নবীন সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হ'ল উনিশ শতকীয় গতানুগতিক ধারার সাহিত্য থেকে।

এই যুগের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী-লেখক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। প্রবল জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বহুমুখী জ্ঞানস্পৃহা, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সঙ্গে প্রাচ্য মনের সমন্বয়ের অসাধারণ বৈচিত্র্য লাভ করেছে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যের ভঙ্গীর প্রাধান্য না থাকায় তাঁর আদর্শ গদ্য-রচনার অনুকারী বেশী জোটেনি। রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য এ-যুগের সাহিত্যে প্রায় নিঃসঙ্গ, কিন্তু অনন্য। রবীন্দ্র-যুগের উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের চিন্তা- ও ভঙ্গী-স্বাতন্ত্র্যও বাংলা সাহিত্যে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা। তীক্ষ্ণ প্রশ্নমনস্কতা, বাস্তব চেতনা এবং রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার সমন্বয়ে উপন্যাসে সৃষ্টি করলেন তিনি একটি নতুন যুগ, সেই যুগ এখনও সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়নি। মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ সম্পর্কে আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টির পরিচয় দিলেন এই জীবনধর্মী লেখক। জীবনের প্রতি এই বাস্তব দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথে ছিল অনুপস্থিত। এ-ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী ভাষাকে অতিক্রম ক'রে সাহিত্যের ভাষাকেও ক'রে তুললেন তিনি গদ্যধর্মী আধুনিক।

বর্তমান শতাব্দীর তিনের দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথ খুঁজছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা বাঙালী তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে তীব্রভাবে জাগ্রত করেছে। গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি রাজনৈতিক মুক্তির জন্য তৎপর হয়েছে। পরাক্রান্ত শাসকজাতি পশু-শক্তির সাহায্যে সে আন্দোলনকে দমন করেছে এবং পরে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দ্বারা বিশেষ ক'রে রাজনীতিতে প্রগতিশীল (বাঙালী) হিন্দুকে শাস্তি দিয়েছে। ফলে চারের দশকের দিকে শিক্ষিত বাঙালী চাকরি-

জীবী মধ্যবিত্ত হিন্দুর রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ হওয়ায় জীবনে নেমে এল হতাশার ম্লান ছায়া। সুস্থ জীবনচিন্তা ক্রমশঃ হ'ল অন্তর্হিত। ধর্মবোধ তো আগেই স্তিমিত হ'য়ে এসেছিল; জাতীয়তাবোধও এল ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে। ফলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবনা-বাসনা, ব্যর্থতা-বেদনা আত্মপ্রকাশ ক'রল এ-যুগের সাহিত্যে। সব চেয়ে জনপ্রিয় হ'ল এ সময়ে উপন্যাস-সাহিত্য। কিন্তু সে উপন্যাস অনুকরণ-তৎপর, আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার বিজৃম্ভণে ভরা। কাব্যেও নৈরাশ্যের সুর। এই নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে উপন্যাসে তারাশঙ্করের মতো শিল্পীর অভ্যুদয় এই সময়কার সাহিত্য-জগতে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নেই। তাঁর শিল্প-ভাবনার মধ্যে বাঙালী পাঠক একটা অভিনব আনন্দবেদনাত্মক জগতের সন্ধান পেল।

তারপর এল বাঙালীর জীবনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং মহামন্বন্তর, এ সময় এক শ্রেণীর লোকের জীবনে এল আর্থিক সমৃদ্ধি, আর এক শ্রেণীর জীবনে সীমাহীন রিক্ততা। এই ভারসাম্যহীন সামাজিক পরিস্থিতিতে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ হ'ল মানুষের মন থেকে ক্রমশঃ অন্তর্হিত। একটা জান্তব ভোগলোলুপ পিপাসা এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মনকেও কলুষিত ক'রে তুলল। যুদ্ধের সময় আমেরিকার সৈন্যদের সংস্পর্শে আগত বাঙালী জীবনের উপর ইয়াঙ্কি সভ্যতার ছাপ মুদ্রিত হ'ল। এ-অবস্থায় সাংস্কৃতিক জীবনে পরিচ্ছন্নতা অথবা সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎকর্ষ আশা করা যায় না। একটা তামসিক যুগের ছায়া নেমে এল বাঙালীর জাতীয় জীবনে।

এ-যুগে মানুষে মানুষে যে বৈষম্য অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে এতদিনকার সমাজাদর্শ এবং সমাজচিন্তাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিল, তার ভিত্তিতে ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চোরা-কারবারের সুড়ঙ্গপথে দেশের মধ্যে একদল লোক অবৈধভাবে অপর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় ক'রে শুধু যে ব্যক্তিগত-ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল তা নয়, শহরে শহরে নিত্য নতুন সিনেমা, থিয়েটার, আধুনিক পদ্ধতির ভোজনাগার প্রভৃতি ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে দেশীয় লোকের চিত্তকে ভোগচঞ্চল ক'রে তুলল। এই হঠাৎ-বড়লোকদের ব্যক্তিগত প্ররোচনায় লোকের ভোগস্পৃহা বেড়েছে, অথচ সে স্পৃহা নিবৃত্ত করবার সামর্থ্য বিত্তহীনদের নেই—এ কারণে সমাজের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্যবোধ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ ক'রল। শিক্ষিত বিত্তহীন সমাজের এই প্রধূমিত অসন্তোষ-বহ্নিকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলল পাশ্চাত্য সাম্যবাদী-চিন্তানেতা কার্ল মার্কসের সমাজতাত্ত্বিক আদর্শ। এই নব্য-মানবতাবাদী সমাজতাত্ত্বিক আদর্শ শুধু যে একশ্রেণীর বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল তা নয়, বাঙালী লেখকের সাহিত্যচিন্তায়ও ফাটল ধরিয়ে দিল। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো স্বীকৃত সাহিত্যিক প্রতিভা কিছুকাল মাত্র আগে বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়েছে। মার্কসবাদী সাহিত্যিকেরা তাঁদের রচনাকে 'পেতি বুর্জোয়া' সমাজের অবসরকালীন বিলাস এবং সেকেলে (demodent) ব'লে উপহাস করতে লাগলেন। পূর্বযুগের আদর্শবাদের স্থানে এল অতি-সচেতন বাস্তববাদ, বিশ্বাসের স্থানে এল নাস্তিক্যবুদ্ধি, প্রশ্নমনস্কতা। সুস্থ সৌন্দর্যবোধ খণ্ডিত ক'রে দিল মানুষের অতিকুৎসিত ও অবাঞ্ছিত বাস্তব পরিবেশ। যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত ধনসম্পদ বৃদ্ধির ফলে মহানগরীর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পায়ন আরও বৃদ্ধি পেল। পূর্বযুগের সামন্ততান্ত্রিক জমিদার-সমাজের শিক্ষিত বংশ-

ধরেরাও আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়লেন এই সদ্যোলাভের জীবনযাত্রার প্রতি। ফলে পল্লীর আকর্ষণ ক্ষীণতর হ'য়ে মহানগরীর আকর্ষণ ক্রমশঃ তীব্রতর হ'য়ে উঠল।

এরূপ সামাজিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্তন দেখা দিল সমাজে ও সাহিত্যে। সমাজে নতুন অভিজাত-শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল, তাদের অভিজাত্যের মূলে হ'ল কাঞ্চন-কৌলীন্য। এই কৌলীন্যের প্রভাবে তারা যে সামাজিক ন্যায়নীতিকে উপেক্ষা ক'রল তা নয়, রাষ্ট্রীয় আইনের চোখেও ধুলা দিল। ধর্ম ও ন্যায়নীতিহীন এই স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে বিত্তহীন মানুষের ক্রোধও উঠল ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হ'য়ে। সমাজের এই শ্রেণী-সংঘাতের চিত্র সাহিত্যে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ না করলেও স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি যে গভীর বিশ্বাস ছিল পূর্বযুগের সাহিত্যে প্রধানতম প্রেরণা, সে প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য অনেকটা ক্ষণিকতা-ধর্মী হ'য়ে উঠল। চিরন্তন জীবনের আদর্শস্বপ্ন, কিংবা সে জীবনকে অবলম্বন ক'রে অখণ্ড সৌন্দর্যানুভূতি বা রোমান্স-প্রীতি অতীতের সামগ্রীতে পরিণত হ'ল। শুষ্ক ভাবাবেগবর্জিত, জীবনের প্রতি তীক্ষ্ণ এবং বক্র দৃষ্টিই হ'ল এ সময় থেকে সাহিত্যশিল্পীর প্রধান লক্ষ্য। ফলে সাহিত্যের শুধু বিষয়বস্তু (content)-তেই নয়, প্রকাশভঙ্গী (form)-তেও এল এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

ধর্মবোধের প্রেরণা ক্ষীণতর হ'য়ে এলেও জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বন্ধন-অসহিষ্ণু হ'য়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে অধীর হ'য়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাঁচের দশকের আগস্ট বিপ্লব। এই আগস্ট বিপ্লব এবং কিছুকাল পরে বাঙলার সুসন্তান নেতাজীর মুক্তিফৌজ-বাহিনী সৃষ্টি ক'রল বাঙলা তথা ভারতেতিহাসের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়—জাতীয় স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে এল ভারত-বিভাগ ও ভারতে উদ্বাস্তু-সমাগম। মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনার পথে এল জাতীয় মুক্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয় জাতীয় জীবনের এই যুগান্তকারী পরিবর্তন আমাদের এ-যুগের কোন সচেতন সাহিত্য-শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেনি 'আনন্দমঠে'র মতো স্মরণীয় কোন স্বদেশ-সচেতন শিল্পকীর্তি-নির্মাণে। উদ্বাস্তু-সমস্যার মতো এত বড় একটা জলজ্যান্ত জাতীয় সমস্যা আমাদের চিত্তের গভীরে আলোড়নের সৃষ্টি করেও যুগান্তরকারী কোন শিল্প-সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। কাঞ্চন-কৌলীন্যের ফলে যুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে যে আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সাম্যবাদী ধারণার বহু প্রসারের পরেও আমরা সে আবিলতা-মুক্ত হ'তে পেরেছি কি? যে সুস্থ জীবন-স্বপ্ন একদিন বাঙালী শিল্পীকে মহৎ শিল্পচেতনায় অনুপ্রাণিত করেছিল, সে স্বপ্ন আজ শিল্পী-মন থেকে অন্তর্হিত হ'ল কেন, সাহিত্য-শিল্প আজ মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য-নির্ভর কেন, বাঙালী সাহিত্যশিল্পীর মন কি আজ শূন্য-কুম্ভের মতো শব্দায়মান—এ সমস্ত প্রশ্ন আজ আধুনিক সাহিত্য- ও সংস্কৃতি-সমালোচকের মনকে আলোড়িত ক'রে তুলেছে। এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মিলবে বিশ শতকের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রাণবস্তুর সন্ধান।

পদ্মাসীন বুদ্ধের প্রতি *

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

হে প্রভু বুদ্ধ, আসীন পদ্মাসনে—
ধ্যান-নিমীলিত নয়ন তোমার
যুগল হস্ত হর্ষে সমুত্থিত ;
কোন সে নিগূঢ় মহা আনন্দ
লভিয়াছ তুমি বল ?
সে বুঝি চরম আনন্দ—তার
পরিবর্তন নাই ?
কোন্ সে শান্তি অনুপলব্ধ
বিলুপ্ত যাহা এ মর-জগৎ হ'তে ?

আমাদের পথ কোলাহল-মুখরিত
তারই মাঝে বহে অবিরাম গতি
রূপান্তরের হাওয়া,
আগামী কালের না-পাওয়া দুঃখশোক
শেষ ক'রে দেয় বিগত দিনের ব্যথা।
স্বপ্নের শেষে আর এক স্বপ্ন
সংঘাত আনে নব সংঘাত—
মৃত্যু খুলিছে জীবনের জটাজাল।

আমাদের তরে অগ্নির জ্বালা
বেদনা-বিহ্বলতা,
অহঙ্কারের গূঢ় রহস্য নহেক' অপ্রকাশ,
পরাজয় হানে চরম আঘাত
অবিরাম উৎসাহে।
ফুলের বিকাশ স্থগিত জীবনে
যদিও জীবন ফল হ'তে বঞ্চিত ;
তবু যে শান্তি পরম লভ্য,
হে প্রভু বুদ্ধ, বিরাজো পদ্মাসনে।
বঞ্চিত নহি সে শান্তি হ'তে মোরা।

তুচ্ছ দু-হাত বাড়ায়ে আমরা খুঁজি
অনধিগম্য বাসনার সফলতা,
পবিত্রতর চূড়ায় উঠিতে চাই—
বিশ্বাস ক্রমে বিলুপ্ত হয়,
চরণে ক্লান্তি নামে,
তবু আত্মার ক্ষুধা যে মোদের
স্বর্গের অভিমুখী,
কিছুতে সে ক্ষুধা মানে না শাসন,
মানে নাক' পরাজয়।

শেষ বহু দূরে—মায়াচ্ছন্ন
দূরে দূরে ছুটে চলে,
ইসারা তাহার তবু—
প্রলুব্ধ করে মন,
আমাদের যত ক্ষণভঙ্গুর এই মুহূর্তগুলি
সেই অনন্ত অসীমে রয়েছে লীন।
তোমার পদ্মাসনে বিরাজিত
যে পরম নির্বাণ—
জ্ঞানাতীত তাহা—
সন্নিধি তার—কেমনে লভিব বল ?

*'To a 'Buddha' seated on a lotus'—Sarojini Naidu.—ভাবানুবাদ

কর্মযোগ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কর্মহীন হ'য়ে থাকা সাধ্য নাই কারো মরলোকে
মুহূর্তও বিনা কর্মে রহিতে পারে না কোন জীব ;
প্রতিদিন বেঁচে থাকা—এও এক মহা কর্মযোগ।
বিশ্ব-প্রকৃতির রাজ্য নিত্যবহ কর্মের প্রবাহ ;
গতি তার রুদ্ধ করে, হেন বীর জন্মে নাই কেহ ;
জগতের কর্মস্রোতে ঝাঁপ দিতে হবেই সবারে।
কর্ম যদি বন্ধ হয়, স্তব্ধ হ'য়ে যাবে সৃষ্টি ধারা,
স্বভাব-সঞ্জাত কর্ম—জীব ধর্ম এই ধরণীতে ;
কিন্তু যদি কর্ম আনে বাধা কারো জীবনের স্রোতে—
সেখানে অটল বীর্যে ফেরাতেই হবে তার গতি।
কর্ম যেন কোন ছলে নাহি হয় বন্ধন তোমার ;
সেই শুধু পুণ্যকর্ম—আত্মা যাহে শুদ্ধ রহে সদা,
লয়ে আসে দিব্য ভাব প্রেমানন্দে যে কর্ম অন্তরে ;
সেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ—করিবে যা নিষ্কাম হৃদয়ে।

কর্মের প্রবৃত্তি হেথা সহজাত মানব-প্রকৃতি,
করিতেই হবে কিছু। নিষ্ক্রিয় কে রহিবারে পারে ?
বিনা কাজে বসে থাকা, শুয়ে থাকা, নিশ্চিন্ত আরামে,
নহে তো সহজসাধ্য, সে সাধনা সুকঠোর অতি !
মন কভু চিন্তা-কর্মে ক্ষণকাল বিশ্রাম কি পায় ?
চিত্ত তব নিত্য রত ভালো-মন্দ নানা ভাবনায়।
আহার বিহার নিদ্রা আত্মরক্ষা মৃগয়া ব্যসন,
হেন কোন কর্ম বিনা এ ধরায় আছে কোন প্রাণী ?
কিন্তু যদি ভাবো মনে—কর্ম করো তুমি কর্তারূপে,
ব্যর্থ হবে সর্ব কর্ম অহমিকা লভিলে প্রশ্রয় ;
প্রকৃতি করান কর্ম প্রকৃতির নিজ প্রয়োজনে,
তুমি আমি ঘুরিতেছি ঘানি-ঘরে বলদের মতো !
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য সম কর্ম করি প্রভুর আদেশে ;
ফসল ফলায় যেবা—সেই একা ক্ষেত্রের মালিক।

কর্তৃত্বের অভিমান স্থান যেন নাহি পায় মনে,
নিজেরে মজুর জেনে ক'রে যাও হুজুরের কাজ,
তোমার দায়িত্বটুকু মনে রেখো আত্ম স্বার্থ ভুলে,
ফলাকাঙ্ক্ষা রেখ না হে, ফলে কাবো নাহি অধিকার,
সর্বকর্মফল করো সমর্পণ প্রভুর চরণে,
তবেই কর্মের ফাঁস পারিবে না তোমারে বাঁধিতে,
অনাসক্তভাবে কোরো সংসারের কর্তব্য তোমার,
লোভে পড়ি মোহবশে যা করিবে ফলের আশায়—
সে কাজ তোমারে দিবে বহু দুঃখ কর্মের বন্ধনে।
সুখে দুঃখে শুভাশুভে স্থির যেবা আপদে সম্পদে—
সমদৃষ্টি সর্বজীবে উচ্চনীচে নাই ভেদাভেদ
আনন্দের পূর্ণ স্বাদ কর্ম মাঝে লভে সে জীবনে।
কর্ম দেয় জ্ঞান ভক্তি—ইষ্টপদে নিবেদিত হ'লে
সেই শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ, যে যোগে কর্মেরও হয় লয়।

আদিম স্বরূপ

শ্রীমতী বিভা সরকার

আজ দেখিতেছি চেয়ে
হৃদয়ের বিষাক্ত নগ্নতা,
হিংসার তমিস্রা-ভরা
ভয়ঙ্কর আদিম সে জীবে।

মানবের অপমৃত্যু
দুর্দান্ত সে দানবের
ক্রূর পদাঘাতে,
চেয়ে চেয়ে দেখছি নীরবে।

লাভা ফোটে সে আগুনে,
ওড়ে ছাই শুভদৃষ্টি-নাশা
ধূমায়িত মহা অন্ধকার
সৃষ্টি নাশে বিষাক্ত ফুৎকারে।

মিথ্যা আবরণ শুধু;
ব্যর্থ সভ্যতার এই—
চরম নীচতা মাঝে
হে মানব, চেন আপনারে।

উপনিষদের ফারসী ও ল্যাটিন অনুবাদ

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উপনিষদ্ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অমূল্য সম্পদ। বিশ্ব-সংস্কৃতি-ভাণ্ডারে উপনিষদের দান অনন্যসাধারণ। ১৬৫৭ খৃঃ ফারসী ভাষায় উপনিষদের প্রথম অনুবাদ হয়। আশ্চর্যের বিষয়, সেই সুদূর অতীতে অন্য কোন ভারতীয় অথবা বিদেশী ভাষায় এই অনুপম জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনুবাদের কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে রচিত আলবেরুনির 'কিতাবুল হিন্দ্' ও অন্যান্য আরবী গ্রন্থে উপনিষদের বিক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ শাহজাহানের পুত্র দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী দারা সিকো ফারসী ভাষায় উপনিষদের অনুবাদের মহৎ কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

১৬৫৩ খৃঃ নভেম্বর মাসে কান্দাহার অভিযানে অকৃতকার্য হইয়া দারা সিকো অত্যন্ত মর্মাহত হন। এই পরাজয়ের গ্লানিজনিত মনোবেদনা দূর করিবার এবং কিছুকাল পিতা শাহজাহানের সান্নিধ্য এড়াইবার জন্য তিনি লাহোরে অনেক দিন অবস্থান করেন। এই বিষাদের সময়ে তাঁহার প্রিয় হিন্দু কেরানি ও তৎকালীন বিখ্যাত ফারসী কবি রায় চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন পাঞ্জাবী অদ্বৈতবাদী ও বৈরাগী বাবালালের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য। কবি চন্দ্রভানই সাক্ষাৎকারের আয়োজন করিলেন। বৈরাগী বাবালালের সহিত দারার সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা এক সপ্তাহ চলিল—ফলে যে দারা ইতঃপূর্বে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরাশ হইয়াছিলেন, তিনি আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া জীবনের প্রতি অধিকতর আশাবাদী হইয়া উঠিলেন। বাবালাল দারাকে হিন্দুধর্মের সার মর্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশের প্রভাবে তিনি স্বাধীনভাবে উপনিষদের চর্চা করিতে প্রবৃত্ত হন। বারাণসীর কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আগ্রহের সহিত পাঠ ও আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন: হিন্দুধর্মও একেশ্বরবাদমূলক, অধিকারিভেদে ইহাতে বিভিন্ন স্তরের সাধনা আছে, এই ধর্মে ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও তাহার ব্যাপক প্রয়োগ রহিয়াছে।

দারা সিকো হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বের সহিত ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দুই ধর্মের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে এবং উভয়ের ভাবের মধ্যেও একটা ঐক্য আছে। ১৬৫৫ খৃঃ তাঁহার গবেষণার সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিয়া তিনি 'মাজ্‌মুউল্ বাহ্‌রিন্' (দুই সমুদ্রের সঙ্গম') নামে একখানা পুস্তক লিখেন। এই পুস্তকে তিনি প্রাচ্যের দুই প্রধান ধর্ম—হিন্দুধর্ম ও ইসলামের তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার হয় এবং দারা স্বয়ং 'সমুদ্রসঙ্গমঃ' নামে ইহার একটি সংস্কৃত অনুবাদও করিয়াছিলেন। *

'সমুদ্রসঙ্গমঃ' গ্রন্থের ভূমিকায় দারা সিকো লিখিয়াছেন: 'সত্যকে জানিবার জন্য হিন্দু ঋষি ও মুসলমান ফকিরগণ যে পথ অনুসরণ করেন, তাহার মধ্যে আমি কোন পার্থক্যই দেখি না। এজন্যই আমি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া উভয় ধর্মের

* সম্প্রতি বহু অনুসন্ধানের পর 'প্রাচ্যবাণী মন্দির' (৩ নং ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা) মূল সংস্কৃতের একটি সংস্করণ ও ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মধ্যে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার আত্মীয়-স্বজনদের উপকারের জন্য এই গ্রন্থ (সমুদ্রসঙ্গমঃ) লিখিতেছি, কিন্তু যে-সকল অজ্ঞ লোক ভিন্ন মত পোষণ করে, তাহাদের জ্ঞানোদয়ের কথা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি না।'

এই গ্রন্থ হইতে পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া উভয় ধর্মের সাদৃশ্য-প্রতিপাদক কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল :

পরমেশ্বরের গুণব্যাখ্যান : হিন্দু ঋষিগণ পরমেশ্বরের তিন গুণের কথা বলিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। একাত্মবাদী সুফীগণের মতে তাঁহার দুই গুণ—জলাল ও জমাল। জগৎব্রহ্মাণ্ড এই দুই গুণ হইতে উদ্ভূত। সুফীগণ জমালের মধ্যে রজোগুণ ধরিয়াছেন। হিন্দুদের মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা। সুফীদের মতেও জিব্রাইল, মিকাইল ও ইস্রাইল—সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দেবতা। (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

আত্মা : হিন্দু ঋষিগণ যাহাকে 'আত্মা' বলেন, ইসলাম তাঁহাকে 'রুহ' বলেন। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ইসলাম ইহাদের নাম দিয়াছেন—রুহজুলই ও রুহকুল্ল। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার বা দর্শন : হিন্দু ঋষিগণ বলেন, বহিশ্চক্ষু অথবা অন্তশ্চক্ষু দ্বারা ঈশ্বর-দর্শন হইতে পারে। শুদ্ধ মনেই তাঁহার দর্শন বা অনুভূতি হয়। যে ঈশ্বরকে ইহলোকে উপলব্ধি করিতে পারে না, সে পরলোকেও পারে না। ঈশ্বর দয়া করিয়া যে-কোন স্থানে ও যে-কোন সময়ে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। কুর্‌আন বলেন—ইহলোকে যে আল্লাহ্‌কে দর্শন (রুয়ত) করিতে পারে না, সে পরলোকেও পারিবে না (১৭.৭৪)। সেদিন তাহাদের মুখমণ্ডল সুখে পরিপূর্ণ হইবে, কারণ সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত তাহারা আল্লাহ্‌কে দর্শন করিবে (৭৫।২২-২৩)। (দশম পরিচ্ছেদ)

পরমেশ্বরের নাম : পরমেশ্বরের অনন্ত নাম। শুদ্ধচৈতন্য ও সিদ্ধপুরুষগণ তাঁহাকে নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্গুণ, সচ্চিদানন্দ বলেন। ইসলাম তাঁহাকে 'মুৎলুক্ বহ্‌ৎ' বলেন। মুসলমানের আল্লাহ্ আর হিন্দুর 'ওঁ' একই। হিন্দুগণ যাঁহাকে নিত্য সমর্থ ও স্বতন্ত্র বলেন, মুসলমানগণ তাঁহাকেই হৈয়, কাদর, মুরোদ বলেন। হিন্দুর সিদ্ধপুরুষ আর মুসলমানের 'নবী' এক। হিন্দুগণ যাঁহাকে ঋষি, মুসলমানগণ তাঁহাকে 'বলী' বলেন। (একাদশ পরিচ্ছেদ)

মুক্তি : হিন্দুগণ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার বিলয় বা বিগলনকে 'মুক্তি' বলেন। মুক্তি তিন প্রকার—জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি, এবং নিত্যমুক্তি। কুর্‌আন বলেন, একটি স্থান আছে তাহাকে 'কুজ্জান্' বলে। কুজ্জান্ অকব্বর অথবা 'ফিরদৌসে আলা'তে প্রবেশ করাকেই মহামুক্তি বা পরম মোক্ষ বলে। (বিংশ পরিচ্ছেদ)

'সমুদ্রসঙ্গমঃ'-গ্রন্থের পরিসমাপ্তিতে দারা শিকো বলিয়াছেন—'আরাধনা পরমেশ্বরস্য বিজ্ঞাপনা চ যা কৃতা তয়া সমুদ্রসঙ্গমসমাপ্তৌ সামর্থ্যং প্রাপ্তম্।' অর্থাৎ পরমেশ্বরের আরাধনা ও জ্ঞানের দ্বারা আমি 'সমুদ্রসঙ্গমঃ' গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি।

হিন্দু অধ্যাত্ম-দর্শন প্রথম আস্বাদন করিয়া দারা এতদূর মুগ্ধ হন যে, তিনি তাঁহার বন্ধু ও পরিবারবর্গকে ইহার রসভাগী করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ বারাণসীর পণ্ডিতগণের সহায়তায় তিনি প্রধান বারোখানি সহ বাহান্নখানি উপনিষদের ফারসী অনুবাদ করেন। প্রথম অনুবাদের পর ১৯৫৭ খৃঃ পারস্যে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত ডক্টর তারাচাঁদের প্রচেষ্টায় ইরানে উপনিষদ্‌গুলির ফারসী অনুবাদ পুন-

মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্বে ফারসী অনুবাদ-মুদ্রণের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়। একবার লাহোরের জনৈক মুসলমান পুস্তক-প্রকাশক উপনিষদ্‌গুলির ফারসী অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্মান্ধতার প্রবল চাপে অতিষ্ঠ ও শঙ্কিত হইয়া প্রকাশক তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হন। ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। উপনিষদ্‌গুলির প্রথম ফারসী অনুবাদক দারা সিকোকেও কাফেরদের ধর্মপ্রচারে সহযোগিতা করিবার অপরাধে দিল্লীর সিংহাসন, এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত হারাইতে হইয়াছিল।

উপনিষদের প্রথম ফারসী অনুবাদের একশত বৎসর পরে ১৭৫৭ খৃঃ আঁকোয়েতিল দ্যুপের্ঁ (Anquetil Duperron) নামক জনৈক ফরাসী ভারতে আসিয়া পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা' অধ্যয়ন করেন এবং তৎসম্বন্ধে কিছু লিখেন। দ্যুপের্ঁ ফারসী ভাষা জানিতেন এবং দারা কর্তৃক ফারসীতে অনূদিত উপনিষদ্‌গুলি ল্যাটিন ও ফরাসী (French) ভাষায় অনুবাদ করিবার কথা চিন্তা করেন। সুজা-উদ্দৌলার রাজসভায় ফরাসী রেসিডেণ্ট মঁসিয়ে জেণ্টাইল—দ্যুপের্ঁকে উপনিষদের ফারসী অনুবাদ মঁসিয়ে বার্নিয়ারের মারফত পাঠাইয়া দেন। দ্যুপের্ঁ দারা সিকোর অনুবাদের পাণ্ডুলিপি অন্য আর একটি প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া প্যারিস হইতে ১৮০১ খৃঃ প্রচুর টীকা-টিপ্পনী সহ দুইখণ্ডে ইহার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। ল্যাটিন অনুবাদটির নাম Oupnek'hat id Est Secretum Tegendum অর্থাৎ প্রাচ্যের অপ্রকাশিতব্য রহস্য ও অব্যক্ত শব্দ। দ্যুপের্ঁর কৃতিত্ব এই যে, তিনি মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি সহ প্রতি সংস্কৃত শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলির সহিত পরিচিত হওয়া যায়। দারা সিকোও এমন ভাবে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন নাই।

দ্যুপের্ঁর 'ঔপনিখৎ' সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য দেশের লোকদিগকে হিন্দুধর্মের সহিত পরিচিত করাইয়া দেয়। উপনিষদের এই ল্যাটিন অনুবাদই প্রখ্যাত জার্মান মনীষী শোপেনহাওয়ারের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জার্মান দার্শনিক এই ল্যাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়াই পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিকট সাহসের সহিত ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন : 'ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার অমূল্য রত্নখনি ভারতীয় উপনিষদ্‌গুলি পাঠ করিলে উচ্চ ভাবের উদ্দীপনা হয়। এগুলি আমার জীবৎকালে যেমনি সান্ত্বনাদায়ক হইয়াছে, মরণেও তেমনি আমায় শান্তি দান করিবে।' দ্যুপের্ঁর এই ল্যাটিন অনুবাদ আবার জার্মান ও অন্যান্য ইওরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এরূপে হিন্দুদর্শন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচারিত হওয়ার পথ সুগম হইল। দ্যুপের্ঁর 'ঔপনিখৎ' প্রকাশিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগৎ ভারতবর্ষকে ব্রহ্মবিদ্যার পুণ্যভূমি বলিয়া অভিনন্দিত করে।

উপনিষদের ফারসী অনুবাদ-প্রকাশের তিন শত বৎসর পরে ভারতে পারস্যের রাষ্ট্রদূত প্রতিভাবান্ ডক্টর আলি আসগর হেকমত মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক ফারসীতে অনুবাদ করেন।

বিদেশী ভাষাগুলিতে ভারতের ধর্ম দর্শন সাহিত্য কাব্য নাটক ইতিহাস ললিতকলা প্রভৃতি অনূদিত হইলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের সম্প্রীতি শুভেচ্ছা ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হয়। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারই আজ বিশেষ প্রয়োজন।

ধর্মসমন্বয় সম্ভব

অধ্যাপক. রেজাউল করীম

মানবসমাজে ধর্মের স্থান অতি উচ্চে। ধর্ম ব্যতীত সমাজ একদিনও টিকতে পারে না। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থবিশিষ্ট মানব-সমাজকে বেঁধে রেখেছে ধর্ম। ধর্ম মানুষকে নানাপ্রকার পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা ক'রে আসছে। এক মানুষকে অপর মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত করে ধর্ম। মানুষের ঐহিক পার-ত্রিক ব্যাপারে ধর্মই তার প্রধান সহায় ও অবলম্বন। সমাজের মেরুদণ্ড, সমাজের আশ্রয়-স্থল ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণের উৎস হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু এই মহামূল্য ধর্মকে নিয়ে পৃথিবীতে কত অপকাণ্ডই না হ'য়ে গেছে। এর কারণ কিন্তু ধর্ম নয়। ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের বিকৃত ধারণার জন্যই ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে পৃথিবীতে বহু অনাচার হয়েছে। মানুষের ধর্মবোধ যখন বিকৃত হ'য়ে যায়, তখন মানুষ ধর্মের নামে এমন বহু কাজ করে, যা ন্যায়নীতি কোন ক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। ধর্মবোধই মানুষকে রক্ষা করে। অপর দিকে দেখি, ধর্মের নামে মানুষ যখন অন্ধ হ'য়ে ওঠে, তখন জঘন্য কাজ করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। অবশ্য এ-দোষ ধর্মের নয়। আসল ধর্ম চিরকালই মহান্ ও উদার। ধর্ম তার পবিত্রতা আধ্যাত্মিকতা ও সর্বজনীন আদ-র্শের দ্বারা ছিন্নভিন্ন মানবসমাজকে এক করতে পারে। আবার এই ধর্মের নামে সমাজে যখন কুসংস্কার, অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন মানুষ নানা ছলছুতা ধ'রে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে বিভেদ সৃষ্টি করে, এবং মনে করে যে সে ধর্মেরই সেবা করছে। ধর্মের নামে মানুষে-মানুষে বিবাদ-সৃষ্টি হয়েছে, এর বহু উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যাবে।

কেন এমন হয়? এর প্রধান উত্তর—ধর্মের মূল নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে মানুষের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। আমাদের এই ভারতবর্ষে নানা সম্প্রদায় বসবাস করে, তাদের বহু লোকের ধারণা যে ধর্মগুলি পরস্পর-বিরোধী। রাজনীতি, অর্থ-নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে মানুষে মানুষে মিলন হ'তে পারে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে তাদের কোন মিলন হবে না। কিন্তু প্রশ্ন করি, বাস্তবিকই কি আমাদের দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম পরস্পর-বিরোধী? প্রত্যেকে দাবি করি, আমার ধর্ম অনাদি ঈশ্বর থেকে আগত। তাই যদি সত্য হয়, তবে বিভিন্ন ধর্ম কেন পরস্পর-বিরোধী হবে? একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, মূলের দিক দিয়ে কোন ধর্মই কারও বিরোধী নয়। যুগের প্রয়োজন অনুসারে এক দেশে ধর্ম যে রূপ গ্রহণ করেছে, অন্য দেশে তার বাহ্য রূপটা হয়তো পৃথক্। এক মহাপুরুষ এ কথা বলেছেন, অন্য পরিবেশে অন্য মহাপুরুষ হয়তো বলেছেন অন্য কথা। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে মূলগতভাবে ওঁদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ধর্মের মূলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করতে হবে। কেবল বাইরের পার্থক্যটিকে দেখলে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। হাকিম সানাই একজন পারস্য ভাষার কবি। তিনি একটি সুন্দর কথা বলেছেন, 'ভাষা আমাদের হিব্রু অথবা সিরীয় অথবা আরবী হ'তে পারে, প্রার্থনার স্থান 'বালকা' অথবা 'বালসা' হ'তে পারে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? যে ভাবে, যে স্থানে ও যে ভাষায় আমরা প্রার্থনা করি না কেন, আমরা প্রার্থনা করি সেই এক মহান্ ঈশ্বরের কাছে।'

ভারতের হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-বৌদ্ধ-পারসিক-শিখ-য়িহুদী—যে যে-ভাবেই ধর্মাচরণ করুক না কেন, তারা সবাই একই বিধাতাকে স্মরণ করে—তাদের পদ্ধতি বিভিন্ন, কিন্তু প্রার্থনার লক্ষ্য বিভিন্ন নয়।

ধর্মভেদের জন্য ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বে বহু অপকাণ্ড ঘ'টে গেছে। মানুষ যদি ধর্মকে ঠিকভাবে গ্রহণ ক'রত, তবে এ-সব ঘ'টত না। আজ তাদের শুনানো দরকার যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ ক'রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে—ধর্মগত বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নেই। সত্য বটে, হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকাণ্ড মুসলমান সমাজের ক্রিয়াকাণ্ড থেকে পৃথক্। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু ধীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ক্রিয়াকাণ্ড পৃথক্ হলেও মূলের দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, বরং এই দুই ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা ব'লে থাকেন। সেইজন্য তাঁরা সর্বদাই রাজনৈতিক অধিকারের উপর জোর দেন। আমাদের এই ভারতবর্ষে মানবজীবনের প্রধান জিনিস রাজনীতি নয়, আমাদের প্রধান জিনিস ধর্ম। আমরা যদি রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের ঐক্যের উপর জোর দিতাম, তবে সত্যকার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বহুদিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত। তাই আজ দিন এসেছে, যখন বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখতে হবে যে আমাদের দেশে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুব বেশী নয়। তা যদি করি তবে, বহু দ্বিধা ও সংশয় কেটে যাবে। তখন ধর্ম আমাদের পৃথক্ ক'রে রাখবে না, বরং এক হ'তে সাহায্য করবে।

যদি বিভিন্ন ধর্মকে আমরা ঐতিহাসিক দিক্ দিয়ে আলোচনা করি, তবে দেখব যে সমস্ত ধর্মের মধ্যেই একটা ঐক্য-ধারা প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। কোন্ অতীতে বেদ-উপনিষদ উদ্গীত হয়েছিল! সেই প্রাচীন কালে আর্য ঋষিগণ এক মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করেছিলেন। যুগ থেকে যুগান্তরে সেই আর্যধারা বয়ে আসছে। কত জাতি এল, আবার কালগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেল, কিন্তু সেই আর্যধারা আজও অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত। পৃথিবীর অপর প্রান্তে দু-হাজার বছর পূর্বে যিশুখৃষ্ট আবির্ভূত হলেন প্যালেস্টাইনের এক কুটিরে। তিনি সেই এক ঈশ্বরের উপাসনার উপরই জোর দিয়েছিলেন। তার সাড়ে ছশ'-বছর পরে আরবের ঊষর বুকে হ'ল হজরত মহম্মদের আবির্ভাব। তিনি কি পৃথক্ কোন আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছেন? তিনি সেই একই বস্তু ভিন্নভাবে প্রচার করেছেন। প্রত্যেক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডের উপর দেশ কাল ও পাত্রের প্রভাব পড়ে; তা তো পড়বেই। কিন্তু অন্তরালে বয়ে চলেছে একই ধারা—একই আদর্শের অবিচ্ছিন্ন স্রোত। ধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, বিভিন্ন ধর্ম পরস্পর-বিরোধী হ'তে পারে না।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কেবল ইসলাম ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে দু-একটি কথা ব'লব। দেশবিভাগের পূর্বে কোন কোন মহল থেকে বলা হ'ত যে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম এত পরস্পর-বিরোধী যে তাদের মধ্যে কোন ঐক্য- বা সমন্বয়-সাধন সম্ভব নয়। সে সময় পার্থক্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। উভয় ধর্মের মধ্যে বহু বিষয়ে পার্থক্য যে আছে, তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এটাও তো খুঁজে দেখতে হবে, উভয় ধর্মের মধ্যে মূলগত কোন ঐক্যসূত্র আছে কি না? তখনকার দিনে বলা হ'ত যে, হিন্দুর ঈশ্বরের আদর্শ একরূপ, আর মুসলমানের

ঈশ্বরের ধারণা ভিন্নরূপ। উভয়ের নৈতিক বোধও পৃথক্। এইভাবে আমাদের পার্থক্য-গুলিকে বড় ক'রে দেখানো হ'ত। কিন্তু বহু বিষয়ে যে সাদৃশ্য আছে, বহু আদর্শ যে অভিন্ন সেগুলি অবহেলা করবার কোন কারণ নেই। সামান্য সামান্য বিষয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিলে মূল জিনিসটা হারিয়ে ফেলব। মহামতি বার্ক এক জায়গায় বলেছেন, 'It is the nature of greatness not to be exact'—মহত্ত্বের প্রকৃতিই এই যে, তা খুঁটিনাটিতে একরূপ হয় না। ধর্ম-ব্যাপারেও বার্কের এই কথাটা খুবই সত্য। তাই বলছিলাম যে, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মে পার্থক্য থাকলেও মিলন- ও সমন্বয়-ক্ষেত্রও প্রচুর আছে। আমরা সেটাকে কোনমতেই অবহেলা ক'রব না, বরং পার্থক্য সত্ত্বেও যেখানে ঐক্য আছে, সেইখানে আমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হবে, সেই ঐক্যসূত্রকে আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এজন্য চাই উদার হৃদয়, আর পরমতসহিষ্ণু মানসিকতা। আমরা যদি হিন্দু আর ইসলাম ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করি, তবে দেখব যে, কতকগুলি প্রধান বিষয়ে এই দুই ধর্মের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। যে-সব পার্থক্য আছে, সেগুলি মৌলিক নয়—দুরতিক্রম্যও নয়।

উভয় ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা ও আধ্যাত্মিক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী—এই দুটি বিষয়ে এমন একটা সাদৃশ্য আছে, যা দেখলে চমকিত হ'তে হয়। হাকিম সানাই এক জায়গায় বলেছেন: ইসলাম ও হিন্দুধর্ম একই পথে, সেই একই ঈশ্বরের দিকে ছুটে চলছে এবং একই সঙ্গে তারস্বরে ঘোষণা করেছে যে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়।

এবার কোর-আন ও উপনিষদ্ থেকে কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ ক'রে দেখাব, দুই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে লালিত হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে একই রূপ সিদ্ধান্ত করেছে। এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে যে ধর্মের মূল বিষয়ে আর্য মন ও সেমিটিক মন অনেকখানি পথ একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে (১) কোর-আনে বলা হয়েছে: 'নিশ্চয় তোমার প্রভু এক। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রভু আর কেউ নেই।' মহাগ্রন্থ উপনিষদেও ঠিক এই কথাটিই অন্য ভাবে বলা হয়েছে।

(২) 'তিনি পরম আত্মিক সত্তা। তিনি কারুর উপর নির্ভরশীল নন, আর কেউ তিনি ছাড়া দাঁড়াতে পারে না। তিনি অজ্ঞাত, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, কেউ তাঁর সমান নয়, তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি সদা জাগ্রত। নিদ্রা কখনো তাঁকে স্পর্শ করে না।' (কোর-আন)

'তিনি অমর। তাঁর আকার নেই, তাঁর কোন মূর্তি নেই। তিনি সব সময় সকল স্থানে উপস্থিত। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সকল বস্তুতে তিনি ব্যাপ্ত। তিনি অজ্ঞাত, পবিত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তিনি সেই সত্তা, যিনি নিদ্রার অবস্থায়—যখন সব ইন্দ্রিয় কাজ বন্ধ করে, তখনও কাজ করেন। তিনিই অনন্ত। তাঁর উপর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ভর করে। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।' (উপনিষদ্)

(৩) 'তিনি মহান্, পবিত্র। মানুষ তাঁকে বর্ণনা করেও তাঁর গুণাবলীর শেষ করতে পারে না। চোখ তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু তিনি সব দেখেন। তিনি ধারণা-শক্তির অতীত এবং মহাবিজ্ঞ।' (কোর-আন)

'তিনি মহান্ ও মানুষের ধারণা-শক্তির অতীত। তাঁর প্রকৃতি মানুষ ধারণা করতে পারে না। শূন্য থেকেও তিনি অধিকতর সূক্ষ্ম। তিনি বিচিত্রভাবে আলো বিকীরণ করেন।'

(উপনিষদ্)

(৪) 'যা কিছু জগতে আছে তা ধ্বংস হয়। কিন্তু মহান্ ঈশ্বরের ধ্বংস হয় না, তিনি অনন্ত জ্যোতির্ময়। সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সুমহান্ ও সুউচ্চ। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেককে তার কাজ নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন—নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য।' (কোর-আন)

'এই নশ্বর বিশ্বের মাঝে তিনিই অবিনশ্বর। তিনি অনন্ত। তিনি সমস্ত অনুভূতির উৎস। তিনি প্রত্যেককে তার নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি মহৎ চিন্তার অধিকারী। তিনি সর্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু। তিনি সর্বকালের জন্য প্রত্যেক বস্তুর উদ্দেশ্য স্থির ক'রে দিয়েছেন।' (উপনিষদ্)

এই ধরনের আরও বহু শ্লোক কোর-আন ও উপনিষদে আছে,—তা থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত করলাম। এ দ্বারা পাঠকগণ বুঝবেন যে কোর-আন ও উপনিষদে ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। স্বীকার করি, এই দুই ধর্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, কিন্তু যেখানে সাদৃশ্য যথেষ্ট, সেখানে কেন আমরা পার্থক্যের উপর এতটা গুরুত্ব দেবো? এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমরা ধর্মের প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন লোকের মানসিকতার প্রতিবাদ করি না। রামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন: ঊর্ধ্ব আকাশে শত শত শকুনি উড়ে বেড়ায়। কিন্তু তাদের দৃষ্টি ভাগাড়ের মৃত জীবের প্রতি। আমরা যদি ধর্মের উচ্চ দার্শনিক স্তরে বসে কেবল পার্থক্যের কথা নিয়ে গণ্ডগোল সৃষ্টি করি, তবে আমরা সেই শকুনির মতোই ব্যবহার ক'রব। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাস করে। তাদের উচিত—নিরপেক্ষ ও উদার দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, আদর্শ ও নীতি পাঠ করা; সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে হবে। ভারতবর্ষ থেকে যত শীঘ্র ধর্মীয় অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর হ'য়ে যায়, ততই দেশের ও জাতির মঙ্গল। বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সেই শুভ বুদ্ধি দেন, যার প্রভাবে আমরা সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় মিলিত হ'য়ে একটি মহাজাতি গঠন করতে পারি।

By the study of different religions we find that in essence they are one. When I was a boy, this scepticism reached me, and it seemed for a time as if I must give up all hope of religion. But fortunately for me, I studied the Christian religion, the Mohammedan, the Buddhistic and others, and what was my surprise to find that the same foundation principles taught by my religion were also taught by all religions.

—Complete Works Vol. I—p. 315—Swami Vivekananda.

ইংলণ্ডে এক বৎসর

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

চার লাফে ছ-হাজার মাইল পার হ'য়ে যখন লণ্ডনে আমাদের প্লেন নামলো তখন ওখানে বেলা ২॥টা। চারিদিক সেপ্টেম্বরের রোদে ঝলমল করছে। আমাদের অভ্যর্থনা করতে ইংলণ্ডের প্রকৃতি যেন উজ্জ্বল সাজে সেজেছে। জুরিখ ছেড়ে প্লেন আর বেশী ওপরে ওঠেনি। ইংলিশ চ্যানেল, টেমস্ নদী, সবুজ মাঠ আর অসংখ্য বাড়ী ওপর থেকে দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য তার আগে ২৬০০০ ফুট অর্থাৎ মেঘলোকের ওপর দিয়েই আমাদের গতি ছিল। সাদা মেঘ—চোখ ঠিকরে যায় আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির জন্য। বাইরের তাপমাত্রা তখন -১০° সেন্টিগ্রেড। পথে আরও দু-জায়গায় নেমেছিলাম। ভূমধ্য-সাগরের ধারে বীরুট বিমান-বন্দরে (তখন UN-এর আওতায়), আর করাচিতে। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সেখানে আমাদের ২৪ ঘণ্টা আটকে থাকতে হ'ল। বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন শহর গড়ে উঠছে। একটা বিরাট আমেরিকান ধাঁচে তৈরী হোটেলে ছিলাম।

পূর্বদিন সন্ধ্যায় দমদমে মাটি ছেড়ে যখন ১৫ মিনিটে প্রায় ৫ মাইল উপরে উঠলাম, তখন যেন দ্যুলোকের অনুভূতি হয়েছিল আর পৃথিবীর বাইরে নিজেকে যতটা নিঃসঙ্গ প্রবাসী ব'লে মনে হয়েছিল, লণ্ডনে পৌঁছে ততটা হয়নি। এ যেন কলকাতারই কোন সাহেব-পাড়ায় এসেছি। তবে বিমান-বন্দর থেকে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস প্রায় ১০ মাইল রাস্তায় কোথাও একটু ময়লা বা কাগজের টুকরো দেখলাম না। এখানে আমাকে নিতে একজন এসেছিলেন। তিনি আমার পূর্ব-নির্ধারিত বাসায়—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল (Bentham Hall)-এ পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ঘরে খাটে গদীর উপর চারখানা গায়ে-দেবার কম্বল-সহ চমৎকার ভাবে পাট-করা বিছানা, দুটি চেয়ার, পড়ার টেবিল, দেরাজ, আর্সি, আলমারি (wardrobe)—এই এদেশের সাধারণ ব্যবস্থা।

হোস্টেল বা হোটেল এদেশে মেয়েরাই চালায়, বেশ দক্ষ। বিকেলেই কলকাতায় 'তার' (Cable-gram) করতে সাহায্য করলেন একটি মেয়ে হোস্টেলে বসেই টেলিফোন ক'রে। সন্ধ্যার পর আমার একটি বাঙালী বন্ধু আসাতে খুবই আনন্দ হ'ল, ভারতীয় খানাও তার সঙ্গে খাওয়া হ'ল।

এ হ'ল 'bed and breakfast' (শয্যা ও প্রাতরাশ)-এর দেশ। প্রথমটি মন্দ পাইনি; প্রাতঃকৃত্যের পর দ্বিতীয়টির খোঁজে নীচে গিয়ে দেখি অন্ততঃ একশ' জন ছেলে-মেয়ে জড় হয়েছে 'কিউ' দিয়ে। পরিজ, কর্নফ্লেক্স্, ডিম, হেরিং (মাছ), চা বা কফি তার পরে 'one or two' অর্থাৎ এক বা দুই চামচ চিনি—এ ছাড়া রুটি তো আছেই। দু-চারটি ভারতীয়, কয়েকটি আফ্রিকান ও ইওরোপীয় ছাত্রের সঙ্গে কথা হ'ল। সব 'holiday' (ছুটি ভোগ) করতে এসেছে দিন-কয়েকের জন্য—গরমের ছুটিতে কেউ বাড়ীতে বসে থাকে না। মেয়েগুলিও একই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে—একলা বা দল বেঁধে। এদের পরনে আঁট-শাঁট প্যাণ্ট—বলে শ্ল্যাক (slack), প্রথম দেখে খুবই বিসদৃশ লেগেছিল, পরে সয়ে গেল, কেউ এক জায়গায় বেশী দিন থাকে না—খেলাধুলা, হাঁটা, সাঁতার, পাহাড় চড়াই ইত্যাদি ক'রে বেড়ায়।

এর পর বৃটিশ কাউন্সিলে আমার বৃত্তি-সংক্রান্ত অনেকগুলি কাজ মেটালাম। এখানে বেশীর ভাগ কর্মীই মহিলা। সকলেই সহানুভূতি-শীল। কুশল প্রশ্ন, ব্যবস্থা, আশ্বাস ও শেষে অর্থ দিয়ে আমায় বিদায় করলেন। একবার হাজিরা দিতে ভারতীয় 'হাই কমিশন' এর অফিসেও যেতে হ'ল। ভারতের পরাধীনতার প্রতীক India House (ইণ্ডিয়া হাউস) একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রাস্তার ওপর ৮ তলা বাড়ী। বহু ভারতীয় ও ইংরেজ কর্মচারী এখানে কাজ করেন। বিখ্যাত লাইব্রেরীটিও দেখলাম। একটি সাহেব-সঙ্গীর সঙ্গে এখানকারই অন্নভোগ গ্রহণ করলাম। একটু দূরেই টেম্‌স্ নদী—কালো জল, কিন্তু পাড়গুলি সুসজ্জিত। নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে। নদীর বুকে ৮।১০টি সেতু।

ফিরে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট অঞ্চলে এলাম কিছু জামা কেনবার জন্য। এইটেই নাকি ফ্যাশন-দুরস্ত জামা-কাপড়ের আড্ডা। দুপাশে বিচিত্র-ভাবে শো-কেস সাজানো। 'চেন স্টোর' এর সংখ্যাই বেশী। এই সব দোকানে যাবতীয় জিনিস পাওয়া যায়। সারা ইংলণ্ডে ৫।৭টা কোম্পানীর শাখাই সব শহরে পাড়ায় পাড়ায়—বিক্রেতা মহিলা। এরাই নিত্য নতুন ফ্যাশন সৃষ্টি ক'রে জনগণকে প্রভাবিত করে। পাশেই আরও উঁচু-দরের ক্রেতাদের জন্য বণ্ড ষ্ট্রীট, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট।

এই সব রাস্তায় বেশ ভিড়; তবে কেউ ফুটপাথের নীচে নামে না। ট্রাম নেই, কলকাতার মতো দোতলা বাস, নতুনত্ব ট্রলিবাস। বাস্ স্টপে শৃঙ্খলাবদ্ধ 'কিউ', কিন্তু বাসে ভিড় নেই। কেন না বেশীর ভাগ লোক মাটির তলায় ইলেকট্রিক টিউব্ রেলে যায়, তবে অল্প রাস্তার পক্ষে নীচে নামা-ওঠায় সময় বেশী লেগে যায়। নামার জন্য লিফ্‌ট্ অথবা সিঁড়ি আছে, কোথাও বা চলন্ত সিঁড়ি (এস্‌কালেটর), আছে, টিউবে এত সুবন্দোবস্ত ও নির্দেশ দেওয়া আছে যে লণ্ডনে কোন লোক হারিয়ে যেতে পারে না। অবশ্য তেমন দরকার হ'লে রাস্তার মোড়ে পুলিস পোস্টের সাহায্য নিতে পারা যায়।

এবারে লণ্ডনে একদিনের বেশী থাকতে পারিনি, তাই খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও এখানকার 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার' যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কেন না শহরের কেন্দ্র থেকে আশ্রমটি ১০।১২ মাইল দূরে। বড়দিনের ছুটিতে এসে শ্রীশ্রীমায়ের উৎসবে যোগদান করি, সে কথা পূর্বে লিখেছি।*

পরদিন রওনা হলাম আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র লীড্‌স্ শহরের দিকে। হোস্টেলের কর্ত্রীই টেলিফোনের সাহায্যে স্ট্যাণ্ড থেকে ট্যাক্সি ডেকে দিলেন। King's Cross রেলস্টেশনে পৌঁছে মিটার দেখে ভাড়া চুকিয়েও নিষ্পত্তি হ'ল না। উপরি এক শিলিং (tips) দিতে হ'ল। ট্যাক্সি থেকে নামতেই রেল-পোর্টার এগিয়ে এসে আমার ব্যাগটি নিল এবং ঠিক গাড়ীতে বসিয়ে দিল। একবার ঠকেছি ব'লে জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিতে হবে?—জবাব দিলে, যা দেবেন। এক শিলিং এর কম দিতে পারলাম না! পরে জানলাম, এরা মাল বইবার জন্য কিছু নিতে পারে না—তবে উপরি (tips) আশা করে। এরা খুব ভদ্র, ও ভাল সুট-পরা।

লণ্ডনে দশ-বারোটা রেল-স্টেশন আছে। কতকগুলি উত্তরে, আর বাকীগুলি দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যাবার জন্য। আমাদের দেশের বড় বড় স্টেশনের মতোই। কোন কোন ক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা কিছু বেশী। তবে গাড়ীর কামরাগুলি আমাদের দেশের তুলনায় অনেক ভাল, শুধু ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাস। ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক্ কামরা। করিডর গাড়ী—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। তাপ-নিয়-ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক সীটের সামনে

* দ্রষ্টব্য : 'লণ্ডনের চিঠি,' 'উদ্বোধন', ৬১তম বর্ষ, পৃঃ ১০১

ইংলণ্ডের বিভিন্ন জায়গার ছবি সাজানো, কেউ নষ্ট করে না,—যদিও কেউ ছেঁড়ে না। গাড়ীতে ভিড় নেই; শুনলাম শনি-রবিবার ভিড় হয়; কারণ সকলে বেড়াতে যায়।

ট্রেনে রেস্টুরাণ্ট গাড়ী থাকা সত্বেও অনেকে প্ল্যাটফর্মে ফেরিওলার কাছে স্যাণ্ডউইচ কিনল। যেমন বাসে, তেমন ট্রেনে পাশের লোকের কথা বলা খুবই কম। তবুও আবহাওয়া আর ইংলণ্ডের প্রশংসা দিয়ে আলাপ জমালাম একটি দম্পতির সঙ্গে। নতুন লোক জেনে স্বাগত জানাল আর ইংলণ্ডের আরও প্রশংসা ক'রে আমাকে বিভিন্ন স্থান দর্শন করতে ব'লল। ভারত সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখলাম না। ট্রেনে যেতে যেতে দেখি চারিদিক সবুজ। পৃথিবী-পৃষ্ঠ কোথাও সমতল, কোথাও তরঙ্গায়িত, কোথাও ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী, কোথাও বা ফালির মতো রাস্তা সবুজ মাঠ ভেদ ক'রে চলেছে। শুক্‌নো মাঠ একটাও চোখে পড়ল না। এ-সব দৃশ্য আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, এমন সময় 'ওয়েটার বয়' জানিয়ে গেল লাঞ্চ তৈরী।

লীড্‌স্ পৌঁছবার পূর্বেই প্রকৃতিদেবী রূপ পরিবর্তন করলেন। রোদ গিয়ে এল কালো মেঘ, ঝিরঝির বৃষ্টি নামল,—এই নাকি এখানে স্বাভাবিক। মনটা দমে গেল। দৃশ্য-পটও গেল পালটে। ঘন ঘন সুড়ঙ্গ পথ পার হ'য়ে চল্‌ল গাড়ী। হঠাৎ ওয়েকফীল্ড স্টেশনে জানলাম, এর পরই গাড়ী থামবে লীড্‌সে। বৃষ্টি তো আছেই—তার ওপর প্ল্যাটফর্মের অবস্থা দেখে কান্না পেল। আমাকে নিতে এসেছিলেন একটি বৃদ্ধা মিস্ (কুমারী), অবশ্য এক বৎসরের মধ্যে এঁকে কোনদিন ভুলেও বৃদ্ধা বলিনি। একদিন নিজেকে বয়স্ক বলেছিলাম, তাও এ রকম বলতে তিনি নিষেধ করলেন, বিশেষতঃ মেয়েদের সামনে।

যতই শহরের মধ্যে ঢুকতে লাগলাম,—যে শহরে এক বছর থাকতে হবে, তার ধূম্র-ধূসর অট্টালিকাগুলি দেখে চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলাম। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ লাইব্রেরী ভবন ও ততোধিক উচ্চ টাওয়ার ক্লকটি দেখে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলাম।

এবার বৃটিশ কাউন্সিল-এর লীড্‌স্-কেন্দ্রে আলাপ করিয়ে আমায় একটা অস্থায়ী ডেরায় তোলা হ'ল। 'বেড এণ্ড ব্রেকফাষ্ট' (শয্যা ও প্রাতরাশ) ছাড়া অন্য ব্যবস্থা নেই। আবার জানিয়ে দেওয়া হ'ল শনি-রবিবার অন্য দোকান-পাটের সঙ্গে সাধারণ রেস্টুরাণ্টগুলিও বন্ধ—এ অঞ্চলে নাকি এইটা বড় অসুবিধা—সকলেই এক সঙ্গে বিশ্রাম নেয়। কাজেই একবার বেরিয়ে দুদিনের রেশন সংগ্রহ ক'রে রেখে দিলাম। অবশ্য ছুটির দিনে ক্ষুন্নিবৃত্তির জায়গা পরে আবিষ্কার করেছিলাম।

পরদিন শনিবার একটি মানচিত্রের সাহায্যে শহরটা একটু ঘুরে নিলাম। সূর্যদেবের কৃপায় দিনটা মন্দ লাগল না। বাসার সামনে একটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর জায়গা—উড্‌হাউস মুর—মিউনিসিপাল পার্ক, চমৎকার ঘাসে ঢাকা—কোথাও একটু কাদা-মাটি দেখলাম না। ছেলেদের খেলার ব্যবস্থা, বড়দের টেনিস্-লন, একটা বাঁধানো চত্বর ও একটু উঁচু বেদীর পেছনে কাঠের ছাউনি—গরমের দিনে খোলা মাঠে থিয়েটার হ'তে পারে, তার ব্যবস্থাও আছে। এক দিকে সবজী-বাগান, শনি-রবিবারে চাকুরে বাবুরা এতে খেটে ফসল ফলান। মাঝে একটি কাঁচে-ঢাকা গরম ঘর (hot-house), বিচিত্র ফুলের বাহার শীতকালে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য। এক-দিকে নেলসনের ও অপর দিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রঞ্জের প্রতিমূর্তি; ভিক্টোরিয়ার মূর্তির নীচে তিন দিকে—ভারত, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রতীক

তিনটি বীরপুরুষের মূর্তি। এ-রকম পার্ক আরও অনেক এখানে আছে, কিন্তু দুবেলা পার হ'তে হ'ত ব'লে এর সঙ্গেই ছিল বেশী পরিচয়—সারা বছরে এর কত রূপই না পরিবর্তন হ'তে দেখেছি!

বিকেলে এক নিমন্ত্রণ পেলাম—রবিবারের মধ্যাহ্ন-ভোজনের; এদের বাড়ীতেই আমার থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। উঁচু জায়গা থেকে খানিকটা নেমে এসে নম্বর খুঁজে পেলাম, এবং কুকুরের সরব সম্বর্ধনার পর গৃহকর্ত্রী ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন—শ্ল্যাক পরা, আমাকে বসিয়ে নানা কথায় আপ্যায়ন করতে লাগলেন—অবশ্য তার অর্ধেকও আমি সেদিন বুঝিনি, কারণ, ইয়র্ক শায়ারের ইংরেজী উচ্চারণ আমাদের নোয়াখালী জেলায় বাংলার মতোই দুর্বোধ্য। খানিক পরে এঁর স্বামী ফিরে এলেন। বাড়ী কর্নওয়াল, উচ্চারণ সুবোধ্য। ছোট ছোট দাড়ীগোঁফ, একটু সৌম্যদর্শন—স্ত্রীর বিপরীত। শুনেছিলাম ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন—ঘরে আলমারিতে বিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন, সব রকমের বেশ ভাল ভাল বইও দেখলাম—মনে হ'ল বাসস্থানের ভাগ্যটা ভালই। পরে জেনেছি, ঐ রকম বইএর সেট ফার্নিচারের অঙ্গ বিশেষ। সে জন্য অবশ্য ভদ্রলোকটির ওপর শ্রদ্ধাহীন হইনি। কথাবার্তায় উদারপ্রকৃতি—যুদ্ধের সময় ভারতে দু-বছর কাটিয়েছেন—সেই থেকেই যেন একটা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব পেয়েছেন তিনি। এঁদের তিন-চার বছরের একটি ছেলে। আরও দুজন ছাত্র এঁদের কাছে থাকেন; একজন ভারতীয় ও অন্যজন সিংহলী বৌদ্ধ। সাধারণতঃ ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থা করা হয় আলাদা ক'রে—নিজেরা একটু কৃচ্ছ্রসাধন করেন। খাবার টেবিলের আদব-কায়দা বিশেষ কিছুই ছিল না—কয়েক মিনিটেই সঙ্কোচ কেটে গেল। তিন প্রস্থ লাঞ্চ—ঝোল, আলু-কপি মাছ বা মাংস প্রভৃতি মিলিয়ে একটা ডিম ও পরে পায়েস-জাতীয় একটা কিছু।

ফেরবার আগেই সপ্তাহে প্রায় ৬০৲ টাকায় থাকা-খাওয়ার (৫ দিনের লাঞ্চ বাদে) ব্যবস্থা হ'ল, এই সব থাকার জায়গাকে বলে 'Diggs'—গৃহকর্ত্রী তখন আমার ঘরের কি রং হবে; কি কাগজ লাগানো হবে, জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। নির্দিষ্ট ঘর সাজাতে দেরি হবে, অগত্যা ছাদের ভেন্টিলেশন-বিহীন ঘরে থাকতে হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই একটু ভাল অঞ্চলে একটি ভাল ঘর খুঁজে নিলাম, কম পয়সাতেও হ'ল। কুকুরের জ্বালাতন থেকেও বাঁচলাম। গৃহকর্ত্রী, স্বামী ও তিনটি স্কুলে-পড়া ছেলে নিয়ে এদের সংসার। আমাকে নিয়ে মোট তিনটি ছাত্র এখানে থাকে। স্বামী পোলিশ—কারখানায় কাজ করে, গাড়ী আছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব ছক-কাটা। গৃহকর্ত্রীকে সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত খাটতে দেখতাম। সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা, বাড়ীর ধুলা পরিষ্কার থেকে আরম্ভ ক'রে—ছেলেদের জামা কাচা ও ইস্ত্রী করা—সবই তিনি করতেন। এরই ফাঁকে রেডিও, টেলিভিসন, পিয়ানো, ছেলেদের পড়ানো—সবই চলছে। ছেলে কটিকে মানুষ করবার জন্য আকুল আগ্রহ। যদিও ওদেশে স্কুলের পাঠে পয়সা খরচ হয় না,—তবু সেকেণ্ডারী স্কুলে ইচ্ছামত প্রবেশ করা চলে না। ছেলেদের সুশিক্ষা ও সদ্ব্যবহার শেখাতে বাপ-মা তৎপর, তবে মাঝে মাঝে তাড়নারও কমতি দেখতাম না। আর বাসা বদলাইনি। কেন না, সবই প্রায় একই ধরনের—কেবল মানুষের আচরণের পার্থক্য। কোথাও ২।৩জন কোথাও বা ৮।১০ জন ছাত্রকে গৃহকর্ত্রী রেঁধে খাওয়ায়; আবার কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে

ছাত্রেরাই রেঁধে খায়; অবশ্য গৃহস্থালীর সমস্তই ঘরের সঙ্গে ভাড়া পাওয়া যায়, পরে সারা ইংলণ্ড ঘুরে দেখেছি—এই রকম বাসা চালানো এদেশের মেয়েদের দ্বারা চালিত একটি বড় ব্যবসা—অনেক বড় হোটেলও মেয়েদের চালাতে দেখেছি।

যেমন ঘর ঘর ভাড়াটে, তেমনি প্রত্যেকের কাছে একটি ক'রে চাবি। দুদিনেই চাবির মানুষ হ'য়ে গেলাম। ছোটখাট চুরি এখানে বিরল। দুধের বোতল বাইরে রেখে চলে যাওয়া বা পয়সা রেখে খবরের কাগজ নিয়ে যাওয়া, সত্যই প্রত্যক্ষ করলাম। ঘরের ভেতরে কিন্তু খিল দিয়ে শোবার ব্যবস্থা নেই, আবার টোকা না দিয়ে কেউ ঘরে ঢোকে না। (ক্রমশঃ)

আসবে সেদিন কবে?

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমার হৃদয় তোমার বসার যোগ্য আসন হবে—
বল সুন্দর, আসবে সেদিন কবে?
আমি বসে আছি পরমাগ্রহে সেদিনের পথ চেয়েঃ
ঘন দুর্যোগে সারাটি আকাশ ছেয়ে
গেছে দেখি : সেই দুর্যোগ-মাঝে দুঃখের দীপ জ্বালি
আমি একান্তে নিভৃতে সাজাই তোমার পূজার ডালি।
নানা ভাবে রচি তোমার আসনখানি—
কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে, সমুখে পিছনে টানি
মনের মতন ক'রে
বারে বারে সেই আসন তোমার আমার হৃদয় 'পরে
সাজাই। কখন তোমার সময় হবে—
আসবে কখন? তোমার চরণ উজ্জ্বল হ'য়ে রবে
আমার হৃদয়ে; সে দুটি চরণ বহু সাধনার ধন।
ওগো সুন্দর, আসবে কবে সে মহাদুর্লভ ক্ষণ?
সাধনা আমার? কই কতটুকু করেছি সাধনা আমি?
তুমি অন্তরযামী,
জান তো সকলি; সাধনা আমার নাই—
শুধু দুঃখের দীপশিখা জেলে অন্তর মাঝে ঠাঁই
করেছি তোমার দিবানিশি জেগে;
ব্যথা-বেদনার ফুলে
ভরেছি আমার পূজার সাজিটি, দেব ওই পদমূলে—
এই আশা নিয়ে বসে আছি আমি—
একে কি সাধনা বলে?

পথ তো তোমার পিছল করিনি
আমার চোখের জলে;
আঁখি দুটি কই অন্ধ হয়নি ওই পথ চেয়ে চেয়ে,
কণ্ঠ রুদ্ধ, ডেকে ডেকে, গান গেয়ে?
তবু কেন আশা মনের গহনে, ও চরণ-ছোঁয়া লেগে
সাধনাবিহীন অন্তরখানি উঠবে আমার জেগে!
তোমার করুণা, ওগো সুন্দর, সে যে নামে অযাচিত
তুমি তো কারেও করনাক' বঞ্চিত।
কে কী দিল আর কেবা কী দিল না,
তুমি তো দেখ না চেয়ে;
তুমি দ্বারে দ্বারে ডাক দিয়ে যাও;
এতটুকু সাড়া পেয়ে
খুশী হ'য়ে ব'স তোমার আসনে,
আপনি আসন পাতি
আপন আলোকে প্রদীপ্ত হ'য়ে—প্রসন্ন দিবারাতি।
সেই করুণার এককণা আমি পাব ওগো সুন্দর,
সাধনা আমার কিছু নাই জানি, তবু খোলা অন্তর
আছে তুমি যবে এসে ডাক দেবে,
তোমাকে বরণ ক'রে
নিতে পারি যেন, পথ-চাওয়া মোর সার্থক হবে,
জীবন উঠবে ভ'রে।

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

ভোগাস্থৈর্যবর্ণনম্

ভোগাদির অস্থিরতা কথিত না হইলে পূর্বোক্ত যাচ্ঞাদৈন্য দূষণীয় বলিয়া ধারণা হইবে না, তাই ভর্তৃহরি ভোগের ক্ষণস্থায়িত্ব বর্ণনা করিতেছেন :

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্‌ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥ ৩১ ॥

মাত্রাধিক বিষয়ভোগে রোগাক্রান্ত হইবার ভয়, সদ্বংশে জাত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাচ্যুতির ভয়, ধনাধিক্যে রাজার ভয়, সম্মানিত ব্যক্তির অপমানের ভয়, বলে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর ভয়, রূপসৌন্দর্যে বার্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে প্রতিপক্ষ কর্তৃক পরাভূত হইবার ভয়, সদ্‌গুণ থাকিলে দুর্জনকৃত নিন্দাদির ভয় এবং শরীরে সর্বদা মৃত্যুভয় বিদ্যমান। সংসারে সকল বস্তুই ভয়গ্রস্ত, মানুষ সর্বদাই আতঙ্কগ্রস্ত, একমাত্র বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভয়শূন্য। ৩১

আক্রান্তং মরণেন জন্ম জরসা চাত্যুজ্জ্বলং যৌবনং
সন্তোষো ধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ।
লোকৈর্মৎসরিভির্গুণা বনভুবো ব্যালৈর্নৃপা দুর্জনৈ-
রস্থৈর্যেণ বিভূতয়োঽপ্যপহতা গ্রস্তং ন কিং কেন বা॥ ৩২ ॥

সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে—ইহাই এখন কথিত হইতেছে। প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত, সুন্দর উজ্জ্বল যৌবন জরা দ্বারা, সন্তোষ ধনতৃষ্ণা দ্বারা, মনঃসংযমের সুখ প্রগল্‌ভা রমণীগণের বিলাসচেষ্টা দ্বারা, মাৎসর্যপূর্ণ ব্যক্তিগণের দ্বারা বিদ্যাবিনয়াদি সদ্‌গুণসমূহ, বিষধর সর্প ও হিংস্র জন্তু দ্বারা অরণ্যপ্রদেশসমূহ, কুমন্ত্রণাদাতা দুর্জন দ্বারা নৃপতিগণ এবং ধনাদি সম্পদ নশ্বরতা দ্বারা কবলিত রহিয়াছে। এ সংসারে এমন কি আছে যাহা কোন কিছু দ্বারা কবলিত নয়? অর্থাৎ সর্ববস্তুই কিছু না কিছু দ্বারা গ্রস্ত। ৩২

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে
লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তি তত্র বিবৃতদ্বারা ইব ব্যাপদঃ।
জাতং জাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃ করোত্যাত্মসাৎ
তৎ কিং তেন নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্মিতং সুস্থিরম্॥ ৩৩ ॥

অসংখ্য আধিব্যাধি দ্বারা মনুষ্যের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, যেখানে সম্পদ্ বিদ্যমান,—বিপদ্ যেন দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সেখানেই প্রবিষ্ট হয়, প্রারব্ধবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মাধীন বিবশ পুরুষকে অবশ্যই মৃত্যু শীঘ্র কবলিত করিয়া থাকে। সুতরাং সেই স্বেচ্ছাবিহারী বিধি এমন কি পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা চিরস্থির? (অর্থাৎ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে)। ৩৩

ভোগাস্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গতরলাঃ প্রাণাঃ ক্ষণধ্বংসিনঃ
স্তোকান্যেব দিনানি যৌবনসুখ-স্ফূর্তিঃ প্রিয়াসু স্থিতা।
তৎসংসারমসারমেব নিখিলং বুদ্ধা বুধা বোধকা
লোকানুগ্রহপেশলেন মনসা যত্নঃ সমাধীয়তাম্॥ ৩৪॥

তাহা হইলে কি কর্তব্য? এক্ষণে তাহাই নির্ধারণ করিতেছেন: ভোগ্যবিষয়সমূহ উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। প্রাণ ক্ষণবিনাশী, যৌবনের সুখভোগও অল্পকালস্থায়ী; অতএব হে লোকহিতোপদেষ্টা বিদ্বান্‌গণ, এই অখিল সংসারকে অসার জানিয়া লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আদর্শ জীবন যাপন দ্বারা সর্বপ্রযত্নে চিত্ত সমাহিত করুন। (চরম পুরুষার্থ লাভের জন্য আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবন যাপন করত অপরকেও সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য অনুপ্রাণিত করুন)। ৩৪

ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলা
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাব্জপটলী-লীনাম্বুবদ্‌ভঙ্গুরম্।
লোলা যৌবনলালসাস্তনুভৃতামিত্যাকলয্য দ্রুতং
যোগে ধৈর্যসমাধিসিদ্ধসুলভে বুদ্ধিং বিধদ্ধ্বং বুধাঃ॥ ৩৫॥

ক্ষণভঙ্গুর বিষয়সুখাদি পরিত্যাগ পূর্বক যোগাভ্যাসে নিরত হওয়া কর্তব্য—ইহাই কথিত হইতেছে: মনুষ্যগণের ভোগ মেঘরাশি মধ্যে প্রকাশমান বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বায়ু-আন্দোলিত পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় আয়ু চঞ্চল, যৌবনের ভোগাভিলাষসমূহও স্থির নয়—এই সকল বিচার করিয়া হে সুধীগণ, ধৈর্য ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সুখলভ্য ব্রহ্মধ্যানে বুদ্ধি নিয়োজিত কর। ৩৫

আয়ুঃ কল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনী যৌবনশ্রী-
রর্থাঃ সঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূগাঃ।
কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ং তদপি চ ন চিরং যৎ প্রিয়াভিঃ প্রণীতম্
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারং তরীতুম্॥ ৩৬॥

প্রকারান্তরে পূর্বোক্ত বিষয়ই কথিত হইতেছে: আয়ু জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল, যৌবনের শোভা কয়েকদিন মাত্র স্থায়ী, ধনসম্পত্তি মনের কল্পনার মতো ক্ষণবিনাশী, বিষয়ভোগসমূহ বর্ষাকালের বিদ্যুতের ন্যায় অস্থির, প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গনও ক্ষণকালের জন্য। অতএব হে মনুষ্যগণ! সংসার-ভয়রূপ সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত কর। ৩৬

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যে নিয়মিততনুভিঃ স্থীয়তে গর্ভবাসে
কান্তাবিশ্লেষদুঃখ-ব্যতিকরবিষমো যৌবনে চোপভোগঃ।
বামাক্ষীণামবজ্ঞাবিহসিতবসতির্বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ
সংসারে রে মনুষ্যা বদত যদি সুখং স্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ॥৩৭॥

ইহলোকে প্রায় সকলেই সংসারসুখে তৎপর, তবে উহা নিন্দনীয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈরাগ্যাশ্রয়ী কবি ভর্তৃহরি বলিতেছেন, বিচার-দৃষ্টিতে সংসারে কিঞ্চিন্মাত্র সুখও নাই:

অপবিত্র পদার্থপূর্ণ জঠরবাসে সর্বগাত্র সঙ্কুচিত অবস্থায় জীব কত কষ্টেই না অবস্থান করে। যৌবনের সুখভোগও প্রিয়তমার বিয়োগ-দুঃখে বিষমভাবে ব্যাহত হয়। সুনয়না কামিনীগণের অবজ্ঞা ও উপহাসের আস্পদ বার্ধক্যও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব হে মানবগণ! এই সংসারে কোথাও কোন অবস্থায় যদি কণামাত্র সুখ থাকে তো বল।—অর্থাৎ দুঃখরূপ সংসারে সুখ নাই। ৩৭

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জয়ন্তী রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহম্।
আয়ু পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্ ॥৩৮॥

বিনাশের কারণসমূহ সন্নিহিত দেখিয়াও মানুষ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে। পরমার্থলাভে যত্নবান্ হয় না,—ইহাই মহা আশ্চর্য! এই কথা কবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতেছেন: বার্ধক্যাবস্থা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভীতি প্রদর্শন পূর্বক সদা সম্মুখে দণ্ডায়মান, পরম শত্রুতুল্য রোগাদিও দেহকে পীড়ন করিতে সতত উন্মুখ, ছিদ্র কুম্ভ হইতে জল নির্গমনের ন্যায় আয়ু প্রতিক্ষণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু কি আশ্চর্য! তথাপি লোকে অন্যায় আচরণ হইতে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। ৩৮

ভোগা ভঙ্গুরবৃত্তয়ো বহুবিধাস্তৈরেব চায়ং ভব-
স্তৎকস্যেহ কৃতে পরিভ্রমত রে লোকাঃ কৃতং চেষ্টিতৈঃ।
আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং
কামোৎপত্তিবশাৎ স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ ॥৩৯॥

যদি আমাদের কথা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অস্থির ভোগাদি বিষয়ের আশা পরিত্যাগ করত পরমকল্যাণ-নিদান আত্মচিন্তাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর—ইহাই গ্রন্থকার নিবেদন করিতেছেন: বিবিধ ভোগসমূহ ভঙ্গুর-স্বভাব ও ভোগবাসনায় পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণাদি-রূপ সাংসার-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে। অতএব হে মানবগণ! এ সংসারে কিসের জন্য ধাবিত হইতেছ? ভোগ-সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টার ফল কি? যদি আমাদের কথায় শ্রদ্ধা থাকে, তবে সকল আশা ও সকল কামনা বশীভূত করিয়া একান্ত অনুরাগের সহিত স্ব-স্বরূপে চিত্ত সমাহিত কর। ৩৯

ব্রহ্মেন্দ্রাদি মরুদ্গণাংস্তৃণকণান্ যত্র স্থিতো মন্যতে
যৎস্বাদাদ্বিরসা ভবন্তি বিভবাস্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ।
ভোগঃ কোঽপি স এক এব পরমো নিত্যোদিতো জৃম্ভতে
ভো সাধো ক্ষণভঙ্গুরে তদিতরে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ ॥৪০॥

যদি তোমার একান্তভাবে ভোগেই স্পৃহা থাকে, তাহা হইলে নিত্য ভোগ্যবস্তু এক আত্মাতেই চিত্ত নিবিষ্ট কর, অন্যত্র নহে,—ইহা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন: যাহাতে স্থিত হইলে মানুষ ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকেও তৃণসদৃশ মনে করিয়া থাকে, যে বস্তুর অনুভব হইলে ত্রিলোকের রাজ্যাদি বিভবও বিরস বলিয়া প্রতীত হয়, এইরূপ নিত্য প্রকাশশীল সর্বোৎকৃষ্ট একমাত্র ব্রহ্মানন্দ সুখই সদা বিদ্যমান। অতএব হে সাধু সাধক! ক্ষণস্থায়ী সংসার-সুখে অনুরক্ত হইও না, ব্রহ্মানন্দ-লাভে তৎপর হও।

কলিকাতায় স্বামীজী ও ক্ষেত্রীর মহারাজা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজী ডাক্তারদের পরামর্শমত দারজিলিংএ স্বাস্থ্য-পরিবর্তনে গিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের ২৩শে পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দের নিকট শুনিলাম স্বামীজী পরদিন প্রাতে দারজিলিং মেলে কলিকাতায় পৌছিবেন। হঠাৎ তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, 'মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসব উপলক্ষে অন্যান্ত রাজার সঙ্গে ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিত সিং বিলাতে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা যে তাঁর গুরুদেবকে তাঁর সঙ্গে বিলাতে নিয়ে যান, সমুদ্রবায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারে বলে স্বামীজীরও নাকি তাঁর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা।'

২৫শে এপ্রিল দারজিলিং মেল আসিবার সময় শেয়ালদায় গিয়া দেখি অপূর্ব ব্যাপার। বড় বাজারের প্রায় সমুদয় মারোয়াড়ী-সম্প্রদায় তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ক্ষেত্রীর মহারাজার প্রজা। স্বামীজী গাড়ী হইতে প্লাটফর্মে অবতরণ করামাত্রই মহারাজা অজিত সিং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিলেন। ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হইল। স্বামীজী অতি সংক্ষেপে দুই-এক কথায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া জবাব দিলেন। পরে ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে তাঁহার বড়বাজারের বাসভবনে চলিয়া গেলেন। ঐখানে শুনিতে পাইলাম, সেদিন বৈকালে স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজাকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজার মঠে যাইবেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে আমি বাগবাজারের শেয়ারের গাড়ীতে আলমবাজারে যাইতেছি, সে সময় পূজনীয় মাষ্টার মহাশয় (শ্রী-ম)-এর সঙ্গে দেখা হইল। গাড়ী বরানগরে পৌছিলে মাষ্টার মহাশয় উক্ত গাড়োয়ানকে আমাদের দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া দিতে বলিলেন। আমরা গিয়া যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলাম, তখন স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং তাঁহার সেক্রেটারী-সহ কালীমন্দির ও রাধাকান্তের মন্দির দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের অভিমুখে যাইতেছেন। আমি ও মাষ্টার মহাশয় তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত। যে ছোট খাটে ঠাকুর বসিতেন তাহাও পুষ্পমালায় সুশোভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা প্রভৃতিও তথায় প্রবেশ করিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামীজী ঐ ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রীর মহারাজা পর্যন্ত দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কেহই ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলেন না। স্বামীজী এই প্রকার তিনবার গড়াগড়ি দিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে যুক্তকরে ঠাকুরের সম্মুখে একপাশে অনিমেষনেত্রে ভাবগম্ভীর নয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন ক্ষেত্রীর মহারাজা প্রভৃতি সকলেই স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করিয়া লুটাইয়া গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। সকলের প্রণাম হইয়া গেলে স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজাকে পঞ্চবটীর দিকে লইয়া চলিলেন।

পঞ্চবটীর তলায় আসিয়া স্বামীজী অপূর্ব ভাবে বিভোর হইলেন। পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ

করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। পরে বালকের মতো আনন্দে পঞ্চবটীর একটি ডালে বসিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। মহারাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তখন আমরা এই রকম গাছে দোল খেতাম, আনন্দ করতাম। আজ সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। দেখ, এই গঙ্গাতীরে কী অপূর্ব দৃশ্য, কী সুন্দর পরিবেশ।' পরে সকলেই সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী উঠিয়া পড়িলেন। পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেই সময় শ্রীযুক্ত রামলাল-দাদা প্রভৃতি পুরোহিতগণ নারিকেলে সৈতা জড়াইয়া স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া মহারাজা শ্রীঅজিত সিংকে পুষ্পমাল্য-সহ নারিকেল অর্পণ করিলেন। তিনিও নতমস্তকে উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। এমন সময় একটি সুন্দর গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবক আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। স্বামীজী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'কি রে তোর বাবা কোথায়?' বালক উত্তর করিল, 'কুঠীঘরের বৈঠকখানায় ব'সে আছেন।' —'তোর বাবা এল না কেন?' বালক নিরুত্তর রহিল। স্বামীজী ইহা বলিয়া মহারাজাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে আলমবাজার মঠের দিকে চলিয়া গেলেন। শুনিলাম, বালকটি ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের পুত্র।

আমি এবং মাষ্টার মহাশয় যখন আলমবাজারে পৌঁছিলাম, তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করিতেছিলেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সমবেত-কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে স্বামীজীর 'জয়গুরু, জয়গুরু' হুঙ্কারে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গে সকলের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আরতি শেষ হইলে স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং এবং সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরঘরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী—মহারাজ অজিত সিং ও গুরুভ্রাতাদের লইয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠের লম্বা ঘরে উপবেশন করিলেন। আমি ও মাষ্টার মহাশয় তথায় উপবেশন করিলাম। স্বামীজী মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রীর মহারাজার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঠাকুরের কথা এবং স্বামীজীর শারীরিক অবস্থার আলোচনা চলিতে লাগিল। স্বামীজী সেই সময়ে প্রকাশ করিলেন, 'আমার তো ইচ্ছা ছিল, মহারাজার সঙ্গে বিলেত চলে যাই। জাহাজে সমুদ্রের বায়ুতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে পারে। সব বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে পরামর্শ নেওয়া হ'ল, কিন্তু কেউ আমার যাওয়া অনুমোদন করছে না। বরং তারা বলে, শীগ্‌গির আলমোড়া যেতে, কারণ বর্ষাকালে দারজিলিং-এর আবহাওয়া ভাল থাকে না।

অজিত সিং সকলের সম্মুখেই প্রকাশ করিলেন, 'আমার বিশ্বাস স্বামীজীর বর্তমান স্বাস্থ্য সমুদ্র-ভ্রমণে অনেকটা ভাল হবে। কিন্তু ডাক্তারদের কি অভিমত বুঝতে পারি না। যাই হোক আগামীকাল সাহেব-ডাক্তার যা বলবেন, তাই করা হবে।'

তারপর দু-একটি ভজন গান গাহিয়া স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজার সঙ্গে তাঁহার বাসভবনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রসাদ দেওয়া হইল। আমি ও মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে আলমবাজার মঠ হইতে বরানগর পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম।

পরদিন অপরাহ্ণে (বসুপাড়ায়) শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে পূজ্যপাদ যোগেন মহারাজের নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় বৃদ্ধ সাধু—দীনু মহারাজ আসিয়া যোগেন মহারাজকে বলিলেন, 'স্বামীজী একলা আসছেন।' কথা শেষ হইতে না হইতেই

স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে দেখিয়া আনন্দে বলিলেন, 'তুমি আসতে পেরেছ?'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমার বিলেতে যাওয়া হ'ল না—ডাক্তারদের সকলেই অমত করলেন,—এমন কি শশী ও বিপিন ডাক্তার পর্যন্ত। তাঁদের পরামর্শ যে আমি আলমোড়াতে চলে যাই। তাই কাল দারজিলিং চলে যাচ্ছি। রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে ২।৪ দিনের মধ্যে ফিরে আসব। একবার মাকে প্রণাম ক'রে যাই।'

যোগেন মহারাজ গোলাপ-মাকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'স্বামীজী এসেছেন, মা ঠাকরুনকে দর্শন করবেন।' এই কথার পর স্বামীজী মাকে দর্শন করিতে চলিলেন। আমরা দুই-একজন তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। তেতলায় শ্রীশ্রীমার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় স্বামীজী দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া খুব আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তোরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবি, মার পাদপদ্ম স্পর্শ করবি না। মা এত করুণাময়ী যে স্পর্শমাত্রই পাপ-তাপ গ্রহণ ক'রে নেন।'

এমন সময় গোলাপ-মা বলিলেন, 'নরেন, মা এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।' স্বামীজী অমনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, দ্বারসম্মুখে মা দাঁড়াইয়া ছিলেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া মাকে বলিলেন, 'মা, কাল আবার দারজিলিং যাচ্ছি।'

শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, 'দারজিলিং-এ কেমন ছিলে বাবা?'

স্বামীজী বলিলেন, 'মা, সেখানে খুব যত্নে ভাল ছিলাম। আমার তো মনে হয় শরীর খুব ভাল আছে। ওখানে মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁর স্ত্রী আমায় খুব যত্ন করছেন। আর এই গরমে দারজিলিং বেশ ঠাণ্ডা এবং বেড়াতে বেশ আনন্দ বোধ হয়। আমি বেশ বেড়াই এখন। ক্ষেত্রীর মহারাজা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে ব'লে আমাকে চিঠি লিখে ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এখানকার ডাক্তারেরা সকলেই বিলেত যেতে নিষেধ করলে। তারা বলেছে আলমোড়া নৈনিতালে যেতে। তাই শিগ্‌গির দারজিলিং থেকে আবার ফিরে আসব। মা, আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঠাকুরের যে কাজ আরম্ভ করেছি, সে কাজ শেষ করতে পারি।'

মা উত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'বাবা, ঠাকুর তোমায় দেখছেন। ঠাকুরের শক্তি তোমার ভিতর খেলা করছে। তাঁর কাজের জন্য তোমায় এনেছেন।'

স্বামীজী বলিলেন 'মা, ঠাকুর তো দেখছেন, তুমিও আমায় আশীর্বাদ কর, কৃপা কর। ঠাকুর ও তোমার কৃপাই আমার সম্বল।' 'জয় মা, জয় মা' বলিয়া স্বামীজী আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

গোলাপ-মা স্বামীজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মা প্রসাদ দিলেন।' স্বামী যোগানন্দ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'এই প্রসাদ স্বামীজীর গাড়ীতে দাও।'

স্বামীজী নীচে চলিয়া আসিয়া বলিলেন, 'ভাই যোগেন, চললাম। আবার তো আসছি। এই বার এসে কাজ শুরু ক'রে তারপর অন্যত্র গমন। কাজ শুরু না ক'রে আমি অন্যত্র যাব না। ডাক্তাররা যাই বলুক।'

আমরা সকলে স্বামীজীকে প্রণাম করিলাম। স্বামীজী ক্ষেত্রীর মহারাজার গাড়ী করিয়া চলিয়া গেলেন।

নবরাত্র

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

'নির্ণয়-সিন্ধু' গ্রন্থে কমলাকর ভট্ট বলেছেন যে অপর-পক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণ সমান্তরাল হচ্ছে যে দেবীপক্ষ। সত্যিকার শ্রেষ্ঠ কল্প হচ্ছে সমস্ত পিতৃ-পক্ষ ধ'রে পিতৃপুরুষদের তর্পণাদি দানে প্রীত করা; অগত্যা পাঁচ দিন ক'রে তিনটি ভাগ ক'রে নিয়ে, উত্তরোত্তর তর্পণের সময়াদি বৃদ্ধি করা; বা শেষ পাঁচ দিন সমস্ত বিধান করা—এ সমস্ত সম্ভব না হ'লে, মহালয়ার প্রশস্ততম দিবসে অন্ততঃ প্রাণপণে পিতৃপুরুষের তর্পণ করা। কোন কারণে তাও যদি না সম্ভব হয়, তা হ'লে 'ষোড়শ শ্রাদ্ধ' বাদ দিয়ে দীপাবলী অমাবস্যায় পিতৃশ্রাদ্ধ করতে হয়। সেভাবে দেবীপক্ষের ১৫ দিনই দেবীর অর্চনা বিধেয়; অগত্যা পক্ষে ষষ্ঠীর বোধন থেকে দশম্যন্তে বিসর্জন পর্যন্ত পূজা ক'রে—লক্ষ্মীপূর্ণিমায় দেবীপক্ষের পারণ।

ফলতঃ—নবরাত্রের বিধানসমূহের প্রতি দৃক্‌পাত করলেই দেখা যাবে—'নব' সংখ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা আছে। এই 'নব' বা 'অষ্টাদশ'—এইগুলি পুণ্য সংখ্যা। যেমন মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব, অষ্টাদশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-নাশ, ভগবদ্-গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়—ইত্যাদি। সমভাবে নবরাত্রের সর্বত্রই 'নব' অর্থাৎ নয়ের উপর বিশেষ জোর আছে। নবরাত্রে নবপত্রিকায় নবমাতৃকার পূজা-সম্পাদন, নবকুমারীর পূজায় অন্তিম আত্ম-নিবেদন—এবং নবদ্বার রোধপূর্বক হংসাবাপ্তি।

'নবপত্রিকা'ই শাকম্ভরী, শতাক্ষী দুর্গা-মাতৃকার প্রতীক। নবপত্রিকায় দুর্গার আবাহন-মন্ত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না, :

ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে।
পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥

মৎস্যসূক্ত-তন্ত্রে নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গার সুন্দর ধ্যানমন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। প্রাণতোষণী তন্ত্রের পঞ্চম পরিচ্ছেদও এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। নবদুর্গার নাম অর্থাৎ রম্ভা, কচ্বী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান্য—এ প্রত্যেক পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দুর্গার নব মূর্তির নাম বিদ্যাপতি তাঁর 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' গ্রন্থে সুন্দরভাবে শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত করেছেন :

ব্রহ্মাণী কদলীকাণ্ডে দাড়িমে **রক্তদন্তিকা**।
ধান্যে **লক্ষ্মী** হরিদ্রায়াং **দুর্গা** মানকপত্রকে॥
চামুণ্ডা কালিকা কচ্বাং **শিবা** বিল্বে প্রতিষ্ঠিতা।
অশোকে **শোকরহিতা** জয়ন্ত্যাং **কার্তিকী** স্মৃতা॥

অন্যদিকে প্রতিপদ্ তিথি থেকে আরম্ভ ক'রে যাঁরা নব-মাতৃকার পূজা করবেন, তাঁদের জন্যও নবমাতৃকার নাম নির্দিষ্ট রয়েছে, যথা—

কুমারিকা ত্রিমূর্তিশ্চ কল্যাণী রোধিণী তথা।
কালিকা চণ্ডিকা দেবী শাম্ভবী দুর্গিকাষ্টমী॥
সুভদ্রা নবমী পূজ্যা **নবরাত্রব্রতে** হিতা॥

এই নবরাত্র-ব্রত দিনে উদ্‌যাপনীয়, অথবা রাত্রে করণীয়—এই প্রশ্নের উত্তরে স্কন্দপুরাণ বলছেন :

'মাসি চাশ্বযুগে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ।
সংপূজ্য নবদুর্গাং চ নক্তং কুর্যাৎ সমাহিতঃ।
নবরাত্রাভিধং কর্ম **নক্তব্রতম্** ইদং স্মৃতম্॥

এই পূজা রাত্রের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল—কারণ, সব পুরাণে তন্ত্রে যখন যখন ভক্ত বা ভগবদবতারদের নিকট জননী দেখা দিয়েছেন, রাত্রি-কালেই দেখা দিয়েছেন—এই দেখা যায়। তার ইতিহাস অতি-প্রপঞ্চিত। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায় যে, সংক্ষেপীকরণের মুখে 'ত্রি-রাত্রে' অহোরাত্রে—এই বিধান পরবর্তীকালে স্থান পেয়েছে। প্রয়োজন হ'লে কেবল জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে—একদিনেই দুর্গা-জননীর আরাধনা ক'রে ফলপ্রাপ্তির আশা করা যেতে পারে—এই শাস্ত্রের বিধান।

নবরাত্রের এই সকল—প্রত্যেক রাত্রের সঙ্গে দেবীর সম্পর্ক, দেশ-বিদেশে নবরাত্রের উদ্-

যাপনের প্রণালী, একই দিবসত্রয়ে মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বতীর পূজার বিধান ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—এই গূঢ় তত্ত্বগুলি মায়ের পূজার অবসরে অবশ্য চিন্তনীয়। আজ শারদীয় পূজার প্রাক্কালে ভাববিহ্বল চিত্তে জননীকে এই বলেই স্তুতি নিবেদন করি:

যস্যেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
নানাবতার-কলনং কুরুতে হরিশ্চ ।
নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শম্ভু-
স্তাং শর্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥

অকিঞ্চন জীব মুক্তি তরে করে আকিঞ্চন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

আজো আশা-নিরাশার জোয়ার-ভাঁটাতে চলে জীবনের নদী,
ধরণীর উৎস হ'তে উৎসারিত হ'য়ে।
ভেসে যায় সীমাহীন সিন্ধুপানে তীব্র গতি ল'য়ে
দুঃখসুখ লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু আলোছায়া স্রোতে নিরবধি।
আজো হায় নিরুদ্দেশে মানস বিহগশ্রেণী। প্রাণের আকাশে
ওঠে পক্ষ-বিধূনন; কোথা তারা বাঁধে নীড়—সেই প্রশ্ন আসে
যুগ হ'তে যুগান্তরে অন্তরের নিভৃত প্রদেশে :
করে শূন্যে প্রদক্ষিণ গ্রহ-তারা, শঙ্কা হয় কক্ষচ্যুত হ'তে পারে,
অসংখ্য নক্ষত্র মৃত। কি রহস্য কেবা জানে বিশ্ব-পারাবারে ?
রহস্যের অধিনেতা! নয়ন নেপথ্যে রহি আনন্দে বিভোর,
রূপ হ'তে অরূপের রচিতেছ ঘর।
'কালের অদৃশ্য চক্রে' কেন্দ্র-স্রোত বহে নিরন্তর ;
অকিঞ্চন জীব মুক্তি তরে করে আকিঞ্চন—আঁখিলোর
ঝরে নীল নভ-তলে। দৈবী করুণার তরে নিয়ত ব্যাকুল ;
তাহারি মুছাতে অশ্রু এলে প্রভু কতবার, তবু সেই ভুল ;
চিনিতে পারে না কেহ পরিপূর্ণভাবে। এখনো বিরলে বসি,
কেহ কেহ করে অনুতাপ।
দয়া দিয়ে ধৌত করি যত কিছু পাপ
তুমি এসে চলে যাও ভগবান্!
তুমি তো সে দিন এলে দীন ব্রাহ্মণের বেশে করিবারে ত্রাণ
কোটি কোটি অভাজনে,
তোমারে চিনিনি মোরা, করি নাই আত্ম-সমর্পণ
প্রতিদিন অর্চনার শুভ-সন্ধিক্ষণে,
তাই এবে বিশ্ব ব্যাপি মানুষের ধ্বনিল কি অশান্ত ক্রন্দন ?

আবেদন

আসামের দুর্গত-সেবাকার্য : জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা ক্যাম্প হইতে দুর্গতদের অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাওয়ায় মিশনের সেবাকার্য সেখানে ১৭ই আগস্ট বন্ধ হইয়াছে। তার পর ২৮শে আগস্ট হইতে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে আসাম হইতে আগত নরনারীদের ভাত ডাল তরকারী খাওয়ানো হইতেছে। ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে ; ১লা সেপ্টেম্বর ১২১০ জনকে খাওয়াইতে হইয়াছে। শিলং-এর গভর্ণমেণ্ট ক্যাম্পে দুধ, কাপড়, কম্বল ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে।

উড়িষ্যায় বন্যাসেবাকার্য : বালেশ্বর জেলায় বাসুদেবপুরে ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে মিশন বন্যাসেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। আপাততঃ কাপড় এবং গবাদির খাদ্য বিতরণ করা হইতেছে।

আমরা এই সেবাকার্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসিগণের নিকট অর্থ-সাহায্যের আবেদন করিতেছি। সাহায্য—সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া)—এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

৫. ৯. ৬০.

স্বাঃ স্বামী মাধবানন্দ, সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

সেবাকার্য-বিবরণী

ফালাকাটায় ৩৫৪ পরিবারের ১৩৭৮ জনের মধ্যে ৪০০ ধুতি, ৪০০ শাড়ী, ৮৫৮ ছোটদের জামাকাপড়, ৩০ সতরঞ্চি, ২৬৫ হারিকেন লণ্ঠন, ২৩৮ বালতী, ২৫০ কড়াই, ২৪৪ হাতা, ২৪৪ খুন্তি, ২৫০ মগ, ২৫০ থালা, ২৪৬ বাটি, ২৫০ গ্লাস, চিঁড়া ৩৬ মণ, গুড় ৮ মণ বিতরণ করা হইয়াছে।

পরে আবার ৭৫ জোড়া ধুতি, ৭৫ জোড়া শাড়ী, ১০০ হারিকেন লণ্ঠন, ১০০ থালা, ১০০ বাটি পাঠানো হইয়াছে।

আলিপুর দুয়ারে স্টেশনে নিম্নলিখিত হারে লোক খাওয়ানো হইয়াছে।

২৮শে আগষ্ট	৬০২	১লা সেপ্টেম্বর	১২১০
২৯শে	৬১২	২রা	১২৫৯
৩০শে	৭০৩		
৩১শে	৮২৫		

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী : রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও সময়োপযোগী বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করা হয়। সাপ্তাহিক সভাগুলিতে বহুসংখ্যক ছাত্রও যোগদান করে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্ত-সমিতির উদ্যোগে বিবেকানন্দ-হলে প্রতি রবিবার সকালে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ পতঞ্জলির যোগসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগসূত্রের পর বর্তমানে 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থের আলোচনা চলিতেছে। তুলসী রামায়ণের হিন্দী আলোচনায় সারা বৎসরে ৩৩টি সভায় শ্রোতৃসংখ্যা ২৮,২৫০।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও জন্মোৎসবগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। স্বামীজীর উৎসবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১১,৫৯১; পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১১,৩৯১। পাঠাগারের পাঠক-সংখ্যা গড়ে দৈনিক ৩৮১। ১৪টি দৈনিক ও ১৩২টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

আশ্রমের ফ্রি চিকিৎসালয়ে ৫২,০১১ (নূতন ১৩,৫২৭) রোগী হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা লাভ করে। আশ্রম-পরিচালিত কারোলবাগ যক্ষ্মা-ক্লিনিকে মোট চিকিৎসিতের সংখ্যা ১১৪,৬৫০; অন্তর্বিভাগে ৪৫৯ জন (স্ত্রীলোক ২২৩) রোগী পর্যবেক্ষণ করা হয়।

দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় বেদান্ত

হলিউড: বেদান্ত-সোসাইটি: প্রধান কেন্দ্র, কেন্দ্রাধ্যক্ষ: স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী: স্বামী বন্দনানন্দ ও স্বামী ঋতজানন্দ।

রবিবাসরীয় বক্তৃতা: এপ্রিল: আশা, বিশ্বাস ও দান; পুনরবতরণ ও অমরত্ব, যীশুর পুনরভ্যুত্থানের তাৎপর্য, সুখ ও মনোনিবেশ।

মে: ঈশ্বরের প্রয়োজন, বৌদ্ধ ধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবন, মৌনাভ্যাস, মন ও অন্তঃকরণ।

জুন: আধ্যাত্মিক সুরোদ্ঘাটন, কিরূপে ভক্ত হওয়া যায়, বিচার ও ন্যায়পরতা।

জুলাই: চরম আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে? মানুষই দেবতা, মানসিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, বিনয় ও অহঙ্কার, ধর্ম ও জনসেবা।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে মঙ্গলবারে ভাগবত এবং বৃহস্পতিবারে গীতার ক্লাস হয়।

সান্টা বারবারা শাখাকেন্দ্রে রবিবারের বক্তৃতা

এপ্রিল: কর্মজীবনে বেদান্ত, যুক্তি ও শ্রদ্ধা, অবতার ও অমরত্ব, প্রার্থনার ধারা।

মে: সুখ ও মনোনিবেশ, অন্তর্জীবন, বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম, সরলতা ও আধ্যাত্মিকতা, নীরবতাই তোমার নাম।

জুন: প্রেমই ভয় জয় করে, আধ্যাত্মিক সুরোদ্ঘাটন, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবন।

জুলাই: কর্মযোগ, আধ্যাত্মিক অনুভূতির লক্ষণ, ভক্তিযোগ, অজ্ঞাত ও অধ্যাত্ম ধ্যানযোগ।

এতদ্ব্যতীত মঙ্গলবারে গীতা ক্লাস হয়।

গ্রীস ও হল্যাণ্ডে বেদান্ত-প্রচার

গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে লণ্ডন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ঘনানন্দ বেদান্ত-বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইয়া বিমান-যোগে গ্রীসে গমন করেন; এথেন্সে ২৫শে, ২৯শে ৩০শে এপ্রিল এবং ৩ই মে এই চারদিন নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দেন:

পাশ্চাত্যের নিকট ভারতীয় মনস্তত্ত্বের ও দর্শনের মূল্য, ধ্যানযোগ, চৈতন্য ও জীবাত্মা, বর্তমান মানব-মনে বেদান্তের আবেদন। প্রথম দুইটি বক্তৃতায় শ্রোতৃসংখ্যা ৬০০ এবং ১০০০ এর উপর, শেষ দুটিতে প্রায় ৪০০ এবং ৬৫০, ইংরেজী বক্তৃতার অনুবাদ গ্রীক ভাষায় মুদ্রিত করিয়া শ্রোতৃমধ্যে বিতরিত হয়।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বামী ঘনানন্দ জুরিখ হইয়া হল্যাণ্ডে যান। আর্নহেম শহরে তিনি ১৬ই মে 'ধ্যানের অভ্যাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, এবং ১৭ই মে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

শ্রীশ্রীমা সারদা (৩য় সংস্করণ): স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯০, মূল্য ১৲। পুস্তকখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এরূপ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকের বিশেষ আবশ্যকতা থাকায় বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দশটি ছোট ছোট অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি আলোচিত হইয়াছে। শেষ চার পৃষ্ঠায় শ্রীশ্রীমায়ের বাছা বাছা কয়েকটি কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান

১৯৫৯ খৃঃ সংবাদ প্রেস রেজিষ্ট্রারের বাৎসরিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভারতে সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং সেগুলির প্রচার-সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৯ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকা-সহ মোট সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৭,৬৫১। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ খৃঃ এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫,৯৩২ এবং ৬,৯১৮।

পরিসংখ্যানে আরও জানা যায় যে, ১৯৫৯ খৃঃ সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১১'২ শতাংশ। ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ খৃঃ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে '৯৯ এবং ৮'৮ শতাংশ। আলোচ্য বর্ষে দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচার-সংখ্যা ১৩'৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৫৮ খৃঃ তুলনায় ১৯৫৯ খৃঃ নূতন কাগজের সংখ্যা শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ১,৩০২টি নূতন কাগজ চালু হয়।

ভাষা-ভিত্তিক প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধির হার :

বাংলা	১০'৩	শতাংশ	মালয়ালাম	৯'৩	শতাংশ
ইংরেজী	৯'০	,,	গুজরাটী	৭'৭	,,
তামিল	১৮'৩	,,	ওড়িয়া	৭'৪	,,
মারাঠী	১৬'৩	,,	উর্দু	৬ ৯	,,
পাঞ্জাবী	১৫'৪	,,			
হিন্দী	১১'৮	,,	কানাড়া	৫ ২	,,
তেলেগু	১০'৬	,,	অসমীয়া	২৬'৮	,,

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার হার বৃদ্ধি :

দৈনিক সংবাদপত্র	১৩'৭	শতাংশ
বাজার দর, আবহাওয়া প্রভৃতি	১০৫'৯	,,
সাপ্তাহিক পত্রিকা	১৩ ৮	,,
পাক্ষিক ,,	৯'৬	,,
মাসিক ,,	৭ ৭	,,
ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক	৩'৫	,,
বার্ষিক	৫'৩	,,

আলোচ্য বর্ষে দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ৫০,০০০ ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া ৯টি ইংরেজী দৈনিক, দুইটি করিয়া হিন্দী তামিল ও মালয়ালাম এবং একটি মারাঠী দৈনিকের প্রচার-সংখ্যাও ৫০,০০০ এর অধিক হইয়াছে। দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে ইংরেজী পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। তাহার পরে ছিল হিন্দী ও তামিল পত্রিকার স্থান।

ভারতের জনসংখ্যা

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান-সংস্থার হিসাবে জানা যায় ১৯৫১-৫৬ খৃঃ ভারতে হাজার-করা মৃত্যুর হার ছিল ২৫ ৯। আশা করা যায়, ১৯৫৬-৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া হাজার-করা ২১'৬ দাঁড়াইবে এবং ১৯৭১-৭৬ খৃঃ হইবে ১২'৬। ভারতে জন্মের হার হাজার করা ৪০ হইতে ৪২ এর মধ্যে উঠা নামা করে।

গত দশ বৎসরের জনসংখ্যা-গণনায় দেখা যায় যে, ভারতে মৃত্যুর হার বেশ কমের দিকে, এবং জন্মের হার অত্যন্ত মন্থরগতিতে হ্রাস পাইতেছে।

১৯৫১ খৃঃ হইতে ভারতের লোকসংখ্যা বৎসরে ৫০ লক্ষ হারে বৃদ্ধি পাইবে ধরা হইয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার বৎসরে ৮০ লক্ষ। বর্তমান হারে হিসাব করিলে ১৯৭৬ খৃঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা ২০ কোটি ৬০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়।

ভ্রম-সংশোধন : ভাদ্র মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত (৪০০ পৃষ্ঠায়) 'কৃষ্ণাষ্টমী' কবিতার লেখকের নাম পড়িবেন : শ্রীরমেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

উদ্বোধন

সর্বরূপা মা

ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহো গন্ধবাহস্ত্বমেব
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্বিকাহংকৃতিশ্চ।
আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বম্।
মাতঙ্গী ত্বঞ্চ ধূমা ত্বমসি চ বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে ॥

[শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত অপরাধভঞ্জনস্তোত্র—১৪।১৫]

হে মাতঃ! তুমিই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—'পঞ্চভূতাত্মক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ; আবার তুমিই মন, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অন্তর্জগৎ; চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তুমি, তুমিই জগতের মূল উপাদান প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি; আবার তুমিই আত্মা, পুরুষ বা চৈতন্য, তুমিই পরম তত্ত্ব; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সর্বদা আত্মস্বরূপে প্রকাশিতা বিকশিতদশনা অভীষ্ট-রূপধারিণী করালিনী হে মাতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।

তুমিই কালী, তারা, পার্বতী, ষোড়শী, ভৈরবী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, লক্ষ্মী, শিবানী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, বগলা, মঙ্গলা ও হিঙ্গুলা। সুন্দর মধুর, আবার ভয়ঙ্কর ও রুদ্র দশমহাবিদ্যা মহামায়ার মহাশক্তির বিভিন্ন বিকাশ; সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী বিকশিতদশনা তুমি অনাবৃত সত্তা; সর্বজীবের সর্বকামনাপূরণকারিণী করালিনী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

শান্তির জন্যই শক্তির সাধনা

'শান্তি' কথাটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অশান্ত মন শান্ত হইয়া আসে। কথাটির মধ্যে অফুরন্ত শক্তি রহিয়াছে! পূজার শেষে শান্তি-জল প্রদানের বিধি, শান্তি-মন্ত্র সাধকের প্রাণে আরাধ্য দেবতার অদর্শন-জনিত বিয়োগ ব্যথা দূর করিয়া এক দিব্য সান্নিধ্যের অনুভূতি আনিয়া দেয়। উপনিষদ-পাঠের আদিতে শান্তি পাঠের বিধি,—সাধকের দেহেন্দ্রিয় সংযত করিয়া উহা তাহাকে রহস্য-বিদ্যা শ্রবণের অধিকারী করে, অন্তে উহাই আবার মননের সহায়ক।

শান্তি-মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে আমরা বুঝি—বাহিরের শান্তি নির্ভর করিতেছে অন্তরের শান্তির উপর। যুদ্ধের শেষে, সংগ্রামের শেষে শান্তি বিজয়োৎসব। দিব্য শুভশক্তি সহায়েই অশুভ শক্তি নির্জিত হয়। অন্যায় দূরীভূত হইলে যখন ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অপরাজিতা অপরাজেয়া মহাশক্তির বিজয়োৎসব এই বিজয়া! অসুর-নিধনের পর ত্রিভুবনে শান্তি ফিরিয়া আসিলে বিশ্বমাতৃরূপা বিজয়িনী মহাশক্তিকে ঘিরিয়া দেবতাগণ এই বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। রাবণ-নিধনের পর লঙ্কাকাণ্ড শান্ত হইলে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী সীতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিতা হইলে যে উৎসব হয়, তাহাই এখনও 'বিজয়া' নামে প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘ সংগ্রাম-শেষে সাফল্য-মণ্ডিত বিজয়ী দলের আনন্দ-উৎসব নূতন এক শান্তি-যুগের সূচনা করে। বিজয়া ও শান্তি তাই প্রায় সমার্থক। বিরুদ্ধ-শক্তি বিজিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি অসম্ভব। শক্তিমান্ বিপক্ষকে পরাজিত করিতে হইলে অবশ্যই অধিকতর শক্তি প্রয়োজন—সে শক্তি শরীরের হউক বা মনের হউক, অস্ত্রশস্ত্রের হউক বা বুদ্ধিকৌশলের হউক! সাধনা ব্যতীত কোন শক্তিই আয়ত্ত হয় না। শান্তির জন্যই তাই শক্তির সাধনা!

সমাজ-সংসার এমনই নিয়মে সৃষ্ট যে এখানে সর্বদা দুই বিপরীত শক্তি খেলা করিতেছে, তাহাদেরই আঘাতে ও সংঘাতে সমাজ-সংসার ভাঙিতেছে, গড়িতেছে। তাই যদি কেহ মনে করেন, একদিন এই সংগ্রাম দূরীভূত হইয়া সর্বত্র এক অনন্ত শান্তি বিরাজ করিবে, সকল বৈষম্য দূরীভূত হইয়া অপূর্ব সাম্যে সব একাকার হইয়া যাইবে, তবে তাহা ভ্রান্ত ধারণা; সে শান্তি শ্মশানেও নাই, সে সাম্য কবরেও নাই। সৃষ্টিস্থিতিলয় পর্যায়ক্রমে আসিয়া থাকে দিবারাত্রির মতো, ঋতু-পরিবর্তনের মতো। কালবৈশাখীর পূর্বে বাতাস স্তম্ভিত, পরে প্রকৃতি শান্ত। সর্বত্রই এই নিয়ম, বাহ্য প্রকৃতিতে—অন্তঃপ্রকৃতিতে, ব্যষ্টিগত ব্যক্তি-জীবনে—সমষ্টিগত সমাজ-জীবনে।

বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয় ঝড়ের মতো; পূর্বে স্তব্ধভাব, পরে শান্তভাব। কিছু দিন পরে আবার চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি। তাই বলিতে হয়, শান্তি—সংগ্রামের শেষে নয়, সংগ্রামের মাঝে মাঝে। শান্তি জীবনেও নয়, মরণেও নয়, উভয়-ভাবের মাঝে। শান্তির স্বরূপ অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া, বলিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া স্বামীজী কত ভাবে ইহাকে

ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার ঔপনিষদ বেদনাময় 'Peace' কবিতায় :

It is lull between two storms,
Between two fits of passion
It is the calm of heart.

তাই বলিতেছিলাম—শান্তি সংগ্রামের শেষে নয়, সংগ্রাম-মুখর জীবনেই মাঝে মাঝে মানুষ শান্তির অস্পষ্ট আভাস পায়। এই আভাসই তাহাকে উন্নততর স্তরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; সেখানে আবার অপ্রাপ্তির অশান্তি, আবার শুরু হয় বাধা জয় করিবার সাধনা, নূতনতর সংগ্রাম; উন্নততর শক্তির সহায়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তির পর আবার কিছু দিনের শান্তি। এই ভাবেই আগাইয়া চলে মানুষের জীবন—মানুষের এই সংগ্রাম ও সাধনা প্রতিফলিত তাহার জীবনের আন্তর ও বাহ্য সকল প্রচেষ্টায়—ধর্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সমাজে, রাষ্ট্রে!

*　　*　　*

বর্তমান বিশ্বে সর্বত্র অশান্তি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে শান্তি স্থাপনের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা নিষ্ফল হইলেও ইহা স্পষ্ট যে বিবদমান কোন পক্ষই ব্যাপক যুদ্ধ চাহিতেছে না। উভয় পক্ষই স্থায়ী শান্তির জন্য ব্যাকুল। ইহার প্রধান কারণ উন্নততর মারণাস্ত্র উভয় পক্ষেরই হাতে রহিয়াছে, যুদ্ধ বাধিলে কে উহা কিভাবে ব্যবহার করিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। যে কোন এক পক্ষ উহা ব্যবহার করিলে উভয় পক্ষই নিশ্চিহ্ন হইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধ মানুষকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা দিয়াছে। উভয় শিবিরের মানুষই বুঝিয়াছে, উলু-খাগড়ার বন বিনষ্ট করিবার জন্য রাজায় রাজায় যুদ্ধ করিবার দিন অতীত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবে পৃথিবী-ব্যাপী সকল মানুষ শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার কোন উপায় রাজনীতিক নেতাদের চোখে পড়িতেছে না। তাঁহারা জাতীয় জীবনের কক্ষ হইতে আন্তর্জাতিক আঙিনায় মিলিত হইতেছেন বটে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের সহিত বিশ্বস্বার্থের সামঞ্জস্য কিভাবে রক্ষিত হইতে পারে, তাহার কোন উপায় তাঁহাদের কাহারও চোখে ধরা পড়িতেছে না! বঙ্গ-সমস্যার সমাধান করিতে পারি না, কঙ্গো-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আমরা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ি। ইহা এক প্রহেলিকা! যে দৃঢ় ভাবে নিজের ভূমির উপর দাঁড়াইতে পারে, সেই অপরকে পথচলায় সাহায্য করিতে পারে।

কোন সমস্যার সমাধান যখন এক স্তরে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টি সহায়ে তখন দেখা যায়—তাহার সমাধান সম্ভব অন্য স্তরে। গণিতের একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। তিনটি বিন্দুকে সমদূরে স্থাপন করা সহজ, কিন্তু যখন চারিটি বিন্দুকে সমদূরে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হয়, তখন প্রথমত প্রায় সকলেই বলিয়া উঠে—ইহা অসম্ভব। আমরা যে ভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত, সে-ভাবে অর্থাৎ সমতল ক্ষেত্রে উহা সম্ভব নয়। তখন সূক্ষ্ম দৃষ্টি তিনটি বিন্দু সমতলে সমদূরে স্থাপন করিয়া ঊর্ধ্বস্তরে ত্রিমাত্রিক ক্ষেত্রে (পিরামিডের শীর্ষে) চতুর্থ বিন্দুটি স্থাপন করিয়া সমস্যার সমাধান করে।

বর্তমান বিশ্ব-সমস্যার সমাধান মনে হয়, জাতীয়তার স্তরে তো নয়ই, আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও সম্ভব হইবে না; অথচ মনে হয় ঊর্ধ্বতর এবং গভীরতর মানবিকতার স্তরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় সমস্যারই সমাধান সম্ভব। জনৈক সাধক বলিয়াছেন, 'দেশ-বিদেশ থাকিলে দ্বেষ-বিদ্বেষও থাকিবে।' এই

উভয়ের উর্ধ্বে উঠিতে হইলে গভীর একত্ববোধের প্রয়োজন। প্রাচ্য-প্রতীচ্যে আদর্শগত পার্থক্যের অন্তরালে—সাম্প্রদায়িতা, প্রাদেশিকতা, ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তা প্রভৃতি বাহ্য বিভিন্নতার অলক্ষ্যে মানুষের মূলগত যে একত্ব রহিয়াছে, তাহাকেই আজ সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে!

আজ আমরা জানি না, মনের কতখানি উৎকর্ষের ফলে মানুষ এই উদার সত্য ধরিতে পারিয়া গাহিয়া উঠিয়াছিল :

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

—মহেশ্বর আমাদের পিতা, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারিণী মহাশক্তি আমাদের সকলের জননী, ত্রিভুবন আমাদের স্বদেশ—এই বোধ হইলে তবেই আমরা বুঝিব কল্যাণকামী সকল মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বন্ধু; এবং এই বোধের উপরই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কারণ এই বোধ-লব্ধ শক্তির দ্বারাই অকল্যাণকর অশুভ শক্তি পরাভূত হইবে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই শান্তি সামরিক বা রাজনীতিক উপায়ে লব্ধ হইবার নহে। ইহার আবেদন মানসিক স্তরে! যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য, অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিবার জন্য মানসিক শক্তিরই অন্যতম বিকাশ, নিম্নতর বিকাশ বিজ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন; উহা ব্যবহার করিবার জন্য শারীরিক শক্তিরও প্রয়োজন। দেখা যায়, ঐ শক্তির অনুশীলন করিবার জন্য ও রাজনীতিক কূটকৌশল সফল করিবার জন্য যথেষ্ট মানসিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু দুই বিপরীত শক্তির অনুশীলন শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ সংগ্রামে পর্যবসিত হয়; একজনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া সাময়িক ভাবে পরাজিত করাই তাহার লক্ষ্য। শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরাজিত পক্ষ বিজেতাকে আবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

সাম্য বা শান্তির জন্য প্রয়োজন আর একটি তৃতীয় শক্তি; এই তৃতীয় শক্তি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য, অল্প মনে হইলেও প্রভূত, প্রয়োজন-মত বর্ধিত হইয়া এই শক্তি দুই সংগ্রামশীল বিপরীত শক্তির মধ্যে সাম্য স্থাপন করে, শান্তি স্থাপন করে। সাম্যের জন্য, স্থায়ী শান্তির জন্য মানসিক শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ অধ্যাত্ম শক্তির সাধনা আজ একান্ত প্রয়োজন। ইহারই সহায়ে মানুষ তাহার পাশবিক ও আসুরিক প্রবৃত্তি দ্বেষহিংসা প্রভৃতি জয় করিয়া অন্তর্নিহিত দেবত্ব বিকশিত করিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অন্যান্য শক্তির সাধনা মানুষের ভোগপ্রবণ স্বার্থবুদ্ধি বর্ধিত করিতে সাহায্য করে মাত্র!

মনকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, মনকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার প্রকৃত জীবন, মনকে সুপরিচালিত করিয়া, মনের গতিকে নদীর গতির মতো সুবাহিত করিয়াই আমরা তাহার দুর্বার গতি-জনিত বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারি; নদীকে সুশিক্ষিত করিয়া ফসল ফলানোর মতো মনের ক্ষেত্রেও কৃষ্টির ফসল তুলিতে পারি। অন্তরে বাহিরে যে প্রচণ্ড শক্তি রহিয়াছে, যাহার হাতে মানুষ ক্রীড়নক-মাত্র, তাহাকে বশীভূত করিয়াই মানুষ জগৎ ও জীবন ঠিক ঠিক ভোগ করিতে পারে, নতুবা জীবন দুর্ভোগ, জগৎ অশান্তির নরককুণ্ড!

জড়বিজ্ঞান-সহায়ে জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বাহিরের বহুতর শক্তিকে নানাভাবে সংযত শৃঙ্খলিত করিয়া মানুষ পৃথিবীকে একভাবে ভোগ করিতেছে সত্য, কিন্তু স্বার্থের দ্বন্দ্বে তাহা অশান্তিপূর্ণ দুর্ভোগেই পরিণত হইতেছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান সহায়ে যখন মানুষ মনের সূক্ষ্ম শক্তিকে সংযত করিয়া ভোগ করিতে শিখিবে, তখনই ব্যাপক শান্তি দেখা দিবে ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে। এই শান্তি আনিতে গেলে প্রয়োজন দেহ-মনের অতীত, অথচ দেহ-মনের অভ্যন্তরে অধ্যাত্ম শক্তির সাধনা।

জগজ্জননী

স্বামী বিবেকানন্দ

শাক্তেরা জগতের সেই সর্বব্যাপিনী শক্তিকে মা ব'লে পূজা ক'রে থাকেন—কারণ, মা নামের চেয়ে মিষ্ট নাম আর কিছু নেই। ভারতে মাতাই স্ত্রী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ। ভগবানকে মাতৃরূপে, প্রেমের উচ্চতম বিকাশরূপে পূজা করাকে হিন্দুরা দক্ষিণাচার বা দক্ষিণমার্গ বলেন, ঐ উপাসনায় আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়,—এর দ্বারা কখন ঐহিক উন্নতি হয় না। আর তাঁর ভীষণ রূপের—রুদ্রমূর্তির উপাসনাকে বামাচার বা বামমার্গ বলে, সাধারণতঃ এতে সাংসারিক উন্নতি খুব হ'য়ে থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় একটা হয় না। কালে ঐ থেকে অবনতি হয়; আর যে জাতি এই সাধন করে, সেই জাতি একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়।

জননীই শক্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ, আর পিতৃভাব থেকে মাতৃভাব ভারতে উচ্চতর বিবেচিত হ'য়ে থাকে। মা নাম করলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব এসে থাকে। শিশু আপনার মাকে সর্বশক্তিমতী মনে ক'রে থাকে: মা সব করতে পারে! সেই জগজ্জননী ভগবতীই আমাদের অভ্যন্তরে নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী—তাঁকে উপাসনা না ক'রে আমরা কখনও নিজেদের জানতে পারি না।

সর্বশক্তিমত্তা সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে, তিনিই তার মষ্টিস্বরূপিণী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই জগন্মাতা। তিনিই প্রাণরূপিণী, তিনিই বুদ্ধিরূপিণী, তিনিই প্রেমরূপিণী। তিনি সমগ্র জগতের ভিতরে রয়েছেন, আবার জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি একজন ব্যক্তি—তাঁকে জানা যেতে পারে এবং দেখা যেতে পারে (যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জেনেছিলেন ও দেখেছিলেন)। সেই জগন্মাতার ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আমরা যা ইচ্ছা করি, তাই করতে পারি। তিনি সত্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন।

তিনি যখন ইচ্ছা যে কোনরূপে আমাদের দেখা দিতে পারেন। সেই জগজ্জননীর নাম ও রূপ দুই থাকতে পারে, অথবা রূপ না থেকে শুধু নাম থাকতে পারে। তাঁকে এই সকল বিভিন্ন ভাবে উপাসনা করতে করতে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যেখানে নামরূপ কিছুই নেই, কেবল শুদ্ধ সত্তামাত্র বিরাজিত।

যেমন কোন শরীর-বিশেষের সমুদয় কোষগুলি (cells) মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর; আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব (ব্রহ্ম) তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা 'মা' বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্তস্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সবিশেষ বা সগুণ, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নিগুর্ণ। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরুপাধিক সত্তা থেকেই 'ঈশ্বর, জীব ও জগৎ' এই ত্রিত্বভাব এসেছে। সমস্ত সত্তা—যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক; এইটিই বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব।

সেই জগদম্বার এক কণা—এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খৃষ্ট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে, তারই উপাসনাতে মহত্ত্ব লাভ হয়। যদি শুদ্ধ ভালবাসা চাও, পরম জ্ঞান চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।

[১৮৯৫ খৃঃ, ২রা জুলাই Thousand Island Park-এ প্রদত্ত Inspired Talks (দেব-বাণী) হইতে সংকলিত]

চলার পথে

'যাত্রী'

বছর দু'এক আগেকার কথা। আমরা চারজন যাত্রী পথপ্রদর্শক দলীপকে নিয়ে 'গোমুখ' গিয়েছিলাম। 'গঙ্গোত্রী' থেকে 'গোমুখ'—দূরত্ব এমন কিছু নয়। তবে ঐ দুর্গম গিরিবর্ত্মে, পথের রেখাহীন বরফ ও উপলখণ্ডের উপর, শিশুর প্রথম চলতে শেখার ভঙ্গীতে টলতে টলতে, যাতায়াতের চৌত্রিশ মাইল পথটুকুকেই দীর্ঘতর ব'লে মনে হয়। এই জনপদহীন নির্জন পথে বিপত্তিও আছে অনেক। তবুও মন বাধা মানে না—মনের মায়াবী ঘোড়াটা আমাদের ক্লান্ত দেহটাকে কি এক যাদুকরী শক্তিতে ভুলিয়ে ঐ দুর্লঙ্ঘ্যকে একদিন সত্যসত্যই পার ক'রে নিয়ে গেল।

আমরা গোমুখের দিকে চলেছি। দু-পাশে বরফঢাকা পাহাড়—এমন কিছু উঁচু নয়। পায়ের নীচেও অনেক জায়গায় বরফ জমেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে কোথাও রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের শিহরণ নেই; নেই কোন বিশাল বন্যপাদপের অনিচ্ছুক আলোড়ন। কেবল একপাশে, অনাদি-কালের রসনির্ঝরিণী পূতসলিলা গঙ্গা সাগরাভিমুখে বয়ে চলেছেন। কবে যে মহাদেবের জটা থেকে বেরিয়েছিলেন এই জাহ্নবী—কে জানে? কিন্তু আজও তাঁর সেই চলার গতির দুর্বার আবেগ প্রশমিত হ'ল না। আজও তাঁর তেমনি চপল, চটুল, উতলা ভঙ্গী—তেমনি শব্দায়িত উচ্ছল বেগ। মনে হয় 'চরৈবেতি'-মন্ত্র-সাধনার তন্ময়তা আজও তাঁর জীবনে সেই প্রথম নেবে-আসা-দিনটির মতই অটুট প্রতিজ্ঞায় একই রকম থেকে গেল।

বেলা দুটোর সময় গঙ্গোত্রী থেকে বেরিয়েছিলাম। আষাঢ়ের সূর্য তখনও মাথার উপর উজ্জ্বল। খানিক এগিয়েই এক জনকোলাহলশূন্যস্থানে এসে পড়লাম। নিস্তব্ধতার সে কি মহান্ রূপ! এত বড় জনহীন শূন্যতা জীবনে আর কোথাও দেখিনি। চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। একটু পরেই অস্তগামী সূর্যের বিলম্বিত রঙ তুহিনমণ্ডিত পর্বত-তরঙ্গের গায়ে অপূর্ব বর্ণচ্ছটা সৃষ্টি ক'রল। আমরা তখন পথের মাঝে 'চীর-বাসা'য় পৌঁছে গেছি। 'চীর-বাসা' একটা বসতি নয়, কেবল একটি পাথরের বাড়ি। উপরটা কাঠের মোটা তক্তা দিয়ে ঢাকা। একজন পাঞ্জাবী 'নাগা' সাধু তখন ছিলেন ওখানে। তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেশ 'তেজী' চা খাওয়া'লেন। আগুনের পাশে বসে শুনলাম তাঁর কাছে গোমুখের অনেক কথা। বললেন—দলীপ সঙ্গে আছে, তাই ভয় নেই। এ-ধারের উঁচু পাহাড় পেরিয়ে বিখ্যাত তেনজিং-এর সঙ্গে ও এ-সব দিকে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছে—তাই এ-দিকের সবটাই ওর নখদর্পণে। দলীপ না থাকলে অন্য কেউ হয়তো কিছু দূরে, উত্তরের বরফ থেকে বেরিয়ে-আসা একটা বড় স্রোতস্বিনীর ধারাকেই 'গোমুখ' ব'লে দেখিয়ে দিত; এই ভাবে 'নকল' গোমুখও অনেকেই দেখে ফিরেছেন। আপনারা ঐ নকল গোমুখকে ডাইনে রেখে, আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলেই 'আসল' গোমুখ দেখতে পাবেন।

'চীর-বাসা'য় রাত্রি কাটাচ্ছি। বেশ জ্যোৎস্না-রাত। কেমন বাধাহীন আলোকময় আকাশ। চাঁদের আলোর দ্যুতি বরফের গায়ে লেগে জায়গাটাকে আরো রহস্যময় ক'রে তুলেছে।

মধ্যাহ্নের স্পষ্ট আলোকে যার ছিল এক রূপ, এই বিজন রাতে তারই হয়েছে রূপান্তর। ওধারে শীতের হাওয়া আর একটু তীব্র হ'য়ে উঠল। হৃদয়ের মধ্যে তখন নতুন মাধুর্য কেমন এক শান্ত পরিপূর্ণতায় ভরা। হিমালয় যে কি অপূর্ব সুন্দর, তা আর কখনও এমন গভীর ভাবে বুঝিনি!

ভোর হবার অনেক আগেই উঠে পড়েছি আমরা। সেই জ্যোৎস্না-হসিত রাতের শেষে ওখান থেকে বেরিয়ে উত্তরমুখে পা চালিয়ে দেওয়া গেল। দূরের আবছায়া পাথরের বড় বড় টুকরোগুলো নিঃশব্দে আমাদের চারপাশে এসে ভিড় জমায়। গঙ্গার কল-কলোচ্ছ্বাস দূর থেকে ভেসে আসে। আমরা এগিয়ে চলি। মনের মাঝে এক অজানা উল্লাস থেকে থেকে উথলে ওঠে—একটা অস্পষ্ট আকুলতাও মনটাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

তখনও সম্পূর্ণ আলোক জাগেনি। কেবল পূর্বদিকটা গাঢ় অন্ধকার থেকে একটু মুক্তি পেয়েছে মাত্র। পথে হঠাৎ দলীপ থমকে দাঁড়ায়; তার ঠিক পেছনে আমি, আমার পেছনে অন্যেরা। দলীপের আঙুলের নির্দেশাভিমুখী হয়ে ওকি দেখলাম! আমাদের হাত দশেক দূরেই হিমালয়ের বিরাট লাল ভালুক! ঐ নিষ্ঠুর আগন্তুকের মরণঘাতী প্রতীক্ষায় আমরা সকলেই তখন নীরব। তার পর, কি জানি কেন, ভালুকটা আমাদের ছেড়ে ধীরে ধীরে পাহাড়ে উঠে গিয়ে আবার একবার ঘুরে কিছুক্ষণ আমাদের দেখে নিল। মনে হয়, তার গায়ের গৈরিক রঙ আমাদের পরণের গেরুয়ার সঙ্গে মিলে যাওয়াতেই এ-যাত্রা সে আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল। তা না হ'লে ঐ ভীষণ হিংস্র ভালুক এ-ভাবে তার শিকার ছেড়ে যেত না—অন্ততঃ দলীপের মত তাই। সেদিনের ঐ রোমাঞ্চকর ঊষাটিকে জীবনে ভুলতে পারব না। আমাদের জীবনে গতানুগতিকতার মধ্যে ঐ বৈচিত্র্যের পরশে চোখ দুটি আজও স্বপ্ন দেখছে। দূরে ঐ তুষার-ঢাকা প্রান্তরের কয়েকটি পত্রহীন ভূর্জপত্রের গাছ—আজও বোধ হয় আমাদের সে অভিজ্ঞতা ভোলেনি।

আরো এগিয়ে চললাম। নির্জন তুষারময় সুখসুপ্ত প্রান্তরে সূর্য উঠল। এই ঠাণ্ডার রাজত্বে সূর্যালোকে কেমন এক মমতা জড়ানো। রবিস্পর্শে কুয়াসার শেষ রেখাটির কোন চিহ্নও আর দিক্-প্রান্তে রইল না। মাথার উপর ঘন নীল আনন্দের আকাশ তখন অবারিত। দূরে তুহিন-শৃঙ্গে রঙের সমারোহ তখনও কিন্তু শেষ হয়নি। আমরা 'তখন 'নকল' গোমুখকে ডাইনে ফেলে এগিয়ে চলেছি 'আসল' গোমুখের দর্শনাশায়।

আবার খরস্রোতা গঙ্গার সুমুখে এসে পড়লাম। নদীর ফেনিল জল রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করছে। সুন্দর শুভ্র ফেনময় দুগ্ধস্রোতের কেমন এক দুর্বার গতি। নদীর এই প্রসন্ন প্রাণধারার স্পন্দন একমাত্র আপন অন্তরেই অনুভব করা চলে। এমন সময়ে সুমুখে গোমুখ চোখে পড়ল। সমস্ত অন্তরটা তখন এক আবেগময় পুলকোচ্ছ্বাসে ভরপুর। দেখলাম—উত্তরে—আমাদের ১০।১৫ হাত সুমুখেই, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী, সত্তর-আশি ফুট উচ্চ হিমবাহের ভীষণ চাপে ঐ বিরাট তুষার প্রাচীরের নীচেকার বরফ কিছুটা গলে গিয়ে একটি ১৫।১৬ ফুট উঁচু খিলানের মত গহ্বর সৃষ্টি করেছে। আর সেই গহ্বর থেকেই সূর্যহসিত 'খড়ি' গোলা জলোচ্ছ্বাস দুর্জয় গতিতে বেরিয়ে আসছে;—প্রমত্তা গঙ্গার সে কি ভয়াবহ গর্জন ও মাতন! মনে পড়ল—'ভয়ানাং ভয়ং; ভীষণং ভীষণানাং; গতিঃ প্রাণিনাং, পাবনং পাবনানাম্'। এই অপূর্ব দৃশ্য সেদিন আমাদের মনে কেমন এক নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। মন ও ইন্দ্রিয়গুলি তখন অন্তর্মুখী—বহির্জগৎ তখন অস্পষ্ট

ছায়াময়। মনের এ অবস্থায় সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা শক্ত; শুধু এক গভীর প্রশান্তিতে তখন আমরা এক অমৃতাস্বাদনে ব্যাপৃত। মনে হয়, ঐ স্তব্ধ মহান্ মুহূর্তে কথা বললেও ঐ দৃশ্যের ধ্যান ভেঙে যেতে পারত। দৈনন্দিন পৃথিবীর বাস্তবতা ছাড়িয়ে, এমন কি নিজেদের জৈব সত্তা ভুলেও তখন এক অথৈ অজানায় আমরা সকলেই হৃদয় মেলেছি।

কিছুক্ষণ সেই মাধুর্যের পরিবেশের মধ্যে কাটিয়ে আমরা ফিরলাম। ফিরলাম জীবনের এক মধুরতম আনন্দের পরিবেশ থেকে। ফিরবার পথে ঘণ্টাখানেক 'চীর-বাসা'য় কাটিয়ে আমরা সেই দিনই সন্ধ্যায় গঙ্গোত্রীতে চলে এলাম। মনে তখনও ভাসছে গোমুখের ছবি। সব ছেড়ে চললাম। পেছনে রইল পর্বত-তরঙ্গের সুবিস্তীর্ণ উচ্চ প্রান্তর, আর সুরভিত স্মৃতির স্বপ্নালু সম্বল। শুনেছি—স্মৃতি কথক নয়, সে চিত্রশিল্পী; তাই সে চির-প্রবহমান জীবনের একটি অপূর্ব অমৃতময় দৃশ্যকে মনের মণি-কোঠায় আঁকড়ে রেখেছে—দেহ-মনকে এক অপূর্ব সুধারসে কানায় কানায় ভরিয়ে দিয়ে।

চল পথিক, গোমুখে চল। গঙ্গার উৎসমুখের চিরন্তন 'হর হর বোম্' শুনবে চল। দেখবে চল, সেই আধ্যাত্মিক সান্নিধ্যকে—যেখানে পৃথিবীর লৌহ-কারাগার নেই, নেই হৃদয়ের ক্লেদ-কালিমাও। অপূর্ব আনন্দালোকে যেখানকার সব কিছুই উদ্ভাসিত; চল, চল সেই আলোক-জীবনে। আর দেরী নয়, শীঘ্র চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

বিজয়া-প্রণতি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

মা তো আমার যায় নি চ'লে,
ভরা সকল ঠাঁই!
জীবন-মাঝে জীবন সে যে—
মা মোর কোথা নাই!

আসা-যাওয়া এ শুধু ছল,
এ যে অভিনয়,
দিশি দিশি দিবা নিশি
ঝরে বরাভয়!

শরণ দিতে অশরণে
মায়ের চরণ-তল
রাঙিয়ে দেছে বুকে বুকে
প্রাণের শতদল!

সবার কাছে আজ বিজয়া—
মাকে আমার পাই,
সবার পায়ে তাই পাঠানু
প্রাণের প্রণাম তাই!

স্বামীজীর স্মৃতি

[শ্রাবণ সংখ্যার পর]

ভক্ত মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়া

স্বামীজী আমাকে বলিলেন, 'আমার কাছে যা জানতে ইচ্ছে করিস্, আমাকে জিগেস্ কর।' আমি বলিলাম, 'ইংলণ্ডে আপনি 'মায়া' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা অনেক বার পড়েছি, কিন্তু মায়া কি বুঝতে পারিনি।' 'কিসে পড়লি ?' 'Indian Mirror এ।'

'দেখ্! মায়া কি তা বোঝা এক, আর মায়া অনুভব করা আর এক রকম।' আমি বলিলাম, 'আপনার কাছে মায়ার রহস্যের কথা বুঝতে চাই।' কিছুক্ষণ তিনি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ও থাক! অন্য কিছু জানতে চাস্ তো বল্।' আমি বলিলাম, 'আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বোঝালেও যদি মায়া কি, না বুঝতে পারি, তাহলে জানব এ জন্মে ও রহস্য আর বোঝা হবে না।'

অতঃপর স্বামীজী মায়ার তাৎপর্য বুঝাইতে লাগিলেন। বহুক্ষণ তিনি অনর্গল যাহা বলিয়া গেলেন, তাহা লিখিতে পারিলে একটি বহুমূল্য প্রবন্ধ হইত। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয়-রাজ্য ছাড়াইয়া এক অতি সূক্ষ্ম সত্তা অনুভব করিল। আমার চোখের সামনে ঘরবাড়ী সবই প্রবলবেগে কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত দৃশ্য জগৎ এক মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল। পুনরায় এই জগতে মন ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু একটা স্বপ্নের ঘোর যেন লাগিয়া রহিল।

এই অনুভূতির পরক্ষণেই আমার ব্যক্তিত্বেরও যেন পরিবর্তন অনুভব করিলাম। স্বামীজীর প্রতি আমার যে ভয় ও সঙ্কোচ ছিল, তাহাও যেন কাটিয়া গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হইতেছিল—এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা সর্বত্র বর্তমান। স্বামীজী, এই মঠ প্রভৃতি এবং আমি—সব যেন তাহার মধ্যে এক অংশ।

তখন আমি বলিলাম, 'স্বামীজী! আপনিও তো মায়ার মধ্যেই রয়েছেন। আপনার মঠ, স্কুল, দরিদ্রসেবা—এ সবও তো মায়া। আপনার এ সব করবার কি দরকার ?'

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ! তুই ঠিক বলেছিস্! আমি মায়ার মধ্যেই রয়েছি। তবে আমি মায়ার সঙ্গে খেলা করছি। যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে—এই খেলা ছেড়ে দেব। তোর মায়ার সঙ্গে খেলা ভাল না লাগে, তুই পাহাড়ে চলে যা। সেখানে কোন গুহায় বসে তপস্যা করগে।'

কর্ম করবার মূলসূত্রটি সেদিন বুঝিতে পারিলাম। 'ভগবানকে জেনে কর্ম করলে সেটা হয় লীলা – সেটা হয় আনন্দের জীবন। যতক্ষণ সত্য বস্তু জানা নেই, ততক্ষণ মানুষের তপস্যা ও ত্যাগ সহায়ে বিচার ও ধ্যান প্রয়োজন।'

স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম এবং তিনিও স্থির অবিচল শিবস্বরূপ হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

প্রসাদ

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হইয়া গিয়াছিল। আসন ও পাতা করা হইয়া গিয়াছিল। স্বামীজীর আমার অপেক্ষায় সকলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এইবার সকলে পরিবেশনের ব্যবস্থা করিলেন।

ইতিমধ্যে স্বামীজী ভাণ্ডার-ঘরের দিকে যাইয়া একটি আপেল ও একটি ছুরি চাহিয়া লইলেন। আপেলটি নিজেই ছাড়াইতে লাগিলেন এবং বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে এক টুকরা কাটিয়া আমাকে দিলেন। পরে এক টুকরা নিজের মুখে দিলেন। এইরূপে আমি তাঁহার হাতে প্রথম প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ যে মনের প্রসন্নতার প্রকাশ তাহা সেদিন বুঝিলাম। যে তত্ত্ববস্তু অতি গূঢ় রহস্যাবৃত, তাহা আধিকারিক পুরুষেরা ইচ্ছামাত্র এই ফলের মতই বিলাইতে সক্ষম, আবার তাঁহাদের প্রেম ও আশীর্বাদ এই স্থূল অন্ন হইয়া আমাদের চিত্তপ্রসাদ আনিতে পারে, তাহাও পরম সত্য বলিয়া বুঝিলাম।

ফলপ্রসাদ পাইলাম, ইচ্ছাময় যেন মনের ইচ্ছাটাই পূর্ণ করিলেন। তখন লোভ আরও বাড়িয়া গেল; মনে হইল যদি স্বামীজী অন্নপ্রসাদ দিতেন, তাহা হইলে জীবন সার্থক হইত।

পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সময় স্বামীজী যেখানে বসিয়া ছিলেন, তাহারই অন্য আর এক দিকে—কিছু দূরে আমি ছিলাম। ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ স্বামীজীর পাতে দেওয়া হইল এবং পরে অন্য সকলের পাতায় একজন ব্রহ্মচারী তাহা পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অন্য আর এক জন ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া স্বামীজী তাহার হাতে তাঁহার পাত হইতে কিছু অন্ন তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'এটা মন্মথকে দিয়ে আয়।' ঠাকুরের লীলাসহচরগণ অন্তর্যামী, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইলাম।

বিচারপ্রবণ মনের স্বভাব হইল সংশয়। ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবৎ-আশীর্বাদ সহজেই পাইয়া থাকেন। আমার মন ভাবপ্রবণ ছিল না, এইজন্য সংশয় তোলাই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু সেই প্রসাদের গুণে আমার সংশয়ধর্মী মন নিরস্ত হইল এবং আমি অকপটে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

মঠের নিয়মাবলী

দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজনের পর সকলের কিছুক্ষণ বিশ্রামের সময়। স্বামীজী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিশ্রাম করিবার সময় তাঁহার ছিল না; মঠের নিয়মাবলী লিখাইতে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার শরীর বেশী দিন থাকিবে না। তাঁহার অবর্তমানে মঠের পরিচালনা যেভাবে হইবে, তাহার একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম করিয়া যাইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। মঠ ও মিশন যে সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ছড়াইবে, তাহা তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই ভাব সমাজে পরিবেশনের জন্য যে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রয়োজন, সেইরূপ কতকগুলি জীবনও তিনি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাবীকালে তাহা কিভাবে অনুরূপ গতিশীল থাকিবে, তাহারও একটা আভাস তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল এবং তদনুযায়ী তিনি মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন।

দীক্ষা

সেই দিন আমি মঠে থাকিয়া গেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সকলে যখন স্বামীজীকে প্রণাম করিতে গেলেন, তাহার কিছুক্ষণ পরে আমিও উপস্থিত হইলাম। স্বামীজী নিজ কক্ষের বাহিরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। চোখ দুটি ঈষৎ ফোলা, যেন ভাবের নেশায় ভরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম, মনে হইল ঠাকুরই যেন দাঁড়াইয়া আছেন। কথা বলিলেন (ঈষৎ জড়াইয়া, যেন মাতাল হইয়াছেন), 'যা তুই গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আয়। শীগ্‌গির আয়।'

কৃপা যে করিবেন, ইহা তাহারই সূচনা। দৌড়াইয়াই চলিয়া গেলাম। সত্য সত্যই একটি ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিলাম। ঠাকুরের ভাব না হইলে তিনি দীক্ষা দিতেন না। মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেনও মাত্র কয়েকজনকে। আমার সেই সৌভাগ্য উপস্থিত, ইহা যেন অকল্পনীয়।

তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি একটি সোফায় চিৎভাবে শুইয়া আছেন। একটি হাত এলাইয়া দিয়াছেন, বলিলেন, 'আমায় ধর্। আমার হাতটা ধ'রে থাক্।' আমার দক্ষিণ হস্তে তাঁহার ডান হাতের কব্জির কাছে চাপিয়া ধরিলাম। সেইখানেই মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—তাঁহার কব্জি বেশ চওড়া। মাথায় তিনি প্রায় আমারই মতন ছিলেন এবং আমার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল—একটু পালোয়ানী ধরনের, খাইতেও পারিতাম প্রচুর—কিন্তু দেখিলাম, আমার আঙুলে তাঁহার হাতের বেড় পাইলাম না। রোগা হইয়াছিলেন, তথাপি হাতের কব্জি বেশ চওড়া ছিল। তাই তাঁহাকে ধরিলাম বটে—কিন্তু তবু ফাঁক রহিয়াই গেল।

স্বামীজী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, কতক্ষণ যে চলিয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কারণ ক্রমে আমার মনও আচ্ছন্ন হইয়া গেল, কালের ও স্থানের মাপ করিতে ভুলিয়া গেলাম। তাহার পর স্বামীজী সোফা হইতে উঠিয়া গালিচার উপর বসিলেন। আমাকেও সামনের অন্য একটি গালিচায় বসিতে বলিয়া বলিলেন, 'স্বপ্নে তুই মায়ের কুমারী-মূর্তি দেখেছিস্, এর পর তুই মায়ের—এই ষোড়শী মূর্তি ধ্যান করিস্।'

আমার এই স্বপ্নের কথা আমি কাহাকেও বলি নাই। সাতটি কুমারী-মূর্তি দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেকের মাথায় স্বর্ণ মুকুট, হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ী সব মূর্তি—সালঙ্কারা এবং পরমাসুন্দরী। ইহারা একের পর একজন করিয়া সম্মুখে আসিলেন এবং পাশ দিয়া দূরে চলিয়া গেলেন।

স্বামীজী বলিয়া চলিলেন, 'এর কিছু পরে তুই স্বপ্নে মহাদেবকে দেখিস্, ত্রিশূল হাতে। তিনি তোকে এই—মন্ত্র দেন। সেই অবধি তুই ওটাই জপ করিস্।'

প্রথম স্বপ্নের কয়েক বৎসর পর আমি স্বপ্নে ঐরূপ মন্ত্র পাইয়াছিলাম, এবং জপও করিতাম। কিন্তু একমাত্র আমি ছাড়া আর কেহই সে কথা জানিত না। স্বামীজীর কথা শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইলাম। আমরা যেমন আরশিতে মুখ দেখিতে পাই, স্বামীজী সেইরূপ মনগুলিকে দেখিতে পাইতেন। এইরূপ অন্তর্যামিত্ব যাঁহার, তাঁহাকে ভগবান ছাড়া আর কি বলিব?

ইহার পর তিনি আমাকে বলিলেন, 'এখন তোর মন্ত্র এই—।' ঐ বীজমন্ত্র উচ্চকণ্ঠে তিন বার আমাকে শুনাইয়া বলিলেন, 'এবার থেকে এই—তোর ইষ্ট মূর্তি।' মানস চক্ষে দেখিতে পাইলাম সেই মূর্তি। দীক্ষা ও সাধনার ক্রম সম্পর্কে তখন কিছু উপদেশ দিলেন, তাহা একান্ত ব্যক্তিগত। গুরুপূজার মন্ত্র ও ধ্যান-স্থান দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'মানস প্রণামের পর গুরুর স্পষ্ট মূর্তি ধ্যান করতে হয়। সহস্রারই প্রকৃষ্ট স্থান। পরে ইষ্টের মন্ত্র জপ করতে করতে হৃদয়ে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। প্রথমে পা থেকে মানসপূজা আরম্ভ করতে হয়। ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে মুখ পর্যন্ত ধ্যান করতে হয়। তবে ধ্যানের গভীরতায় হাত বা পা কিছুই থাকে না। মূর্তির চিন্তা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নির্বিকল্প সমাধি হয় না। কিন্তু একটির পর একটি ধ'রে চলতে হয়। নইলে সুদীর্ঘ সময় লাগতে পারে।'

দীক্ষান্তে আমায় বলিলেন, 'আমার কাছে বসে জপ ও ধ্যান কর্। যত কাজেই ব্যস্ত থাকিস্ না কেন, প্রত্যহ সামান্ত ক্ষণের জন্তও ওটা করিস্।'

মহিমবাবু

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময় মাঝে মাঝে মঠে আসিতেন। স্বামীজী যেমন গুরুভ্রাতাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতেন, মহিমবাবুকেও কতকটা সেইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তিনি সাদা কাপড়ে থাকিতেন, সাধাবণতঃ ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিতেন। তাঁহার গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। স্বামীজীর রঙ আর কোন ভ্রাতা পান নাই। তবে শরীরের গঠন সব ভ্রাতারই এক ধরনের ছিল। স্বামীজীর সহিত মহেন্দ্রবাবুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ মিল ছিল; তাঁহারও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। চোখদুটি তাঁহার ছোট ছিল, তাঁহার নেত্র বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্রদীপ্ত ছিল। স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের সহিত তিনি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, আবার স্বামীজীর শিষ্যদিগের সহিতও আলাপ করিতে ছাড়িতেন না।

'দু নৌকায় পা দিস্ না'

একদিন স্বামীজী আমাকে বলিলেন, 'ভাখ্! দু নৌকায় পা দিস্ নি। যা হয় একটা কর।' হয় বিবাহ ক'রে সংসার করা, নইলে সন্ন্যাস লওয়া—এই দুইটির একটি বাছিয়া লইতে বলিলেন।

আমি ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 'তাড়া নেই! তবে মন স্থির করে নে।'

ইহার এক বৎসর পর আমার বিবাহ হয়।

ভবিষ্যদ্বাণী

'এই শরীর আর কর্ম করবার উপযুক্ত হবে না। এটা ছেড়ে আবার নতুন শরীর নিয়ে আসতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী রয়ে গেল।'

আর একদিন ভাবের মুখে তিনি বলিলেন, 'আমি মুক্তি চাই নে। যতদিন না সব জীবের মুক্তি হবে, ততদিন আমাকে বার বার আসতে হবে।'

চীনের ভবিষ্যৎ

এই সময় চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শক্তিমান দেশগুলি চীনকে ভাগাভাগি করিয়া শোষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। জাপানও তাহাদের দলে ভিড়িল। সেই সময় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত পুরাতন সভ্য একটা দেশ—এই বার কি শেষ হ'য়ে যাবে?' স্বামীজী অল্পকাল চুপ করিয়া রহিলেন; পরে বলিলেন, 'আমি দেখেছি—একটা প্রকাণ্ড হাতীর পেটে একটা বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হ'ল—কিন্তু সেটা একটা সিংহশাবক। এই বাচ্চাটা বড় হবে। তখন নতুন চীন তোয়ের হবে।'

'ভারত স্বাধীন হবে'

ভারত সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণতঃ দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়।'

'কুড়ি বৎসরের মধ্যেই একটা মহাযুদ্ধ হবে; পাশ্চাত্য দেশগুলি যদি materialism (জড়বাদ) না ছাড়ে, তাহলে আবার যুদ্ধ অনিবার্য।'

'স্বাধীন ভারতবর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্যের materialism (জড়বাদ) নেবে। প্রাচীন ঐহিক গৌরবকে নতুন ভারত ম্লান ক'রে দেবে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ উত্তরোত্তর অধ্যাত্মবাদী হবে। তারা জড়বাদের শিখরে পৌঁছে বুঝেছে—জড়ে শান্তি দিতে পারে না।' [ক্রমশঃ]

মানুষের অমরত্ব

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সম্প্রতি-পরলোকগত রাশিয়ান লেখক বোরিস প্যাস্টারন্যাকের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো'র একটি অধ্যায়ে (১৩.৩) মানুষের আত্মা সম্বন্ধে একটি আলোচনা আছে। জনৈক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধাকে উপন্যাসের নায়ক যুরা (ডক্টর জিভাগোর যৌবন-কালের নাম) সান্ত্বনা দিতেছেন। বৃদ্ধা মরিতে ভয় পাইতেছেন, বলিতেছেন, 'একটি দাঁত তুলে ফেলতেই কত ভয় হয়। কিন্তু এ তো আর শুধু দাঁতটি নয়. এ যে আমার যা কিছু সব লয় পেতে বসেছে, আমার জীবনটাকেই উপড়ে ফেলবার উপক্রম।'

যুরা। তা বটে। কিন্তু এও তো ঠিক যে এই বিশ্বজগতে অসংখ্য মূর্তি ও আকারের অনবরত পরিবর্তন ও আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটলেও এক মহান বিরাট প্রাণ-শক্তি সর্বদাই জগৎকে ছেয়ে রয়েছে। এই প্রাণশক্তির কখনো বিলয় হয় না। ক্রমাগত নতুন নতুন দেহের মধ্য দিয়ে সে জন্ম পরিগ্রহ করছে।

বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুর পর আবার কি আমি জন্মাব?

যুরা। মৃত্যু থেকেই তো আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, শুধু লক্ষ্য করেননি, এই যা। আবার মৃত্যু থেকে উঠবেন। সেই এক মহাপ্রাণ যা নব নব আকৃতি পরিগ্রহ করছে, আপনার প্রাণ তো তাতেই এক হ'য়ে রয়েছে। সেই মহাপ্রাণের তো বিনাশ নেই।

বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুকালে আমি যন্ত্রণা অনুভব ক'রব না কি?

যুরা। শরীরের পেশীসমূহের ক্ষয় ঘটলে তারা যন্ত্রণা অনুভব করে কি? অর্থাৎ প্রশ্ন এই, আপনার চেতনার কি দশা হবে? কিন্তু চেতনা-বস্তুটি কি দেখা যাক। দেখুন—কেউ যদি সজ্ঞানে ঘুমুতে চায়, তাহলে তার অনিদ্রা ঘটে। কেউ যদি পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হ'তে চায়, তাহলে তার হজমের নিশ্চিতই ব্যাঘাত হয়। এক কথায় আমাদের 'জ্ঞান' বা চেতনাকে যদি নিজের অভি-মুখে প্রয়োগ করি, তাহলে তা বিষের তুল্য। জ্ঞান বা চেতনা তখনই সার্থক, যখন তা নিজের বাইরে নিয়োজিত হয়। চেতনা যেন একটি আলো, যা সমুখের পথ দেখায়, যাতে আমরা হোঁচট না খাই। এ ঠিক এঞ্জিনের হেড্-লাইটের মতো। হেড্‌লাইটকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দিলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। ওর কাজ হ'ল এঞ্জিনের সমুখের লাইনকে আলোকিত করা।' আমাদের চেতনাও সেইরূপ আমাদের বাইরের জগৎকে আলোকিত ক'রে রাখে।

বৃদ্ধা। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমার সেই চেতনার কি অবস্থা ঘটবে?

যুরা। ঠিক কথা। আপনার চেতনা। কিন্তু 'আপনি' কে? ভেবে দেখুন তো এ পর্যন্ত বরাবর আপনি নিজেকে কোন্ বস্তুটির সঙ্গে 'আমি' ব'লে তাদাত্ম্য অনুভব ক'রে এসেছেন। আপনার পরি-পাক যন্ত্র? লিভার? রক্ত-শিরা-উপশিরাসমূহ? না। যতই পিছনে

তাকিয়ে দেখুন, আপনার স্মৃতিতে দেখতে পাবেন বরাবর আপনার নিজের কোন বহিঃপ্রকাশের সঙ্গে আপনার নিজের তাদাত্ম্যবোধ জড়িয়ে রয়েছে—আপনার নিজের তৈরী কোন জিনিস, আপনার পরিবার বা অপর লোকজন। অতএব আপনার চেতনা বা 'আপনি' হলেন আপনার দেহকেন্দ্রিক কোন সত্তা নয়—অপরের মধ্যে আপনার সত্তা। আপনার চেতনা বরাবর এই সত্যেই বিধৃত হ'য়ে এসেছে—এই সত্যেই আনন্দলাভ ক'রে এসেছে। অপরের মধ্যে আপনি—এই আপনার আত্মা, আপনার অমরত্ব। 'আপনি' বরাবরই অপরের মধ্যে ছিলেন, এখনও রয়েছেন এবং পরেও থাকবেন। অতএব ভয় পাবার তো কিছু নেই।

লেখক বলিতেছেন—এই কথোপকথনের পর রোগিণী অনেক শান্ত বোধ করিয়াছিলেন। যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, শরীর ও মনে একটি স্থিরতা লক্ষিত হইয়াছিল।

সম্ভবতঃ রোগিণীর মনে যুবা-কথিত আত্ম-দৃষ্টি একটি গভীর ছাপ দিয়াছিল। জীবন-প্রান্তে মানুষের দেহকেন্দ্রিক আমিত্ব নিজের ব্যর্থ আস্ফালন ও ক্ষুদ্রতায় কখন কখন বিরক্ত হইয়া উঠে এবং সেই অনাসক্তির মুহূর্তে যদি কোন বৃহত্তর সত্যের পরিচয় সামনে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মানুষের 'আমি' উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে অবলম্বন করিতে চায়। বৃদ্ধা তাহাই করিয়াছিলেন। এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহার চেতনা—আমি-বোধ দেহ-মনের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জীবন অর্থে তাঁহার দেহের জীবন, দেহের মৃত্যু অর্থে তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলয়, তাই তাঁহার ভয় হইতেছিল। যুবা তাঁহাকে বুঝাইলেন—মানুষের চেতনা দেহকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বকেন্দ্রিক। মানুষের চেতনা অখিল জগতের সব কিছুতে ছড়াইয়া আছে। একটি দেহ ধ্বংস হইলে বিশ্ব-চেতনা হইতে সেই দেহটুকুই বাদ যায়, কিন্তু বাকী বৃহৎ জগৎ তো পড়িয়া থাকে। মানুষের প্রকৃত আমিত্ব অর্থাৎ বিশ্বচেতনা সেই অবশিষ্ট জগৎকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সে পূর্বেও যেমন সারা জগতে ছড়াইয়া ছিল, দেহের মৃত্যুর পরও সেইরূপ থাকিবে। অতএব মৃত্যুর পর আমি অন্ধকারে ডুবিয়া যাইব—এই ধারণা মিথ্যা। আমি কোন কালেই একটি দেহে আবদ্ধ ছিলাম না, সারা বিশ্বেই ছড়াইয়া ছিলাম, দেহের মৃত্যুর পরেও সেইরূপ থাকিব—ইহাই সত্যদৃষ্টি। যে কোন ভাবে হউক, বৃদ্ধার মন আমিত্বের এই বিশ্ব-ব্যাপ্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়াছিল এবং সেইজন্য কথঞ্চিৎ শান্তিও লাভ করিয়াছিল।

ইহা গেল আমি-বোধ বা আত্মার বৃহত্ত্বের পর্যালোচনা দ্বারা সান্ত্বনা। যুবা জীবন বা প্রাণশক্তির অসীমতার কথাও বৃদ্ধাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যতক্ষণ আমরা বাঁচিয়া আছি, ততক্ষণ আমরা দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির ক্রিয়া অনুভব করি। কিন্তু এই প্রাণশক্তি তো শুধু আমার দেহেই সীমাবদ্ধ নয়। অসংখ্য প্রাণি-দেহে সেই একই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হইতেছে। যদি আমি সেই মহাপ্রাণের সহিত ঐক্য অনুভব করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নিজের দেহে প্রাণস্পন্দন থামিয়া গেলেও ভীত হইব না। জানিব যে অসংখ্য অপরপ্রাণিদেহে মহাপ্রাণরূপে আমার অস্তিত্ব এবং ক্রিয়ার কখনও অবসান নাই।

প্রাণের অসীমতা এবং চেতনা বা জ্ঞানের বিশ্বব্যাপ্তি—এই দুইটি সত্যের পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্যাস্টারন্যাক তাঁহার উপন্যাসের নায়ককে দিয়া মানুষের অমরত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন

এবং ঐ অমরত্বের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া মৃত্যুভয় জয় করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বার্গসঁ এবং আরও কতিপয় পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মহাপ্রাণের কথা বলিয়াছেন। প্রাণ সম্বন্ধে প্যাস্টারন্যাকের আলোচনা তাঁহাদের মতের অনুরূপ। তবে মানুষের চেতনা বা আমি-বোধ সম্পর্কে প্যাস্টারন্যাকের অভিমত পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় অনেকটা নূতন। মন লইয়া পাশ্চাত্ত্যে অনেক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু উপনিষদের ভাষায় 'মনেরও মন'—অর্থাৎ মানুষের চেতনা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য একেবারেই উদাসীন। ইহার কারণ এই যে, পাশ্চাত্ত্য-মনীষা প্রধানতঃ বহির্মুখ। রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় বিশ্বজগৎ এত বিপুলভাবে তাহার হৃদয়মনবুদ্ধিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে যে, উহাকে সর্বদা পুরোভাগে রাখিয়া তবে অন্য যাহা কিছু করিবার করিতে সে অগ্রসর হয়। সমাজ, শিক্ষা, কলা, সাহিত্য, নীতি, ধর্ম, দর্শন—সব কিছুরই সুর পাশ্চাত্ত্যে ইন্দ্রিয়বেদ্যজগৎ-কেন্দ্রিক। ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে স্বয়ংপ্রমাণ। ইহাকে যে অস্বীকার করে সে বাতুল। তাই দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে পৃথক মানুষের চৈতন্যস্বরূপের কথা পাশ্চাত্ত্য মনীষার নিকট অবান্তর, অলীক, অপ্রয়োজনীয়। যে জাতি বা সংস্কৃতি অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা বলে, অতীন্দ্রিয় সত্যকে ইন্দ্রিয়বেদ্য সত্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দেয় পাশ্চাত্ত্য-মনীষা তাহাকে নির্মমভাবে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

তাই প্যাস্টারন্যাকের লেখায় মানুষের চেতনা বা আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া কিছু বিস্ময় জাগে। অবশ্য এই আলোচনা 'ডক্টর জিভাগো'র ৫৬০ পৃষ্ঠার মাত্র দুই পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ। উহা মূল উপন্যাসের সহিত অতি সামান্যই সংশ্লিষ্ট। উপন্যাসের নায়ক যুরার চরিত্রের একটি দিক দেখাইবার জন্যই বোধ করি লেখক উহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক চায়ের আসরের কথোপকথনের চেয়ে উহাতে বেশী মনোযোগ দিবেন না—মনে হয়।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটুকুতে মানুষের চেতনা সম্বন্ধে প্যাস্টারন্যাক একটি বৈপ্লবিক অভিনবতার (পাশ্চাত্ত্য-দৃষ্টিভঙ্গীর নিকট) পরিচয় দিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করা উচিত। অবশ্য ইহাও সত্য যে তাঁহার 'আত্মবাদ' বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। মানুষের চেতনা সর্বদাই বহির্বিষয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং ঐ চেতনাকে অন্তর্মুখ করিলে মানুষের সর্বনাশ হয় (এঞ্জিনের হেড্-লাইটের উপমায়), ইহা বালসুলভ কবিকল্পনা। চেতনা দেহে সীমাবদ্ধ নয়, সারা বিশ্বে ছড়াইয়া আছে ; ইহা উপনিষদ্‌ও বলেন, কিন্তু ইহাই চেতনার সমগ্র পরিচয় নয়। বেদের 'পুরুষসূক্ত' বলেন, 'ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ'—চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার যদি চারিটি অংশ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ চারি অংশের তিনটিই সৃষ্টির ঊর্ধ্বে বর্তমান, শুধু এক অংশ অখিল বিশ্বচরাচরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আত্ম-চৈতন্য জগৎ ছাড়াও থাকিতে পারেন। বিশ্বজগতে চৈতন্য ওতপ্রোত, কিন্তু বিশ্বজগতের বাহিরেও চৈতন্য বর্তমান। মানবাত্মা তাহার ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ অপেক্ষা অনন্তগুণে বড়।

জগদতীত চৈতন্যের পরিচয় লাভ করিতে হইলে চেতনাকে অন্তর্মুখ করিতে হইবে, ইহাই উপনিষদের শিক্ষা। কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন, 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃপ্রসাদাৎ মহিমানমাত্মনঃ॥' —অণু হইতে অণু, বৃহৎ হইতে বৃহত্তর চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা মানুষের হৃদয়-গুহায় বিরাজ

করিতেছেন। বাসনা জয় করিয়া, ইন্দ্রিয়-নিচয়কে প্রশমিত করিয়া সেই আত্মাকে দর্শন করা যায়, দর্শন করিলে সমস্ত দুঃখশোক হইতে নিষ্কৃতি মিলে। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, একনিষ্ঠ ধ্যান দ্বারা অন্তরের অন্তরে আত্মচৈতন্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। বার বার এইরূপ সাক্ষাৎকারের ফলে আত্মপ্রতীতি স্থায়ী হয়। তখন যোগী দেখিতে পান—আত্মা শুধু অন্তরে নন্, তিনি বাহিরেও সর্বভূতে, সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত।

সারা জীবনে মানুষ অসংখ্য আকর্ষণ ও কাজে দিশাহারা হইয়া থাকে। নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে—নিজের গভীরতম সত্য সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার অবসর নাই, সুযোগও নাই। তাহারই মধ্যে হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া হাজির হয়। তখন মানুষের একটু হুঁশ আসে—তাই তো মৃত্যুই কি জীবনের শেষ? মরিবার সঙ্গে সঙ্গে কি আমি শেষ হইয়া যাইব—না মরিবার পরও কোথাও কোনরূপে থাকিব? এই প্রশ্নের একটি নিঃসন্দিগ্ধ উত্তরের জন্য সে ব্যাকুল হয়। 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের বৃদ্ধাটি এইরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। উপন্যাসের নায়ক যুবার মুখে মানুষের আত্মার অমরত্বের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

সান্ত্বনা দিতে পরিশ্রম করিতে হয় না, পয়সাও লাগে না। তাই মানুষের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি সান্ত্বনাবাক্য রাশীকৃত পুস্তকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের নায়ক যুবার সান্ত্বনা-বাক্য উহার একটি নিদর্শন মাত্র। কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে কি? উপনিষদ্ বলেন—ভিজে না। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ—পুঁথি পড়িয়া, বচন ঝাড়িয়া আত্মাকে লাভ করা যায় না। আত্মবিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ঘাম ফেলিতে হয়, রক্ত দিতে হয়। কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত কয়জন?

উপনিষদ্ বলেন—অমৃতত্ব মানুষের চিরন্তন সম্পত্তি। অপেক্ষা শুধু ঐ সম্পত্তি লাভের জন্য চেষ্টা করা—ঐ সম্পত্তিকে করতলগত করা। মানুষ নিজেকে চিনিতে পারিলে এক মুহূর্তে সেই সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। তখনই সে অমর হয়। সে অমরত্ব শুধু একটা বিশ্বাস নয়, পরিকল্পনা নয়, দার্শনিক মতবাদ নয়। উহা নিঃসন্দিগ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ, প্রত্যক্ষ ভাস্বর সত্য।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥ কঠোপনিষৎ ১।২।২৩

কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন বা শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, ধারণাশক্তি কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও আত্মাকে লাভ করা যায় না। ঐকান্তিকতার সহিত আত্মজ্ঞানলাভে প্রয়াসী সাধকের শুদ্ধ অন্তঃকরণে স্ব-স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অন্তর্যামিরূপে বা আচার্যরূপে আত্মা যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তাঁহারই নিকট আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

অগ্নিগর্ভ বাণী

[নবপর্যায়]

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী

'…নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়-জঙ্গল; পাহাড়-পর্বত থেকে।'—**স্বামী বিবেকানন্দ**

ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হ'তে আসবে, তার আভাস দিতে গিয়ে স্বামীজী উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এই যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর কোন উল্লেখ তাতে নেই। তিনি ঘুণাক্ষরেও এমন কথা বলেননি যে বেরুক নূতন ভারত স্কুল-কলেজ থেকে, 'শিক্ষিত' সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে। এই অনুল্লেখ কি ইচ্ছাকৃত? আর যদি তাই হয়, তবে নিশ্চয়ই এর কোন তাৎপর্য আছে। তিনি ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারে জন্মেছিলেন, নিজে স্কুল-কলেজে পড়েছিলেন, ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকেরাই তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিল এবং এখনও তারাই তাঁর বাণী বহন করছে, তাঁর আদর্শকে রূপায়ণের চেষ্টা করছে; তবুও কেন ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর উপর এত অনাস্থা? আর চাষাভূষো, জেলে-মালা, মুচি-মেথরের উপর এত ভরসা, এত নির্ভরশীলতা—তাদেরই এত জয়গান? ভবিষ্যৎ ভারতের তারাই কেন স্রষ্টা বলে অভিহিত, অথচ শিক্ষিত শ্রেণীর নামগন্ধ নেই কেন? এটা ভাববার কথা।

ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্পর্কে কি মনোভাব তিনি পোষণ করতেন, তার পরিচয় স্বামীজীর অনেক বক্তৃতায় এবং উক্তিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে উন্নত চরিত্রের অনেক লোক দেখা যায় বটে, কিন্তু স্বামীজীর মতে ইংরেজী শিক্ষার সাধারণ ফল চরিত্রগঠনের এবং জাতিগঠনের দিক দিয়ে খুব ইষ্টজনক হয়নি। রামনাদ-অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

ভোগচেষ্টায় কিরূপ সফলতা লাভ করা যায়,—আমরা পাশ্চাত্য জাতির নিকট তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিখিতে পারি। কিন্তু অতি সাবধানে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাকে অতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আজকাল আমরা যে সকল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের প্রায় কাহারও জীবন বড় আশাপ্রদ নহে। আমাদের একদিকে প্রাচীন হিন্দুসমাজ, অপরদিকে আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতা। যদি আমায় কেহ এই দুটির মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করিয়া লইতে বলে, আমি প্রাচীন হিন্দুসমাজকেই পছন্দ করিব। কারণ সেকেলে হিন্দু অজ্ঞ হইলেও, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইলেও তাহার একটা বিশ্বাস আছে—সেই জোরে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তি একেবারে মেরুদণ্ডহীন, সে চারিদিক হইতে কতকগুলি এলোমেলো ভাব লইয়াছে; তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই, শৃঙ্খলা নাই, সেগুলিকে সে আপনার করিয়া লইতে পারে নাই, ভাবের বদহজম হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইতে পারে না, তাহার মাথা দিনরাত্র বোঁ বোঁ করিয়া

এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। সে যে সকল কার্য করে, তাহার গূঢ় কারণ কি শুনিবে?—আমাদের হর্তা কর্তা বিধাতা ইংরেজলোকে কিসে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দুটি বাহবা দিবে, ইহাই তাহার সর্বকার্যের অভিসন্ধির মূলে।* সে যে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হয়, সে যে আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে, তাহার কারণ—ঐ সকল আচার সাহেবদের মতবিরুদ্ধ। কেন আমাদের কতকগুলি প্রথা দোষাবহ? কারণ সাহেবেরা এরূপ বলিয়া থাকে। এরূপ ভাব আমি চাহি না। বরং নিজের যাহা আছে, তাহা লইয়া নিজের জোরের উপর থাকিয়া মরিয়া যাও। যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, তবে দুর্বলতাই সেই পাপ। এই প্রাচীন পথাবলম্বী ব্যক্তিগণ সকলেই মানুষ ছিলেন—তাঁহাদের সকলেরই একটা দৃঢ়তা ছিল; কিন্তু এই পাশ্চাত্য ভাবমোহে বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণ এখনও কোন নির্দিষ্ট জীব-পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। তাহাদিগকে পুরুষ বলিব, না স্ত্রী বলিব, না পশুবিশেষ বলিব! তবে পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতকগুলি আদর্শ পুরুষও আছেন।

তৎপরে মাদ্রাজ নগরীতে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে স্বামীজী যে বক্তৃতা করেন, তাতে আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর গুণাগুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

* ইংরেজ আর এখন আমাদের হর্তাকর্তাবিধাতা নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় স্বাধীনতা-লাভের পর বিদেশীয়দের প্রশংসা কুড়ানো আমাদের বাতিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যাঁদের হাতে এখন দেশের শাসনভার, বিদেশীয়দের নিন্দাপ্রশংসাই তাঁদের অধিকাংশের মতিগতির ও কার্যাবলীর নিয়ামক, যদিও অনেকক্ষেত্রেই সেই সমস্ত নিন্দাপ্রশংসা কপট এবং স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত।—লেখক

'তোমরা এক্ষণে যে শিক্ষালাভ করিতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু উহার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর এই দোষ এত বেশী যে গুণভাগ উহাতে ডুবিয়া যায়। ঐ শিক্ষায় মানুষ প্রস্তুত হয় না,—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তি-ভাব পূর্ণ। এইরূপ শিক্ষা অথবা নাস্তিভাব-ভিত্তিক অন্য যে কোন শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক।'

স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতায় এরূপ উক্তি আরও অনেক পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতীয়দিগকে শ্রেণী-হিসাবে স্বামীজী দুর্বলচরিত্র পরমুখাপেক্ষী, পরানুকরণ-সর্বস্ব, চিন্তাশক্তিবিহীন, মেরুদণ্ডহীন ব'লে গণ্য করতেন। স্কুল-কলেজে তৈরী হচ্ছে এক নকল ইওরোপ, সত্যিকারের ভারতবর্ষ ওখানে অবহেলিত, অপমানিত। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে ওখান থেকে নূতন ভারতের আবির্ভাবের সম্ভাবনা অল্প।

স্বামীজীর উক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। ভারতকে যদি বেঁচে থাকতে হয়, তবে তার নিজস্ব জীবন-ধারা ও আদর্শ সে কখনও ছাড়তে পারে না। নিজ প্রকৃতিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থেকেই পাশ্চাত্য জাতিদের নিকট যা কিছু শিক্ষণীয় সমস্তই সে শিখুক, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান হজম ক'রে সম্পূর্ণ নিজের জিনিস ক'রে নিক। তিনি বারংবার বলেছেন—ইওরোপ অন্নবস্ত্র-সংস্থানের, রোগ-নিরাকরণের, পার্থিব অভাব-মোচনের বহু উপায় আবিষ্কার করেছে—অপরা বিদ্যার চর্চায় পাশ্চাত্য দেশবাসীরা আমাদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলে গিয়েছে। সুতরাং তাদের কাছে এ সকল বিদ্যা আমাদিগকে নতমস্তকে শিখতে হবে। এতে কোনই লজ্জা নেই :

'অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও, শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে—অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া, অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বতন্ত্রত্ব হারাইও না। এই ভারতের জাতীয় জীবন হইতে একেবারে অন্যরূপ হইয়া যাইও না, এক মুহূর্তের জন্য মনে করিও না যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতিবিশেষের পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।'

অন্যত্র আরও জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

'মনে কর তোমরা পাশ্চাত্য জাতির সম্পূর্ণ অনুকরণে সমর্থ হইলে, কিন্তু যে মুহূর্তে উহাতে সমর্থ হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমাদের মৃত্যু হইবে, তোমাদের জীবন বিন্দুমাত্র থাকিবে না।'

স্বামীজী যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর সমূলে উচ্ছেদ কামনা করেছিলেন, তা নিশ্চয় নয়। কঠোর ভাষায় এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ এই ছিল যে ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণী যেন নিজেদের দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে সেগুলি শোধরাবার চেষ্টা করে, এবং বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সমগ্র সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত নিজেকে উৎসর্গ করে। বিশেষতঃ তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ-তৈরি-করা শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবনে ও প্রবর্তনে তারা যেন যোলআনা মন প্রাণ ঢেলে দেয়। ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগকে উদ্দেশ করেই তিনি বলেছিলেন ঃ

'আমাদিগকে সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। এটি কি বুঝিতেছ? তোমাদিগকে উহার কল্পনা করিতে হইবে, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, যতদিন উহা না করিতেছ, ততদিন তোমাদের জাতির উদ্ধার নাই।'

ইংরেজ যখন আমাদের স্কন্ধে আসীন ছিল, তখন ইংরেজের ব্যবস্থাকে উপেক্ষা ক'রে, সরকারী সাহায্য ও অনুগ্রহ-বিগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে,—শুধু আত্মশক্তির দ্বারা মানুষ-তৈরি-করা শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য তিনি 'শিক্ষিত' সমাজের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদন যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছিল, তা নয়। স্বামীজী যেভাবে চেয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে না হলেও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা বাংলা দেশে অন্ততঃ হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে ঐ চেষ্টা সাফল্যলাভ করেনি। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিদেশী রাজশক্তির প্রতিকূলতাই ছিল ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। স্বাধীনতা লাভের পর এই কারণ দূরীভূত হয়েছে। কিন্তু ফল কি দাঁড়িয়েছে?

স্বাধীন হবার পর পরানুকরণ ও পরানুচিকীর্ষার জন্য দিন দিন আমরা যেন আরও উঠে পড়ে লেগেছি। যে শিক্ষাদীক্ষা ও চালচলনকে পাশ্চাত্যের চোকবোজা নকল এবং আমাদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ব'লে এতকাল উঁচু গলায় নিন্দা ক'রে এসেছি, সেগুলোকেই এখন আমরা শুধু যে প্রশংসা করছি তা নয়,—অনুকরণের মাত্রা আরও চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়ে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে নিষ্ফল শিক্ষা-ব্যবস্থাকে চারিদিকে আরও ছড়িয়ে দেবার, আরও ফাঁপিয়ে তোলবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছি। চারদিকেই রব উঠেছে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা কিছুই হয় না, ছাত্রেরা পাঠে অমনোযোগী, শিক্ষকেরা কাজে উদাসীন। যাঁদের উপর বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনার ভার, তাঁরাই বলছেন যে যোগ্যতাসম্পন্ন ও উৎসাহী শিক্ষকের একান্ত অভাব; উপযুক্ত মাইনে দিলেও মনোমত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তবুও নিত্য নূতন স্কুল কলেজ খোলা হচ্ছে। এই অদ্ভুত অযৌক্তিক কার্যকলাপের

কারণ কি?—একমাত্র কারণ ইংরেজী-শিক্ষিত সমাজের শ্রেণীস্বার্থ।

কথাটা খোলাখুলিই বলবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে আমরা—ইংরেজী-শিক্ষিতের দল—বরাবর জোর গলায় ব'লে এসেছি যে ইংরেজের শাসন-প্রণালী অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং হৃদয়হীন,—ইংরেজ রাজপুরুষেরা গরীব দেশের রক্ত শোষণ ক'রে মাইনে নেয় অত্যন্ত মোটা এবং তার বদলে কাজ দেয় নামমাত্র, ভারতবাসী জনসাধারণের সুখদুঃখ তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে এই স্পর্ধাবাক্যও শোনাতে ত্রুটি করিনি যে একবার শাসনতন্ত্র আমাদের হাতে আসুক, আমরা দেখিয়ে দেবো—কত সস্তায় কাজকর্ম কত উত্তমরূপে চালানো যেতে পারে, অধিকন্তু জনসাধারণের প্রতি আমাদের সেবার প্রবৃত্তি আর তো হৃদয়ে ধরে রাখতে পারছিনে,—একবার যদি সে প্রবৃত্তি আপন চরিতার্থতার পথ খোলা পায়, তবে দেশে দুঃখদারিদ্র্যের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না।

তেরো বৎসর পূর্ণ হ'য়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে। বলতে গেলে স্বাধীনতার এই প্রথম পর্ব ইংরেজী-শিক্ষিত শ্রেণীর এক মহাপরীক্ষার কাল। ইংরেজের পরিত্যক্ত রাজশক্তি এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই শ্রেণীরই করায়ত্ত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি বলুন, সংবাদপত্র বলুন, শিক্ষাদীক্ষা বলুন শাসনযন্ত্র বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় বলুন, মিউনিসিপ্যালিটি বলুন—সব কিছু এঁদেরই করায়ত্ত, এঁদেরই দ্বারা পরিচালিত। দেশের লোকের চিন্তাধারা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করবার—এমন কি সর্বাঙ্গীণভাবে দেশের জীবনকে কোন বিশেষ খাতে পরিচালিত করবার অপরিসীম ক্ষমতা ও সব রকম উপায় এঁদের হাতের মুঠোর ভিতরে। এ যাবৎ এই ক্ষমতা ও সুযোগের কী ব্যবহার এই শ্রেণী করেছেন, তা আজ খতিয়ে দেখবার সময় হয়েছে। যদি এই ক্ষমতা ও সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা ক'রে থাকি, তবে আজ কেন চারিদিকেই ব্যর্থতা, অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার, দুর্নীতির প্রাবল্য, অকর্মণ্যতা, আলস্য, জড়তা এবং এই গরীব দেশের জনসাধারণের অর্থের এমন নিদারুণ অপব্যয়?

একটুখানি সততা, একটুখানি দূরদৃষ্টি, একটুখানি দায়িত্ববোধের সহিত যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা ৫০ জন, কিংবা ২৫ জন ব্যক্তিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতেন, অন্ততঃ সত্য কথা বলবার মতো সৎ সাহস দেখাতেন, তাহলে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের পর ভারতের ভাগ্যাকাশ এরূপ ঘনঘটার অন্ধকারে আবৃত হ'ত না এবং দেশ এরূপ অভাব ও দুর্নীতির মহাপঙ্কে নিমগ্ন হ'ত না। এ কথার বিশদ ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন অনাবশ্যক, যেহেতু প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে এর যথেষ্ট প্রমাণ দেখতে পাবেন। বিশদ বর্ণনা কিংবা প্রমাণ দিতে গেলে এ কাহিনীর শেষ নেই—যে দিকে যাওয়া যাবে, সেদিকেই অফুরন্ত।

শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেন এবং মুখেও বলেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া বৃথা, কারণ বর্তমান যুগের গণতন্ত্রে যুক্তিবিচার, নীতিধর্ম, জনমত প্রভৃতির বাস্তবিক কোন স্থান নেই, দৃঢ়সংবদ্ধ রাজনৈতিক দলই সর্বেসর্বা, আর দলের যাঁরা পরিচালক সেই মুষ্টিমেয় লোকের হাতেই ক্ষমতার চাবিকাঠি; অন্যেরা তাঁদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারে না! নাৎসী জার্মানীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁরা বলেন যে জার্মানদের ন্যায় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সাহসী এবং

কর্মঠ জাতিও হিটলার ও তাঁর দলের হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তও তাঁরা উল্লেখ করেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, প্রথমতঃ নাৎসী জার্মানীর দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার ঠিক মেলে না। যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী (Intellectuals) নাৎসী নেতাদের হাতে ক্রীড়নক হয়েছিল, তারা কখনও ব্যক্তিগত অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের জন্যে আত্ম-বিক্রয় করেনি। তারা সত্যই বিশ্বাস ক'রত যে হিটলারের নীতির অনুসরণের দ্বারা তারা জার্মানীকে বড় করছে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা জীবন পর্যন্ত পণ করেছিল। তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে থাকলেও, কিংবা তাদের উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্টিতে দূষণীয় হ'লেও একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে তাদের ভাবটা ছিল ত্যাগের ভাব, স্বার্থসিদ্ধির ভাব নয়। আমাদের ভাব হচ্ছে আত্মপ্রতারণা। দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তি যদি ঠিক হয়, তবে অনিবার্যরূপে সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে বর্তমান অবস্থার কোনই প্রতিকার নেই। এরূপ সিদ্ধান্ত মনুষ্যত্বের অবমাননাকর এবং কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যে অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটজনক—এ কথা জেনে-বুঝেও শিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা যদি নীরব ও নিশ্চেষ্ট থাকেন অথবা কপটাচারের আশ্রয় নেন, তবে তাঁদের শিক্ষাদীক্ষায় ধিক্, তাঁদের অপরাধ অমার্জনীয়। এই প্রশ্নই আজ বিশেষ ক'রে তাঁদের সম্মুখে। কী উত্তর তাঁরা দেন, কী আচরণ তাঁরা করেন, তা দিয়েই ইতিহাসে তাঁদের বিচার হবে।

সাধারণভাবে সমগ্র ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বামীজী কেন যে মেরুদণ্ডহীন ও অন্তঃসারশূন্য মনে করতেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। দেশকে সেবা করবার, দেশকে দ্রুত উন্নতির পথে নিয়ে যাবার যে স্বর্ণ সুযোগ এই সম্প্রদায় পেয়েছিলেন, তার অসদ্ব্যবহারই তাঁরা করেছেন, সদ্ব্যবহার করেননি। জনসাধারণ এই সমাজের উপর যেটুকু আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করেছিল, তার মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। যে সমস্ত আশ্বাসবাক্য ও প্রতিশ্রুতি এঁরা জনসাধারণকে শুনিয়েছিলেন, তা অলীক ব'লে পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। সুতরাং ধর্মে মহান্, কর্মে মহান্ যে ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখেছি, সেই নূতন ভারত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্য হ'তে বেরুবে না—একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

বহু পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছিলেন :

> আসল কথা এই যে এক্ষণে আমাদের উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ, দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক।

এখন আর শুধু 'সহৃদয়তার অভাব' নয়, একটা যেন পারস্পরিক রেষারেষির ভাব দেশের সর্বত্র দেখা দিয়েছে, এবং এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী 'শিক্ষিত' শ্রেণী। এই শ্রেণীর মতিগতি পরিবর্তিত করবার জন্য স্বামীজী এঁদের সম্বোধন ক'রে ব্যাকুলকণ্ঠে বলেছিলেন :

> প্রথম পূজা বিরাটের পূজা, তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের পূজা—ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে—সেবা নহে ; 'সেবা' বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে না, 'পূজা' শব্দেই ঐ ভাবটি ঠিক প্রকাশ করা যায়। এই সব মানুষ—এই সব পশু—ইহারাই তোমার ঈশ্বর, আর তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসা পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশীগণের পূজা করিতে হইবে। তোমাদের নিজেদের ঘোর কুকর্ম-ফলে কষ্ট পাইতেছ, তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।

হায় ! এই বজ্রনির্ঘোষ বাণী, এই কাতরতাপূর্ণ ব্যাকুল আহ্বানও আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙাতে পারেনি। একদা যেটুকু বা কর্ণপাত করেছিলাম,

স্বার্থসিদ্ধির ও ভোগবিলাসের সুযোগ পেয়ে তাও আজ স্বেচ্ছায় ভুলে রয়েছি। এক হিসাবে বলতে গেলে 'শিক্ষিত' সমাজের শ্রেণীস্বার্থ আজ দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর অল্প কয়েক বৎসরে যে প্রভূত তিক্তকষায় অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, তার ফলে স্বামীজীর সতর্ক বাণীর গভীর সার্থকতা আমাদের মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা উচিত। তাতে সমর্থ হবো কিনা, কায়মনোবাক্যে তাঁর উপদেশ পালনে যত্নবান্ হবো কি না,—আজকের দিনে সেইটেই আমাদের সম্মুখে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। ভারত বলতে শুধু উচ্চবর্ণ কিংবা শিক্ষিত সম্প্রদায় নয়; এঁরা সংখ্যায় আর ক'জন? সুতরাং জনসাধারণের মধ্য থেকেই যে নূতন ভারত বেরুবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে আবির্ভাব কি ধরনের হবে,—শিক্ষিত শ্রেণী তাতে কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন,—নূতন ভারতের জনসাধারণ কোন্ আদর্শে পরিচালিত হবে—এ-সব কথাই আজ বিশেষভাবে চিন্তনীয়। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে; ইতিমধ্যে অনেক কিছু ব্যাপক ও গভীর পরিবর্তন দেশের বাইরে ও ভিতরে ঘটে গিয়েছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণেরও দৃষ্টিভঙ্গী, মতিগতি এবং ধর্মভাব আগেকার মতো আর নেই। নিজেদের দুরবস্থার জন্যে পরের ঘাড়ে দোষ না চাপাবার জন্যে এবং কোন বিষয়েই পরনির্ভরশীল না হবার জন্যে স্বামীজী অনুন্নত শ্রেণীকেও সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাঁরাও সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেননি। বর্তমান অবস্থায় জনসাধারণ কোন্ পথ অবলম্বন করবে তা বলা কঠিন, কারণ বহু বিচিত্র এবং বিভ্রান্তিকর চিন্তাস্রোত চারদিকেই প্রবহমান। যাই হ'ক, সে বিচারে প্রয়োজন নেই। আমাদের অর্থাৎ 'শিক্ষিত' এবং 'ভদ্র' শ্রেণীর—সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে নিজের দিকে তাকানো; আত্মানুসন্ধান ও আত্মকর্তব্য-বিনির্ণয়। এ সম্পর্কে স্বামীজীর একটি অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত ক'রে আলোচনা শেষ করা যাক্। এটি এমন একটি উপদেশ, যা যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা থাকলেই পালন করতে পারেন, কারও জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না, কারও উপর নির্ভর করতে হয় না, মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে হয় না।

'সমগ্র জগৎ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে আদর্শ জগতের কল্পনা করিয়া আসিতেছে, যাহাতে শীঘ্র তাহার আবির্ভাব হয়, যাহাতে সকল জাতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, এতদুদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই যতটুকু সাধ্য ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে ততটুকু দেওয়া উচিত। এই আদর্শ জগতের কখনও আবির্ভাব হইবে কি না—তাহা আমি জানি না; এই সামাজিক সম্পূর্ণতা কখনও আসিবে কি না, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। কিন্তু জগতের এই আদর্শ অবস্থা কখনও আসুক বা না আসুক, আমাদের প্রত্যেককে এই অবস্থা আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে কালই জগতের এই অবস্থা আসিবে; আর আমার—কেবল আমার কার্যের উপরই ইহা নির্ভর করিতেছে। আমাদের প্রত্যেককেই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অপর সকলে নিজ নিজ কার্য শেষ করিয়া বসিয়া আছে,—একমাত্র আমারই কেবল কাজ করিবার বাকি আছে; আর যদি আমি নিজ কার্য সাধন করি, তবেই জগৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমাদের নিজেদের উপর এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইবে।'—আদর্শ জগতের রূপায়ণের সম্পর্কে স্বামীজী এই যে উপদেশ দিয়েছেন, আদর্শ ভারতের রূপায়ণ সম্পর্কেও তা হুবহু প্রযোজ্য। সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা নিশ্চয়ই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; কিন্তু তা যদি সম্ভবপর নাও হয় তথাপি ব্যক্তির পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে থাকা সমর্থনযোগ্য নয়।

চণ্ডীতে দেবী-মাহাত্ম্য

[মেধস-কথিত উপদেশ ও উপাখ্যানমালা]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অপর নাম 'দেবীমাহাত্ম্য'। এই শাস্ত্রে দেবী মহামায়ার অপার মহিমা-কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। মেধস ঋষির উপদেশাবলী, ঋষিবর-কথিত উপাখ্যানমালা, দেবগণ-কৃত স্তব-স্তুতিসমূহ, ভগবতী-বাক্যনিচয়, মার্কণ্ডেয় মুনির কথোপকথন—সর্বত্রই দেবীর অতুল মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত। বস্তুতঃ শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রায় প্রতিটি শ্লোকই দেবীর অনন্ত মহিমাসূচক। 'দেবী-মাহাত্ম্য' পাঠ-শ্রবণ বা স্মরণ-মননে দেবীর সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ হয়। স্বয়ং দেবীমুখে চণ্ডীতে অভিব্যক্ত হয়েছে—'সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।' এই মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণে আরও বহু ফলপ্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ভগবতী-বাক্যে রয়েছে।

দেবী মহামায়ার অনবদ্য মাহাত্ম্য-কথা কেবল চণ্ডীতেই নয়, অন্যান্য শাস্ত্র-পুরাণাদিতেও বহুল বর্ণিত রয়েছে। স্বল্প পরিসরে ঐগুলির অবতারণা সম্ভব নয়। আমরা এখানে চণ্ডী থেকে মেধস ঋষি-কথিত দেবীমাহাত্ম্য সংক্ষেপে অনুধ্যান ক'রব।

উপদেশাবলী

ঋষিবর মেধসের তত্ত্বপূর্ণ উপদেশসমূহের পটভূমিতে রয়েছে জিজ্ঞাসু সুরথ ও সমাধির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। মহারাজ সুরথ রাজ্যহারা হ'য়ে বনবাসী হয়েছেন। আর সমাধি বৈশ্য বিপুল ধনসম্পত্তি হারিয়ে বনে এসেছেন। তাঁদের উভয়েরই ভাগ্য-বিড়ম্বনা ও হৃদয়-বেদনা একই প্রকার। শত্রুরা এবং অমাত্যগণ রাজ্যলোভে সুরথের সমস্ত রাজ্য অধিকার ক'রে নিয়েছে। আর সমাধির স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ধনলোভে তাঁর যাবতীয় ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। তাঁরা উভয়েই বিষয়ের বিষম বিষক্রিয়ায় জর্জরিত। তথাপি বিষয়ের প্রতি তাঁরা কেন মায়ায় আসক্ত? হীন চক্রান্তকারী আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতিও তাঁরা কেন মমতায় আবদ্ধ? তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কেন ঐরূপ স্নেহ-মমতায়, মায়া-মোহে অকারণ বিমুগ্ধ। অন্তরের এই তীব্র জিজ্ঞাসার সদুত্তর লাভের আকাঙ্ক্ষায় সুরথ ও সমাধি ঋষিবর মেধসের শরণাপন্ন হন।

ঋষিবর তাঁদের বলেন: সমস্ত জগৎ ভগবতী মহামায়ার অপার মায়ায় সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানিগণের চিত্তকেও তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহগর্তে ও মায়ার আবর্তে নিক্ষেপ করেন। জগৎপতি ভগবান বিষ্ণুও তাঁর অমোঘ প্রভাবে বিমুগ্ধ এবং যোগনিদ্রায় অভিভূত হন। সেই মহামায়াই এই নিখিল বিশ্বচরাচরের সৃজনকারিণী, পরমা আদ্যাশক্তি। তাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্য অতি বিচিত্র ও অতুলনীয়। তিনি একাধারে জীব-জগতের বন্ধনকারিণী, আবার মুক্তিদাত্রী। অবিদ্যারূপে বন্ধনের কারণ, বিদ্যারূপে মুক্তির হেতু তিনি সর্বেশ্বরেশ্বরী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ মহান্ দেবগণেরও নিয়ন্ত্রী তিনি। তিনি নিত্যা, জন্ম-মৃত্যুরহিতা। তিনি সর্বব্যাপিনী, সর্বগতা। তাঁর সত্তা ব্যতিরেকে চরাচরে কোন বস্তুরই পৃথক্ অস্তিত্ব নেই। তিনি বিশ্বরূপা, জগন্মূর্তি। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপ তিনি ধারণ

করেছেন। যদিও তিনি সনাতনী, শাশ্বতী, নিত্যা; তথাপি দেবগণের কার্যসিদ্ধি ও জগৎ-পরিপালনের নিমিত্ত তাঁর আবির্ভাব হয়। যুগে যুগে মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে সমুৎপন্না হন, অবতীর্ণা হন।

তাঁকে আন্তরিক ব্যাকুল হ'য়ে আরাধনা করলে তিনি শরণাগতের সকল অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তিনি সর্বার্থসাধিকা। সন্তানকে তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তাঁর চরণে কাতর প্রার্থনা করলে তিনি ইহলোকে ভোগ-ঐশ্বর্য এবং পরলোকে স্বর্গসুখ, নির্বাণমুক্তি—সবই অকাতরে দান করেন। তিনি প্রলয়কালে মহাকালী মহামারী রূপে সমস্ত জগৎ গ্রাস করেন। তিনি একাধারে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী। তিনি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপে সৃজন, স্থিতিকালে স্থিতিশক্তি-রূপে পালন এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপে বিনাশ সাধন করেন।

তিনি সুসময়ে অভ্যুদয়কারিণী লক্ষ্মীরূপে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি দেন। আবার দুঃসময়ে দারিদ্র্য-দায়িনী অলক্ষ্মীরূপে দুঃখ-দৈন্য-অশান্তি দেন। গন্ধ-পুষ্প, ধূপ দীপ প্রভৃতি উপচারে ভক্তিভরে সেই পরমেশ্বরীর অর্চনা করলে তুষ্টা হ'য়ে তিনি ধনপুত্রাদি এবং ধর্মে মতি ও শুভগতি প্রদান করেন। আরাধনায় পরিতুষ্টা হ'লে তিনি অযাচিত ভাবে শরণাগতের সকল মনোরথ পূর্ণ করেন। তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্বর্গ-দাত্রী; তিনি সুখদা বরদা মোক্ষদা। ঐহিক সুখ-অভ্যুদয় এবং স্বর্গীয় আনন্দ-মুক্তি তিনিই। তাঁর অভয় পাদপদ্মে শরণ নিলে কোন অভাব থাকে না, কোন ভয় থাকে না।

ঋষিবর মেধস-কথিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক উপাখ্যানরাজির পশ্চাতে রয়েছে মহারাজ সুরথের আর এক আগ্রহাকুল জিজ্ঞাসা,—কিভাবে সেই মহামায়ার আবির্ভাব হয়? মেধস তার উত্তরে অসুরদের নিধন ও দেবগণের রক্ষাকল্পে দেবীর আবির্ভাবের কয়েকটি বৃত্তান্ত তাঁদের একে একে শোনান।

মধু-কৈটভ বধ

কল্পান্তে প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলমগ্ন হ'লে ভগবান বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন। চারিদিক জলময় দেখে প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির বীজ-সম্ভার নিয়ে বিষ্ণুর নাভিকমলে আশ্রয় নেন। প্রলয়-শেষে প্রজাপতি নবসৃষ্টির নূতন কল্পারম্ভ করবেন, এই উদ্দেশ্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর কর্ণ হ'তে মধু ও কৈটভ নামে দুটি অতি ভীষণাকার ও মহাবলবান্ দৈত্য উৎপন্ন হয়। তারা ব্রহ্মাকে দেখামাত্রই তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণ নিলেন, কিন্তু দেখলেন—তিনি যোগনিদ্রায় অভিভূত। তখন তিনি বিষ্ণুর জাগরণের জন্য কাতরকণ্ঠে ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করলেন। মহামায়া যোগনিদ্রা তাঁর স্তবে পরিতুষ্টা হ'য়ে বিষ্ণুর নেত্রাসন ছেড়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হ'য়ে বিষ্ণুকে জাগ্রত করেন এবং মধু-কৈটভ-নিধনে প্রেরণা দেন। বিষ্ণু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহু বছর কেবল বাহুযুদ্ধই হ'ল, তবুও দৈত্যেরা পরাজিত হ'ল না। মহামায়া তখন তাদের তাঁর মায়াপ্রভাবে সম্মোহিত করলেন। ফলে তারা ভয়ানক গর্বিত হ'ল এবং দম্ভভরে বিষ্ণুকে বর দিতে চাইল। বললে: 'তোমার রণনৈপুণ্যে আমরা পরিতুষ্ট। আমরা তোমাকে তোমার ইচ্ছানুরূপ বর দিতে চাই।'

বিষ্ণু ভাবলেন, এখন আর অন্য বরের প্রয়োজন কি? তাই তিনি তাঁর হাতে তাদের মৃত্যু কামনা করলেন। তারা তখন ব'লল, 'তথাস্তু। তোমার ন্যায় বীরের হাতে মৃত্যু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তবে

যে স্থান জলপ্লাবিত হয়নি সেই স্থানে আমাদের বধ করতে হবে।' বিষ্ণু দেখলেন সর্বত্রই কেবল জল। তখন তিনি নিজের জঙ্ঘার উপর দৈত্যদের রেখে সুদর্শন চক্রদ্বারা তাদের বধ করলেন। এইভাবে মহামায়ার প্রেরণায় ও শক্তিপ্রভাবে বিষ্ণু মধুকৈটভকে বধ করলেন। দেবীর কৃপায় ব্রহ্মা দুরাত্মা মধুকৈটভের হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

মহিষাসুর-বধ

পুরাকালে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে একশত বৎসর ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অসুরাধিপতি মহিষাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে অতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। তখন দেবতাদের দুঃখ-দুর্গতির অবধি থাকে না। মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার ক'রে নিয়ে ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়। দেবতারা তখন নিজেদের অধিকার হারিয়ে স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হলেন। নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে মহিষাসুরের অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য ব্রহ্মাকে অগ্রণী ক'রে দেবগণ শিব ও বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তাঁদের মুখে দেবতাদের দুঃখ-দুর্দশা এবং মহিষাসুরের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারের বৃত্তান্ত শুনে শিব ও বিষ্ণু ভয়ানক কুপিত হলেন। প্রচণ্ড কোপে তাঁদের বদনমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। তাঁদের মুখ হ'তে মহাতেজ নির্গত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত অন্যান্য দেবতারও দেহ হ'তে অদ্ভুত তেজ বিচ্ছুরিত হয়। দেবগণের দেহ-সঞ্জাত সেই অনুপম তেজোরাশি দেখতে দেখতে দিগন্তব্যাপী এক বিরাট জ্বলন্ত পর্বতের আকার ধারণ করে। সেই পুঞ্জীভূত তেজোরাশি হ'তে এক অপূর্বশ্রী নারী-মূর্তির আবির্ভাব হ'ল। বিভিন্ন দেবতার তেজ হ'তে তাঁর শ্রীঅঙ্গের বিভিন্ন অবয়ব গঠিত হয়। ইনিই মহামায়ার মহাবতার মহালক্ষ্মী।

দেবগণ সেই মহালক্ষ্মীকে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা রণসাজে সজ্জিতা করলেন, নিজেদের বিবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা করলেন। তিনি দেবগণ কর্তৃক সম্মানিতা ও রণসাজে সজ্জিতা হ'য়ে মুহুর্মুহুঃ অট্টহাস্য করতে লাগলেন। দেবীর ঐ অট্টহাস্য, ধনুকের টঙ্কার ও ঘণ্টা-ধ্বনিতে ত্রিলোক প্রকম্পিত হ'ল। ঐ দুঃসহ শব্দ শুনে মহিষাসুর ভয়ানক বিচলিত হ'য়ে উঠল। তার আজ্ঞায় অসুর-সেনাপতিগণ ও সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। মহিষাসুর নিজেও বিশাল সৈন্যবাহিনীকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক'রে দেবীর দিকে ধেয়ে এল। রণাঙ্গনে উপস্থিত হ'য়ে সে দেখল—দেবীর মাথার মুকুট গগন স্পর্শ করেছে, পদভারে পৃথিবী অবনত, অঙ্গ-জ্যোতিতে ত্রিভুবন আলোকিত, ধনুকের টঙ্কারে পাতাল পর্যন্ত আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ, এবং তাঁর সহস্রভুজে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত।

অসুরদের সঙ্গে দেবীর তুমুল যুদ্ধ হ'ল। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে অবশেষে দৈত্যপতি মহিষাসুর অগণন সৈন্য-সেনাপতিসহ দেবীহস্তে নিহত হ'ল। দেবতারা তখন নিজ নিজ অধিকার ফিরে পেলেন। তার ফলে ত্রিভুবন সুস্থ হ'ল। দেবতারা মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি নন্দনপুষ্প দ্বারা ভক্তিভরে দুর্গতিনাশিনী মহামায়াকে অর্চনা করলেন। ত্রিলোকে দেবীর বিজয়োৎসব হ'ল।

শুম্ভ-নিশুম্ভাদি বধ

আবার কত দিন পরে অসুরপতি শুম্ভ এবং তার পরাক্রমশালী ভ্রাতা নিশুম্ভ শচীপতি ইন্দ্রকে পরাজিত ক'রে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দুর্গত দেবগণ তখন দুর্গতিনাশিনী মহামায়াকে স্মরণ করলেন। তিনি তাঁদের রক্ষাকল্পে তাঁদের

সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। দেবীর অপরূপ রূপের প্রভায় চারিদিক আলোকিত হ'ল। তাঁর আশ্চর্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে শুম্ভ তাঁকে বিবাহ করবার প্রস্তাব পাঠাল দূতের মাধ্যমে। শুম্ভের অভিপ্রায় শুনে দেবী গম্ভীর ভাব ধারণ ক'রে বললেন, 'যিনি সংগ্রামে আমায় পরাজিত করবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করবেন, যিনি আমার তুল্য বলশালী—তাঁকেই আমি পতিরূপে বরণ ক'রব।'

দূত সুগ্রীবের মুখে দেবীর ঐরূপ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অসুরপতি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'ল। সে তখন মহাসুর ধূম্রলোচন নামক সেনাপতিকে সৈন্য-সামন্ত সহ পাঠাল, দেবীকে বলপূর্বক নিয়ে আসার জন্য। ধূম্রলোচন ও তার সৈন্যসামন্তেরা দেবীর সম্মুখীন হওয়া মাত্রই তাঁর কোপানলে ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। শুম্ভ তখন চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুই দুর্ধর্ষ অসুরকে পাঠাল অগণন সৈন্য-সহ। চণ্ড-মুণ্ডও সসৈন্য নিহত হ'ল। তখন অসুরপতির আজ্ঞায় রক্তবীজ নামক দুর্দান্ত অসুর ধেয়ে আসে যুদ্ধ করার জন্য। সেও হতবীর্য হ'য়ে প্রাণ হারাল দেবীর দিব্য-শক্তির কাছে।

এইরূপে সমস্ত সৈন্য-সেনাপতি দেবী-হস্তে নিহত হ'লে শুম্ভ ও নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হ'ল। অদ্ভুত যুদ্ধ ক'রে তারাও দেবীর পদমূলে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হ'ল। শুম্ভ-নিশুম্ভাদি অসুরেরা দেবী-হস্তে নিহত হ'লে দেবতারা স্বর্গরাজ্য পুনরায় লাভ করলেন। তখন ত্রিলোক প্রকৃতিস্থ হ'ল, সর্বত্রই শান্তি স্থাপিত হ'ল।

মায়ের পূজা

সেখ সদরউদ্দীন

মায়ের কৃপা কেমন ক'রে
তুই, মাগিস কাঙালী?
ভায়ের তাজা রক্তে যে মা'র
চরণ রাঙালি!

ভাইকে ভাল বাসলি নাক'
মা, ফেলছে আঁখি-জল,
কেমন ক'রে পূজা রে তোর
সফল হবে বল?

মায়ের পূজা করিস পরে
শ্রদ্ধা-অনুরাগে,
ভাইকে ভাল বাসিস রে তুই
অর্ঘ্য দেবার আগে।

ভেদ না ক'রে মুচি-মেথর
হিন্দু-মুসলমান,
সবার মাঝে বিলিয়ে দে তোর
প্রীতি অফুরান!

ফুটবে রে তোর ঘরের গাছে
ফুল যে রাশি রাশি,
তার মাঝেতেই হরষ-মনে
দেখিস মায়ের হাসি।

ফুলের রাশি ঝরবে যবে
মায়ের পদতলে,
দেখবি সুখে মায়ের পূজা
ভাসি' নয়ন-জলে।

শক্তিরহস্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

পরাশক্তি অনাদি ও অনন্ত। শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে কেহ কখন সক্ষম হন নাই এবং হইবেনও না। জলের হিমশক্তির বা অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় শক্তি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। পরিদৃশ্যমান জগৎ শক্তিরই বিকাশ, শক্তি ভিন্ন কোন কিছুরই উদ্ভব সম্ভব নহে। এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—সেই এক মহাশক্তির লীলামাত্র। যখন এই লীলার কার্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন শক্তির ব্যক্তাবস্থা; এবং যখন মহাপ্রলয়ে লীলা অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন শক্তির অব্যক্ত অবস্থা। অব্যক্ত অবস্থায় শক্তি ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকেন। কুণ্ডলীকৃত সর্পে যেমন সর্পের গতিশক্তি লীন অবস্থায় থাকে, উহাও সেইরূপ। সর্পটি পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলে যেমন তাহার গতিশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেইরূপ পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলে মহাশক্তির বিকাশ দেখা যায়। যাহা কারণ তাহাও শক্তি এবং যাহা কার্য তাহাও শক্তি; তবে কারণরূপে শক্তি অব্যক্ত ও কার্যরূপে ব্যক্ত। মহাপ্রলয়ের অবসানে যখন জীবের সুপ্ত কর্মবীজ ফলপ্রসূ হইয়া উঠে, তখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিগুণময়ী শক্তি—যিনি সৃষ্টির বীজ কুড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি জাগিয়া ওঠেন। ব্রহ্ম যেন স্থির সমুদ্র ও শক্তি সেই সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের ন্যায়। নিম্নে স্থির ও গভীর সমুদ্র না থাকিলে যেরূপ তদুপরি উর্মিমালার আবির্ভাব সম্ভব হয় না, সেইরূপ পদতলে শিবরূপী নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম না থাকিলে সগুণা লীলাময়ী মহাশক্তি কালীর নৃত্যও সম্ভব হয় না। কিন্তু ঐ সিন্ধু ও তাহার বীচিমালা যেরূপ স্বরূপতঃ একই, সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি স্বরূপতঃ এক।

এই মহামায়া বিদ্যা ও অবিদ্যারূপা। বিদ্যা মায়া জীবকে শ্রেয়-পথে চালিত করেন ও অবিদ্যা মায়া তাহাকে প্রেয়-পথে লইয়া যান। জ্ঞান, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিদ্যার বিভূতি; আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি অবিদ্যার বিস্তার। অতএব অবিদ্যা ভোগবন্ধনদায়িনী ও বিদ্যা জ্ঞানশক্তিপ্রদায়িনী। মহামায়া ব্রহ্মস্বরূপিণী। ব্রহ্ম নিত্যচৈতন্যময়, মহামায়া মহাশক্তিও নিত্যচৈতন্যময়ী। চৈতন্যময় ব্রহ্মের সহিত শক্তির কোনকালে বিচ্ছেদ নাই, এইজন্য শক্তিকেও চৈতন্যময়ী বলিতে হয়, অতএব শক্তিকে কখন জড় বলা যায় না। ব্রহ্ম ও শক্তি মিলিত হইয়াই চরম তত্ত্ব। দুইটি দানা মিলিত হইয়া যেমন একটি বীজ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম ও শক্তিরূপ দুইটি দানার মিলনই পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। সমুদ্র ও তাহার তরঙ্গ মিলিয়া সমুদ্র, তরঙ্গকে বাদ দিলে সমুদ্রকে আর চেনা যায় না। এই দুইটির একটিকে বাদ দিলে সৃষ্টি হইতে পারে না।

মহামায়া যিনি পরব্রহ্মের শক্তি, তাঁহাকে মায়া ও অবিদ্যা এই দুই ভাবেও ভাগ করা হইয়া থাকে। মায়ায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয় ও অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলা হয়। উক্ত মায়া সহযোগেই ব্রহ্ম জগৎকারণ ঈশ্বর। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে যখন শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রাধান্য ঘটে, তখন তাঁহাকে মায়া বলা হয় এবং মলিনসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতিকে

বলা হয় অবিদ্যা। জীবের অন্তরে যে শক্তির অনুভব হয়, তাহা জীবাত্মা; গীতাকার তাঁহাকেই পরা-প্রকৃতি বলিয়াছেন। বাহিরে উপলব্ধ যে প্রকৃতি, তাহাই অপরা প্রকৃতি। এই জগৎ সেই মহা-শক্তির খেলা মাত্র। ভাল ও মন্দ উভয়ের মধ্য দিয়া একই শক্তি প্রকাশ পাইতেছেন। সেই মহাশক্তি জগজ্জননী সগুণা, আবার নির্গুণা। তিনি ত্রিগুণময়ী আবার গুণাতীতা।

আমাদের এই দেহের মধ্যেই শিব ও শক্তি আছেন। শিব হইতেছেন পরমাত্মা ও শক্তি জীবাত্মা; এইজন্য যোগশিখ-উপনিষদে এই দেহকে 'শিবালয়' বলা হইয়াছে। ইহা উপ-নিষদুক্ত একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষীর কথার অনুরূপ। শিব শক্তিরূপী ও শক্তি শিবরূপিণী, চিন্ময়ী। অন্তরে ও বাহিরে যেদিকে দেখা যায়, সেখানেই শিব ও শক্তি। মানুষের বুদ্ধি-শক্তি, বাক্শক্তি, কল্পনাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, অনু-ভবশক্তি, চিন্তাশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং দৈহিক শক্তি, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করিবার শক্তি প্রভৃতি সমুদয় শক্তিই একই মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। এক কথায় যাহা অব্যক্ত, তাহা গুণাতীত; ও যাহা ব্যক্ত তাহাই গুণের লীলা। জগতে পুং-বাচক সকল পদার্থই শিব ও স্ত্রী-বাচক সকল পদার্থই শক্তি। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হই-য়াছে, 'মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।' এই ব্রহ্ম ও শক্তির একত্ব যিনি অব-গত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কখন ভেদ থাকিতে পারে না, তাই শক্তিবিহীন হইয়া শিব ও শিব-বিহীন হইয়া শক্তি কখন থাকিতে পারেন না। শক্তি পরমাত্মার সহিত নিত্যসংযুক্ত।

এক শ্রেণীর বেদান্তবাদী তাঁহাদের বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিকে মিথ্যা বলেন। কিন্তু মানুষের যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ তিনি শক্তির এলাকার মধ্যে। বস্তুতঃপক্ষে শক্তি মিথ্যা হইতে পারেন না, এমন কি মহা-প্রলয়েও শক্তির নাশ হয় না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে পুনরায় সৃষ্টি কি প্রকারে সম্ভব? সৃষ্টি অনিত্য হইলেও প্রবাহাকারে নিত্য। সৃষ্টিকে অনিত্য বলিবার কারণ উহা আদিমান্ ও অন্তযুক্ত।

সৃষ্টি ব্রহ্মের সত্তার ন্যায় শাশ্বত নহে, এইজন্য উহাকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে। উক্ত বৈদান্তিকগণের যুক্তি এই যে যেহেতু সৃষ্টি মিথ্যা, সেই হেতু যে শক্তির দ্বারা এই সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাহাও মিথ্যা। তাঁহাদের মতে এক-মাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই কেবল সত্তা আছে, শক্তির কোন পৃথক্ সত্তা নাই। এই সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, এইবার তাহা আলোচনা করা যাক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শক্তিকে কখন মিথ্যা বলেন নাই। শক্তির রহস্য সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বিস্তৃত প্রসঙ্গাদি করিয়াছেন, অন্য কোন অবতার পুরুষ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার মতে যতদিন মানুষের দেহজ্ঞান আছে, যতদিন মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়বদ্ধ ও যতদিন সে বাহ্যজগৎ দেখিতেছে, ততদিন তাহাকে শক্তি স্বীকার করি-তেই হইবে। বেদান্তবিচারে ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য হইলেও মানুষ যতক্ষণ নিজের দেহমন সত্য বলিয়া স্বীকার করে, ততক্ষণ জগৎও সত্য এবং জগৎ সত্য হইলে জগৎকারণ যে মহাশক্তি তিনিও সত্য। 'যখন তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত, তখন তাঁকে বাক্যমনের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম বলি।' 'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটি বোধ হয়, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দুটি থাকে না, অভেদ, এক,—যে একের দুই

নেই—অদ্বৈতম্।' 'বেদান্তবাদী বলেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, জীবজগৎ—এ-সব শক্তির খেলা, বিচার করতে গেলে এ-সব স্বপ্নবৎ। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু, ব্রহ্মই বস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। যতক্ষণ একটু 'আমি' থাকে, ততক্ষণ সেই আদ্যাশক্তির এলাকা, তাঁর আণ্ডারে (under), তাঁকে ছাড়িয়ে যাবার জো নেই।' 'মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করেছেন। দুটি জিনিস বইতো আর কিছু নেই—ব্রহ্ম আর শক্তি। জ্ঞান হ'লে ও দুটি এক বোধ হয়। তিনি যতক্ষণ লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ দুটো ব'লে বোধ হয়, কিন্তু আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। মায়া ভগবানেরই শক্তি। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তখন সকল শক্তির সংহরণ ক'রে নিষ্ক্রিয় হ'তে পারেন। যখন নিষ্ক্রিয়, তখনও সকল শক্তি তাঁতেই পর্যবসিত থাকে। ব্রহ্মই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। তিনি যদি 'আমি' একবারে মুছে দেন, তখন যে কি হয়, মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ ঘট, ততক্ষণ দু-ভাগ জল—ঘটের ভেতরে এক ভাগ, বাইরে এক ভাগ। ঘট ভেঙে গেলে এক জল; তাও বলবার জো নেই, কে বলবে? ঘটটি কি? 'আমিই' ঘট। ঐ 'আমি' যদি যায়, তাহলে যা আছে তাই আছে, মুখে বলবার কিছু নেই। যেমন কর্পূর পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না।' অতএব যতক্ষণ জীবের 'আমি' বোধ আছে, ততক্ষণ শক্তিকে মিথ্যা বলা যায় না।

সাধনকালে সাধক ঐ মহাশক্তিরই উপাসনা করেন। কেহ কেহ চেতনাযুক্ত শক্তিকে অর্থাৎ ব্রহ্মময়ী শক্তিকে 'মা' বলিয়া উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ শক্তিযুক্ত চেতনের বা ব্রহ্মের উপাসনা করেন। শক্তিহীন ব্রহ্মের উপাসনা কেহই করেন না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে শক্তি-উপাসনারই নামান্তর বলা যাইতে পারে। যদি অনন্তকে মানুষ চিন্তা করে, তবে হয় তাঁহাকে অনন্ত সত্তাস্বরূপ, অথবা অনন্ত শক্তিরূপিণী বলিয়াই চিন্তা করিতে হইবে; এবং শক্তি ভিন্ন কোন চিন্তাই আমাদের সম্ভব নহে। সাধনের চরম পরিণামে হয় মহাশক্তি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাইবেন, না হয় ব্রহ্মই শক্তির সহিত এক হইয়া যাইবেন। ব্রহ্ম ও শক্তি এই দুইটির মধ্যে একটি অপরটিতে বিলীন হইয়া যাইবেন। তখন একমাত্র সত্তা থাকিবেন, যাঁহাকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, তাই সাধকগণ শক্তিরূপিণী মাকেই বলেন অনন্ত আনন্দময়ী। তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণই আমাদের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকে মাতৃভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনি তন্ত্রসাধনার সময় আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে ত্রিপুরাসুন্দরীজ্ঞানে পূজা করিয়া সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন; তিনি প্রতি নারীতে জগন্মাতাকে উপলব্ধি করিতেন। শাক্ত ধর্মমতে সাধককে পরাশক্তির অনাদিত্ব, অনন্তত্ব এবং সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিতে হয় ও জগতের যাবতীয় নারীতে জগন্মাতার বিকাশ দেখিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব উক্ত বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শাক্ত হইলেও বিশুদ্ধ মাতৃভাব ব্যতীত তন্ত্রোক্ত বামাচারের সাধনা তিনি করেন নাই। ঐ পথকে তিনি বিপদসঙ্কুল বলিয়াছেন। তন্ত্রকর্তা হয়তো এক শ্রেণীর অত্যন্ত ভোগাসক্ত ব্যক্তিকে সাধনপথে আকৃষ্ট করিবার জন্য তন্ত্রমধ্যে উহাকে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু ঐ পথ সকলের জন্য নহে। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ এই ধারণা পোষণ করেন যে শক্তি (স্ত্রী) গ্রহণ ব্যতীত তন্ত্র-

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না; এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা শক্তি গ্রহণ করেন ও মনের দুর্বলতার জন্য ঐ উপায়ে সিদ্ধিলাভের পরিবর্তে অধঃপতিত হন। তাই যুগাবতার ভগবান তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার পবিত্রতম দিকটি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া তাহার আদর্শ জগদ্বাসী নরনারীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগে শক্তিসাধকগণ যদি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সাধনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সাধনার ক্ষেত্রে পতনের কোন কারণ ঘটিবে না। তিনি বলিতেছেন, 'আমার মাতৃভাব, সন্তানভাব। এ ভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন লজ্জায়। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথা আছে, কিন্তু সে ভাব ভাল নয়। বীরভাবে প্রায়ই পতন হয়, ভোগ রাখলেই ভয়। মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী, কোন ভোগের গন্ধ নেই, এতে কোন বিপদ নেই। স্তন মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি। এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। তুমি মা, আমি তোমার ছেলে—এই শেষ কথা।'

এই যে পবিত্রতম ভাব, ইহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য। কারণ যতদিন নারীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি না হয়, ততদিন পর্যন্ত কোন সাধকই পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না। এই অবস্থা লাভের পর সাধকের সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনের যোগ্যতা জন্মায় ও তখন তাঁহার নিকট আর স্ত্রী-পুরুষ ভেদবোধ থাকে না। সাধনার পরিসমাপ্তির পর সাধক সদা দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন ও সমাধির মহানন্দ ভোগ করেন।

এখন একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে: শক্তিসাধক অর্থাৎ মাতৃভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী? সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণই সাধনের চরম অবস্থায় স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অদ্বৈতে স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন। ঐ অবস্থার কথা—I and my Father are one. এই হিসাবে বলা যায় দ্বৈতবাদ সাধনের প্রথম সোপান এবং শাক্তগণ যখন জগন্মাতাকে উপাসনা করেন, তখন তাঁহারা দ্বৈতস্তরেই থাকেন, কারণ তখন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য থাকে ও তখন পর্যন্ত তাঁহারা জগন্মাতার সহিত একীভূত হইয়া যান না। ভক্তির আতিশয্যে তাঁহারা হয়তো বলেন, 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।' ইহা বলিলেও জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহা তাঁহারা জ্ঞাত থাকেন। তবে এই একত্ব জ্ঞান থাকিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত 'তিনি ও আমি'—এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'মা' বলিয়া প্রার্থনা চলে। সাধনের চরম অবস্থায় বিশ্বজননী তাঁহার ভক্ত সন্তানকে সংসারের আবিলতা হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে অভয় অঙ্কে চিরতরে গ্রহণ করেন ও তাঁহারই নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত সত্তার সহিত তাহাকে এক করিয়া লন।

শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মের জীবভাব। জীবরূপে যখন তিনি পুত্রত্ব স্বীকার করেন, তখন শিব তাঁহার পিতা ও শক্তি মাতা। ঐ জীব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন আত্মস্মরণ বা পিতৃস্মরণ করেন, তখন মাতাই তাঁহাকে পিতার সহিত এক করিয়া দেন। সাধক তখন নির্বাণ মুক্তি না চাহিলেও এবং মাতৃসেবাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলেও পরিশেষে মা তাঁহাকে চিন্ময় সত্তায় বিলীন করিয়া দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে অদ্বৈত ভাব শেষ কথা, উহা বাক্যমনের অতীত, উপলব্ধির বিষয়। অতএব ভাষার দ্বারা উহার পরিচয় দেওয়া বা বাক্য দ্বারা উহা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্ম ও শক্তির একত্বসূচক আর একটি বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করি: 'বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে, তাঁকেই আমি মা ব'লে ডাকি।'

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

কালমহিমানুবর্ণনম্

সংসারে সর্বপদার্থ কালের বশীভূত। বর্তমান প্রসঙ্গে দশটি শ্লোকে সেই কালের মহিমা বর্ণিত হইতেছে। প্রথমেই গ্রন্থকার কালের সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রকাশ করত তাঁহাকে নমস্কার করিতেছেন :

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রং চ তৎ
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষৎ তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উদ্বৃত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ
সর্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ ॥৪১॥

সেই সুরম্য রাজধানী, সেই বলবিক্রমশালী সর্বজনপূজ্য রাজা ও তাঁহার পার্শ্বস্থ সামন্তমণ্ডল, সেই রাজসভার বিদ্বজ্জনমণ্ডলী ও চতুষ্পার্শ্বে শোভা-বিস্তারকারিণী চন্দ্রবদনী রমণীগণ, সেই বলদৃপ্ত উন্মার্গগামী রাজকুমারবৃন্দ, স্তুতিপাঠক সেই বন্দিবর্গ ও তাহাদের স্তুতিকথন—এই সমস্তই যাঁহার দ্বারা কবলিত হইয়া স্মৃতিরূপে পর্যবসিত হইয়াছে, সেই সর্বশক্তিমান্ কালস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥৪১

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি গৃহে তত্র তিষ্ঠত্যথৈকো
যত্রাপ্যেকস্তদনু বহবস্তত্র নৈকোঽপি চান্তে।
ইত্থং নেয়ৌ রজনিদিবসৌ লোলয়ন্ দ্বাবিবাক্ষৌ
কালঃ কল্যো ভুবনফলকে ক্রীড়তি প্রাণিশারৈঃ ॥৪২॥

বর্তমান শ্লোকে কালকে অক্ষক্রীড়ানিপুণ পুরুষের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সর্বপ্রাণি-নিয়ন্তৃত্ব কথিত হইতেছে: যে গৃহে (বা অক্ষক্রীড়া-পাত্রে) এক সময় বহু (প্রাণী বা ঘুঁটি) বিদ্যমান ছিল, সেখানে ক্রমে একটিমাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, পুনঃ যেখানে একটিমাত্র বিদ্যমান সেখানে ক্রমশঃ বহু একত্র হয় ও ক্রীড়াবসানে আবার একটিও অবশিষ্ট থাকে না।—এইরূপে সর্বগ্রাসী সুচতুর, অক্ষক্রীড়ানিপুণ কালস্বরূপ ভগবান দিবারাত্রিরূপী অক্ষদ্বয় পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ ও গ্রহণ করত এই সংসাররূপ অক্ষক্রীড়া-ফলকে (পাত্রে) প্রাণিদিগকে ঘুঁটিস্বরূপ করিয়া বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছেন ॥৪২

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভিঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥৪৩॥

মোহমদিরাপানে প্রমত্ত মানব কালের এই বিচিত্রলীলা, এই অদ্ভুত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না, ইহাই বর্ণিত হইতেছে :

আদিত্যের উদয় ও অস্তগমন দ্বারা অহরহঃ আয়ুক্ষয় হইতেছে; দেহযাত্রার্থ বহুবিধ প্রভূত আয়াসসাধ্যকার্যে চিত্ত নিবিষ্ট থাকাতে কাল সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ব্যতীত হইয়া যাইতেছে; জন্ম, বার্ধক্য, নানাবিধ বিপদ, মৃত্যু প্রভৃতি সম্মুখে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইয়াও প্রাণে ত্রাস উৎপন্ন হইতেছে না। বুদ্ধিভ্রংশকারিণী মোহময়ী প্রমাদরূপিণী মদিরা পান করত সমস্ত জগৎ বিবেক-জ্ঞানরহিত উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।৪৩

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতপ্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈরিত্থংবিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহান্ন লজ্জামহে ॥৪৪॥

অহো! প্রমাদগ্রস্ত হইয়া লোকে কালের মহিমা অবগত হইতে পারিতেছে না ইহাও কালেরই প্রভাব। পুনঃপুনঃ চক্রবৎ একই দিনরাত্রি-প্রবাহ চলিতেছে, বিষয়-সম্পাদনে উদ্যোগী মনুষ্যগণ সুগুপ্ত প্রারব্ধ-তাড়িত হইয়া, জানিয়া শুনিয়া বারবার উক্ত ও অনুভূত বিষয়সকল ভোগ করিতে করিতে বৃথাই সংসারমার্গে ধাবিত হইতেছে। অহো! এই চর্বিত চর্বণ, এই একই বিষয়ভোগ করাইয়া সংসার আমাদিগকে কি হীনদশাগ্রস্তই না করিয়াছে! তথাপি আমরা মোহবশতঃ লজ্জিত হই না।৪৪

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে
স্বর্গদ্বারকবাটপাটনপটুর্ধর্মোঽপি নোপার্জিতঃ।
নারীপীনপয়োধরোরুযুগলং স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্ ॥৪৫॥

সাংসারিক ব্যাপারে খিন্নচিত্ত ব্যক্তিদিগের খেদোক্তি বর্ণিত হইতেছে:

ভববন্ধন-ছেদনরূপ মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত পরমেশ্বর শ্রীশিবশম্ভুর চরণকমলযুগল শাস্ত্রবিধি অনুসারে (মনঃসমাধান পূর্বক) চিন্তন করি নাই, সাক্ষাৎ স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনভূত জ্যোতিষ্টোমাদি যাগানুষ্ঠানও করি নাই, কামও জীবনে কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় নাই—অহো! গর্ভধারিণী জননীকে জরাজীর্ণ করিবার জন্যই আমাদের জন্ম হইয়াছে! ৪৫

নাভ্যস্তা প্রতিবাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা
খড়্গাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদলনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ।
কান্তাকোমলপল্লবাধররসঃ পীতো ন চন্দ্রোদয়ে
তারুণ্যং গতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ ॥৪৬॥

যে অবস্থায় যাহা কর্তব্য তাহা যথাবিধি সম্পন্ন না হইলে বৃথাই আয়ু ব্যয়িত হইয়া থাকে, ইহা সূচনা-পূর্বক বলিতেছেন: প্রতিবাদিগণের পাণ্ডিত্য-গর্ববিনাশকারিণী ও বিনীতগণের হৃদয়াহ্লাদিনী বেদ-শাস্ত্রাদি বিদ্যা অধ্যয়ন ও পরিশীলন করি নাই; তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগের দ্বারা হস্তিমস্তকের পৃষ্ঠদেশ

বিদারণ করত, শত্রুকুল নির্মূল করত আস্বর্গপ্রসারী কীর্তিও অর্জিত হয় নাই ; বিমল চন্দ্রোদয়ে কামবিলাসাদি হইতেও বঞ্চিত রহিয়াছি ;—অহো নির্জন গৃহমধ্যস্থ দীপালোকের ন্যায় বৃথাই যৌবনকাল অতিবাহিত হইয়া গেল ! ৪৬

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তং চ নোপার্জিতং
শুশ্রূষাঽপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্ন সম্পাদিতা ।
আলোলায়তলোচনাঃ প্রিয়তমাঃ স্বপ্নেঽপি নালিঙ্গিতাঃ
কালোঽয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রের্যতে ॥৪৭॥

বিদ্যাদি উপার্জন না করিয়া পরপ্রদত্ত অন্নদ্বারা জীবন নির্বাহ করাতে আয়ু বৃথাই ব্যতীত হইয়াছে। এইরূপে পশ্চাত্তাপ পূর্বক বিদ্যাদি লাভের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিতেছেন :

জীবনে পরমার্থসাধক বিদ্যালাভেও সমর্থ হইলাম না, ইচ্ছাকৃত পর্যাপ্ত ধনও উপার্জন করা হইল না, একাগ্রচিত্তে পিতামাতার পরিচর্যাও করি নাই, 'সাংসারিক' সুখও কিছুমাত্র ভোগ করা হয় নাই ; অহো ! কাকের ন্যায় পরান্ন-ভোগলালসায় বৃথাই জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল। ৪৭

বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চিরপরিচিতা এব খলু তে
সমং যৈঃ সংবৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিষয়তাং তেঽপি গমিতাঃ ।
ইদানীমেতে স্মঃ প্রতিদিবসমাসন্নপতনা
গতাস্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ ॥৪৮॥

যে স্বদেহ-পোষণার্থ লোকে নীচ জনের সেবা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, কালবশে সেই দেহও বিনষ্ট হয়, অতএব তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদারাধনেই মনোনিবেশ করা কর্তব্য, এই অভিপ্রায়ে কালের বিচিত্র পরিণাম বিবৃত হইতেছে :

যে মাতাপিতা হইতে আমরা জাত হইয়াছি, তাঁহারা বহুদিন পূর্বেই কাল-কবলিত হইয়াছেন ; যাঁহাদের সঙ্গে একত্র পালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারাও এখন স্মৃতির বিষয় হইয়াছেন অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছেন। আর আমরা এখন এই বার্ধক্য-দশায় প্রতিদিন বালুকাময় নদীতীরস্থ আসন্ন-পতনোন্মুখ বৃক্ষতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৪৮

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্ধং গতং
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্ ॥৪৯॥

মানুষের আয়ু বিধাতা কর্তৃক শতবর্ষ নির্ধারিত হইয়াছে। উহার অর্ধভাগ রাত্রিকালীন নিদ্রাবস্থাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। বাকী জাগ্রৎকালীন অর্ধভাগ বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থার জড়তা ও শক্তিহীনতাতেই অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট পঞ্চবিংশতি বৎসর নানা ব্যাধি ও পুত্রকলত্রাদি বিয়োগজনিত দুঃখসহ (জীবিকা উপার্জনের নিমিত্ত) ধনাঢ্যগণের কষ্টকর পরিচর্যাদিতে বিগত হয়। জলতরঙ্গতুল্য চঞ্চল ও ক্ষণিক এই জীবনে প্রাণিগণের সুখ কোথায় ? ৪৯

ক্ষণং বালো ভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সংপূর্ণবিভবঃ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততনু-
র্নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীযবনিকাম্ ॥৫০॥

জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখ উপলব্ধ হয় না, মৃত্যুই সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইহা বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন:

মনুষ্য ক্ষণমধ্যে বাল্যাবস্থা ও স্বল্পকাল মধ্যেই ভোগোন্মুখ যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্ষণমধ্যে বিত্তহীন দরিদ্র আবার ক্ষণকাল মধ্যেই বিত্তশালী হইয়া থাকে। এইরূপে অচিরেই কুঞ্চিত লোলচর্ম ও জরাজীর্ণাঙ্গ হইয়া মনুষ্য এই কপট সংসার-নাটকাবসানে বিভিন্ন কৃত্রিম বেশ পরিবর্তনকারী নটের ন্যায় যমরাজপুরী রূপ যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়। ৫০

যতিনৃপতিসংবাদবর্ণনম্

অতীত অনন্ত পুণ্য পরিপাক বশতঃ শুভভাগ্যোদয়ে পূর্বকথিত কাল-পরিণাম সম্যকরূপে অবগত হইয়া তীব্রবৈরাগ্যসহায়ে কেহ কেহ বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করত পবিত্র যতিধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। সংসারভোগে বিতৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ত্রৈলোক্যরাজ্যভোগও তৃণবৎ তুচ্ছ প্রতীত হয়। কোন রাজার প্রতি বৈরাগ্যবান্ যতিপ্রবরের উক্তিবর্ণনপ্রসঙ্গে 'নিরঙ্কুশ ও নিঃস্পৃহ যতিভাবই মুমুক্ষুগণের অবশ্য সাধনীয়' ইহাই জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে 'যতিনৃপতিসংবাদ' আরব্ধ হইতেছে:

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ।
ইত্থং মানধনাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং
যদ্যস্মাসু পরাঙ্‌মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততো নিঃস্পৃহাঃ ॥৫১॥

হে রাজন্! তুমি যদি রাজা বলিয়া উন্নতমস্তক, তাহা হইলে আমরাও গুরুসেবালব্ধ বিবেকবুদ্ধির গর্বে সমুন্নতশির; তুমি যদি বিত্তবৈভবে প্রসিদ্ধ, তবে বলি, আমাদেরও বিদ্যার যশোগান কবিগণ দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তার করিয়া থাকেন। এইরূপে ধনমানাদি দ্বারা আমাদের উভয়ের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান; এই জন্য তুমি যদি আমাদের প্রতি অনাদরপরায়ণ হও, তাহা হইলে আমরাও তোমার প্রতি একান্তই নিঃস্পৃহ জানিও। ৫১

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরামীশ্মহে যাবদর্থং
শূরস্ত্বং বাদিদর্পব্যুপশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং নঃ।
সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামা
ময্যপ্যাস্থা ন তে চেৎ ত্বয়ি মম নিতরামেব রাজন্ননাস্থা ॥৫২॥

পূর্বোক্ত বিষয়টিই প্রকারান্তরে বর্ণিত হইতেছে: হে রাজন্! তুমি প্রভূত ধনরাশির অধিপতি, আমরাও অশেষ শাস্ত্রমর্মার্থ-পারদর্শী; তুমি যুদ্ধে রিপুদলনে কুশল, আমরাও শাস্ত্রার্থ-

করণে প্রতিবাদিগণের পাণ্ডিত্য-গর্ববিনাশে সুচতুর; তোমাকে ধনীরা বা ধনাকাঙ্ক্ষিগণ ধনলোভে সেবা করিয়া থাকে, রাগদ্বেষাদিবুদ্ধিগত মলিনতা প্রক্ষালনার্থ অধ্যাত্মতত্ত্বশুশ্রূষু মুমুক্ষুগণ আমাদেরও সশ্রদ্ধ সেবা করিয়া থাকেন। যদি আমাদের উপর, হে রাজন্! তোমার শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তোমার উপরও আমাদের কোন আস্থা নাই, অর্থাৎ আমরাও তোমার কোন অপেক্ষা রাখি না।৫২

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ সম ইব পরিতোষো নির্বিশেষো বিশেষঃ।
স তু ভবতু দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥৫৩॥

চিত্তে সন্তোষ বিদ্যমান থাকিলে কোন কৃচ্ছ্রতাই কষ্টকর বলিয়া প্রতীত হয় না—রাজার প্রতি যতির এইরূপ উক্তি বিবৃত হইতেছে: হে রাজন্! বল্কলাদি পরিধানেই আমরা পরিতুষ্ট আর তুমি বিচিত্র বহুমূল্য বস্ত্রাদিতে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক; সন্তোষ কিন্তু আমাদের উভয়েরই তুল্য, তোমার ও আমার পরিতোষের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ নাই। যাহার তৃষ্ণা বলবতী, সংসারে সেই দরিদ্র। যে কোন উপায়ে মনে সন্তোষ থাকিলে ধনবান্ই বা কে, আর দরিদ্রই বা কে? ৫৩

ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং ক্ষিতিরপি শয়নার্থং বাসসে বল্কলং চ।
নবধনমধুপানভ্রান্তসর্বেন্দ্রিয়াণামবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জনানাম্ ॥৫৪॥

শরীরযাত্রা যে কোন উপায়ে নির্বাহ হইয়া যায়, অতএব দুর্জনগণের উদ্ধত ব্যবহার আমরা কেন সহ্য করিব? ইহাই বর্তমান শ্লোকে বলা হইতেছে: ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত ফল ও তৃষ্ণা শান্তির জন্য সুমিষ্ট সুপেয় জল সুলভ, শয়নার্থ ভূশয্যাও বিদ্যমান এবং আচ্ছাদনের নিমিত্ত বল্কল-চীরাদিও দুষ্প্রাপ্য নহে। সুতরাং সদ্যোলব্ধধনমদমত্ত ও বিভ্রান্তচিত্ত কুপথগামী দুর্জনদিগের অনাদর ও উপেক্ষাপূর্ণ ব্যবহার আমরা সহ্য করিতে পারি না। ৫৪

অশীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥৫৫॥

দুর্বৃত্ত রাজন্যাদির সেবাদ্বারা জীবন ধারণাপেক্ষা ভিক্ষাশনে কালযাপনও শ্রেয়ঃ। পূর্বোক্ত এই সকল কথাই অন্য ভঙ্গিতে বর্ণিত হইতেছে: আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন, দিগম্বর পরিধান ও পৃথিবীপৃষ্ঠেই শয়ন করিব,—(এই রূপেই যখন আমাদের জীবন উত্তমরূপে ব্যতীত হইতে পারে তখন) ঐশ্বর্যমদান্ধ রাজাদিগের নিকট আমাদের কি প্রয়োজন? ৫৫

[আশাবাসো বসীমহি—দিগ্‌বস্ত্র পরিধান করিব। ঈশ্বরৈঃ—ঐশ্বর্যশালী রাজাদিগের দ্বারা।]

ন নটা ন বিটা ন গায়কা ন চ সভ্যেতরবাদচুঞ্চবঃ।
নৃপমীক্ষিতুমত্র কে বয়ং স্তনভারানমিতা ন যোষিতঃ॥৫৬॥

আমরা তো নাট্যনিপুণ নট নহি, ধূর্ত বিটও নহি, আমরা সঙ্গীতবিদ্যাকুশল গায়ক নহি, জন-মন-বিনোদকারী পরিহাসকুশল অশিষ্টালাপী সভাসদও নহি, আর আমরা সুন্দরী স্ত্রীও নহি, সুতরাং রাজদর্শনে আমাদের কি প্রয়োজন? রাজসভায় নট প্রভৃতিরাই সম্মান লাভ করিয়া থাকে, বিদ্বান্‌গণ নহেন। অতএব রাজদর্শন বা রাজসেবা করা আমাদের একান্তই অনুচিত। ৫৬

বিপুলহৃদয়ৈরীশৈরেতজ্জগজ্জনিতং পুরা বিধৃতমপরৈর্দত্তং চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা।
ইহ হি ভুবনান্যন্যে ধীরাশ্চতুর্দশ ভুঞ্জতে কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥৫৭॥

জগতের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের আধিপত্য লাভ করিয়া অভিমানবশতঃ পুরুষের বিষয়মদে উন্মাদবৎ আচরণ নিতান্তই অনুচিত, ইহাই কথিত হইতেছে :

পূর্বে (হরিশ্চন্দ্রাদি) এমন উদারবুদ্ধি সার্বভৌম নৃপতিগণ ছিলেন, যাঁহারা (স্বকীয় জ্ঞান কর্ম দ্বারা) জগৎকে সংস্থাপিত করিয়াছেন, আর (মহারাজ যযাতি প্রভৃতি) এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা জগৎকে সম্যক্‌রূপে পরিপালন করিয়াছেন ; (বলি প্রভৃতি) এরূপ রাজাও ছিলেন, যাঁহারা শত্রুকুল নির্মূল করত পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিয়া তৃণসম তুচ্ছজ্ঞানে উহা অপরকে দান করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালেও এমন অনেক ধৈর্যশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন পালন করিতে সমর্থ। ইহা জানিয়াও মাত্র কতিপয় গ্রাম বা নগরের আধিপত্য লাভ করিয়া মানুষ এত মদান্ধ হয় কেন ? ৫৭

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি ন জাতং নৃপশতৈ-
র্ভুবস্তস্যা লাভে ক ইব বহুমানঃ ক্ষিতিভৃতাম্।
তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়বলেশেঽপি পতয়ো
বিষাদে কর্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্ ॥৫৮॥

সংসারে ভূস্বামিত্ব-অভিমান অতি তুচ্ছ, ইহাই বর্ণিত হইতেছে :

এই পৃথিবীকে শত শত নৃপতি ভোগ করিতেছে, অভুক্তাবস্থায় ইহা একক্ষণও কোন কালে থাকে নাই, তাহার (সেই পৃথিবীর) আধিপত্য-লাভে নরপতিগণের এমন কি উৎকর্ষ হইয়া থাকে ? এই ভূমিখণ্ডের (পৃথিবীর) এক অংশের এবং তাহারও অতি ক্ষুদ্র একদেশমাত্রের আধিপত্য লাভ করিয়া বস্তুতঃ যেখানে (অল্পলাভ নিমিত্ত) বিষাদগ্রস্ত হওয়া কর্তব্য, সেখানে মূর্খ ভূস্বামিগণ বিপরীতক্রমে আনন্দানুভবই করিয়া থাকে, ইহাই আশ্চর্য ! ৫৮

মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ সর্বোঽপ্যয়ং নন্বণুঃ
স্বাংশীকৃত্য তমেব সংগরশতৈ রাজ্ঞাং গণা ভুঞ্জতে।
তে দদ্যুর্দদতোঽথবা কিমপরং ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং
ধিগ্ ধিক্ তান্ পুরুষাধমান্ ধনকণান্ বাঞ্ছন্তি তেভ্যোঽপি যে ॥৫৯॥

সামান্য ঐশ্বর্যশালী রাজাদিগের নিকট যাহারা ধন প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহারা অধিকতর ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিতেছেন :

সমুদ্রবেলার জলরেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এই সমগ্র পৃথিবী-রূপ মৃৎপিণ্ড (বস্তুতঃ বিচারদৃষ্টিতে) একটি ক্ষুদ্র অণু ব্যতীত আর কিছুই নহে। শত শত যুদ্ধ দ্বারা এই মৃৎপিণ্ডই স্বায়ত্ত করিয়া রাজারা ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল দরিদ্র রাজবৃন্দ কিছু দান করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? কিন্তু সেই পুরুষাধমগণের প্রতি শত ধিক্কার—যাহারা সেই ক্ষুদ্র রাজাদিগের নিকট

হইতেও ধনকণা প্রত্যাশা করিয়া থাকে। অতএব নীচ ব্যক্তিগণের নিকট যাচ্ঞা করা অপেক্ষা পরমানন্দময় যতিজীবন যাপন করা সর্বতোভাবে বিধেয়—ইহাই তাৎপর্য। ৫৯

স জাতঃ কোঽপ্যাসীন্মদনরিপুণা মূর্ধ্নি ধবলং
কপালং যস্যোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিধয়ে।
নৃভিঃ প্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা
নমদ্ভিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ ॥৬০॥

জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ভগবদারাধনা করিয়া থাকেন, শ্রীভগবানের প্রিয় এরূপ ভক্তগণের জীবনই সফল, অপরের নহে—ভর্তৃহরি ইহাই সিদ্ধান্ত করিতেছেন:

তিনিই সফলজন্মা পুরুষ, দেহান্তে যাঁহার শ্বেত কপাল (শিরঃ-অস্থি) মদনরিপু শ্রীসদাশিব অলংকাররূপে আপন মস্তকে সর্বোপরি ধারণ করিয়া থাকেন। আপন তুচ্ছ প্রাণপোষণে ব্যগ্রচিত্ত কতিপয় ইতরজন কর্তৃক পূজিত হয় বলিয়া অভিমানী রাজাদিগের এমন অসীম গর্বরূপ তাপের উদ্রেক হয় কেন? বস্তুতঃ ভগবদারাধনা- ও ভগবদনুগ্রহ-বর্জিত জীবন নিষ্ফল। ৬০ [ক্রমশঃ]

শ্যামাসঙ্গীত

[ঝাঁপতাল]

কথা ও সুর—শ্রীশিশিরকুমার ভট্টাচার্য (বি. মিউজিক)

স্বরলিপি: কুমারী দীপ্তি সরকার

হৃদয়েরি রাঙা জবায়, পুজবো দুটি রাঙা চরণ
রাঙা পায়ে লুটিয়ে মাগো, ধন্য হবে বিফল জীবন॥

ভবের হাটে বেচা কেনা
এবার মা তুই চুকিয়ে দেনা,
চোখের জলে দিবানিশি তোর ধ্যানেতেই আছি মগন॥

রামপ্রসাদের বেটী হ'লি, মা, গদাধরে কোলে নিলি,
বিবেকানন্দের মনে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিলি।

আমায় মা তুই দিসনে ফাঁকি
জনম বিফল হবে নাকি?
পাষাণ হ'য়ে পাষাণী তুই, আর কত কাল দিবি যাতন॥

+ ২ ।

II মা গা | রসা -া সা | সা সা | রা সন্‌্া -া I
হৃ দ | য়ে॰ ॰ রি | রা ঙা | জ বা॰ য়

I পা ধা | সা -রা রা | গা গা | জ্ঞা গা -া I
পুঞ্জ বো | তু ॰ টি | রা ঙা | চ র ণ

গ
I সা সা | গা -া পা | ক্ষধা ধা | পমা -া মা I
রা ঙা | পা ॰ য়ে | লুটি য়ে | মা॰ ॰ গো

ম
I সা মা | মা -া পা | গা রা | গা -া গা I
ধ ন্য | হ ॰ বে | বি ফল্ | জী ॰ বন্

I গা পা | গপা ধন্‌্া র্সা | র্সা র্সা | র্রা না -া I
ভ বের | হা॰ ॰॰ টের | বে চা | কে না ॰
আ মায় | মা॰ ॰॰ তুই | দিস্ নে | ফাঁ কি ॰

II না না | না -া র্সা | ধর্সা র্সা | না ধা পা I
এ বার | মা ॰ তুই | চুকি য়ে | দে ॰ না
জ নম্ | বি ॰ ফল্ | হ॰ বে | না ॰ কি

I ক্ষা ক্ষা | ক্ষা -পা পা | ক্ষা ধা | পা -মা গা I
চো খের | জ ॰ লে | দি বা | নি ॰ শি
পা ষাণ | হ ॰ য়ে | পা ষা | ণী ॰ তুই

ম
I রা গা | মা -পা পা | রা রা | সা -া সা II IIII
তোর ধ্যা | নে ॰ তেই | আ ছি | ম ॰ গন
আর ক | ত ॰ কাল্ | দি বি | যা ॰ তন্

II প্‌্া ধ্‌্া | সা -া রা | গা গা | মা রা গা I
রাম্ প্র | সা ॰ দের্ | বে টী | হ লি মা

I রা রা | গা -া মা | রা রা | গা -া গা I
গ দা | ধ ॰ রে | কো লে | নি ॰ লি

I সা গা | পা -া পা | ক্ষা -পা | ক্ষা -া পা I
বি বে | কা ॰ নন্ | দে র্ | ম ॰ নে

I পা ধা | পমা -া গা | রা গা | মা -া গা I
জ্ঞা নের্ | আ॰ ॰ লো | জ্বে লে | দি ॰ লি

ইংলণ্ডে এক বৎসর

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লীড্‌স্ পৌঁছবার তিন দিন পরে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করলাম। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পূর্বে গিয়েছিলাম ব'লে ঐ সময়টুকু অপেক্ষা করতে বললেন। আলাপ-আলোচনার পর কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা পদ্ধতি মোটামুটি ঠিক হ'ল। এরপর এঁরা আমার বাসস্থান, শীতের থেকে আত্মরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি ব'লে দিলেন। বিদেশে যাতে আমি একলা বোধ না করি, সে বিষয়েও অনেক কথা হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে লীড্‌স্ ইউনিভারসিটির বয়স ৫০।৬০ বছরের বেশী নয়। তবে যুদ্ধোত্তর কালে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও অনেকগুলি নতুন বাড়ী হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে গেছে, এখন ৩০০০। এর মধ্যে আবার ভারতীয় ৯০ জন। এখানেও বেশীর ভাগ ইংরেজ ছাত্র বৃত্তিভোগী; হয় বিশ্ববিদ্যালয়, নয় কোন শিল্প-সমিতি দিচ্ছে, না হয় যে যার কাউন্টি থেকে বৃত্তি পাচ্ছে।

আর্টস্‌-ছাত্রদের খুব কম ক্লাস, সায়েন্স-ছাত্রদের কিন্তু ৯টা থেকে ৫টা, বুধবার ও শনিবার বিকেলে ছুটি। রিসার্চের ছাত্রদের রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে দেখতাম, অবশ্য সবাইকে নয়। এদের সকলকে একটা ক'রে চাবি (master key) দেওয়া হয়—যখন খুশি ল্যাবরেটরীতে ঢুকবে ব'লে। ছাত্রেরা বাড়ীতে কেউ পড়ে না—লাইব্রেরীতে ১০০০ ছেলে বসে পড়বার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সবাই পড়ে। অবশ্য টারমিনাল পরীক্ষার পূর্বে পড়ার চাড় বেশী হয়। পরীক্ষার পরই ক্রিসম্যাস, ঈস্টার বা গরমের ছুটি। সে-সব সময়—বিশেষতঃ গরমের দু-মাস ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়।

রাজনীতি-আলোচনা ছেলেদের মধ্যে কম। তবে প্রায় ইউনিয়ন-হলে (Union Hall) তর্ক-যুদ্ধের ব্যবস্থা আছে; সেটা যেন একটা ছোটখাট পার্লামেণ্ট—কায়দা-কানুনের কোন ত্রুটি নেই। এই হ'ল ভবিষ্যৎ পার্লামেণ্টারিয়ানদের হাতে খড়ি।

'That this house would rather pursue other things than knowledge', 'That this house will not respect the Sabbath', 'That this house is tired of politics', 'That this house has no confidence in Her Majesty's Government', 'That this house would make divorce easier'.—এই-সব তর্কের বিষয়।

ক্লাস বা লাইব্রেরীর তুলনায় এই ইউনিয়নের কার্যকলাপ বা মাতামাতি কোন অংশে কম নয়। প্রত্যেক ছেলেকেই এর সদস্য হ'তে হয়—বাৎসরিক চাঁদা পড়ার খরচের প্রায় সপ্তমাংশ। এখানেই খেলার, রেডিও-টেলিভিসনের, সপ্তাহান্তে নাচের, সিনেমার, নাপিতের, স্নানের, লাইব্রেরী প্রভৃতি—সব কিছুর বন্দোবস্ত আছে। পুরানো বই কেনা-বেচার কেন্দ্র, খাতা-পেনসিল খবরের কাগজ—তাও এখানে। এমন কি ছুটির মধ্যে ছোটখাটো কাজের সন্ধানও এখানে পাওয়া যায়; কেউ ফেরী ক'রে, কেউ পোস্ট পিওনের কেউ বা দোকানে কাজ ক'রে ছুটির সময় কিছু উপার্জন ক'রে নেয়। দুপুরের খাওয়ার জন্য

এই খানেই সস্তা ক্যানটিন। মাছ, মাংস, তরকারী থেকে ফলমূল দুধ, কেক, কফি সবই পাওয়া যায়। লাইসেন্স প্রাপ্ত 'Bar'ও এর মধ্যে আছে।

ইউনিভারসিটি ছাড়া এখানকার সব বড় শহরে আর একটা শিক্ষাকেন্দ্র থাকে। এ-সব জায়গায় নানা রকম টেকনলজি, কমার্স, আর্টস্ শিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, এরা সাধারণতঃ ডিগ্রি দেয় না; ব্যাবহারিক দিকের ওপর জোর। ছেলেদের ফুরসৎ কম। অনেক ছেলেই কিছুদিন কারখানায় কাজ করবার পর এখানে পড়ছে। অনেকে আবার সকালে দুপুরে অন্য কাজ ক'রে বিকেলের ক্লাসে পড়ে। অনেক ভারতীয় ছাত্র এই রকম কোর্স পড়ে। এখানে অবশ্য ইউ-নিয়নের বন্দোবস্ত কম।

লাইব্রেরী-আন্দোলন যে কতবড়—তা এদেশের যে কোন শহরে গেলেই বোঝা যায়। প্রত্যেক পাড়ায় মিউনিসিপাল লাইব্রেরী, চাঁদা নেই; সব বাসিন্দাই মেম্বার। আর বইএর তাকের কাছে গিয়ে বই পছন্দ করাই এখানকার ব্যবস্থা। চুরির ভয় কম; অবশ্য প্রবেশ-পথে পাহারা থাকে।

ইংলণ্ডের লোক রাস্তায় ঘাটে বিশেষ কথা বলে না; কিন্তু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে মেলা মেশা করবার জন্য বিভিন্ন সমিতি বা প্রতিষ্ঠান থেকে বন্দোবস্ত করে। এর প্রথমটা শুরু হয় বিশ্ববিত্যালয়েই (University Overseas Warden-এর দ্বারা)। কয়েকটি রোটারি ক্লাবও নিমন্ত্রণ করেন বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য; সকলের কথা টেপ রেকর্ডিং (tape recording) করা হয়, নানা ভাবে ছাত্রদের নিঃসঙ্গতা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য দূর করবার চেষ্টা করে; তবে তার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ হয় না। এই সব আলোচনায় দেখেছি ভারত সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অতি অল্প, এমন কি ভূগোলের জ্ঞানও বড় কম। মনে হয় যুদ্ধের পূর্বে বেশীর ভাগ লোকেরই বিনা কাজে দেশ দেখার অভ্যাস ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই বাঘ, মশা, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা, সতীদাহ ঘিরেই তাদের প্রশ্ন; অতএব এ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করতে হয়েছে। আমাদের পাঁচসালা পরিকল্পনা সম্বন্ধে এত প্রচার সত্ত্বেও এরা বলে, ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারতীয়েরা ভুল করেছে।

ইতিমধ্যে একদিন প্রফেসারের বাড়ীতে রিসার্চের ছাত্র ও অন্যান্য লেকচারারদের সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ হ'ল। আমি যাওয়া মাত্র আমাকে টয়লেট (Toilet)-এর ঘর দেখিয়ে দেওয়া হ'ল—পরে বুঝেছি অনেকক্ষণ থাকার ব্যবস্থা হ'লে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা এইরূপ। স্ত্রী-কন্যার সঙ্গেও গৃহস্বামী আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা আমাকে আপন ক'রে নিলেন। এক এক ক'রে সকলেই আসতে লাগলেন—সস্ত্রীক অথবা স-বান্ধবী। বান্ধবীদের এ রকম সামাজিক মর্যাদা দেখে এ-সম্বন্ধে আমার ধারণা পালটে গেল। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের বান্ধবীরা সাধারণতঃ নির্বাচিতা ভাবী স্ত্রী। কবে পরীক্ষা শেষ হবে, আর ২১ বছর বয়স পেরুবে—তার অপেক্ষায় থাকে, চাকরির তো অভাব নেই। এখানে একটি নতুন দৃশ্য দেখলাম, শিক্ষক ছাত্রদের গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছেন বিয়ার, শ্যাম্পি, শেরী বা স্যাম্পেন। আমি অবশ্য লেবুর রসের বেশী এগোতে পারলাম না, এটা কেউ অভদ্রোচিত ব'লে মনে করেননি। পুরানো ধাঁচের চুল্লির বুনেদি চাল সকলেই পছন্দ করে। আগুনের পাশে বসে ২০।২৫ জনের গল্প চলতে লাগল। মধ্যে একবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোজ (Buffet dinner) সারা হ'ল—অবশ্য নানা রকমের

খাবার জিনিস ছিল। ৫।৬ ঘণ্টায় নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন ফিরলাম তখন রাত ২টা। অবশ্য আমাকে একজন পৌঁছে দিয়ে গেল।

এক অস্ট্রেলিয়ান লেকচারার, প্রায়ই আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন ও সারাদিন গল্প করবার জন্য আটকে রাখতেন। এ এক রকমের সপ্তাহ-শেষ যাপন করা। এঁদের দুটি শিশুকন্যা—যেন গলার হার। এদের মা কোন সময়েই এদের কাছ-ছাড়া করেন না। আয়া রাখার ব্যবস্থা এ-দেশে নজরে পড়েনি। এই স্তরের লোকদেরও ঝি-চাকরের পাট নেই। গৃহস্থালীর কাজে পুরুষেরা মেয়েদের যথাসম্ভব সাহায্য করে। অধ্যাপকের স্ত্রী St. Alban গির্জার পাদরীর কন্যা। পাদরী-পত্নী বড়দিনের বন্ধে আমাকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যান। বৃদ্ধার জন্ম ভারতে—তাই ভারতীয়দের ভালবাসেন। বলেন, 'কৃষ্ণের প্রেম-ধর্ম ভাল লাগে, কিন্তু তোমাদের কালীকে বুঝি না।' আমি তাঁকে শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত Women Saints of East and West বইখানি উপহার দিলাম। ঠাকুর ও মা সম্বন্ধে এঁর আবছা ধারণা। দেশে ফেরবার আগে আর একবার যাবার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।

অন্য একদিন আর একজন লেকচারারের বাড়ীতেও প্রায় ২।৩ ঘণ্টা ধরে ভারতীয় দর্শন ও নানা দেবদেবী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল। অবশ্য খাবার দেরী হচ্ছে ব'লে কয়েকবারই ক্ষমা চাইলেন। এঁর স্ত্রীরই সব বিষয়ে বিশেষ ঔৎসুক্য। এ রকম সাধারণতঃ আমার নজরে পড়েনি। শুনলাম তিনি স্কুলে পড়ান। লেকচারার ওয়েল্‌সের লোক, যুদ্ধের সময় দক্ষিণ ভারতে এক বৎসর কাটিয়ে এসেছেন। সেই সময় একখানি গীতাও কিনেছিলেন—মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের প্রকাশিত। রাজনীতির কথা আসতে—বিশেষ ক'রে ভারত-বিভাগ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখে ঐ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ রাখা হ'ল।

এক পোলিশ লেকচারার একদিন নিমন্ত্রণ করলেন। এঁর আইরিশ ভার্যা। নিবেদিতার কথা ও আইরিশ মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা তাঁকে জানালে খুব খুশী—তবে নিবেদিতার কথা ইনি কিছু জানতেন না। এই লেকচারারটি ইংরেজের মতো নয়,—কথা বলেন প্রচুর, সঙ্গে সঙ্গে কাজও ক'রে চলেছেন প্রচুর। এঁদের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। সব সংসার একই ছাঁচের; ছোট জমাট গণ্ডি। কিসে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারেন—তার চেষ্টা। আর ছেলেদের চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, স্কুলে শিক্ষা কি ক'রে ভাল হয়—তার চিন্তা; রাজনীতি বা অন্য তত্ত্ব আমল পায় কম। কথায় কথায় ইংরেজের দোষ দেখা, আর আমেরিকার সুখ-সমৃদ্ধির দিকে নজর। এ দিন অবশ্য একটি আমেরিকান ছাত্রীও নিমন্ত্রিত হয়েছিল।

ডিসেম্বর এসে পড়ল। শীত একটু একটু ক'রে বাড়ছে। অমনি উলের মোজা, শাওয়ার-প্রুফ ওভার কোট, টুপি, দস্তানা সব চাপানো হচ্ছে। আস্তে আস্তে—ভোরে তো দূরের কথা, কোন মতে বিছানা ছাড়াই শক্ত হ'য়ে উঠল। কেন না সূর্যদেবও উঠতে লাগলেন ৮।৮॥ টায়। গাছের পাতাগুলি প্রায় সবই ঝরে গিয়ে শুধু ডালগুলো বেরিয়ে থেকে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি ক'রল। মাটির ঘাস কিন্তু সতেজ। সব বাড়ীতেই হয় ষ্টীম পাইপ দিয়ে, নয় চুল্লি জ্বেলে ঘর গরম রাখা হয়। শনি ও রবিবার খুব বেড়াতে হয়, ঘরে টেকা যায় না।

ডিসেম্বরেই একদিন হঠাৎ সন্ধ্যায় সাদা পুষ্পবৃষ্টি দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। অবশ্য যাঁরা কাশ্মীর বা হিমালয়ে গেছেন, তাদের এ

রকম বরফ-পড়ার (snow fall) অভিজ্ঞতা আছে। দু-দিন ক্রমান্বয়ে বরফ পড়ল, সাত দিন বাদে যখন বরফ গলতে আরম্ভ ক'রল, তখন রাস্তায় কাদা হ'ল। অবশ্য বালি দিয়ে রাস্তা চলার সুবিধা ক'রে দেওয়া হয়।

বড়দিন এসে পড়ল। অনেক আগে থেকেই উদ্যোগ-আয়োজন—আমাদের দুর্গোৎসবের মতো। খাওয়া-দাওয়া, বেশ-ভূষা আমোদ-প্রমোদ, কার্ড-বিনিময় এই সবই বিশেষ অঙ্গ। বাইরের লোক দু-চার জনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। বাকী ছুটিটা কাটাতে গেলাম লণ্ডনে।

এখানকার মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী-গুলি সত্যই চিত্তাকর্ষক। এরা যে পুরাতনের কত বড় পূজারী, এখানে তা বেশ বোঝা যায়। বর্তমানে যে জিনিসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাকে গুদামে ফেলে দেওয়া হয় না; তার স্থান মিউজিয়ামে—যাতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ দর্শকের চোখে আপনি ধরা পড়ে। শিল্প, বিজ্ঞান, জীবজন্তু, চিত্রকলা—সব বিষয়েই এইরূপ।

পার্লামেণ্ট বা ওয়েষ্টমিনস্টার প্যালেস দেখার সুযোগ হ'ল। গত যুদ্ধে যা ভেঙেছিল তা এমনভাবে মেরামত হয়েছে, যে বোঝা যায় না—কোথাও ভেঙেছিল। গাইড্ সব দেখাল—এরা যে নূতন আইন অপেক্ষা পুরাতন রীতি বেশী পছন্দ করে, তা এদের প্রত্যেক কথাতেই বোঝা যায়। প্রথম চার্লস্ (Charles I) ১৬শ শতাব্দীতে কবে 'হাউস অব কমন্সে' ঢুকে-ছিলেন, তারপর তাঁকে প্রজাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল; সেজন্য এখনও নিয়ম: কোন রাজা না ব'লে এখানে ঢুকবেন না। এ রকম নানা কথা প্রচলিত আছে।

লণ্ডনের আর সব দ্রষ্টব্যের কথা ও রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারের বিবরণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন-প্রসঙ্গ 'উদ্বোধনে'র পাতায় পূর্বে (৭১তম বর্ষ, পৃঃ ১০১) প্রকাশিত হয়েছে।

ফিরে এসে আবার পূর্ণ উদ্যমে পড়াশুনা ও কাজকর্ম চলল। এর ফাঁকে একটি দলের সঙ্গে এক শনিবার ২৫ মাইল পূর্বে ছোট্ট আউস্ (Ouse) নদীর দুধারে ইংর্ক (York) শহরে ঘুরে এলাম। সেদিন খুব কুয়াশা। এক সময়ে ইয়র্কই ছিল ইংলণ্ডের রাজধানী। রোম্যান, স্যাক্সন, ডেনদের আমল থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরটি বাণিজ্য, সংস্কৃতি এমন কি ধর্মপ্রচারেরও কেন্দ্র ছিল। তখন চারিদিক দেও-য়ালে ঘেরা ছিল। অনেক জায়গায় চওড়া দেওয়াল এখনও বর্তমান। ইংলণ্ডের সব থেকে পুরানো ক্যাথিড্রাল—অর্থাৎ উপাসনা-মন্দির—ইয়র্কমিন্স্টার (York Minster) এই শহরেই। ৭ম শতাব্দীতে এর গোড়া পত্তন—পরে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত একটু একটু ক'রে এটি নির্মিত হয়েছে। বিভিন্ন মূর্তি-খচিত কাঁচ (Stained glass) বিশেষ দর্শনীয়—তার মধ্যে পাঁচ ভগিনীর জানালা (Five sisters' window) খুবই সুন্দর। যুদ্ধের সময় এগুলি খুলে রাখা হয়েছিল; আবার লাগানো হচ্ছে। পাত্রী মহাশয় সব দেখালেন—ইঞ্চিফুটের হিসাবে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চ-তায় এটি পৃথিবীতে কোন্ স্থান অধিকার করে—তাও জানালেন। প্রার্থনা-স্থানটি এত বড়, যে একটি টেনিস-লন হ'তে পারে। রেলের ও সাংস্কৃতিক দুটি মিউজিয়াম দেখলাম। শহরের মধ্যে উঁচু ঢিপির ওপর সেকালকার পাহারা মঞ্চ (Clifford's Tower) এখনও রয়েছে।

ইয়র্ক শহরটি রেলের কেন্দ্র, কিন্তু বাণিজ্য বা শিল্প-কেন্দ্র নয়। তাই ধোঁয়ার উপদ্রব নেই—বেশ পরিষ্কার। সরু ছ-ফুটি গলির (Shambles) প্রাধান্য। এগুলি আবার পুরাতনের স্মৃতি, তাই গলির ধারে পুরাতন কাঠের বারান্দা বার-

করা বাড়ীগুলিও ঠিক রাখবার চেষ্টা,—গভর্নমেণ্ট টাকা দেয়; ভাল ভাল কাপড় গহনার দোকান এরই মধ্যে। আর একটা মজার কথা—এখানে রাস্তায় মোটর অপেক্ষা সাইকেলই বেশী দেখা যায়—সম্ভবতঃ সরু গলির জন্য। সকলে মিলে হোটেলেই উঠলাম—নিচু নিচু ঘর, বিশেষ খাদ্য ইয়র্কশায়ার পুডিং (ময়দার বড়া)। সন্ধ্যার পর ফিরে এলাম।

শীতের ছোট দিন, বাইরে যাওয়া অসুবিধা ব'লে এক রবিবার আমরা একদল লীড্‌স্ টাউন-হলে কনসার্ট শুনতে গেলাম। হলে ঢুকেই একটু আশ্চর্য হলাম। বিরাট হল, ঝাড় দিয়ে সাজানো, চমৎকার কারুকার্য। চারতলা সমান গ্যালারী; অন্ততঃ তিন-চার হাজার লোক। লিভারপুল রয়েল ফিল্‌হারমনিক অরকেস্ট্রা—দলে প্রায় একশ' জন বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে আছেন। কন্‌ডাক্টর আসতেই হাততালির রোল দু-মিনিট ধরে চলল—একটু আওয়াজ বেরুতেই সব নিস্তব্ধ। কন্‌ডাকটরের ছড়ির তালে তালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যন্ত্রী তার যন্ত্র বাজিয়ে চলল। মধ্যে ১৫ মিনিট ক'রে দুবার বিরাম দিয়ে তিন ঘণ্টাকাল এরা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। বিশেষ ক'রে Beethoven (বিঠোফেন : ১৭৭০-১৮২৭)-এর Violin concerto আমার ভাল লেগেছিল। আস্তে আস্তে সুরে সুরে উন্নত ঝঙ্কার, নানা পর্দায় সুর সৃষ্টি ক'রে তালে তালে মনকে মুগ্ধ করে।

বিজয়ার পর এখানে কিছু অনুষ্ঠান হয়নি ব'লে দুঃখ হয়েছিল; ২০শে থেকে ২৬শে জানুআরি প্রজাতন্ত্র-সপ্তাহে ভারতীয় ছাত্রসমিতি তা পুষিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিন অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আয়েঙ্গার (Visiting Professor) ২৬শে জানুআরির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। পরদিন ছাত্রদের মধ্যে থেকে কয়েকজন রাজা রামমোহন, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, বিনোবা সম্বন্ধে ছোটোখাটো বক্তৃতা দিলেন। খেলাধূলা এবং একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল। অবশেষে ২৬শে Republic Day Dinner—লুচি পোলাও মাংস। ১০০ জন ইংরেজও যোগ দিয়েছিলেন। পরদিন 'রামায়ণ' ছায়াছবি (Shadow-play) দেখানো হ'ল।

এদেশে আবার নতুন ক'রে ক্যাথলিক মিশন (Catholic Mission) নিজেদের দেশের দিকে নজর দিয়েছে। খৃষ্টানদের যাতে ধর্মে একটু মতি হয়। ইউনিভার্সিটিতে ৭ দিন ধরে দুটি বড় বড় ধর্মযাজক (Missioner) Rev. Father Huddleston ও Rev. Dr Routley একবেলা ছাত্রদের জন্য ও একবেলা অন্য লোকেদের জন্য বক্তৃতা ক'রে গেলেন। বিষয় (১) Christ and the World's Problems, (২) Christ and the Enquirer's Difficulties, (৩) Creation, (৪) Incarnations, (৫) Atonement, (৬) The Holy Spirit, (৭) The Sacrament.

দু-একটি শুনেছিলাম। যদিও সব ধর্মের ছাত্রদের উদ্দেশ ক'রে বলা, তবু খৃষ্টানী গোঁড়ামি—যথা, যিশু ছাড়া অন্য কোন ত্রাতা নেই—এই ভাবই বক্তৃতার মধ্যে বেশী। গির্জাতেই খৃষ্টের জমাট ভাব বর্তমান—এইটাই বোঝালেন। ঐ দেশীয় ছেলেদের মধ্যে ধর্মভাব আমাদের দেশের ছেলেদের অপেক্ষা বেশী বলেই মনে হয়েছে। দু-চার জনকে গির্জায় অবৈতনিক ছেলে পড়ানোর কাজ করতেও দেখেছি। তবে প্রোটেস্টাণ্ট গির্জা ক্রমশঃ আরও হীনবল হচ্ছে। এর প্রমাণ আয়ার্লণ্ড গিয়েও পেয়েছি—এক পাদ্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে। আরও ১০।১৫টি সম্প্রদায়ের অবস্থাও এই রকম।

শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে জানুআরির শেষে ও ফেব্রুআরিতে সত্যই অসহ্য হয়েছিল। কিছুদিন গরম প্যাণ্টের নীচে গেঞ্জিও পরতে হয়েছিল। রাত্রে বিছানায় দুটি গরম জলের ব্যাগ, চারটি কম্বল। বাইরে বেরুলে আঙুলের ডগাগুলি অসাড় হ'য়ে পড়ত। মধ্যে দু-তিন বার তুষারপাতও দেখলাম। ঝির ঝির ক'রে সাদা পুষ্পবৃষ্টির মতো, প্রথমটা বেশ লাগে। একবার টানা দিন দশেক চারিদিক সাদা বরফে ঢাকা থাকার পরে হঠাৎ একটা আতলান্তিক মহাসাগরীয় হাওয়া জলীয় বাষ্প বয়ে নিয়ে এসে তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি বাড়িয়ে দিল। তখন বরফ গলে আবার একটু একটু ক'রে সবুজ ঘাসের মুখ দেখে সকলেরই আনন্দ। তবে এর পরই রাস্তায় কাদা ও আকাশে বৃষ্টি—পথ চলতে কাঁদিয়ে দেয়।

বরফের সময় পাখীদের বড় মুস্কিল। লোকে মাঠে বরফের উপর খাবার রেখে যায়। অনেক পাখী মরেও বটে—তবে বেশীর ভাগ পাখীই দেশছাড়া হয়।

ক্রমে একটু একটু ক'রে শীত কমতে আর বেলা বাড়তে লাগল। কুয়াসাও আর তেমন হয় না। মার্চের শেষে লীড্‌স্ পরিবহন সংস্থা চার পাশের ৪০।৫০ মাইল অঞ্চল বাসে ক'রে বেড়াবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন Wharf-dale (হোয়ার্ফ নদীর উপত্যকা) ঘুরে এলাম চার পাঁচ জন বাঙালী ছেলে। পথের দৃশ্যগুলি সত্যই খুব ভাল লাগল। ওট্‌লি, ইল্‌কৃলি, বোল্‌টন এবি (Abbey) হ'য়ে গ্রাসিংটন এলাম। নামগুলি বেশ। সরু নদীর পাশে পাশে রাস্তা আর দুধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ মাঠ ক্রমেই উঠে গেছে পাহাড়ের ওপরে। মাঠগুলি বরাবর পাথরের বেড়া দিয়ে প্লটে ভাগ করা—গরু ভেড়া মুরগী চরাবার জন্য। এরাই এখানকার পণ্য। অনেকে নদীর ধারে অথবা পাহাড়ের গায়ে পিক্‌নিক্ করতে এসেছে। পথে ছোট ছোট গ্রাম পড়ল। দরিদ্রের কুটির—পাথর আর টালি দিয়ে তৈরী। ভেড়া মুরগী পালনই এদের কাজ; দুধের ব্যবসাও আছে। পথের শেষ প্রান্তে একটা পাথরের খাদ। খাদে কাজ ক'রে আর যাত্রীদের অর্থে এদের বেশ চলে। হঠাৎ মেঘ ক'রে ঝির ঝির বৃষ্টি এল—অনেকেরই দিনটি নষ্ট হ'ল। আমি ভিজে ভিজেই বেড়ালাম, তার জন্যে পরে একটু সর্দি জ্বর হ'ল।

গুড্ ফ্রাইডে এসে পড়ল। ঐ দিন লণ্ডন থেকে স্বামী মুখ্যানন্দ লীড্‌সে এলেন উইটন্ (Weeton) যাবার পথে। স্টেশনে দেখা হ'ল, সঙ্গে তাঁর host (আমন্ত্রণকারী)।

পরদিন আমারও সেখানে নিমন্ত্রণ হ'ল। ভদ্রলোকটি যুদ্ধের সময় তিন বৎসর ভারতে ছিলেন—করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে যাতায়াত করতেন। এখানে স্কুল মাষ্টার। মা ও ছেলের ছোট্ট সংসার। বাড়ীটি ভারতীয় কায়দায়। ঘরের ভেতর সব ছবিই প্রায় ভারতের। গ্রীষ্মাবকাশে ভদ্রলোক দক্ষিণ আমেরিকায় পর্বতারোহণে গেছলেন তার রঙীন চলচ্চিত্র দেখালেন; সেখানকার পাহাড়ীরা ঠিক তিব্বতীদের মতো। বৃদ্ধা মা ভারতীয় খানা অর্থাৎ খিচুড়ি, পাপর, পান্তুয়া স্বহস্তে তৈরী ক'রে খাওয়ালেন। লীড্‌স্ থেকে যদিও ১২।১৪ মাইল দূর—ইলেকট্রিক লাইট নেই রাস্তায়—কারণ এরা গ্রাম্য ভাবে থাকাই পছন্দ করে। রেল স্টেশনটিও তেমনি,—লোকজন নেই, বিনা টিকিটে উঠতে হ'ল। নামবার সময় চেকারকে ভাড়া বাবদ এক শিলিং দিয়ে নেমে পড়লাম। (ক্রমশঃ)

বেদবিধি ও ভক্তিধর্ম

অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার

হিন্দুধর্ম বেদবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। দশবিধ সংস্কার বেদবিধির অনুগামী। গৃহস্থ্যাদি বৈদিক অনুষ্ঠান-বিধি ও মন্বাদি স্মৃতি-অনুমোদিত এই সকল সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতি শুদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক পরম শ্রেয় লাভ করিবেন, ইহাই বৈদিক ধর্ম। মনু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন:

বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্যঃ শরীর-সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহা-যজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥

বেদবিধি অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং একমাত্র এই ধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারাই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে:

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণম্॥

বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণকারী পুরুষ কর্তৃক সেই পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হইবেন। তাঁহার সন্তোষ বিধানের অন্য পন্থা নাই।

ভক্তিধর্ম কিন্তু এই বেদবিধি-সম্মত মার্গ অনুসরণ করিয়া চলে নাই। দক্ষিণ ভারতে তীর্থযাত্রা-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রায় রামানন্দের সহিত যখন সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, তখন রামানন্দ সর্বপ্রথমে বিষ্ণুপুরাণের ঐ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কিন্তু বলিয়াছিলেন, 'এহো বাহ্য আগে কহ আর।'

জাতি, কুল, মান, এই সকল ভক্তিধর্মে অকিঞ্চিৎকর। 'চরিতামৃতে' কথিত হইয়াছে:

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
পণ্ডিত কুলীন মানীর বড়ই অভিমান॥

বাইবেলে আমরা ভগবান্ ঈশার বাণী শুনিতে পাই—দীনাত্মারাই ধন্য, কারণ তাঁহাদের ঈশ্বরদর্শন হইবে।

নীলাচলে রথস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তব করিতে করিতে মহাপ্রভু আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন:

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি। আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থী নহি, সন্ন্যাসীও নহি। আমার পরিচয় হইতেছে এই: যিনি পূর্ণরূপে পরম আনন্দময় অমৃতের সমুদ্রতুল্য, সেই গোপীনাথের পদকমলের দাসের আমি দাসানুদাস।

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে শ্রীভগবান্ লাভের জন্য জাতি বা বর্ণ অকিঞ্চিৎকর। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং যিনি ভক্তিমান্ তিনি চণ্ডাল হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ।

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম, তিনি চণ্ডাল হইলেও পূজ্য। যিনি তোমার নাম

কীর্তন করেন তিনি তপস্যা, যাগযজ্ঞ, তীর্থস্নান, বেদপাঠ, সমস্তই অনুষ্ঠান করেন।

পুনশ্চ ঐ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে :

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্তনাদ্
যৎ প্রহ্বণাদ্ সংস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥

কোন এক সময়ে যাঁহার নাম শ্রবণ বা কীর্তন করিলে বা যাঁহাকে নমস্কার বা স্মরণ করিলে কুক্কুরমাংস-ভোজীও সদ্য সোমযাগের যোগ্যতা লাভ করে, হে ভগবন্, সেই তোমাকে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?

'হরিভক্তি-বিলাসে' উক্ত হইয়াছে :

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

অভক্ত চতুর্বেদে নিষ্ণাত ব্যক্তি আমার প্রিয় নহেন, কিন্তু ভক্ত চণ্ডাল আমার প্রিয়। তাঁহাকে দান করিবে, তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে, আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপ পূজ্য।

আচার্য শঙ্কর বিচার করিয়াছেন, ব্রহ্ম-বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কিনা; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এই বিচার একেবারেই অবান্তর। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভের জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন : হে অর্জুন, আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা পাপযোনি (চণ্ডালাদি)—স্ত্রী, বৈশ্য তথা শূদ্র—তাহারা সকলেই পরমা গতি লাভ করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীতেও এই কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেব প্রত্যহ প্রাতে সমুদ্রস্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং তাহার পরে ঠাকুর হরিদাসের বাসস্থানে গিয়া তাঁহাকে দর্শন দিতেন। হরিদাস মুসলমান-গৃহে প্রতিপালিত বলিয়া মন্দির-দর্শনে যাইতেন না, তাঁহার আবাস হইতে মন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন। মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস কুণ্ঠিত হইতেন।

হরিদাস কহে, প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন :

প্রভু কহে—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হইয়াও ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য এইরূপে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের আলবারগণের মধ্যেও আমরা ভক্তিধর্মের এই মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। শ্রীভগবানে প্রেম লাভই পরম পুরুষার্থ—এই কথা তাঁহারাও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয়ও ছিলেন, তবুও তাঁহারা শ্রীশ্রীবরদরাজের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অপূর্ব চরিতকথা শ্রবণ করিয়া এই প্রতীতি জন্মে যে ভক্তিধর্মে জাতিকুলের কোন গুরুত্ব নাই। দাক্ষিণাত্যের আলবারগণ রচিত স্তোত্রাদি 'তামিলবেদ' নামে পরিচিত এবং ভক্তিধর্মের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্যও কাঞ্চীপূর্ণ নামক এক শূদ্রবংশীয় মহাত্মার সাহচর্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার প্রার্থনাও জানাইয়াছিলেন। কাঞ্চীপূর্ণ অবশ্য তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন নাই,—শ্রীনারায়ণ তাঁহার জন্য শীঘ্রই গুরু প্রেরণ

করিবেন, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। রামানুজ এই শূদ্র মহাত্মার প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ভক্তিধর্মের পরাকাষ্ঠা যাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় সেই ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের মুরলীরবে আকৃষ্ট হইয়া গৃহধর্ম ছাড়িয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীভগবান্ তাঁহাদের নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য বলিয়াছিলেন:

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাং চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্॥

একান্তচিত্তে পতির শুশ্রূষাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম। পতির আত্মীয় স্বজনের এবং সন্তানগণের সেবাই নারীজাতির কর্তব্য। ইহার উত্তরে গোপীগণ শ্রীভগবানের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন:

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্যেবমেতদুপদেশ পদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠ ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

পতির, অপত্যের এবং পতির সুহৃদ্গণের অনুবৃত্তি করা স্ত্রীগণের পরম ধর্ম—আপনি বলিলেন, ইহা ঠিক বটে। তবে আপনি সকলের প্রিয়তম, সমস্ত জীবের বন্ধু এবং আত্মা, সুতরাং আপনাকে কামনা করাই জীবের কর্তব্য।

তাঁহারা আরও বলিয়াছিলেন যে তিনিই তাঁহাদের পরম প্রিয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর্তিদায়ক পতি ও সুতাদির সেবা করিয়া কি লাভ হইবে? তাঁহাদের উক্তির মর্ম এই—ভক্তিধর্মে পাতিব্রত্যাদি বিধিরও স্থান নাই। শ্রীভগবানের জন্য সমস্ত সম্বন্ধই ছিন্ন করা যাইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন: ঈশ্বরের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদিয়াছে, কর্তব্য-ধর্মের তাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং লোকধর্ম অপালনের জন্য তাঁহার কোন প্রত্যবায়ও নাই। ভক্ত বর্ণধর্মাদির অতীত, ভক্তের জাতি নাই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বেদবিধি লৌকিক ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও ভক্তিধর্ম উহার অতীত। ভক্তের জাতি-বর্ণের প্রশ্ন অবান্তর, তিনি কি পরিমাণে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন, সেই প্রশ্নই বড়। বিদুর শূদ্রাণীপুত্র হইয়াও পরমপূজ্য ছিলেন। ব্রজের গোপ-গোপীগণ তাঁদের প্রেমের রজ্জু দিয়াই শ্রীভগবান্‌কে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ভক্তি দেখিয়াই ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব প্রার্থনা করিয়াছিলেন:

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

যে ব্রজগোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্যপথ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, উদ্ধব সেই গোপীগণের চরণরেণু-ধন্য শ্রীবৃন্দাবনের গুল্মলতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

ভক্তের এই মাহাত্ম্য অকারণে কীর্তিত হয় নাই। প্রকৃত ভক্ত ভগবান্‌কেই চাহেন, মোক্ষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট তুচ্ছ। শ্রীভগবান্ কর্তৃক বর প্রার্থনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় ধ্রুব বলিয়াছেন:

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

আমি উত্তম পদ পাইবার আশায় তপস্যায় রত হইয়া দেবতা এবং মুনীন্দ্রগণেরও অপ্রাপ্য

তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। কাচ খুঁজিতে গিয়া আমি দিব্যরত্ন পাইয়াছি। হে প্রভু, আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অন্য বর চাহি না।

'চরিতামৃত'কার মোক্ষবাঞ্ছাকে 'কৈতব-প্রধান' বলিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই। নিজের উপরে ভক্তভাব আরোপ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শিক্ষাষ্টকে' প্রার্থনা করিয়াছেন:

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

ইহাই ভক্তের প্রার্থনা।

ভক্ত চাহেন শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হউক, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হউক, শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হউক।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

বাংলার ভক্তকবি নীলকণ্ঠের সঙ্গীতেও এই প্রার্থনা মুখরিত হইয়াছে:

আর কতদিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার।
কবে বলতে হরিনাম, শুনতে গুণগ্রাম
অবিরাম নেত্রে বইবে জলধার।

একটি আখ্যানের ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্তের ভাবটি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একবার প্রকৃত ভক্তের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য দ্বারকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসুখের ভান করিয়া নারদকে বলিলেন, ভক্তের পদরজ পাইলে তাঁহার ব্যাধি প্রশমিত হইবে। নারদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় আত্মীয় স্বজনগণের নিকট যাইয়া পদরজ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই পদরজ দিতে সাহসী হইলেন না। সকলেই বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের স্বজন হইলেও গুরুজন, তিনি স্বয়ং নররূপী নারায়ণ, তাঁহাকে পদধূলি দিয়া কি আমরা নরকে যাইব? নারদ তখন শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নন্দ যশোদা এবং ব্রজের অন্যান্য গোপ-গোপীগণ সকলেই কৃষ্ণের সংবাদ জানিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিলেন। নারদ তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত ব্যাধির ও তাঁহার অদ্ভুত ঔষধের কথা তাঁহাদিগকে জানাইতেই সকলে তৎক্ষণাৎ পদরজ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ নিরাময় হইলেই তাঁহারা সুখী হইবেন, সে জন্য তাঁহারা চিরকাল নরক বাস করিতেও প্রস্তুত। নারদ তাঁহাদের এই অপূর্ব ভক্তিভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে প্রকৃত ভক্তের মর্ম তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই জন্যই কৃষ্ণপ্রেমকে অপ্রাকৃত বলা হইয়াছে। এই জন্যই ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় এবং ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের এত মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ভাষায় ভক্তকে প্রণতি জানাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি:

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

অন্বেষণ

শ্রীমতী বিভা সরকার

কোন দিন শ্রান্ত মনে
অন্য কিছু অন্বেষণে
জীবনের ছোট অবকাশে- –
যখন জাগিছে শুধু
নিঃসঙ্গ একটি তারা
সীমাহারা সাঁঝের আকাশে,
খুঁজেছ কি বসিয়া একেলা
সাঙ্গ করি বেচা-কেনা পালা
বিক্ষুব্ধ এ নগরীর ভিড়ে ?
আশ্রয়-ভিক্ষুক সম
আপনার হৃদয়ের
নিরালায়—নিভৃতির নীড়ে ?
পথশ্রান্ত হে উদ্‌ভ্রান্ত মন,
খুঁজে পাবে জীবন-দর্শন—
চিত্তমাঝে অন্য কিছু নয়,
আকাশে একটি তারা
কোন্ মৌন-রূপে হারা
নির্নিমেষ শুধু চেয়ে রয় !
ক্ষণকাল হারাইয়া যেও
সকল সান্ত্বনা হ'তে শ্রেয়
দু-দণ্ড সে আশ্রয় শান্তির।
দিনান্তের স্তব্ধ সন্ধিক্ষণে
ছায়াপথ সুনীল গগনে
চোখবোঝা দিনান্ত পৃথ্বীর।

প্রার্থনা

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

বহু পথ ঘুরে তোমারি দুয়ারে
এসেছি ক্লান্ত চরণে,
লহ কোলে তুলে করুণাময়ী গো
চাহগো করুণা নয়নে।

পথেরি চলায় শ্রান্ত এ দেহ
ক্লান্তি এসেছে পরানে
জীবন ঘিরিয়া অবসাদ ঘোর
নামিয়া আসিছে নয়ানে।

তব স্নেহ-কোলে ঘুমাক এ প্রাণ
মৃত্যুর অবগাহনে ;
আমি, ডুবিয়া রহিব যুগ যুগ ধরি,
স্বরগ-সুষমা-স্বপনে।

সমালোচনা

Letters of Swami Vivekananda (New Edition)—Advaita Ashrama, 4 Wellington Lane, Calcutta 13. Pp. 552, Price Rs. 6·00

স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণী তাঁহার প্রতিটি পত্রে মূর্ত হইয়া আছে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের তথা বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কি রূপ হইবে এবং তাহার জন্য কি কি উপাদান প্রয়োজন, পত্রগুলিতে তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে স্বামীজীর বাণী বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে, স্বাধীন ভারতেও তাহার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে নাই।

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—একদল ত্যাগী দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক। সেই যুবকদল ভারতকে তাঁহার পরিকল্পিত ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং বিশ্বসভ্যতার দরবারে ভারতের জন্য যে মহিমময় আসন নির্দিষ্ট আছে—সেইখানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইহাই জগতে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনের উপায়।

আলোচ্য নূতন সংস্করণে স্বামীজীর পত্রসমূহ হইতে ২২৯টি পত্র নির্বাচিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, এই পত্রগুলিতে স্বামীজীর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত। পূর্ব পূর্ব সংস্করণে কোন্ পত্র কাহাকে লিখিত—জানা থাকা সত্ত্বেও—তাহা সর্বত্র উল্লিখিত ছিল না, এই সংস্করণে সেই নামগুলি সংযোজিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বামীজীর সমস্ত পত্রের সহিত পরিচিত হইতে চান, তাঁহারা 'The Complete Works of Swami Vivekananda' অনুশীলন করিবেন। স্বামীজীর উদ্দীপনাময় পত্রগুলি নর-নারীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বদেশের এবং বিশ্বজগতের সেবায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা ৩৯৮, মূল্য পাঁচ টাকা।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-রচয়িতা 'মাস্টার মহাশয়ের' পূত সঙ্গে লেখক দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ভাব পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দিনলিপিতে সযত্নে রক্ষিত ছিল, তাহাই আজ গ্রন্থাকারে 'শ্রীম-দর্শন'-রূপে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের কিছু নূতন কথা এবং স্বামীজী-প্রমুখ তাঁহাদের লীলাসহচরগণের কথা রহিয়াছে, 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃতের' ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষৎ গীতা ভাগবত প্রভৃতির আলোচনাও ইহাতে আছে। পুস্তকের প্রারম্ভে একটি সুলিখিত ভূমিকার (২২ পৃষ্ঠা) পর মাস্টার মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী (১৩ পৃঃ) সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভূমিকায় সাধু ও চলিত ভাষা মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় পাঠে অসুবিধা হয়।

দেব-গীতি—মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়, ৩৯ দেব লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১১৪; মূল্য টাকা ১·৫০।

সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গান সাধকের অন্তরের ভাব-নির্ঝর। তাঁহার

গুরু-স্তব 'ভবসাগরতারণকারণ হে' প্রতিদিন সহস্র কণ্ঠে গীত হয়।

আলোচ্য পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, মায়ের গান, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন, আগমনী, বিজয়া, শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীত, হরিসঙ্কীর্তন প্রভৃতি অধ্যায়-ক্রমে সন্নিবেশিত। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। গ্রন্থশেষে শ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তনের অনুরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামকীর্তন (আদি মধ্য ও অন্ত্যলীলা) ভক্তগণের বিশেষ ভাল লাগিবে।

শ্রীশ্রীকালীপূজাপদ্ধতি—স্বামী কৈবল্যানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, পোঃ লাক্‌সা, বারাণসী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৫+পরিশিষ্ট ৩২। দক্ষিণা টাকা ১·২৫।

বহু দিন হইতে শ্রীশ্রীকালীপূজার একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তকের অভাব ছিল, শ্রীশ্রীকালীপূজাপদ্ধতি প্রকাশিত হওয়ায় সে অভাব দূরীভূত হইল।

আলোচ্য পুস্তকে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজার প্রয়োগ-সমেত দক্ষিণাকালী, বামাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালীর পূজাদি বিধিবদ্ধভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রটন্তী ও ফলহারিণী কালীপূজা, দেবীর ষোড়শ যাত্রা, শতোপচার, পঞ্চতত্ত্ব-সংস্কার, পঞ্চবলি, শান্তিস্তোত্র, বীরহোম প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সীমান্তের সপ্তলোক: শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় প্রণীত; প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২; ১৫৩ পৃষ্ঠা; মূল্য তিন টাকা।

শিক্ষাবিদ্ লেখক শুধু দেশভ্রমণের জন্যই যে সীমান্তের সপ্তলোক ঘুরেছেন, তা নয়; তিনি গেছেন সাহিত্যিকের মন নিয়ে—তার সঙ্গে সমাজসেবীর চোখ! তিনি দেখেছেন দেশ, তার থেকে বেশী দেখেছেন দেশের মানুষ। বিশাল ভারতের প্রান্তে প্রান্তে বিশেষত সীমান্তে আমাদের যে সব প্রতিবেশীরা আছেন, তাদের কথাই তিনি সহানুভূতিশীল মন নিয়ে বলেছেন—দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রপারে সিংহল থেকে উত্তরে হিমালয়ের সিকিম ভূটান মুশৌরির কথা তিনি বলেছেন, অবিস্মরণীয় আসামের কথা বইখানির অনেকখানি জুড়ে আছে—নীলাচলবাসিনীর কামাখ্যার বর্ণনা, চা-বাগানের কুলিদের জীবন-কথা, বনজঙ্গলে দুঃসাহসের যাত্রা নিখুঁত ভাবে চিত্রিত। স্থানে স্থানে ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাস বেশ সাবলীল ভাবে মিশে গেছে।

দুটি বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথম: একটি সূচীপত্রের অভাব। দ্বিতীয়: অমর কণ্টক মধ্যভারতে। দশখানি চিত্র পুস্তকের বিষয়-বস্তু পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরে।

অপরূপা: (শিশুদের বার্ষিক), প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা ৯, ৫১২ পৃষ্ঠা মূল্য পাঁচ টাকা।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও 'দেবসাহিত্য কুটীর' বাংলা দেশের শিশুজগৎকে উপহার দিয়েছেন পূজাবার্ষিকী 'অপরূপা'। বহু গল্প কবিতা ছবির সম্ভারে ভরে উঠেছে বিরাট গ্রন্থখানি। শিশুদের সঙ্গে 'বড়'-রাও বইখানি পড়ে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন।

নবপ্রকাশিত পুস্তক

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত, উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১০, মূল্য চার টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ত্যাগী শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের ঘটনাবহুল বিস্তৃত জীবনী সহজ সরস ভাষায় লিখিত। ১৮।১৯ খানি ছবি ও একটি মানচিত্র সন্নিবেশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে, তিব্বতে ও হিমালয়ে, স্বামীজীর সঙ্গে, জামনগরে, রাজপুতানায়, মুর্শিদাবাদের পথে, দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য, অনাথ আশ্রম স্থাপন, সেবাব্রতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা, স্বামীজী-প্রসঙ্গে প্রভৃতি ২২টি অধ্যায়ে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজের জীবন-বর্ণনাক্রমে মঠ ও মিশনের পুরাতন অনেক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচরগণের বহু প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ সেবাধর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিকটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি সাধক, ভক্ত, কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র, সমাজসেবী সকলকেই স্ব স্ব জীবনপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে: প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গামাতার পূজা গম্ভীর পরিবেশে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজার কয়দিনই আকাশ প্রায় মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। মহাষ্টমীর দিন ৬,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন, কয়েক সহস্র ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শাখাকেন্দ্রে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কাঁথি, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, মালদহ, মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ, রহড়া, বরিশাল, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম,) বালিয়াটি, বোম্বাই, শিলং, শিলচর এবং সোনার-গাঁ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কার্যবিবরণী

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেন্টস্ হোম—বেলঘরিয়া (২৪ পরগনা)—এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৯ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে ছাত্রাবাসে ৮৮ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৫৭ জন ফ্রি, ৯ জন আংশিক খরচ দিয়া ছিল।

পরীক্ষা-ফল: এম-এ পরীক্ষার্থী এক জন ছিল, সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ৩ জন বি-এ পরীক্ষার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ উত্তীর্ণ ২ জন। ৩ জন বি. এস-সি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জনই কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ। আই-এ ১০০% উত্তীর্ণ; আই. এস-সি-তে ২৩ জনের মধ্যে ২০ জন উত্তীর্ণ, ১৫ জন প্রথম বিভাগে (১টি সরকারী বৃত্তি সহ)।

কলিকাতা ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন কলেজের ৪৭টি দরিদ্র ছাত্রকে পরীক্ষা-ফি বাবদ ৬৭৫ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়।

আশ্রম-লাইব্রেরি : ৩০৫০ সুনির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে ছাত্রেরা ৭৫১টি পড়িবার জন্য লইয়াছিল এবং পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাহাদিগকে ৬৪৭ খানি গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া হয়। ৬টি দৈনিক ও ১৩টি সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত রাখা হইয়াছে।

পুরী ভুবনেশ্বর ব্যতীত কৃষ্টি ও ঐতিহ্য-সম্পন্ন আরও কয়েকটি স্থানে বিদ্যার্থীরা এই বৎসর ভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। নববর্ষ উপলক্ষে ও বিজয়া-সম্মিলনে আশ্রমের বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে।

শিল্পপীঠ : এই লাইসেন্সিয়েট এঞ্জিনিয়রিং বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ খৃঃ জুলাই মাসে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর আনুষ্ঠানিক ভাবে ইহার উদ্বোধন করেন ১৯৫৯ খৃঃ ডিসেম্বরে। শিল্পপীঠের দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে, ছাত্রসংখ্যা ৩৬০।

শ্যামলাতাল : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৫৯ খৃঃ (৪৩ তম বর্ষের) কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে অবস্থিত হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে সেবাশ্রমটি অবস্থিত। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বতীয়দের একমাত্র চিকিৎসার স্থান।

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ : বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা (bed) আছে; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই অল্প-সংখ্যক শয্যা কিছুই নয়, আমরা এ বিষয়ে বদান্য ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এ পর্যন্ত সেবাশ্রমে উভয় বিভাগে মোট ১,৯৩,৩৬৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

পশুচিকিৎসালয় : গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য এই বিভাগটি খোলা হয়। এ পর্যন্ত ৫০,৮৭১ পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। এখানে অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার) : প্রতি-শনিবার নিম্নোক্ত সূচী অনুযায়ী পাঠ ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল :

বিষয়	বক্তা
১৯৬০, মার্চ :	
শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
গীতা	„ সাধনানন্দ
শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, ও স্বামীজী	শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
ভাগবত	পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী
এপ্রিল :	
মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী,
ভক্তিতত্ত্ব	স্বামী জীবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা কথকতা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দের বাল্যলীলা	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল,
শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত	স্বামী দেবানন্দ
ও ছায়াচিত্রে 'মা'	শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়
মে :	
ভাগবত	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
গীতা	„ সাধনানন্দ
মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী,
ভাগবত	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
জুন :	
সনাতন ধর্ম ও যুগধর্ম	„ নিরাময়ানন্দ
যুগধর্মে আচার্য বিবেকানন্দ	„ সম্বুদ্ধানন্দ
ধর্ম ও ইহার প্রয়োজনীয়তা	„ ভূতেশানন্দ
মহাভারত	অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী,

বক্তৃতা-সফর

এ বৎসরের প্রথম হইতে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বোম্বাইএর বাহিরে যে সকল স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার একটি নির্বাচিত সূচী প্রকাশিত হইল; অধিকাংশ বক্তৃতাই ইংরেজীতে, কতকগুলি হিন্দীতে, কয়েকটি বাংলায়।

মাস	স্থান	বিষয়
জানু.	সুরাট	সেবা—জাতির আদর্শ
	,,	শক্তিমান্ পুরুষ বিবেকানন্দ
	পুনা	স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমা
ফেব্রু.	,,	সনাতন ধর্ম
	শোলাপুর	বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরু
	,,	ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান
		ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম
	,,	তরুণ ভারতের কাছে স্বামীজীর বাণী
		শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি
মার্চ	মাউন্ট আবু	বিশ্বের কাছে ভারতের বাণী
	,,	বিশ্বজনীন ধর্ম
জুন	বারাণসী	শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য
	কলিকাতা	বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ
	কটক	শ্রীরামকৃষ্ণ কেন এসেছিলেন?
	ঢাকা	মহাপুরুষ-সঙ্গ
	মাদ্রাজ	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ
		ভারতের মহীয়সী নারীগণ
	নাত্তারাম পল্লী	ভারতের মহাপুরুষগণ
	ত্রিরুপাতুর	আজ যে শিক্ষা প্রয়োজন
		কর্মযোগের বিজ্ঞান ও দর্শন

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেণ্টারে প্রতি রবিবার বেলা ১১ টায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে ভাষণ প্রদত্ত হয় :

জুন :	ব্যক্তিত্বমান্ ঈশ্বর ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সামঞ্জস্য, আধুনিক মানবের নিকট ধর্মের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান, ধ্যানের বাধা জয় করা, প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্ত।
জুলাই	আধ্যাত্মিক ভাবশূন্য জীবন বিফল [অতঃপর গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়]

প্রতি মঙ্গলবার রাত্রি ৮৷৷টায় স্বামী বুধানন্দ রাজযোগ ও প্রতি শুক্রবার ঐ সময় স্বামী নিখিলানন্দ গীতা ব্যাখ্যা করেন।

সেবাকার্য

আসাম-দুর্গত-সেবা : জলপাইগুড়ি জেলায় ফালাকাটা ক্যাম্পে স্থিত আসাম-দুর্গতদের মধ্যে মিশন ২৮শে জুলাই হইতে ১৭ই আগস্ট (দুর্গতদের অন্যত্র সরাইয়া লওয়ার পূর্ব) পর্যন্ত সেবাকার্য করিয়াছে। তাহার পর আলিপুর ডুয়ার্স জংসন স্টেশনে ২৮শে আগস্ট হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আসাম হইতে আগত নরনারীদের ভাত ডাল তরকারী খাওয়ানো হইয়াছে। আগতদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছিল যে কয়েকদিন ২৭০০ জনকে খাওয়াইতে হইয়াছিল। ইহাদের জন্য চাউল ৯ই সেপ্টেম্বর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনামূল্যে দিয়াছেন। ফালাকাটায় এবং আলিপুর ডুয়ার্স ক্যাম্পে ৫০টি পরিবারের মধ্যে ১১০০ ধুতি শাড়ী, ১২৬০ ছোট ছেলেদের জামা, ৩০ সতরঞ্চি, ২৫৮ বাল্‌তি, ৩৫০ করিয়া কড়াই, হাতাখুন্তি, মগ, এনামেলের ৫০০ থালা, ৪০০ গ্লাস, ৪০০ বাটী, এবং ৩৬৫টি হারিকেন ল্যাণ্টার্ন বিতরণ করা হইয়াছে। ফালাকাটায় ৪৭ মণ চিঁড়া ও ১১ মণ গুড় বিতরিত হইয়াছে।

শিলংএ গভর্নমেণ্ট ক্যাম্পস্থিত শরণার্থীদের মধ্যে রোগী ও শিশুদের জন্য গড়ে দৈনিক ২১ সের করিয়া গোদুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছে। এছাড়া

১০০ খানি পশমী কম্বল, ৩৫ খানি ধুতিশাড়ী ও আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে।

উড়িষ্যায় বন্যাসেবা : বালেশ্বর জেলায় বাসুদেবপুর অঞ্চলে ৪২টি গ্রামে ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১১ই অক্টোবর পর্যন্ত মিশন সেবাকার্য করিয়াছেন। ওখানে ১৬৯০ ধুতি, ১৭৩৮ ছোটদের সার্ট প্যান্ট, শিশুখাদ্য হিসাবে ৪৫০ পাউণ্ড বার্লি, ৪৫০ পাউণ্ড বিস্কুট, ২॥০ মণ চিনি, গবাদির খাদ্য ১৫৩৩ মণ কুঁড়া বিতরণ করা হইয়াছে। এছাড়া ৪৭০ টাকা সাহায্যও দেওয়া হয়।

কটক জেলায় জেনাপুর অঞ্চলে এখনও সেবাকার্য চলিতেছে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে গুঁড়াদুগ্ধ বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। ৮০০ ধুতি বিতরণের জন্য পাঠানো হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বিজ্ঞান-সংবাদ

মহাকাশ হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ : মিশিগান জ্যোতির্বিদ্‌গণ শনিগ্রহ ও নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আগত বেতার-তরঙ্গ ধরিতে পারিয়াছেন। ৩ হাজার আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত নীহারিকাপুঞ্জের একটি নক্ষত্র হইতে এই তরঙ্গ ভাসিয়া আসিয়াছে।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ফ্রেড হ্যাডক লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল সায়েণ্টিফিক রেডিও ইউনিয়নের ত্রয়োদশ অধিবেশনে বলেন, ৮৫ ফুট ব্যাসের একটি নূতন ধরনের রেডিও টেলিস্কোপে ইহা ধরা পড়িয়াছে।

নক্ষত্রের আয়ু সম্পর্কে এই তথ্য নূতন আলোক সম্পাত করিবে। শনিগ্রহ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে সংগৃহীত তথ্যসমূহ বর্তমান গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

পরমাণুশক্তি-চালিত সাবমেরিন : ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ পর্যটক ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাগেল্যান জাহাজে ৩ বৎসরে পৃথিবী পরিক্রমা করিয়াছিলেন। সেই একই পথে পরমাণুশক্তি-চালিত মার্কিন সাবমেরিন ট্রিটন ৬১ দিনে সমুদ্রের নীচে থাকিয়া ৩১,০০০ মাইল অতিক্রম করে। ট্রিটন ইহার পরেও ১০,৯৭২ মাইল অতিক্রম করিয়া ৮৪ দিনে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়া আসে।

নিদ্রার আবশ্যকতা : সাধারণ লোকের ধারণা শরীরকে বিশ্রাম দিবার জন্য ঘুমের প্রয়োজন, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে মানুষ শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘুমায় না। তাঁহারা বলেন, মস্তিষ্কের যে অংশের জন্য মানুষ স্মরণ যুক্তি-বিচার ও কল্পনা করিতে পারে তাহাকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যই নিদ্রার আবশ্যকতা।

খাদ্য ও জনসংখ্যা

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (F.A.O.) বিবরণীতে প্রকাশ গত ১৯৫২-৫৩ হইতে ১৯৫৭-৫৮ (এই ৫ বৎসরে) ভারতের খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়িতেছে।

সংস্থার বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ: ভারতের জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১'৩ হারে, সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়াছে শতকরা ১'৯ হারে। পৃথিবীর আরও তেরটি দেশে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত সমতালে চলিয়াছে, অথবা উহাকে সামান্য মাত্রায় অতিক্রম করিয়াছে। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে—যথা ব্রহ্মদেশ, সিংহল ও পাকিস্তানে খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত তাল রাখিতে পারে নাই।

খাদ্যসমস্যার সমাধান

কৃষিবিষয়ে পূর্ব ভারত রাজ্যসরকারগুলির উপদেষ্টা আমেরিকার অভিজ্ঞ কৃষিবিজ্ঞানবিদ্ ডক্টর আর্নল্ড ক্লেম (Dr. Arnold W. Klemme) এদেশে তাঁহার গত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া ১১ই অক্টোবর রোটারি ক্লাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে ভারতের প্রধান সমস্যা খাদ্যসমস্যা। তাহা সমাধান করিবার উপায় ভারতেই আছে, যদি চাষীরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। খাদ্যের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, প্রকৃতির দানরূপে পশ্চিমবঙ্গে সেগুলি বিশেষভাবে রহিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি তিনি উল্লেখ করেন:

(১) সার: পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমান করা যায়, যে ১ কোটি একর জমিতে ধানচাষ হয়—তাহার তিন-চতুর্থাংশ জমি সার দিয়া চাষ করিলে খাদ্যঘাটতি দূরীভূত হইবে। ইস্পাত-কারখানার পরিত্যক্ত শ্ল্যাগ এবং স্থানীয় অন্যান্য পদার্থ সহজপ্রাপ্য সার।

(২) জলসেচ: বাংলাদেশে কর্ষিত ভূমির তিন-চতুর্থাংশ পলি-পড়া জমি, অল্প খরচেই নদীর বা নলকূপের জল দ্বারা ঐগুলিতে জলসেচ সম্ভব।

(৩) জমি-উদ্ধার: পশ্চিমবঙ্গে ২৮ লক্ষ একর জমি লবণাক্ত, ঠিকভাবে উদ্ধার করিতে পারিলে উহা খুবই উর্বর হইবে।

(৪) নূতন ফসল: সারের ব্যবহার এবং ভালভাবে জলনিকাশ ও জলসেচ হইলে পশ্চিমবঙ্গের চাষী বছরে দুই তিনটি ফসল তুলিতে পারে। ভুট্টা, সিম ও বিবিধ শাকসব্জী মানুষের এবং গৃহপালিত পশুর পরিপূরক খাদ্যরূপে উৎপন্ন হইতে পারে।

ভ্রমসংশোধন

আশ্বিন সংখ্যার উদ্বোধনে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর পটভূমিকা' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে 'অমাবস্যা' স্থলে 'প্রতিপদ' পড়িবেন। উঃ সঃ

উদ্বোধন

শ্রীসারদামণি-মাতৃভাবস্তুতিঃ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমলচতুর্ধুরীণ-বিরচিতা

শ্রীসারদাম্বা মাতৃসারাৎসারা।
অগ্নিবায়িন্দ্রদেবা যদি স্যুঃ মতিবিক্লবা
উমাকারা সা হি সন্তানোদ্ধারা।
স্তুত-'কিমেতদ্ যক্ষমি'তি যুগযুগান্ত-প্রশ্নততি-
সুসমাধান-সুখদান-সদাতৎপরা ॥১

ত্রেতাদ্বাপরভরণী সীতারাধারূপিণী
কলৌ যশোধবা চ গৌরমনোহরা।
যুগে যুগে মে জননী প্রভুধ্যানসারথনিঃ
সারদা তু মণিমণিঃ সর্বযুগোত্তরা ॥২
শ্রীসারদা মাতৃসাবাৎসাবা ॥

'মাতৃভাবো হি গরিষ্ঠঃ সখ্যমধুরযোঃ শ্রেষ্ঠঃ'
রামকৃষ্ণ-মত-নিত্য-সুখপ্রচারিণী।
সারদাম্বিকামণিঃ মাতৃভাবশিরোমণিঃ
কাশ্যাং বিমোচিতা যয়া পথচারিণী ॥৩

মাতৃমহানামামৃত- পান-ধন্য-খগ-চেতঃ
চন্দনাপি কৃতার্থা পিঞ্জরবাসিনী।
ধেনুকালীশ্যামলী যুগপচ্চ বৎসাবলী
হাম্বা শব্দায়তে করতলাথিনী ॥৪

জননী-প্রসাদধন্যঃ নরেন্দ্রঃ স্তুতবরেণ্যঃ
ভুবনবিজয়ী প্রাহ 'মাতা গরীয়সী',
তথা নাগমহাশয়ঃ গৃহস্থসন্ন্যাসাশ্রয়
উচ্চৈ'র্মাতৃদয়া জ্যায়সী শ্রেয়সী' ॥৫

প্রাপ্তনিত্যমাত্রাশিষ- ভক্তভৈরবগিরীশো
সততমকথয়ন্ 'মাতা দয়ালুতরা'।
জননীপাদসংবলো ভণতি যতীন্দ্রবিমলোঽ-
স্বা সারদাতুল্যা নিত্যা পরাৎপরা ॥৬

বঙ্গানুবাদ ঃ জননী শ্রীসারদামণির মাতৃভাবের স্তুতি

জননী সারদামণি মাতৃমণ্ডলীর সারেরও সার। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার যখন বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে, তখন সন্তানদের উদ্ধার জন্য সাধনের জননী উমা হৈমবতী হ'য়ে দেখা দেন। পুত্রগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'এই সম্মুখের বিরাট জ্যোতিঃপুঞ্জ, এ কি?' যুগযুগান্তরে সন্তানদের এই প্রশ্ন-সমূহের সুন্দর মীমাংসা ক'রে দিয়ে জননী তাঁদের সুখদানের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব থাকেন।১

ত্রেতাযুগে সীতা, দ্বাপরে রাধা, কলিযুগে যশোধরা ও বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে তিনি সকলের ভরণ করেছেন। যুগে যুগে আমার জননী প্রভুর অর্থাৎ যুগাবতারের ধ্যানের শ্রেষ্ঠ আকর—অর্থাৎ পরমেশ আমার জননীকেই করেছেন নিরন্তর ধ্যান। এমন জননীদের মধ্যেও জননী সারদা সত্যি মণিরও মণি—সর্বযুগের বিশ্বধাত্রী জননীদের তিনি সর্বতোভাবে অতিক্রম ক'রে গেছেন (কারণ দ্বাদশবর্ষের জপের মালা, সাধনায় সিদ্ধি ঠাকুর ফলহারিণী কালীপূজার দিনে মায়ের চরণেই সমর্পণ করেছিলেন)।২

জননী শ্রীসারদা জননীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। তিনি ঠাকুরের সেই বিশিষ্ট মত নিত্য আনন্দ সহকারে প্রচার করেছেন ঃ 'মাতৃভাবই শ্রেষ্ঠ ; সখ্য ও মধুর ভাব থেকেও শ্রেষ্ঠ'। কাশীতে পথের ভিখারিনীকে যিনি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে মুক্তিদান করেছিলেন, সেই দেবী সারদামণির কৃপার অন্ত নেই—বিশ্বমাতাদের শিরোমণি তিনিই।৩

জননীর চন্দনা পাখী—তার প্রাণও মায়ের মহানাম-রূপ অমৃত পান ক'রে ধন্য। পিঞ্জরে বাস করেও তার জীবন কৃতার্থ। ধবলী ও শ্যামলী গাভী এবং সঙ্গে সঙ্গে বাছুরেরাও মায়ের করতলের স্পর্শলোভে নিরন্তর হাম্বা রব ক'রত। ৪

জননীর স্নেহধন্য সুতশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ বিশ্ব বিজয় ক'রে এসে বলেছেন, 'পিতা অপেক্ষা মাতা বড়।' সমভাবে গৃহস্থসন্ন্যাসী নাগমহাশয়ও উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, 'বাবার থেকে মা দয়াল।৫

ভক্তভৈরব গিরীশ চিরকাল মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এবং পেতেন-ও। তিনি সর্বদাই বলতেন মায়ের দয়াই সমধিক। জননীর পাদযুগলই যতীন্দ্রবিমলের একমাত্র সম্বল। সেই সম্বলে ভর ক'রে সে বলছে—জননী শ্রীসারদা অতুলা, তিনিই সনাতনী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠা।৬

কথা প্রসঙ্গে

পুতুল, প্রতীক ও প্রতিমা

দিনে দিনে প্রতিমাপূজার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, দেশে ধর্মভাব বাড়িতেছে। কাহারও কাহারও মত ঃ ধর্মভাব লোপ পাইতেছে, ঠাকুর-দেবতায় না আছে ভক্তি, না আছে ভয়। পাড়ার কতগুলি বেকার যুবক চাঁদার খাতা বগলে লইয়া জোর করিয়া চাঁদা আদায় করে ; প্যাণ্ডাল-মাইক, চা-জলখাবার, জলসা ও ট্যাক্সিতে শতকরা ৯০ টাকা খরচ হয়, বাকী টাকায় প্রতিমা, পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ। এই তো সর্বজনীন পূজার আয়-ব্যয়। একই পাড়ায় একাধিক সর্বজনীন পূজা দরিদ্র গৃহস্থের উপর নূতনতর করভার! এরূপ পূজা বাড়িয়া লাভ কি? না ভজন, না পূজন—সারা দিন এবং রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মাইক-সম্প্রসারিত আধুনিক গান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার বিলাতী সুরের বিকৃত অনুকরণে হিন্দী সিনেমার গান, শুনিলেই মনে হয় ঢাকের বাদ্যির মতো—থামিলেই মিষ্টি।

যাহারা বহু ব্যয়- ও শ্রম-সাপেক্ষ দুর্গাপূজা করিতে পারিল না, তাহারা একদিনের কালী-পূজার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। পূজা

একটা পাইলে হয়, পাড়ার একদল যুবকের ইহাতে মহা উৎসাহ। পূর্বে ছিল ছাত্রেরা সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা করিত। সরস্বতী ছাত্রদের দেবতা, বিদ্যাদায়িনী; তাঁহাকে লইয়া ছেলেদের মাতামাতি শোভা পাইত; কিন্তু মা কালীকে লইয়া মাতামাতি দেখিলে ভাবনা হয়, গোটা দেশ কি সত্যই কৈবল্যমুক্তির জন্য ব্যস্ত হইয়াছে? আজকাল আবার কারখানায়, ছোট বড় কারিগরী দোকানে বিশ্বকর্মা পূজা, তাও প্রতিমূর্তি করিয়া। মনসা-শীতলার পূজার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। ঐ পূজা একবার লাগিলে পাড়ায় পনের দিন উৎসবের মত্ততা চলিতে থাকিবে! কিন্তু কেন যে পূজা, উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞাসা করিলে কোন সদুত্তর পাওয়া যাইবে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দিনের পর দিন যাত্রা, জলসায় পাড়া সরগরম। দেবতা লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।

আর একটি জিনিস লক্ষণীয়, উপাস্য দেবতার প্রতিমূর্তি অপেক্ষা তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ, অনুষঙ্গ, উপসঙ্গ মূর্তিগুলির পারিপাট্য বাড়িতেছে, তাহাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এবার এক পূজামণ্ডপে দলে দলে লোক ছুটিয়াছিল, মা কালীর প্রতিমা দেখিতে নয়—ঢাকীর মূর্তি দেখিতে! মন্দিরে রহিয়াছেন মা কালী, মাটীর পুরোহিত পূজা করিতেছেন, মণ্ডপের মধ্যস্থলে মন্দির চত্বরে খাকী সার্ট গায়ে ঢাকী ঢাক বাজাইতেছে, অবশ্য শব্দহীন, পরবর্তী কোন বৎসর হয়তো শব্দও শোনা যাইবে, টেপ-রেকর্ডিংএর যুগে ইহা এমন কিছু শক্ত নয়। দেখিলাম—মা কালীর প্রতিমা নয়, ঢাকীই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্র।

দেখিয়া শুনিয়া মনে হইয়াছে—এ পূজামণ্ডপ না শিল্প-প্রদর্শনী! আরও মনে হইল—এ প্রতিমাপূজা না পুতুলপূজা?

যাহারা পূজার রহস্য বোঝে না—তাহাদের চোখে এ সবই পুতুল ছাড়া আর কি? যাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার আছে, তাহারা প্রতিমা দেখিয়াই প্রণাম করিবে; যাহাদের সে সংস্কার নাই, তাহারা ঐরূপ পূজাকে পৌত্তলিকতার কুসংস্কার বলিবে, ইহাতে আমাদের বলিবার কি আছে? আমরা যদি ভাব ও ভক্তির গম্ভীর পরিবেশের পরিবর্তে একটা হৈ-হল্লার হালকা পরিবেশ সৃষ্টি করি, তবে নিশ্চয় অন্যধর্মী লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেহ প্রতিমাপূজার রহস্য ভুলিয়া পুতুল-প্রদর্শনী লইয়াই মাতিয়াছে। প্রতিমাপূজার গভীর তাৎপর্য না জানিয়া কেহ ইহাকে পৌত্তলিকতা বলিতেছে।

* * *

প্রিয়জনের প্রতিকৃতি মানুষ চিরদিন কাছে রাখিতে চায়। যে যাহাকে ভালবাসিয়াছে—সে তাহার ছবি চোখে আঁকিয়াছে, মনে আঁকিয়াছে, ঘটে আঁকিয়াছে, পটে আঁকিয়াছে। নিকটতম সান্নিধ্য লাভের আশায় তাহার ছবি সে অঙ্গেও আঁকিয়াছে। চোখের আড়াল হইলে সেই ছবি সে দেখিয়াছে, ছবি দেখিয়া যখন আশা মিটে নাই, তখন সে তাহার মূর্তি গড়িয়াছে। সাবয়ব মূর্তি (statue) দেখিয়া সে ঈপ্সিত জনের সান্নিধ্য লাভ করিতেছে—এই চিন্তায় সে বিভোর হইয়াছে।

এই ঈপ্সিত ব্যক্তি মানবিক সম্পর্ক হইতে কখন যে ইন্দ্রিয়াতীত দেবতার আসনে গিয়া উঠিয়াছে, আর কখন যে দেবতা স্বর্গের সিংহাসন হইতে নামিয়া মর্ত্যধূলার সম্পর্কে ধরা দিয়াছেন, তাহার সন্ধান সাধক-কবিদের মানসলোকেই ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা গাহিয়াছেন, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা'। মানুষ যদি দেবতাকে ভাল-

বাসিতে চায়, তবে তাহারা একটা ভালবাসার সম্পর্কের মাধ্যমে প্রিয়রূপে—মানবরূপেই তাঁহাকে ভালবাসিবে, ইহা ছাড়া অন্যরূপে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের মানবিক রূপ চিন্তা করা অন্যায় তো মোটেই নয়, বরং ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক, ব্যাপক ও চিরন্তন।

অনন্ত ঈশ্বর, ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাঁহাকে চিন্তা করা অন্যায়—এই জাতীয় চিন্তা কোন ধর্মবিশেষের নিজস্ব নহে। সকল ধর্মের মধ্যেই বিভিন্ন স্তরের সাধক আছেন। প্রথম স্তরে মনে হয়, ঈশ্বর বাহিরে; কিন্তু কিভাবে, তাহার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। তখনই মানুষ বাহ্য প্রতীক (symbol) অবলম্বনে ঈশ্বরভাবের সান্নিধ্য কল্পনা করিয়া ঐ ভাব অনুভব করিতে চায়; পরবর্তী মধ্যস্তরের সাধক বুঝেন, ঈশ্বর অন্তর্যামী, আমার অন্তরে, প্রত্যেকের অন্তরে। সর্বশেষে তিনি উপলব্ধি করেন, ঈশ্বর সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান।

এই শুদ্ধ সত্তাচৈতন্যকেই পরব্রহ্ম বলা হয়, ইনি নিশ্চয়ই নির্গুণ ও নিরাকার। ইনি যেমন দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নন, তেমনি ইনি কোন গুণের দ্বারাও বর্ণনীয় নন। 'তিনি দয়ালু' একথাও বলা চলিবে না। 'দয়ালু' বলিতে গেলেই ঐ গুণের আধার একটি ব্যক্তিরূপ মনে আসিবে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর, তাঁহার স্তব-স্তুতি ধ্যান-পূজা অসম্ভব। তিনি প্রার্থনারও উর্ধ্বে! তবে ধর্মভাবাপন্ন মানুষের এত পূজা, এত প্রার্থনা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? অবশ্যই এক ধাপ নামিয়া আসিতে হইবে! সগুণ ব্রহ্মই মানুষের উপাস্য। এই সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, সৃষ্টি-স্থিতিলয়কর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্! 'তিনি সাকার, নিরাকার আরও কত কি!' শ্রীরামকৃষ্ণের কি অনুপম দৃষ্টান্ত: অসীম জলরাশি, স্থানে স্থানে হিমে বরফ হইয়া গিয়াছে! ঈশ্বর নিরাকার বলিয়া তিনি সাকার হইতে পারেন না—একথা কি করিয়া বলা যায়? যিনি সর্বশক্তিমান্, তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার হইয়াও ইচ্ছা করিলে ভক্তকে তাহার মনের মতো রূপে দেখা দিবার জন্য, তাহাকে ধরা দিবার জন্য তিনি নিশ্চয় সাকার হইতে পারেন। যদি বল পারেন না, তবে বলিতে হয়, তিনি সর্বশক্তিমান্ নন! এ কথা স্ব-বিরোধী!

ঈশ্বরতত্ত্ব সকল ধর্মে মোটামুটি এক প্রকার, সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু জীবতত্ত্ব লইয়া শুধু বিভিন্ন ধর্মে নয়, একই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। এই জীবভাবকে কেন্দ্র করিয়াই তো ধর্ম-সাধনা, দর্শন-উপাসনা—সব কিছু! জীব সম্বন্ধে যাহার যেরূপ ধারণা, তাহার সাধনা, উপাসনা এবং জীবনযাপন-পদ্ধতি সেইরূপ হইবে।

যাঁহাদের ধারণা বিশ্বাতিরিক্ত (extra-cosmic) ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন না, কি দিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলেন। শেষ পর্যন্ত বলিতে হয়—তাঁহার ইচ্ছামাত্র এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জীব সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা সামঞ্জস্যহীন। জীবের দেহ এই জগতের পদার্থজাত হইলেও জীবের জীবন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস এবং জীবের শ্রেষ্ঠ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিকৃতি (image)-অনুযায়ী সৃষ্ট, অতএব প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইল—ঈশ্বরের আকার আছে, এবং মানুষ সেই আকৃতিরই প্রতিকৃতি। এই নরাকৃতি ঈশ্বর-ধারণার (anthropomorphic view of God) জন্য লজ্জিত হইবার কিছু নাই, ইহা স্বাভাবিক।

নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মভাব ধরিতে না পারা পর্যন্ত সগুণ সাকার ভাব অবশ্য স্বীকার্য। দেহবান্ ব্যক্তির পক্ষে নিরাকার-ভাব ধারণা করা অতি কষ্টকর (অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'—গীতা ১২।৫)।

যাঁহাদের ধারণা ঈশ্বরই মায়াশক্তি দ্বারা জীব-জগৎ হইয়াছেন, তাঁহারা বলেন: ঈশ্বরই নিমিত্ত-কারণ, তিনিই উপাদান-কারণ; তিনি এক হইয়াও লীলায় বহুরূপে প্রতিভাত হন। আত্মা যতক্ষণ সীমাবদ্ধ দেহ-মনে অভিমান করে, ততক্ষণই সে জীব, অসীম বিশ্বে যাঁহার আত্মবোধ, তিনি ঈশ্বর। বেদান্তের তত্ত্ব তন্ত্রের সাধনায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাই এই ভাবের উপাসকগণ বলিতে পারিয়াছেন, 'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ' দেবতাই দেবতার পূজা করিতে পারেন। দেবতা হইবার জন্যই দেবতার উপাসনা, দেবতার সান্নিধ্য-কল্পনা। প্রথমে দেহভাব, মধ্যে জীবভাব, শেষে আত্মভাবে উপনীত হইয়া সাধক বুঝিতে পারে, 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'।

এই ভাবে উপনীত হইতে মানুষের জন্ম-জন্মান্তর লাগিতে পারে; মনোজগতে বহুযুগ-ব্যাপী যাত্রার শেষে এই ভাব মানুষের মনশ্চক্ষে বিদ্যুতের আলোকের মতো প্রতিভাত হইয়া রহস্যাবৃত মহাসত্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, অন্তর্জগতে মানুষের নিঃশব্দ অভিযান কি ভাবে শুরু হইল, তাহা লইয়া বহুতর মতবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে। মৃত্যুই কি মানুষের মনকে প্রথম অন্তর্মুখী করিয়াছিল? এই মাত্র যে ছিল, সে কোথায় চলিয়া গেল? কোন্ শূন্যে মিলাইয়া গেল? স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা—নিশ্চয়ই তাঁহারা আছেন, চোখের আড়ালে কোথাও থাকিয়া এখনও আমাদের কল্যাণ-চিন্তা করিতেছেন,—আদিম মানবের এই বিশ্বাসই তাহাকে পরলোকের চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে। মরিয়া আমিও যাইব পিতৃলোকে পরলোকে, যদি আমি পিতৃপিতা-মহের পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি। পূর্বপুরুষ-উপাসনাই ধর্মভাবের প্রথম স্তর, সর্বত্র না হইলেও মানবজাতির এক বৃহৎ অংশে ইহাই লক্ষিত হয়।

মানবজাতির আর এক শাখায় আরও একটি ভাবের খেলা দেখা যায়; সেখানে বহিঃপ্রকৃতির প্রচণ্ড শক্তিরাজি অসহায় মানুষকে দেবতা-চিন্তায় মগ্ন করিয়াছে; জ্ঞানলাভের জন্য, শক্তিলাভের জন্য তাহাকে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা-পরায়ণ করিয়াছে। রাত্রির অন্ধকার-নাশকারী সূর্য কোথা হইতে আসিল? হে সূর্য, আমার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত কর! সূর্যের আলোয়, মেঘের বৃষ্টিতে, আকাশের ঝঞ্ঝায় তাহারা দেবতা-শক্তির খেলা দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া সেই সেই দেবতাকেই অর্ঘ্য দিয়াছে।

পরিশেষে বোঝা যায়, সকল ধর্ম-ভাবের মূলে একটি ভাবই খেলা করিতেছে, সেই ভাবটি আয়ত্ত করিবার জন্যই সকল সাধনা, সকল উপাসনা; সেটি সীমার বন্ধন হইতে মুক্তি! মৃত পিতৃপুরুষ উপাস্য, কেন না তাঁহারা দেহবন্ধন হইতে মুক্ত, তাহারা শক্তিশালী, কল্যাণক্ষম; সূর্যাদি দেবতা অসীম শক্তিশালী—কল্যাণকারী, অতএব উপাসনীয়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে মানুষ বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করিয়াছে। বিভিন্ন উপায়ে মহা-সত্যের সম্মুখীন হইয়া একজন মনে করে, আমি যেভাবে সত্যে উপনীত হইয়াছি, ইহাই পথ—একমাত্র পথ; এবং কল্যাণবোধ-প্রণোদিত হইয়াই সে অপরকে সেই পথে আনিতে চায়। এইখানেই শুরু হয় যত মত-

বিরোধ! দেহের বেলা যেমন নিজের রুচি-অনুযায়ী খাদ্য নিজেকেই গ্রহণ করিতে হয়—পরিপাক করিতে হয়, মনের বেলাও তেমনি মনোমত ভাব ধারণা করিতে হয়, নতুবা 'পর ধর্মো ভয়াবহঃ'।

একটি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস ও উপাসনা-পদ্ধতি হইতেই এক একটি ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে; প্রত্যেকটি সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। এক ধর্মের লোক যদি বলে, আমার ধর্মপদ্ধতিই সত্য, আর সব ভুল, তবে বুঝিতে হইবে তাহারটিও ভুল।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে উপাসনা বিভিন্ন। একটি মূর্তিমাত্রে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা যেমন পৌত্তলিকতা, একটি কোন রীতি নীতি মত বা পদ্ধতির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া বা একটি মাত্র পুস্তককে অভ্রান্ত মনে করিয়া তাহার উপাসনা করাও এক প্রকার সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা! ইহা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নহে।

প্রাথমিক অবস্থায় ঐ রূপ নিষ্ঠা গাছের বেড়ার মতো কিছুটা উপকার করে, কিন্তু বেড়া যেন গাছের বৃদ্ধিকে রুদ্ধ না করে, তাই স্বামীজী বার বার বলিয়াছেন: It is good to be born in a church but not to die there. কোন একটা পদ্ধতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু উহার মধ্যে মরা ভাল নয়, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি লাভের জন্য পদ্ধতির সীমা অতিক্রম করিতে হইবে। প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ মুক্ত মন। মুক্ত মন কোন ধর্মের বা পদ্ধতির ক্রীতদাস নহে। এই মুক্ত ভাব লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য, ইহাই ব্রহ্মভাব বা আত্মভাব।

* * *

কিন্তু কি উপায়ে ইহা লাভ করা যাইবে! মনের যে অবস্থায় আমরা আছি, এই অবস্থা হইতেই আমাদের ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। দেহমন-বিশিষ্ট এবং দেহমনে অভিমানী মানুষ আমরা। বনের মধ্যে পথ হারাইয়া যে বনের বাহিরে যাইতে চায়, তাহাকে অবশ্যই বনের মধ্য দিয়াই চলিতে হইবে! দেহমনের বাঁধনে আবদ্ধ মানুষ এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহার দেবতাকেও এই দেহমন-বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করে, তাঁহার প্রতীক অবলম্বন করিয়া তাঁহার চিন্তা করে—তাঁহার দিকে আগাইয়া যায়। তাঁহারই প্রতিমা গড়িয়া, নিজ প্রাণ হইতে তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া দেবতার ভাবে ভরিয়া যায়। আবার পূজান্তে দেবতার চৈতন্যশক্তি নিজের মধ্যে সংহরণ করিয়া প্রতিমা কারণ-সলিলে বিসর্জন দেয়, ব্যক্ত আবার অব্যক্ত হইয়া যান;—ইহাই প্রতিমাপূজার রহস্য। ইষ্টদেবতার বিগ্রহ হৃদয়মন্দির হইতে আনিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গৃহ-মন্দিরে স্থাপন করিয়া সাধক দিনের পর দিন পরম প্রিয়তমকে মানুষের মতো সেবা করে। দেবতাভাবের সান্নিধ্যে বাস করবার এ এক অপূর্ব কৌশল, স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলন ঘটাইবার এ এক অনুপম উপায়। ইহাই বিগ্রহসেবার অন্তর্নিহিত রহস্য।

যাহারা এ রহস্য জানে না বা বোঝে না, তাহাদের চক্ষে প্রতিমাপূজা অবশ্যই পুতুল-পূজা। যাঁহারা প্রতিমা-পূজার আয়োজন করেন, তাঁহারা যদি এ রহস্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে জানিয়া অগ্রসর হন, তাহা হইলে পূজামণ্ডপ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে, পূজা সার্থক হইবে। সর্বজনীন পূজা সত্যই সকলের সর্বকল্যাণ সাধন করিবে।

যাহারা এ রহস্য বুঝিবে না, তাহাদের কর্তব্য এরূপ পূজার সংস্পর্শ ছাড়াই বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা।

আর যাঁহারা প্রতিমাপূজা মানেন না বা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বৃথা প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধ সমালোচনা না করিয়া মানব-জাতির—বিশেষতঃ বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করুন এবং নিজের মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তাহা হইলেই বুঝিবেন, প্রতীক বা প্রতিমা ব্যতীত ধ্যান-চিন্তা-উপাসনা অসম্ভব! ব্রহ্মভাবে স্থিতি উত্তম বা শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; সেখানে নামরূপ প্রতিমা-প্রতীক কিছুরই প্রয়োজন নাই; কিন্তু সাধনার স্তরে ধ্যানের জন্য 'রূপ', জপের জন্য 'নাম' এবং পূজার জন্য 'প্রতিমা' একান্ত প্রয়োজন।

ঈশ্বর : ব্যক্ত ও অব্যক্ত

স্বামী বিবেকানন্দ

যাকে তোমরা ব্যক্তিত্বভাবাপন্ন ঈশ্বর বল, আমার ধারণা তিনি এবং নৈর্ব্যক্তিক সত্তা একই, একই কালে তিনি সাকার ও নিরাকার। আমরাও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। কথাটি নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'অব্যক্ত', আর আপেক্ষিক-ভাবে ব্যবহার করলে আমরা 'ব্যক্তি'। তোমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-সত্তা, সকলেই সর্বব্যাপী। শুনলেপ্রথমটা মাথা ঘুরে যায়, কিন্তু আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এ কথা যতখানি সত্য, ঐ কথাও ততখানি সত্য, আত্মা সর্বব্যাপী না হ'য়ে পারে কি ক'রে? আত্মার দৈর্ঘ্য নেই, প্রস্থ নেই, বেধ নেই, জড়ের কোন ধর্মই আত্মায় নেই। আমরা সবাই যদি আত্মা হই, তাহলে দেশ (space) দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হ'তে পারিনা, দেশ দেশকেই সীমাবদ্ধ করতে পারে, জড় জড়কে; আমরা যদি শরীরে আবদ্ধ থাকতাম, তাহলে আমাদের জড়বস্তুই হ'তে হ'ত। শরীর, আত্মা—সব কিছুই জড় হ'ত। 'শরীরে বাস করা', 'আত্মাকে শরীরে আটকে রাখা' প্রভৃতি কথাগুলি শুধু সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হ'ত, এর অতিরিক্ত এদের কোন অর্থ থাকত না।

তোমাদের অনেকেরই মনে আছে—আত্মার কি সংজ্ঞা আমি দিয়েছি : প্রত্যেকটি আত্মা হচ্ছে এক একটি বৃত্ত, একটি বিন্দুতে যার কেন্দ্র এবং যার পরিধি কোথাও নেই। কেন্দ্র হচ্ছে শরীরে, সেখানেই সব কর্মশক্তি প্রকাশিত। তোমরা সর্বব্যাপী, তবে সত্তাচেতনা একটি বিন্দুতে ঘনীভূত। সেই বিন্দুটি কিছু জড় কণা সংগ্রহ ক'রে সেগুলিকে আত্মপ্রকাশের যন্ত্রে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে সত্তা নিজেকে প্রকাশ ক'রে তাকে বলে 'শরীর'।

তাহলে তুমি সর্বত্র আছ। যখন একটি শরীর বা যন্ত্র আর কাজ করতে পারে না, তখন শরীরের কেন্দ্র—তুমি সরে যাও, আবার নতুন স্থূল বা সূক্ষ্ম জড়কণা সংগ্রহ ক'রে তাদের মাধ্যমে আবার কাজ করতে থাকো। এই হ'ল মানুষ। তা হ'লে ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হচ্ছেন একটি বৃত্ত, যার পরিধি কোথাও নেই, এবং যার কেন্দ্র সর্বত্র। এই বৃত্তের প্রতিটি বিন্দু চেতন ও সক্রিয়। সীমাবদ্ধ আত্মা আমাদের সঙ্গে সমানে কাজ ক'রে চলেছে। আমাদের শুধু একটি বিন্দু চেতন, সেই বিন্দু একবার আগিয়ে চলেছে, একবার পিছিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় শরীর যেমন অতি ক্ষুদ্র, ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি নগণ্য। আমরা যখন বলি, ঈশ্বর কথা বলছেন, তখন তার অর্থ—তিনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যমে বলছেন। আমরা যখন বলি—তিনি দেশ-কালের সীমার অতীত, তার অর্থ তিনি ব্যক্তিত্বশূন্য সত্তা। এই উভয়ই একই সত্তা।

একটি দৃষ্টান্ত দিই ; আমরা এখানে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখছি। মনে কর, তুমি সূর্যের দিকে আগিয়ে চলেছ। কয়েক হাজার মাইল কাছে গিয়ে দেখবে আর এক সূর্য—অনেক বড়। সব শেষে দেখবে প্রকৃত সূর্য লক্ষ মাইল জুড়ে। এখন এই যাত্রাটিকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যাক, প্রত্যেক স্তর থেকে ছবি তোলা হ'ল। প্রকৃত সূর্যেরও ছবি তুলে নিয়ে ফিরে এসে সবগুলি তুলনা কর, মনে হবে প্রত্যেকটি পৃথক্। প্রথম দেখা গিয়েছিল একটি ছোট লাল গোলাকার পদার্থ, এবং শেষে দেখা গেল লক্ষমাইল-ব্যাপী বিরাট প্রকৃত সূর্য। উভয়ই একই সূর্য।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাই। অসীম সত্তাকে আমরা দেখছি বিভিন্ন স্থান থেকে, মনের বিভিন্ন স্তর থেকে। নিম্নতম মানুষ দেখছে তাঁকে পূর্বপুরুষ-রূপে ; দৃষ্টি যখন আরও বড হ'ল, তখন তাঁকে দেখছে একটি গ্রহের নিয়ন্তা-রূপে, দৃষ্টি আরও ব্যাপক হ'লে মানুষ বুঝতে পারে তিনি বিশ্বের নিয়ামক। সর্বোচ্চ মানব অনুভব করেন, 'তিনি আমারই স্বরূপ'। ঈশ্বর সর্বদা একই, তাঁকে যে বিভিন্নভাবে বোধ হয়, তার কারণ দৃষ্টির প্রভেদ ও তারতম্য।

[অনুবাদ : God, Personal and Impersonal—C.W. VIII. Pp. 188-9.]

মন-মাঝে

'বৈভব'

আজি, আমার 'অন্তর-মন্দির
অতীব গহন গম্ভীর।
বন মাঝে—
মম মন মাঝে
এ কি অপরূপ মন্দির রাজে!
মন্দির মাঝে
কেন জানি না যে
নিশিদিন রিনিরিন মন্দিরা বাজে!

মন্দির মাঝে
কে যেন বিরাজে—
কত দিন ভয়হীন—যেতে পারি না যে!
মন্দির-দ্বারে
জ্যোতির আকারে
প্রদীপ-শিখারেখা পড়ে পথমাঝে ;
তাই ধরে যাই,
এই গানই গাই,
দেখি মম প্রিয়তম মূরতি রাজে!

চলার পথে

'যাত্রী'

ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষ চিরকালই তার বিরাটের পূজা—মন্দিরাদির অঞ্জলি দিয়েই সার্থক ক'রে রেখেছে। ধর্মের প্রতি ভারতবাসীর এই অনুরাগের নিদর্শন ও তার পূজা-আরাধনার অনিমেষ স্বাক্ষর আজও তাই বহুদিকে মাথা তুলে আছে। আমরা আজ উত্তরাধিকার সূত্রে সে সবের অমৃতাস্বাদন করছি মাত্র। এই রকম এক শাশ্বত মন্দিরাগুলি রয়েছে মধ্যপ্রদেশের 'খজুরাহ'তে। এবার ৺পূজায় সময় সেই খজুরাহতেই গিয়েছিলাম।

কলকাতা থেকে পাটনা হ'য়ে ৺কাশী। তারপর সেখানকার চিরজাগ্রত ৺বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার পায়ে মাথা লুটিয়ে, সেখান থেকে আর এক যাত্রীকে নিয়ে, এলাহাবাদ হ'য়ে মধ্যপ্রদেশের 'সাতনায়' চলে এলাম রেলে চড়ে। সেখান থেকে আবার 'বাস'-এ প্রায় বাহাত্তর মাইল গিয়ে আমরা দুই যাত্রী একদিন বিকেলে খজুরাহ পৌঁছে গেলাম।

কৌতূহলটা বোধ হয় মানুষের রক্তগত। সেই রক্তের টানেই খজুরাহতে এসে তার মন্দির-সম্পদ্‌কে সেদিন বিকেলে মাত্র এক ঝলক দেখলাম। কিন্তু দু-চোখ তাতেই অপলক হ'য়ে গেল, মনে হ'ল—বিংশ শতাব্দীর এই প্রখর মধ্যাহ্নেও আমরা বাস্তব ভারতের বুকে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছি রহস্যময় অতীন্দ্রিয় এক স্বপ্ন-লোকে, যেখানে সহজাত এমন কিছু আছে, যা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে, চেতনায় ঝড় বইয়ে দেয়।

তিন দিকের ছোট্ট 'পান্না'-পর্বতশ্রেণীর নীলদেহ জুড়ে গভীর বন। তারই বুক চিরে আধুনিক কালের পিচের রাস্তা দিয়ে এঁকে-বেঁকে এখানকার ছোট্ট গ্রাম এই খজুরাহতে এসে পৌঁছেছিলাম। পথকষ্ট ছিল, কিন্তু শরতের সোনাঝরানো আকাশ, চোখের সামনের এই রাঙা-মাটির দেশটিকে আরব্য-উপন্যাসের বিচিত্র রেখায় আমাদের মন যাদুর এক মধুর প্রলেপে ভুলিয়ে কখন যে তাকে মনোরম ক'রে দিয়েছিল, তা বুঝতে পারিনি। আর বুঝতে পারিনি ব'লেই, তখন আমাদের মন বর্তমানকে ছাড়িয়ে অতীতের এক মনোহর বঙ্কিম রেখাপথ ধরেই—এক অস্পষ্ট সময়-বেলায় এসে দৃষ্টি মেলল। দেখলাম—চণ্ডেলা (-চন্দ্রিল্য—চন্দ্র থেকে উপজাত) রাজবংশের আরম্ভের সেই প্রথম মহীয়সী নারী—হেমবতীকে। বিখ্যাত পুস্তক 'মহোবা-খণ্ডে' যাঁর বর্ণনা রয়েছে।

'গহিরওয়ার'-জমিদারের কুল-পুরোহিত হেমরাজের কন্যা, বালবিধবা হেমবতী বাপীতটে স্নান করতে নেমেছেন। তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হ'য়ে আকাশের চাঁদ এলেন নেমে। দেবতার সঙ্গে মানবীর মিলন হ'ল। তারই ফলে বৈশাখ শুক্লা একাদশী তিথিতে, সোমবারে জন্মালেন সুবিখ্যাত চন্দ্রবর্মন (চন্দ্রব্রহ্ম)। ছোট বয়সেই চন্দ্রবর্মনের সে কি সাহস ও তেজ! ষোল বছর বয়সেই প্রস্তরাঘাতে ব্যাঘ্র এবং লগুড়াঘাতে এক সিংহ মেরে ফেললেন! তারপর বড় হ'য়ে, গ্রাম থেকে জনপদ, জনপদ থেকে প্রদেশ, এমনি ক'রে অনেক ভূখণ্ড জয় ক'রে

তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত 'চণ্ডেলা' রাজবংশের। সেদিনকার দুর্ধর্ষ 'গুর্জর-প্রতিহার,' প্রবল-প্রতাপ 'রাষ্ট্রকূট' এবং বাংলার শক্তিশালী 'পাল' রাজাদের কাছ থেকেও দেশ জয় ক'রে এই ভাবে রাজ্য গড়ে তোলা যে সত্যই শক্তির পরিচায়ক, এ কথা পুরাণ নয়, ভারতবর্ষের যে কোন প্রামাণ্য ইতিহাসের দশম শতাব্দীর ঘটনা-বর্ণিত পাতা কিছু ওন্টালেই বোঝা যাবে।

এই সুদৃঢ় রাজ্যস্থাপন করলে কি হবে, চন্দ্রবর্মনের মায়ের মনে কিন্তু শান্তি নেই। তিনি তাঁর অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য 'ভাণ্ড্য'-ব্রত উদ্‌যাপন করতে চান। এজন্য চাই পঁচাশীটি মন্দির, সরোবর, উদ্যান প্রভৃতি রচনা। মাতৃগতপ্রাণ চন্দ্রবর্মন তাই তাঁর 'জজাহুতি' (জেজাক-ভুক্তি) রাজ্য-খণ্ডের রাজধানী খজুরাহতে (খর্জুরবাহক) মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করলেন। এখানকার মন্দিরশ্রেণীর স্থাপত্য-শিল্পী 'চিচ্ছা', তাঁর উপাধি যে 'বিজ্ঞান-বিশ্বকর্তা' ছিল, তা এখানকার শিলালিপিতেই পাওয়া গেছে।

খজুরাহ পৌঁছে সেদিন আমরা ওখানকার পশ্চিমের মন্দির-গোষ্ঠি দেখে নিলাম। তার পরের দিন পায়ে হেঁটে, দেড় মাইল দূরে জৈন মন্দিরাদি ও সাড়ে তিন মাইল দূরে দক্ষিণের মন্দির-গোষ্ঠি দেখা শেষ করি। এখানকার মন্দির-গোষ্টিতে ভারতের সর্বধর্ম-সমন্বয় হয়েছে। বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, শাক্ত ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মন্দিরাদি তাই একই সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, দেখা যায়। ভাঙা ও অভাঙা মন্দিরাদি মিলিয়ে খজুরাহ ও তার নিকটবর্তী 'জট্‌করী' গ্রামে আজও ত্রিশটি মন্দির রয়েছে, প্রায় সবগুলিই লাল বেলে পাথরে তৈরী। মন্দির গড়ার কাল ৯৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দ ব'লেই পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন।

মন্দিরগুলির মধ্যে মাতঙ্গেশ্বর ও জৈন মন্দিরেই এখনও কিছুটা পূজাদির ব্যবস্থা রয়েছে। আর বাকীগুলিতে বহিরাগত অত্যাচার ও কালের প্রভাবে পূজাদি মুছে গেছে। মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরের বিরাট গৌরীপট্টের ব্যাস হবে প্রায় একুশ ফুট এবং তদুপরি সু-মসৃণ বিরাট শিবলিঙ্গের ব্যাস হবে প্রায় চার ফুট এবং উচ্চতা প্রায় সাড়ে আট ফুট। 'দুলাদেও' (স্বর্গীয় বধূ) মন্দিরটিও শিবের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত; কিন্তু প্রাচীন মূর্তির বদলে এখানে পরে অন্য একটি শিবলিঙ্গ বসানো হয়েছে। শিবের অবয়ব-মূর্তিও এই মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ। এই মন্দিরটির শিল্পকীর্তি অতুলনীয়। 'চৌষট্‌ যোগিনী' মন্দিরে আগে পঁয়ষট্টিটি খোপ ছিল, এখন সব ভেঙে গিয়ে পঁয়ত্রিশটিতে দাঁড়িয়েছে। অধুনালুপ্ত মধ্যের বড় খোপটি ছাড়া বাকী চৌষট্টিটিতে যোগিনী-মূর্তি ছিল। এই মন্দিরটি গ্র্যানাইট পাথরে তৈরী। 'ভুদাহি' মন্দিরটি ব্রহ্মার। এর গর্ভমন্দিরের ওপরের দিকে শ্মশ্রু-সম্বলিত ব্রহ্মার মূর্তি রয়েছে, বাহন হংসও আছে এবং এ সব ঘিরে আবার নবগ্রহ মূর্তি। চতুর্ভুজ বা লক্ষ্মণজীর মন্দিরের গায়ে লক্ষ্মীমূর্তির দুই দিকে ব্রহ্মা ও শিবের মূর্তি বৈষ্ণবভাবের জয় ঘোষণা করে। বরাহ-মন্দিরে বিরাট বরাহমূর্তির দেহে ব্রহ্মার পট উৎকীর্ণ। ভরতজী বা চিত্রগুপ্তের মন্দিরের বেদীতে একটি পাঁচফুট উচু সূর্যের উঁচু-জুতা-পরা মূর্তি, সপ্তাশ্ব রথ চালাচ্ছেন। এই মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের ওপরেও একটি সুন্দর সূর্যমূর্তি রয়েছে। আবার একটি বিষ্ণুমূর্তিও মাঝের কুলুঙ্গিতে বসানো। 'ঘণ্টাই' মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাব দেখা যায়। জৈন মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরের মূর্তিটি ১৮৬০ খৃঃ তৈরী ক'রে বসানো হয়েছে। জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের

চৌদ্দ ফুট উঁচু মূর্তিটি সত্যই মনোরম। দেবী জগদম্বা বা জগদম্বী-মন্দিরের ভেতরের মকরবাহন গঙ্গার মূর্তিটি দেখে মনে হয়, পূর্বেকার বিষ্ণুমূর্তিকে সরিয়ে তা বসানো হয়েছে। কারণ মন্দিরটির গর্ভমন্দিরের দ্বারের উপরেই বিষ্ণুমূর্তি খোদাই করা। এখানে একটি তিন মাথা ও আট হাত বিশিষ্ট শিবের মূর্তি রয়েছে পশ্চিমের নকসার নীচেকার কুলুঙ্গিতে। যাওয়ারী-মন্দিরে এক চার হাত উঁচু বিষ্ণুর মূর্তি বসানো। খজুরাহর বিশ্বনাথ-মন্দিরে ১০০২-৩ খৃঃ একটি পান্নার তৈরী শিবলিঙ্গ বসান রাজা ধঙ্গ্। পরে তা সরিয়ে সাধারণ পাথরের লিঙ্গ বসানো হয়েছে, শিলালিপি-পাঠে তাই মনে হয়। এর সুমুখেই বিরাট নন্দীর সু-মসৃণ বৃষমূর্তিটি সত্যই দেখবার জিনিস। জট্‌করী গ্রামের চতুর্ভুজ মন্দিরের নয় ফুট উঁচু মনোরম বিষ্ণুমূর্তি সকলকেই আকর্ষণ করে। এ ছাড়া, দৈহিক শক্তিসাধনার প্রতীক বিরাট হনুমান্ বা মহাবীরের মূর্তি দু-জায়গায় দুটি রয়েছে। খজুরাহর সুবিখ্যাত কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির শুধু ভাবের নয়, বোধ হয় ঐ রীতির ভাস্কর্যেরও চরম নিদর্শন। মন্দিরের গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ, অর্ধমণ্ডপ, অধিষ্ঠান প্রভৃতি মিলিয়ে 'সপ্তরথ' কারুকীর্তির প্রথায় তৈরী। স্তরে স্তরে পাথর গেঁথে 'সপ্তাঙ্গ'-প্রথায় এই মন্দির ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠে গেছে। মন্দিরের 'শিখর'-এর নয়নসুখকর গতিকে 'অঙ্গশিখর' সজ্জায় সাজিয়ে তুলে শীর্ষের 'অমলক'-এ এসে সুন্দরভাবে শেষ হয়েছে দেখতে পাই।

বাইরে ও ভেতরে মন্দির-গাত্রে খোদিত নানা মনুষ্য-মূর্তি জীবনের বিভিন্ন কর্মধারায় মেতে আছে। এ ছাড়া নানা অপ্সরা, দেবদেবী, গন্ধর্ব, যক্ষ, জীবজন্তু, মানব-মিথুন প্রভৃতির অসংখ্য মূর্তিতে মন্দিরগাত্র বিচিত্রভাবে সজ্জিত। এরা সবাই শিল্পীর ভূয়োদর্শনের বিচিত্র রেখায় জীবন্ত। এই সব মূর্তির কোনটির হয়ত দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা অথচ মুখে-চোখে অপরূপ কমনীয় ভাব ফুটে রয়েছে। কোন মূর্তির আবার উজ্জ্বল চোখে দুর্বার মিনতি। কোন পৌরুষব্যঞ্জক মূর্তির ঠোঁটের ভাঁজে শিশুর সারল্য। কারো আবার দাঁড়াবার ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ ঋজুতা। কারো মুখে রূপালি হাসির বান ডেকেছে। কেউ বা স্বচ্ছ প্রখর চাউনি মেলে কি যেন বোঝাতে চায়। কারো বা পদ্মপলাশ চক্ষুদুটি নির্লিপ্ত ঔদাস্যে চিরদিনই সুদূর-নিবদ্ধ। কেউ আবার তার কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়েছে স্পষ্টভাবে। কারো বা কি এক অদ্ভুত কৌতূহলে ঝিকিমিকি ক'রে উঠেছে দুটি চোখই। কেউ হয়ত একটা সুস্থির স্নিগ্ধতা টেনে এনেছে নিজের দেহের সব কিছুর ওপরেই। কোথাও বা অভ্যস্ত জীবনের পরিমণ্ডলে গড়া এক দীপ্ত-মূর্তি আমাদের বর্তমান বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে স্বপ্নাতুর চোখে চেয়ে আছে। কোন কোন মূর্তি আবার কি এক প্রত্যাশিত সম্ভাবনার খুশিতে ভরপুর। ঈর্ষার স্পর্শে কারো কারো ভুরু হয়েছে সর্পিল। এমনি কত কি!

আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি, অতীতের এই মূর্তিগুলিকে যে সব শিল্পী এমন জীবন্তভাবে আমাদের দিকে মুখোমুখি ক'রে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাদের মনে সৃষ্টির কি অপূর্বতাই না একদিন শিহরিত হয়েছিল। এই শ্রেষ্ঠ শিল্পিবৃন্দ কি আধুনিক কালের অবিশ্বাসের সংসারে চিরতরে হারিয়ে গেছে?—এ কথা ভাবতে কষ্ট হয়, এই কথা বিশ্বাস করতেও দ্বিধা জাগে। তবুও ওপরে ঐ পরিব্যাপ্ত অগাধ আকাশের প্রসারিত বক্ষের তলে আজও যেন ঐ শিল্পীদের বিদায়ের

বিধুর সুরটি ধরা পড়ে আছে। এখান থেকে তাই দৃষ্টি সরিয়ে দূরে তাকাই। চোখে পড়ে—ধূলার কুয়াসা তুলে গরুর গাড়ি চলেছে মহুয়ার বনকে বামে রেখে, দূরের ঐ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, নদীর তীরের নিচু ধানের জমির দিকে। চারিদিকের শস্যহীন প্রান্তরে ঐ দিকটাতেই যা কিছু চাষ-আবাদ হ'য়ে গ্রামের ছোপ লেগেছে; তারপরেই সব ঝাপসা। আর একটু গিয়ে একবারেই অন্ধকার। কিন্তু এই ভাবে প্রকৃতির কোলে দৃষ্টি মেলেও কোন আশ্বাস পাই না। মনের মধ্যে শুধু এক বিচিত্র অস্থিরতা জট পাকিয়ে ওঠে। রুদ্ধ যন্ত্রণায় এক সময়ে স্বপ্ন-ভ্রমণের প্রহর শেষ হ'য়ে যায়। ভাবি: উত্থান-পতন, জন্ম-মৃত্যু, ধ্বংস ও সৃষ্টি—এই নিয়েই তো জীবন। তাই অতীতের স্বপ্ন-রোমন্থন ছেড়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভারতের কথা চিন্তা করতে থাকি। যে ভারতবর্ষে আবার আসবে ধর্মের জোয়ার, জ্ঞানের বন্যা, শিল্পের প্লাবন। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—স্বামীজীর একথা কি সত্য না হ'য়ে পারে?

চল পথিক, ঐ মন্দির-প্রাণ খজুরাহর দিকে চল। সেখানকার অশরীরী শিল্পীদের প্রস্তর-স্বাক্ষরের গভীর অর্থ উপলব্ধি ক'রে নিজের দেহ-মন্দিরটিকে সুন্দর ক'রে গড়ে তোল। বসাও সেখানে তোমার অন্তর-দেবতাকে—তাঁকে প্রাণের টানে জাগাও। তাহলেই তো তোমার নিজস্ব শিল্প-কীর্তি সার্থক হ'য়ে উঠবে। সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার জীবন, তোমার মন, তোমার প্রাণ, তোমার সব কিছু। চল চল, নিভৃত হৃদয়ের মাঝে সেই শিল্পসৃষ্টির পথে। আর দেরী নয়, চল। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ**।

জয়তু সারদা

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

এলে মাগো ধরাপরে গৌরী অপর্ণা;
স্বরূপ লুকায়ে এলে অরূপা অবর্ণ্যা।
দাও সবে বরাভয়, শক্তি অনন্ত;
করি তম অপগত করো প্রাণবন্ত।
বিশ্বের সারভূতা সারদা শ্রীদুর্গে!
মনের অসুর-ভাব নাশো জ্ঞান-খড়্গে।

হে অধরা! দিলে ধরা স্বেচ্ছায় মর্ত্যে,
এ ধরার পাপতাপ বুঝি দূর করতে।
বিশ্বের ইতিহাসে তুমি মা অনন্যা,
তোমারে মা ধরি বুকে, এ ধরণী ধন্যা।
প্রণমি চরণে মাগো হে জগত-ধাত্রী!
কন্যা ও মাতা রূপে এলে শুভ-দাত্রী।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

পূজনীয় কেদারবাবার প্রেরণায় আমরা ১৯১৭ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা রওনা হই। মঠে ঠাকুরের বিরাট উৎসব দর্শন করিয়া তাহার কয়েক দিন পরেই শ্রীশ্রীমায়ের দেশ জয়রামবাটী রওনা হইলাম সকাল ৮-৩০মিঃ ট্রেনে। বেলা ২-৩০মিঃ সময় বিষ্ণুপুর স্টেশনে পৌছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশ্বর সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আহারাদি করিয়া রাত্রি ৭টার সময় গরুর গাড়ীতে রওনা হইলাম। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল; মনে প্রবল ব্যাকুলতা, যাহাতে মায়ের পুণ্য দর্শন ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিলাম সমস্ত রাস্তা; পথও তখনকার দিনে বিপদ্‌সংকুল ছিল। বেলা ৯টার সময় কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছিয়া মহারাজদের প্রণাম করিয়া শুনিলাম, শ্রীশ্রীমা অসুস্থা, রক্ত আমাশয়ে ভুগিতেছেন প্রায় ১০।১২ দিন যাবৎ। এই সংবাদ শুনিয়া হতাশ হইলাম। মায়ের দর্শন বোধ হয় আর ভাগ্যে হইল না। পূজনীয় কেশব মহারাজ বলিলেন, 'হতাশ হয়োনা, জয়রামবাটী থেকে আজ বিকেলে লোক আসবে। তার কাছে মায়ের সংবাদ পাবে।' তখনকার দিনে কোয়ালপাড়া আশ্রমের অনুমতি ভিন্ন জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ীতে কেহ যাইতে পারিত না, কারণ মায়ের শরীর সুস্থ না থাকিলে মহারাজগণ কাহাকেও যাইতে দিতেন না। ভগবানের কৃপায় বৈকালে লোক আসিল; তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম, মা অদ্যই অন্নপথ্য করিয়াছেন। পূজনীয় কেশব মহারাজ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি এখনই জয়রামবাটী রওনা হও।' আমি অমনই শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। বৈকাল ৬টার সময় জয়রামবাটী পৌছিলাম। পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ আমাকে লইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট পৌছাইয়া দিলেন। জীবনে এই প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইলাম। মনে আনন্দ আর ধরে না। মা তাঁহার ঘরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার দেশ কোথায়?' বলিলাম, 'ঢাকা-বিক্রমপুর।' মা বলিলেন, 'বাঙাল।' এই কথাটি মা আমাদের আদর করিয়া বলিতেন। পাঠক যেন ভুল না বোঝেন। মা নিজ হাতে আমাকে একটি পানতুয়া প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ পাইয়া জ্ঞান মহারাজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রি ৯টার সময় খাইবার ডাক আসিল। আরও দুই জন ভক্ত সহ খাইতে বসিলাম। আমাদের খাওয়া শেষ হইলে অপর দুই জন ভক্ত শালপাতা তুলিতে গেলে মা বলিলেন, 'পাতা নিতে হবে না, লোক আছে।' আমি পাতা তুলিলে অপর ভক্তগণ বলিলেন, 'মা নিষেধ করছেন, তুমি কেন পাতা তুলছ?' আমি তাঁদের বলিলাম, 'আমরা তো মায়ের সব কথাই শুনছি, কেবল এই কথাটাই অমান্য ক'রব?' এই কথা শুনিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ একটুখানি ছেলের বুদ্ধি, বাঙাল কিনা।' অপর ভক্তগণ মায়ের এই কথায় লজ্জিত হইলেন। আমি পাতা তুলিলে মা আমাকে আর বারণ করিলেন না।

এবার মা প্রসাদ পাইবেন। রাঁধুনীকে বলিলেন, 'খেতে এস মা।' রাঁধুনী অভিমান করিয়াছে, খাইবে না। মা বলিলেন, 'কেন তুমি

খাবে না? এই বয়স! আমার ভক্তের সংসার, তুমি না খেলে কি আমি খেতে পারি? এস মা, লক্ষ্মী মেয়ে। শীগ্‌গির খেতে বোসো, আমার উপর অভিমান করোনা মা।'

রাত্রিতে পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের ঘরেই শুইলাম। তাঁহাকে আমার দীক্ষার কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কাল সকালে মাকে এই বিষয় ব'লব। তুমি ব্যস্ত হয়োনা।' আশায় আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে পূঃ জ্ঞান মহারাজ কার্য উপলক্ষে বাহিরে গেলেন। বেলা ৯টা বাজে, আমি বিশেষ ভাবিত হইলাম। কারণ ঐ দিনই আমায় এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। তখনকার দিনে পুলিসের বড় জ্বালাতন ছিল; কে মায়ের বাড়ীতে এল গেল, সব সংবাদ নিত; এক রাত্রির বেশী থাকিতে দিত না। সেটা ছিল স্বদেশী যুগ। শ্রীশ্রীমাও সকালে পূজার সময় ভিন্ন দীক্ষা প্রায়ই দিতেন না। বিষণ্নমনে পূঃ জ্ঞান মহারাজের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় রাধুদিদির স্বামী মন্মথবাবু আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি গাইতে পার?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, গান তো সকলেই গাইতে পারে, প্রশ্ন হচ্ছে ভাল মন্দের।' মন্মথ বাবু বলিলেন, 'একটা গাওনা।' আমি বলিলাম, 'না, মশায়, আমার মনটা এখন ভাল নয়।' তিনি বলিলেন, 'কেন?' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'পূজনীয় জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে কথা ছিল, আজ প্রাতে তিনি আমার দীক্ষার কথা শ্রীশ্রীমাকে বলবেন। দেখুন বেলা ৯টা বেজে গেছে। এখন পর্যন্ত তিনি ফিরলেন না।' মন্মথ বাবু বলিলেন, 'চল, আমি তোমার দীক্ষার কথা মাকে ব'লছি।' আমি যেন অকূলে কূল পাইলাম। আমাকে লইয়া মন্মথবাবু মাতাঠাকুরাণীর নিকট গেলেন। মা তখন উঠানে বসিয়া কুটনা কুটিতেছিলেন। মন্মথবাবু বলিলেন, 'মা, এই ছেলেটি দীক্ষার জন্য আপনার কাছে এসেছে।' শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি শরতের চিঠি এনেছ?' তখনকার দিনে শরৎ মহারাজের সুপারিশ ব্যতীত অপরিচিত লোকদের মা প্রায়ই দীক্ষা দিতেন না, কারণ পুলিসের হাঙ্গামা ছিল। আমি 'না' বলায় শ্রীশ্রীমা আবার প্রশ্ন করিলেন, 'মঠে কোন সাধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মা! পূজনীয় রাখাল মহারাজের সঙ্গে পরিচয় আছে।' শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'রাখালের সাথে! বেশ, তুমি স্নান ক'রে এসে অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।'

আমি তো আনন্দে আত্মহারা হইয়া স্নান করিয়া আসিয়া শ্রীশ্রীমায়ের ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। মন্মথবাবুর জন্যই আমার দীক্ষা হইল। তিনি কিন্তু আমাকে আর গান গাহিতে বলিলেন না। আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন—১৩২৩ সালের ২৯শে ফাল্গুন, সংক্রান্তি। বেলা ১১টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের ডাক আসিলে আমি মায়ের ঘরে যাইয়া তাঁহার পাশে বসিলাম। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কে আছে?' আমি যথাযথ উত্তর দিলে তিনি হঠাৎ গম্ভীর অথচ করুণাময়ী মূর্তিতে আমাকে গায়ত্রী জপ করিতে বলিলেন। গায়ত্রী জপ করা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?' আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে মা বলিলেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা কর—ঠাকুর, তুমি আমার ইহকালের ও পরকালের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।' আমি তাঁহার আদেশানুসারে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। এবার তিনি আমাকে একটি মন্ত্র বলিয়া ১২ বার জপ করিতে বলিলেন। আমি উহা করিলে তিনি আর একটি মহামন্ত্র আমার কানে বলিলেন

এবং সঙ্গে সঙ্গে জপপ্রণালী দেখাইয়া দিলেন। বলিলেন, 'রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ১০৮ বার জপ করবে।' আরও বলিলেন, 'যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু।'

আমি একখানা সরু লালপেড়ে কাপড় ও কিছু ফল মিষ্টি দিলাম, গুরুদক্ষিণা বাবদ। তিনি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন। বলিলেন, 'তোমার আবার আমাকে কাপড় দেবার কি দরকার ছিল?' আমি আনন্দের সহিত তাঁহার শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। মা বলিলেন, 'দেখ বাবা, আমার শরীর ভাল নেই, গতকাল মাত্র ভাত খেয়েছি।' আমি বলিলাম, 'হাঁ্যা মা, সব শুনেছি, আমার উপর আপনার অহেতুকী কৃপা।'

দীক্ষা হইয়া গেল। তিনি আমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদী হালুয়া ও মুড়ি খাইতে দিলেন। আমি প্রসাদ পাইয়া বাহির-বাড়ীতে যাইয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি, মা কি করিয়া জানিলেন আমার ব্রাহ্মণ-শরীরের কথা, আমার পৈতা তো ঢাকা ছিল, গায়ত্রী জপ করিতে বলিলেন। প্রথম মন্ত্রটি যাহা আমি পূর্বেই স্বপ্নে পাইয়াছিলাম, তাহাই বা কি করিয়া জানিলেন? তাঁহার অন্তর্যামিত্ব অনুভব করিয়া অবাক্ হইলাম। দীক্ষার পর মনে বড়ই আনন্দ হইল, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—জন্ম সার্থক।

দ্বিপ্রহরে ভাত খাইবার ডাক আসিল, আমি মাকে বলিলাম, 'আপনার প্রসাদ পাব।' মা বলিলেন, 'তা প্রসাদ পরে পাবে, এখন খেতে বসে যাও।' তিনি আমাদের খাওয়া দেখিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, 'পেট ভরে খাও বাবা।' আমরা খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে যাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে মায়ের ডাক আসিল, আমরা ভিতরে গেলাম। মা আমাদের হাতে তাঁহার প্রসাদী অন্ন দিলেন, আমরা তাঁহার প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইলাম। বেলা ২টার সময় মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম, কারণ ঐ দিনই আমাকে কামারপুকুর যাইতে হইবে। মা বলিলেন, 'ওখানে শিবু আছে, রঘুবীরকে কিছু ভোগ দিও, রাত্রিতে গুরুগৃহে বাস ক'রে সকালে কলকাতায় রওনা হবে, খুব সাবধানে যাবে, তুমি ছেলেমানুষ। মঠে গিয়ে বাবুরামকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দেবে।' এবার আমি তাঁহার পাদোদক ও মিছরি-প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়াতে যেন মুগ্ধ না হই, আর তোমার পাদপদ্মে যেন ভক্তি থাকে।' তিনি এই প্রার্থনা বুঝিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। পূজনীয় মাস্টার মহাশয় বলিতেন, 'সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।'

এবার কামারপুকুর রওনা হইলাম। বেলা ৫টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি পুণ্যতীর্থে পৌছিলাম। সেখানে পূজনীয় শিবুদাদাকে পাইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি দয়া করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাকে সমস্ত দেখাইলেন। গুরুগৃহে রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন সকালে আনন্দিত মনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পদব্রজে আরামবাগ হইয়া রাত্রি ৬টার সময় চাঁপাডাঙ্গা পৌছিলাম। পথে ভীষণ রৌদ্রে কষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যখনই মায়ের অহেতুকী কৃপার কথা স্মরণ হইয়াছে, তখনই এই কষ্ট আর কষ্ট বলিয়া মনে হয় নাই। ঐ দিন রাত্রে কলিকাতা যাইবার ট্রেন না থাকায় স্টেশনেই পড়িয়া রহিলাম। পরদিন সকাল ৭টায় ট্রেনে উঠিয়া বেলা ১১টার সময়

হাওড়া-ময়দানে পৌঁছিলাম। কয়েক দিন পরে মঠে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহাশীর্বাদের কথা তাঁহাকে বলিলাম। মা অসুস্থ অবস্থাতেও কিভাবে আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। তিনি মায়ের অহেতুকী কৃপার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'কি আর ব'লব, কৃপা, কৃপা, কৃপা!' এই বলিয়া তিনি হাতে জপ করিতে লাগিলেন, কিছু পরে আবার বলিলেন, 'মায়ের কৃপার কথা যেন তোর মনে থাকে, বেইমান হ'সনি। মা যে কি বস্তু—পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারও বোঝবার শক্তি নেই। তিনিই কালে তোদের কৃপা ক'রে বোঝাবেন। এখন কেবল তাঁর কথা স্মরণ ক'রে যা, আহা লোক-কল্যাণের জন্য তিনি কি না করছেন! দেহের একটু বিশ্রাম পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছেন।' শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি একেবারে যেন মাতিয়া গেলেন। আমার মনে হইল, যেন মায়ের মাহাত্ম্য তিনি বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার মুখে মায়ের মাহাত্ম্য শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইল শ্রীশ্রীমাই যেন তাঁহার মাহাত্ম্য শুনাইবার জন্য পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের নিকট আমাকে পাঠাইয়া-দিয়াছেন।

পাঠককে আর একটি গল্প, যাহা পূজনীয় কেশব মহারাজের নিকট কোয়ালপাড়া আশ্রমে শুনিয়াছিলাম, তাহা উপহার দিতেছি। আমি পূজনীয় কেশব মহারাজকে বলিলাম, 'মায়ের কথা আমাদের কিছু বলুন।' তিনি বলিলেন, 'মায়ের কথা তোমাকে কি আর বলব! তিনি যে কে, তা আমরা এখনও কিছু বুঝতে পারিনি। তপস্যা না থাকলে মাকে বোঝা বড় শক্ত। যদিও আমরা তাঁর এত কাছে আছি, তাঁকে বুঝতে পারলাম কই? একটি ঘটনা তোমাকে বলছি, শোন:

একদিন আমি মাকে বললাম—'মা! আপনার শরীর সুস্থ নয়, প্রায়ই ভুগছেন, আপনাকে যে রান্না ক'রে দেয়, তার সম্বন্ধে আপনি তো সবই জানেন, আপনি যদি দয়া ক'রে বলেন তবে অন্য একজন লোক দেখি।' মা তো আমার এই কথা শুনেই ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন, বললেন,—'তোমরা ছাড়লে ছাড়তে পার, আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায়?' আমি তো এই কথা শুনেই মায়ের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলাম, 'মা আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি কৃপা ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।' এবার বোঝ শ্রীশ্রীমা কে? কে এই অভয়বাণী দিতে পারে—'আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায়?' আমরা যেমনই হই না কেন, মায়ের নিকট আমরা তাঁর ছেলে ভিন্ন আর কিছুই নয়। তিনি নিজেই বলেছেন,—'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তাদের ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে। আমি যে তাদের সত্যিকারের মা, পাতানো মা নয়।'

ধন্য মা, ধন্য মা, ধন্য তোমার অহেতুকী কৃপা! কলিকালে তোমার মতো মা-ই জীবের একমাত্র আশ্রয়-স্থল। সাধে কি পূজনীয় নাগমহাশয় বলতেন, 'বাবার চেয়ে মা দয়াল।'

মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে একটু অবসর পেয়ে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম বেলা প্রায় ১১টায়। মন্দিরে সাধারণ যেরূপ ভিড় হয়, সে তুলনায় নির্জন বোধ হ'ল। অঙ্গনের একদিকে দ্বাদশ শিবের মন্দির ; অন্যদিকে বাম পার্শ্বে প্রথমে বিষ্ণু-মন্দির, পরে মা ভবতারিণীর মন্দির। আজ ১০৭ বৎসর পরে সেই সব আছে, নেই কেবল সেই মহামানব—দেশবাসী যাঁকে দেবতারূপে আরাধনা করে। কোথায় সেই কোমলাঙ্গ আচার্যদেব, জাতির মহাসঙ্কটে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন? যাঁর প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি উপদেশ ভবিষ্যতের আশার বাণী শুনিয়েছিল, যাঁর পরিকরগণ জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ মানুষ হ'য়ে জীবকে শিবজ্ঞানে পূজা করতে শিখিয়েছিলেন, ভারতীয় কৃষ্টিকে উজ্জীবিত ক'রে পরের জন্য জীবন-ধারণের ব্রতকে রূপ দিয়েছিলেন।

এই তো সেই মন্দির। মন্দির মধ্যে মাতা ভবতারিণী সেই বরাভয়দাত্রী মূর্তিতে বিরাজমানা। আজ কি আর মা জেগে নেই? আজ এই মন্দির ও মূর্তি কি অতীতের কেবলমাত্র স্মৃতিটুকু নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? কি ক'রে তা বলি। কত ভক্ত নরনারীকে আকুল হ'য়ে মার নিকট প্রণতি জানাতে দেখলাম। ভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাব দেখলাম না, তবে কি বিশ্বাসের অভাব? সে কথাও কি জোর ক'রে বলা যায়। ঐ তো ভদ্রলোক, শুনলাম বহু কষ্টে দূর থেকে এসেছেন। না, না—কিছুর জন্য প্রার্থী হ'য়ে নয়, উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একবার দেখা এবং দেখে সার্থক হওয়া।

মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি নিছক অর্থের অপচয়, না সময়ের অপব্যয়? এ কি অবসর কালে চিত্ত-বিনোদন অথবা কোলাহল থেকে দূরে এসে নির্জনতা-উপভোগ? কি জন্য অনেকে এখানে আসে? ফেরবার সময় চিত্তে কেন একটা তৃপ্তির উদয় হয়; কেন মনে হয়—সময়টি বেশ কাটল, আবার শীঘ্র আসতে হবে; আরও কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আরও আনন্দ হ'ত। এ কি শুধু এই সুন্দর মন্দিরের পরিবেশ?—ভাগীরথীর মনোরম সান্নিধ্য? মনে হয়—তা বোধ হয় নয় শুধু। এখানে রয়েছে যেন চিত্তের বিশ্রাম। জগতে ধন, মান, ঐশ্বর্য ও অপরাপর অনেক কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু এরূপ বিশ্রামের স্থান তো কোথাও নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কত সময় বলেছেন, সংসারে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করা একরূপ অসম্ভব। কত উদাহরণ দিয়েছেন: আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায়—কত লোক সত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন ক'রে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও বহু কষ্টে তাদের জীবন যাপন করতে হচ্ছে। নিরলস কর্ম ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু জাগতিক সুখ ও শান্তি হ'তে তারা বঞ্চিত। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে—জগতে আমরা যাকে সুখ ও দুঃখ ব'লে জানি, সুখ ও দুঃখের সংজ্ঞা বোধ হয় তা নয়। অর্থে ও বৈভবে যে সুখ, সে সুখে মন তৃপ্ত হয় না। অতুল বৈভব ও ঐশ্বর্য পেয়েও আরও বেশীর আকাঙ্ক্ষায় অনেকে অসুখী। জাগতিক সুখের সব কিছু পেয়েও অনেকে অসুখী। কেউ বা সব কিছু ত্যাগ ক'রে প্রকৃত সুখ ও শান্তির জন্য শাকান্ন খেয়েও জীবন কাটাতে রাজী। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী

হয়েও বহু লোক দেখা যায় ভোগে বঞ্চিত। হয় কৃপণ, নয় চিররুগ্ন। বহুবার বহুলোকের জীবনে প্রমাণিত হ'য়েছে যে প্রকৃত সুখ ও শান্তি শুধু ঐশ্বর্য ও বৈভবের দ্বারা পাওয়া যায় না। কোন কিছু পাবার বা করবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়েও আমরা তা পেতে বা সম্পন্ন করতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি সব সময় আমাদের চালিত করছে। তা হ'লে দেখা যায় একমাত্র পথ সেই অদৃশ্য শক্তির শরণাগত হওয়া।

আমাদের স্বাস্থ্য নেই, শক্তি নেই। নেই শ্রদ্ধা, ভক্তি বা বিশ্বাস। তাই কি আমরা এত অসুখী ও বিব্রত? মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা—তাও তো আমাদের স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। তা হ'লে আমরা কি ক'রব? আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত কি ঐহিক শিক্ষায় আমাদের জীবনে নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা আসবে? মনুষ্য-শরীরকে দেবমন্দির না ভাবলে বোধ হয় আমরা মানুষের মর্যাদা রক্ষা করতে পারব না।

* * *

বিষ্ণুমন্দিরের চত্বরের উপর চোখ পড়ল। ঐ সোপানশ্রেণীর চত্বরেই তো ঠাকুর মাঝে মাঝে বসতেন। মনে হ'ল কে যেন বলছেন: ভয় নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। জগৎটা শিক্ষাকেন্দ্র—এখানে শুধু দেখতে ও শিখতে আসা। মন্দ দেখলে মন্দই দেখতে পাবে এবং ভাল দেখলে আরও ভাল তোমার সামনে উদ্ভাসিত হবে।

মানুষের অবচেতন মন কি চায়? সেই মন চায় সকলে সুখী হ'ক। আমি যেন সকলের ভাল করি, সকলে ভাল থাকলেই আমি সুখে থাকব। হিংসা, অহেতুক জিদ ও অকারণ ক্ষোভ আমাদের মনের স্বাভাবিক হিতবুদ্ধি আবৃত ক'রে রাখে। যা করা উচিত, তা না করতে পেরে আমরা উত্তেজিত হই, সাধারণ মানুষের স্বভাব হ'তে বিচ্যুত হই। সেই বিচ্যুতির জন্যই অসুখী হই, নিজের উপর ক্রোধান্বিত হই, এবং সব কিছু বিস্মরণ হওয়ার জন্য নানা ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে জীবন যাপন করি। শরীর যদি দেবতার মন্দির জ্ঞান করি, তবে সেই শরীর অশুচি হ'লে আমাদের দুঃখ পাওয়া স্বাভাবিক।

আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়ল। তিনি বলতেন, 'দু-পাতা পড়েই লেকচার, কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নেই, ভজন নেই, বিবেক-বৈরাগ্য নেই, দু-চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার।'

দ্বাদশ শিবের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে গেলাম। সেই বড় ঘরটির এক পাশে ছোট খাট। পুরানো দিনের ছবি চারিদিকে টাঙানো রয়েছে। কতকগুলি পুরানো ছবি উদ্দীপনা জাগাল। শ্রীশ্রীঠাকুর এই ছবিগুলির সামনে হাততালি দিতে দিতে নাম করতেন; বলতেন, 'হা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, জ্ঞান কৃষ্ণ, প্রাণ কৃষ্ণ, মন কৃষ্ণ, আত্মা কৃষ্ণ, দেহ কৃষ্ণ।' আবার বলতেন, 'প্রাণ হে গোবিন্দ, মম জীবন।'

কত মহামানব এখানে পদার্পণ করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত পান করেছেন। মনে হ'ল—ঠাকুর যেন ছোট খাটটির উপর বসে আছেন; ভক্তবৃন্দ একমনে একপ্রাণে ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে আছেন। নরেন্দ্র বোধ হয় সুমধুর স্বরে গান গাইছেন। মাষ্টার মহাশয় একনিষ্ঠভাবে 'কথামৃত' সংগ্রহে ব্যস্ত। আহা, যাঁরা সে সময় বর্তমান ছিলেন, তাঁরা কত ভাগ্যবান্! আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। ধর্মকথা ভিন্ন আর কোন কথা নেই। কত

সরস উদাহরণ, কত সহজ ব্যাখ্যা—কত হৃদয়গ্রাহী উপদেশ। উঠে যেতে ইচ্ছা হয় না। মনের মধ্যে সেই সব দিনের কথা ও গুঞ্জন শুনতে পেলাম। অবিরাম গতিশীল জগতে এইরূপ স্থান ভিন্ন চিত্তবিশ্রামের উপযুক্ত পরিবেশ আর কোথায়?

দুটি ভদ্রলোক ঘরে বসে আলোচনা করছেন। আধুনিক সমাজে ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব,—সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ইত্যাদি। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়ল। মাষ্টার মহাশয়ের অমর কীর্তি 'কথামৃত' খুলে পড়তে লাগলাম; ১৬ই অক্টোবর, ১৮৮২ খৃঃ কথা:

ঘরের পূর্বদিকের দরজার কাছে নরেন্দ্রাদি গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র—আজকাল ছোকরারা কি রকম দেখছেন?

মাষ্টার—মন্দ নয়। তবে ধর্মোপদেশ কিছু হয় না।

নরেন্দ্র—আমি নিজে যা দেখেছি, তাতে বোধ হয় সব অধঃপাতে যাচ্ছে। বার্ডসাই, ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুল পালানো—এ সব সর্বদা দেখা যায়। এমন কি দেখেছি যে কুস্থানেও যায়।

মাষ্টার—যখন পড়াশুনা করতাম, আমরা তো এরূপ দেখি নাই, শুনি নাই।

নরেন্দ্র—আপনি বোধ হয় তত মিশতেন না। এখন দেখেছি যে খারাপ লোকে নাম ধরে ডাকে; কখন আলাপ করেছে কে জানে?

মাষ্টার—কি আশ্চর্য!

নরেন্দ্র—আমি জানি, অনেকের চরিত্র খারাপ হ'য়ে গেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষীয়েরা ও ছেলেদের অভিভাবকেরা এ সব বিষয় দেখেন তো ভাল হয়।

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর হইতে তাঁহাদের কাছে আসিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, 'কি গো, তোমাদের কি কথা হচ্ছে?

নরেন্দ্র বলিলেন, 'এঁর সঙ্গে স্কুলের কথাবার্তা হচ্ছিল। ছেলেদের চরিত্র ভাল থাকে না।' ঠাকুর একটু ঐ সকল কথা শুনিয়া মাষ্টারকে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন, 'এ সব কথাবার্তা ভাল নয়। ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা ভাল নয়। তুমি এদের চেয়ে বয়সে বড়; বুদ্ধি হয়েছে, তোমার এ-সব কথা তুলতে দেওয়া উচিত ছিল না।' (নরেন্দ্রের বয়স তখন ১৯।২০, মাষ্টারের ২৭।২৮)

* * *

ঘর থেকে বেরিয়ে গোল বারান্দায় গেলাম। গঙ্গা বোধ হয় একই ভাবে বয়ে যাচ্ছে। ভক্তেরা এখান থেকে গঙ্গাকে প্রণাম জানাতেন; ঠাকুরও প্রণাম করতেন। মা-গঙ্গাকে প্রণাম জানিয়ে নহবত ঘরে গেলাম। আজ আর সেই দরমার বেড়া নেই। মা ঠাকরুন দরমার বেড়ায় ফুটো ক'রে ঠাকুর ও ভক্তদের দেখতেন। ঠাকুরের সেই সরস সাবধান-বাণী মনে পড়ল। তিনি রামলালকে বলছেন, 'কি রে, তোর খুড়ির দরমার ফুটো যে বেড়েই যাচ্ছে।'

মা ঠাকরুন আমাদের কত কষ্ট করেছেন! ঐটুকু নহবত ঘরে দিনের পর দিন জিনিসপত্রের মধ্যে ও ভক্তমেয়েদের সঙ্গে কত কষ্টে দিন যাপন করতেন! কত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম! লোকশিক্ষার জন্য জগদ্ধাত্রী মা আমাদের কত কষ্ট সহ্য করেছেন। মায়ের একটি ছবি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আলেখ্যের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চক্ষু জলপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

মনে হ'ল বলি—তুমি যে-দেশে জন্ম নিয়েছিলে, যে-দেশে লীলা ক'রে গেছ, সে দেশের এত দুঃখ-দুর্দশা কেন? তুমি মা, আমাদের দেখ।

হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চবটীতে গেলাম। বেল-তলা ও পঞ্চবটী শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনার স্থল। বৃদ্ধ অশ্বত্থ গাছটির পত্রের মর্মর শন্‌শন্ শব্দ ও অদূরে সুরধুনীর মন্দ মধুর কুলকুল-ধ্বনি মনটিকে আবেশ-আকুল ক'রে তুলল। বৃক্ষটি যেন বলছে—কত স্মৃতি বুকে নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছি। দেখেছে সে জগজ্জননীকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণের আকুলি-বিকুলি, ধ্যানমগ্ন ঠাকুরের অপরূপ অবয়ব। মায়ের সঙ্গে আত্মার সম্মিলনে তাঁর কি মধুর রূপ। সুরধুনীও আবেগকম্পিত হ'য়ে যেন সেই কথায় সায় দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। ধ্যান করছি, পাপপুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল,—লড়ায়ে গোরার রূপ ধ'রে এসেছিল; টাকা, মান, দেহসুখ, নানা রকম শক্তি এই সব দিতে চাইল। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। কত গুহ্য কথা। মা দেখা দিলেন, তখন আমি বললাম—মা ওকে কেটে ফেল। মায়ের সেই রূপ, সেই ভুবনমোহন রূপ মনে পড়ছে।'

মনে পড়ল লক্ষ্মীদিদির কথা। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে পঞ্চবটীর দিকে গেছেন; কিছুক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল শ্রীশ্রীমাও যেন সেদিকে গেলেন। ব্যাপার কি, অনুধাবন করবার জন্য লক্ষ্মীদিদি সেদিকে গেলেন। দেখলেন—ঠাকুর ও মা পঞ্চবটীর বেদীতে আসীন এবং পরক্ষণে ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে তাঁর রোমাঞ্চ হ'ল। তিনি দেখলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা হর-পার্বতী রূপে বিরাজমান; আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল। অন্যান্য ভক্তদের সংবাদ দেবার জন্য তিনি অতি শীঘ্র নহবতে ফিরে এলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি শ্রীশ্রীমাকে রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত দেখে মায়ের পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন। আবেগে কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

আর একদিনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাষ্টার মশাই পঞ্চবটীতলে কথা বলছেন। মাষ্টার মশাই অশ্বত্থবৃক্ষের দু-একটি ঝরা পাতা পকেটে রাখলেন। ঠাকুর বললেন, সেদিন ঝড়ে গাছের একটি ডাল ভেঙে গিয়েছে। মাষ্টার মশাই বললেন, 'জানি। আমি একখণ্ড শাখা বাড়ীতে রেখে দিয়েছি।' মাষ্টার মশাই আবার বললেন, 'সব কিছু চুকে বুকে গেলে এ স্থান মহাতীর্থ হবে।' করুণাময় ঠাকুর মৃদু হাসলেন।

উদ্যান পরিক্রমা ক'রে ফিরে এলাম। দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের শতবর্ষ-পূর্তি দিবসে মন্দির-প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির মর্মর-মূর্তি স্থাপিত হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর ও নহবতের মাঝখানে। পুণ্যবতী রাণী পূর্বাস্যা হ'য়ে বসে আছেন ফটকের দিকে মুখ ক'রে; সকলকে যেন সমাদরে আহ্বান ক'রে বলছেন, তোমরা এস, এই মহাতীর্থ দর্শন ক'রে অপার আনন্দ উপভোগ কর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের দিকে প্রণাম ক'রে আনন্দপূর্ণ মন নিয়ে ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম—আবার আসব।

তুলসীদাসের 'জানকীমঙ্গল'

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তুলসীদাসের এই ক্ষুদ্র মঙ্গলকাব্যটি আলোচনার সূচনায় 'রামচরিতমানস' থেকে তুলসীকৃত সীতারাম বন্দনার অংশবিশেষ স্মরণ করছি :

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্॥
যন্মায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরাঃ।
যৎসত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ॥
যৎপাদপ্লবমেকমেব হি ভবাম্ভোধেস্তিতীর্ষাবতাং।
বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্॥

—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী, কল্যাণকারিণী রামবল্লভা সীতাকে প্রণাম করি। এই অখিল বিশ্ব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁর মায়ার বশবর্তী, যাঁর সত্তা থেকে উৎপন্ন এই অনিত্য সংসার রজ্জুতে সর্পভ্রমের মতো নিত্যরূপে প্রতিভাত, সেই অশেষকারণের ঊর্ধ্বে যিনি বিষ্ণুরূপী রামনামধারী ঈশ্বর, যাঁর পদপল্লব ভবসাগর উত্তরণের একমাত্র উপায়, তাঁকে প্রণাম।

এই প্রণামমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, তুলসীর রামসীতা-কাহিনী কোন ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত নয়, তাঁর কাব্যের পটভূমি ভক্তহৃদয়। তুলসীর 'রামচন্দ্র' আধ্যাত্মিক পরিভাষায় 'সগুণ ব্রহ্ম'। সেই রামনামই ভক্তকে উদ্ধার করে। 'রামচরিতমানসে'র বালকাণ্ডে তুলসীদাস এই নাম-মাহাত্ম্যের অমর কাব্যরূপ দিয়েছেন :

রাম নাম মণিদীপ ধরু জীহ দেহরী-দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিআর॥

যদি তোমার অন্তর-বাহির আলোকিত ক'রে তুলতে চাও, তাহলে দেহের দেউড়ী জিহ্বাতে রামনামের মণিদীপটি ধরো। দেউড়ীর দীপ যেমন ঘরের ভিতর বাহির দুদিকই আলোকিত করে, তেমনি রামনামে দেহ ও চিত্ত দুইই শুদ্ধ আলোকে পূর্ণ হবে।

তাই রামনাম গানে মহাবীরের মত তুলসীদাসেরও অক্লান্ত অনুরাগ, অফুরন্ত উৎসাহ। 'রামচরিতমানসে'র পাশাপাশি বিনয়পত্রিকা, কবিত্ত-রামায়ণ, রামাবতী, রামলালা নহছু, বরবৈ রামায়ণ এবং জানকীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের মধ্য দিয়ে সেই রামসীতার লীলা-অনুধ্যানে কবির হৃদয়কে ভরে রেখেছিল।

এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই গানটির ভাষায় :

তোমারি নাম বলব আমি, বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে॥
... ...
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে—এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

এমনি ক'রে জীবনের আদি থেকে অন্ত অবধি তুলসীদাস রামনাম-স্মরণের আয়োজন করেছিলেন। তুলসীর দৃষ্টিতে রামচন্দ্র দেহ-ধারী ভগবান।

ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভূপ।
কিয়ে চরিত-পাবন পরম প্রাকৃত নর-অনুরূপ॥
জথা অনেক বেষ ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন হোই॥

ভক্তের কল্যাণের জন্যই শ্রীভগবান রাজা রামচন্দ্রের রূপ ধারণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষেরই মতো, অথচ পরম পবিত্র চরিত্র তিনি দেখিয়ে গেছেন; নট যেমন নানা বেশ ধারণ ক'রে নানাভাবে নৃত্য করেন, অথচ সেই সব ভাবের কোনটাই নটের আসল ভাব নয়,

ভগবানও তেমনি মানুষী লীলায় রাম সেজে এসেছিলেন। (রামচরিত-মানস : উত্তরকাণ্ড)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবতার-স্বরূপের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হ'ল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ; অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোন এক বিশেষ স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মূর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মতো হ'ল।' (আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী)

'জানকীমঙ্গল' বা 'পার্বতীমঙ্গল' কোনটিই বাংলা সাহিত্যের অর্থে মঙ্গলকাব্য নয়। তবে মঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্মরণমনন যদি মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে 'জানকীমঙ্গল'ও মঙ্গলকাব্য। রামসীতার বিবাহ-মঙ্গলই 'জানকীমঙ্গল' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু; কিন্তু বিষয়বস্তু 'জানকীমঙ্গলে'র অবলম্বনমাত্র। এই সমগ্র কাব্যটির ব্যঞ্জনা রয়েছে ভক্তহৃদয়ের তন্ময় অনুধ্যানে। তাই রাম, সীতা, জনক, বিশ্বামিত্র, প্রতিবেশী পুরজন, মিথিলা-নগরীর আনন্দোৎসব সব কিছুর মধ্য দিয়ে এক পবিত্র শান্তরসের বিমল আনন্দানুভূতি পাঠক ও শ্রোতার প্রাণে সঞ্চারিত হয়। কাব্যের সূচনাতেই কবি বলেছেন : সিয় রঘুবীর বিবাহ যথামতি গাবৌঁ॥

সুভ দিন রচ্যৌ স্বয়ংবর মঙ্গলদায়ক।
সুনত শ্রবণ হিয় বসহিঁ সীয় রঘুনায়ক॥
(জানকীমঙ্গল)

অদ্বিতীয় জ্ঞানী রাজা জনকের সুখসাগর জনকপুরীতে জাত হয়েছেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতা। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স হ'লে হরধনুর্যোজনার শর্ত ক'রে জনক কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করলেন। আয়োজিত স্বয়ংবর-সভায় যোগদান করতে যাত্রা করলেন নানা দেশের রাজন্যবৃন্দ। ঠিক ঐ সময়ে বিশ্বামিত্র এসেছিলেন অযোধ্যায় রাজা দশরথের কাছে। মুনির আগমন-সংবাদ পেয়ে রাজার সঙ্গে সপুত্রক রাণীরাও মুনিকে প্রণাম করতে এলেন। রামচন্দ্রকে দেখে বিশ্বামিত্রের মনোভাব :

রামহিঁ ভাইন্হ সহিত জবহিঁ মুনি জোহেউ।
নৈন নীর, তন পুলক, রূপ মন মোহেউ॥
পরসি কমলকর সীস হরসি হিয় লাবহিঁ।
প্রেমপয়োধি-মগন মুনি পার ন পাবহিঁ॥
(জানকীমঙ্গল)

—ভাইদের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের রূপ দর্শনে বিশ্বামিত্রের নয়নে প্রেমাশ্রু ও দেহে পুলক সঞ্চারিত হ'ল। ঋষি তাঁর কমলপাণি দিয়ে রামচন্দ্রের শিরস্পর্শ করলেন, হৃদয়ে তাঁকে অনুভব ক'রে অন্তহীন প্রেমসমুদ্রে মগ্ন হলেন।

দশরথের কাছ থেকে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে চেয়ে নিলেন যজ্ঞনষ্টকারী রাক্ষসদের নিধনের জন্য। তাড়কা-বধ, অহল্যা-উদ্ধার প্রভৃতি কাজ শেষ ক'রে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র এলেন জনকের স্বয়ংবর-সভায়। রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্রের চরণ বন্দনা করতে এসে রামচন্দ্রকে দেখতে পেলেন : অবলোকি রামহি অনুভব মনু ব্রহ্মসুখ সৌগুণ দিয়ে॥ (জানকীমঙ্গল) —রামচন্দ্রের দর্শনে জনকের হৃদয়ে ব্রহ্মানন্দের শতগুণ আনন্দ অনুভূত হ'ল।

দেখি মনোহর মূরতি মন অনুরাগেউ।
বন্ধেউ সনেহ বিদেহ, বিরাগ বিরাগেউ॥
(জানকীমঙ্গল)

—রামচন্দ্রের মনোহর মূর্তি দেখে জনক মুগ্ধ হলেন, বাঁধা পড়লেন স্নেহবন্ধনে, তাঁর অন্তরের বৈরাগ্য পরিণত হ'ল রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগে। বিশ্বামিত্রের কাছে তিনি জানতে চাইলেন রামচন্দ্রের পরিচয়। ঋষি বললেন :

যে পরমারথরূপ ব্রহ্মময় বালক। (জানকীমঙ্গল)

তাই বুঝি ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষির বিষয়বিমুখ মন এই দেহধারী ব্রহ্মসত্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ঈশ্বরের আনন্দ ভোগ করবার জন্য জ্ঞানী ভক্ত-ভক্তি নিয়ে থাকে। ······ নিত্যে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা। যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা।' 'ভক্তি মেয়েমানুষ, অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বার-বাড়ী পর্যন্ত যায়।'

রাজর্ষি জনকের হৃদয়াকাশে তুলসীদাস জ্ঞান-সূর্য ও ভক্তিচন্দ্রের একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রামচন্দ্র 'ব্রহ্মময় বালক'—অবতারপুরুষ। তাই ব্রহ্মজ্ঞ রাজর্ষি রামচন্দ্র-দর্শনেই ভক্তিপ্লুতহৃদয়।

স্বয়ংবর-সভায় সমবেত রাজন্যবর্গের দৃষ্টি পড়ল রামচন্দ্রের উপর। রূপে, গুণে, ব্যক্তিত্ব-মহিমায় রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয় আর কেউ সেখানে ছিলেন না। জনক ও জনকগৃহিণী রামচন্দ্রকেই জামাতারূপে লাভ করতে চেয়ে হরধনুযোজনার প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে মনে মনে শঙ্কিত হলেন। ওদিকে মাল্যাভরণধারিণী সীতাও শ্রীরামচন্দ্রকেই মনে মনে বরণ করলেন। রামচন্দ্র সেই বরণীয় প্রেম অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন:

প্রেম পরখি রঘুবীর সরাসন ভংগেউ।
জনু মৃগরাজ-কিসোর মহাগজ গঞ্জেউ॥

—কিশোর সিংহ যেমন ক'রে মহাগজকে হত্যা করে, সীতার প্রেম অনুভব ক'রে রঘুবীর তেমনি ক'রে হরধনু ভঙ্গ করলেন। এর পর জনকের পক্ষ থেকে শতানন্দ গেলেন অযোধ্যায় দশরথ প্রভৃতিকে নিয়ে আসবার জন্যে। দশ-রথাদির আগমনের পর সমগ্র মিথিলাবাসীর উদ্বেগ প্রশমিত ক'রে জানকী-রামচন্দ্রের বিবা-হের আয়োজন হ'ল। বরবেশে সজ্জিত শ্রীরাম-চন্দ্রের অপূর্ব শোভন মূর্তি:

ব্যাহ-বিভূষণ-ভূষিত ভূষণ-ভূষণ।
বিশ্ববিলোচন বনজবিকাসক পূষণ॥ (জানকীমঙ্গল)

—সব অলঙ্কারের যিনি অলঙ্কারস্বরূপ সেই রাম-চন্দ্র ভূষিত হয়েছেন বিবাহ-সজ্জায়। তিনি সারা বিশ্বের কমলনেত্র-উন্মীলনকারী সূর্যস্বরূপ।

কিন্তু সীতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তুলসীদাস স্তব্ধ হ'য়ে গেছেন। সেই দিব্য পবিত্রতার চলমান বিগ্রহটি ভাষায় বর্ণনা করতে তাঁর দ্বিধা হ'যে থাকবে:

জুবতি-জুথ মহঁ সীয় সুভাই বিরাজই।
উপমা কহত লজাই ভারতী ভাজই॥

—সখীদের সঙ্গে সীতা এলেন বিবাহমণ্ডপে, শুদ্ধস্বভাবই তাঁর সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্যের উপমা দিতে না পেরে সরস্বতীও নিবৃত্ত হয়েছেন। তখন জনক:

সংকল্পি সিয় রামহি সমর্পী সীল সুখ সোভামঈ।
জিমি সংকরহি গিরিরাজ গিরিজা,
হরিহি শ্রী সাগর দঈ॥ (জানকীমঙ্গল)

—সঙ্কল্প ক'রে শোভা- ও শীলমণ্ডিতা সীতাকে সমর্পণ করলেন রামচন্দ্রের হাঁতে—যেমন ক'রে হিমালয় পার্বতীকে সমর্পণ করেছিলেন শঙ্করের হাতে, সাগর লক্ষ্মীকে সমর্পণ করেছিলেন নারায়ণের কর-কমলে।

শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অন্য তিন ভাইয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল। মিথিলায় কিছুদিন ধ'রে আনন্দোৎসব চলল। তারপর এক সময় দশরথ পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে ফিরে চল-লেন। রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্তন কালে জনকের নিবেদন লক্ষণীয়:

তাত তজিয় জনি ছোহ ময়া রাখবি মন।

—বাবা রাম! আমার প্রতি তোমার প্রীতি যেন থাকে। আমার উপর অনুগ্রহ রেখো।

জনকের মধ্যে দুটি সত্তা এখানে দেখতে পাই—একটিতে তিনি রামচন্দ্রের গুরুজন, অন্যটিতে তিনি রামচন্দ্রের ভক্ত।

'রামচরিতমানসে' জনক তো পূর্ণ ভক্ত। সেখানে রামচন্দ্রকে উদ্দেশ ক'রে জনক বলছেন:

বারবার মাগউঁ কর জোরে।
মনু পরিহরই চরণ জনি ভোরে॥
সুনি বরবচন প্রেম জনু পোষে।
পূরণকামু রামু পরিতোষে॥ (বালকাণ্ড)

—হে নাথ, করজোড়ে বারবার এই ভিক্ষা চাই, ভুল করেও যেন আমার মন তোমার চরণ ত্যাগ না করে, প্রেমের অশ্রুতে ভরা একথা শুনে পূর্ণকাম রামচন্দ্র পরিতুষ্টি লাভ করলেন।

অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর রাজপ্রাসাদে ও নগরে আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে জানকীমঙ্গলের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। পরিশেষে তুলসীদাস মনে করিয়ে দিয়েছেন:

উপবীত ব্যাহ উছাহ জে সিয় রাম মঙ্গল গাবহীঁ।
তুলসী সকল কল্যাণ তে নরনারী অনুদিন গাবহীঁ।

—উপনয়ন, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সীতারাম-মঙ্গল গাইলে সব নরনারীর কল্যাণ হবে। অর্থাৎ এই পুণ্য বিবাহকাহিনীর স্মরণ-মননের মধ্য দিয়ে বিবাহের মঙ্গলময় সত্যটি বরবধূর অন্তরে উদ্ভাসিত হবে।

বস্তুতঃ রামায়ণ-মহাভারতের মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় অধ্যাত্ম-আদর্শের যে উত্তুঙ্গ বিকাশ ঘটেছে, সেই হিমালয়-সদৃশ মহাকাব্যের জগতে 'রামচরিতমানস' মানসসরোবরেরই মতো বিশাল, আর 'জানকীমঙ্গল' যেন একটি ছোট্ট নির্ঝরিণী। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে রামায়ণ-কাহিনী কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, তার নিশ্চিত নিদর্শন।*

* কলিকাতা আকাশবাণীর সৌজন্যে।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য—'

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

দয়াল, বিশ্বাস দাও, অনন্ত বিশ্বাস!
বিচারবুদ্ধিতে, প্রভু, বজ্রাঘাত করো।
অন্ধকূপে বন্ধ হ'য়ে আসিছে নিঃশ্বাস,
উন্মুক্ত আকাশতলে তুলে মোরে ধরো!
বজ্রাহত তরু আমি! বিলুপ্ত উৎসাহ!
সত্যভ্রষ্ট, জড়তায় আছি মৃতপ্রায়!
করুণ নয়নে, দেব, মোর পানে চাহো,
আলস্য নিশ্চিহ্ন করো প্রাণের বন্যায়।

উচ্চারিলে কুরুক্ষেত্রে, 'করিও না ভয়।
অন্তরে বাহিরে উর্ধ্বে রয়েছি জাগিয়া
পরম দেবতা আমি—তোমার আশ্রয়!
উদ্ধারিব, এসো সর্ব ধর্ম তেয়াগিয়া।'
সর্বাঙ্গে কর্দম বহি এসেছি দুয়ারে;
চরণ-ধূলিতে করো নির্মল আমারে!

চার্বাক দর্শন ও জন্মান্তর নিরাস

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

মানুষের জ্ঞানপিপাসা চিরকালই বর্তমান। মানুষ ইতর জীবের ন্যায় আহার-নিদ্রাদিতেই পরিতৃপ্ত হয় না। মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়া সে তাহার প্রয়োজনীয় বিষয়ের তত্ত্ব-নির্ধারণ করিতে চায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপের পর্যালোচনায়ও সন্তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর স্বরূপ-নিশ্চয়ে বদ্ধপরিকর হয়। এই চেষ্টার ফলে নানা প্রকার দর্শনের উদ্ভব। পাশ্চাত্য দেশে যেমন নানা দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতেও বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা প্রকার দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনের বিষয় চিন্তা করিলে আপাততঃ মনে হয়—মানুষের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে দর্শনগুলি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে; কিন্তু শ্রুতি, পুরাণ, মহাভারত, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়, প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত দর্শনের যুক্তি ও চিন্তাধারা কোথাও পূর্বপক্ষরূপে কোথাও বা সিদ্ধান্তরূপে বর্তমান। যদিও ভারতীয় দর্শনের ক্রম নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তথাপি সর্বত্র চার্বাক দর্শন খণ্ডিত হওয়ায় এবং শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ কর্তৃক অদ্বৈত বেদান্ত আদৃত ও গৃহীত হওয়ায় মনে হয়—চার্বাকদর্শন সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে ও অদ্বৈতবেদান্ত সর্বোচ্চস্তরে। এই ভাবে সাজাইয়া নিম্নে একটি ক্রম দেওয়া হইল: (১) চার্বাক (২) জৈন (৩) বৌদ্ধ (৪) শৈব (৫) বৈষ্ণব (৬) বৈশেষিক (৭) নৈয়ায়িক (৮) বৈয়াকরণ (৯) মীমাংসা (১০) শক্তি (১১) সাংখ্য (১২) যোগ (১৩) বেদান্ত (অদ্বৈত)।[১] অবশ্য এই সকল দর্শনের ক্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে চার্বাক দর্শন সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

কেহ কেহ বলেন—চার্বাক একজন ব্যক্তির নাম। কাহারও মতে—চারু (মনোহর) বাক (বাক্য) যাহার, তিনি চার্বাক। আবার কেহ কেহ বলেন, চারুর (বৃহস্পতির) বাক্যই চার্বাক। অনেকের মতে বৃহস্পতি চার্বাক দর্শনের প্রবর্তক।[২] কেহ বলেন বৃহস্পতি এই দর্শন সৃষ্টি করিয়া প্রথমে চার্বাক নামক এক ব্যক্তিকে উপদেশ দেন। চার্বাক শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে উহা প্রচার করে।[২]

অবশ্য এই বৃহস্পতি কোন লোকবিশেষের নাম নয়, উহা একটি উপাধিবিশেষ। এই বৃহস্পতি দেবগুরু, অথবা কোন শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবুদ্ধিমান্ বাগ্মী মনুষ্য, কি অন্য কেহ—তদ্বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই চার্বাকদর্শনই লোকায়ত, পাষণ্ড, হেতুবাদী, ভূতচৈতন্যবাদী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।[৩]

ইঁহারা বলেন প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ।[৪] পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি প্রমেয় (তত্ত্ব বা পদার্থ)।[৫] কাম ও কাঞ্চনই পরম

১ মধ্যবর্তী ক্রমগুলি পরিবর্তন-সহিষ্ণু।

২ 'ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতম্।' বিজ্ঞান ভিক্ষু উদ্ধৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যভূমিকা।

৩, ৪ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রিকৃত।

৫ প্রমাণমেকং প্রত্যক্ষং তত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ম্। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি-উদ্ধৃত শ্লোক।

পুরুষার্থ।[৬] চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা।[৭] কাম-কাঞ্চন-জনিত সুখই স্বর্গ।[৮] কণ্টকাদি-জনিত দুঃখই নরক।[৯] মৃত্যুই মুক্তি।[১০] ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, ধর্ম, অধর্ম, কর্মফল প্রভৃতি অলীক পদার্থ।[১১]

জানালার ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যে যখন সূর্যকিরণ পড়ে, তখন লক্ষ্য করিলে সেই সূর্য-কিরণের মধ্যে যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার ন্যায় পদার্থ দেখা যায়—তাহাই ত্রসরেণু; তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং অদৃশ্য কোন পদার্থ নাই; যেহেতু প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমাণ নাই। এই রূপ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় চতুর্বিধ ত্রসরেণু হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল পৃথিবী, জল তেজ ও বায়ু সৃষ্টি হয়। স্বভাববশতই ঐ ত্রসরেণুগুলি সংযুক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। অচেতনের প্রবর্তক ঈশ্বর প্রভৃতি কোন কর্তা নাই। এই চতুর্বিধ ভূতই সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া চেতন ও অচেতন জগৎ উৎপন্ন করে।[১২]

উপাদান-দ্রব্যে মাদকতা শক্তি না থাকিলেও দ্রব্যগুলি সম্মিলিত হইলে তাহা হইতেই মদ উৎপন্ন হয়। ঘটাবয়ব মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা জলাহরণ-ক্রিয়া সম্ভব না হইলেও ঘটরূপে সংঘাতপ্রাপ্ত মৃত্তিকা দ্বারা জলাহরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; সেইরূপ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুতে চৈতন্য অনুভূত না হইলেও ঐ সকল ভূত যখন দেহাকারে সংহত হয়, তখন উহা হইতেই চৈতন্য (দেহে) উৎপন্ন হয়।[১৩] সুতরাং দেহই আত্মা, চৈতন্য দেহের ধর্ম। দেহাতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌরবর্ণ ইত্যাদি অনুভবে আমি পদ ও স্থূলাদি পদের সামানাধিকরণ্য বশতঃ স্থূল দেহই আত্মা।[১৪]

প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অসিদ্ধ বলিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ না হওয়ায় এই স্থূল শরীরই আত্মা। এই কারণে জন্মান্তরও অসিদ্ধ।[১৫]

কিন্তু যেমন প্রত্যেক দর্শনের নানা মত আছে, সেইরূপ এই চার্বাক দর্শনেরও নানা একদেশী আছে। কেহ কেহ অনুমান-প্রমাণের আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার করেন।[১৬] কোন চার্বাক ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলেন; কেহ প্রাণকে, কেহ মনকে আত্মা বলেন। কেহ কেহ আকাশকে পঞ্চম ভূত বলিয়া স্বীকার করিতেন।[১৭]

চার্বাকের কথা এই যে জীবমাত্রই স্বাভাবিক-ভাবে নিজেকে বড় করিতে চায়। যে প্রকারে

৬ নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ। সর্বদর্শনসংগ্রহ—মাধবাচার্য।

৭ দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ।—ব্রঃ সূঃ শাঃ ভাঃ ১।১।১

৮, ৯ সর্বদর্শনসংগ্রহ।

১০ মরণমেবাপবর্গঃ। —অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি উদ্ধৃত বৃহস্পতিসূত্র

১১ ধর্মাধর্মৌ ন বিদ্যেতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ। —ষড়্দর্শন সমুচ্চয়—হরিভদ্রসূরি।

১২ ক্ষণিকভূতচতুষ্টয়ত্রুটিপুঞ্জরূপো দেহ এবাত্মা স্যাৎ। —অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

১৩ ননু যথা মাদকতাশক্তিঃ প্রত্যেকদ্রব্যাবৃত্তিরপি মিলিতদ্রব্যে বর্ততে এবং চৈতন্যমপি স্যাৎ। ননু যথাবয়বেষ্ব-বর্তমানমপি পরিমাণজলাহরণাদি কার্যং ঘটাদৌ দৃষ্টম্ এবমেব শরীরে চৈতন্যং স্যাদিতি। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—৩,২২

১৪ দেহাত্মবাদে চ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদি সামা-নাধিকরণ্যোপপত্তিঃ।—সর্বদর্শনসংগ্রহ

১৫ প্রত্যক্ষাতিরিক্তং প্রমাণমেব ন ভবতি ব্যাপ্ত্যসিদ্ধেরিতি চার্বাকাঃ। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য—৫।২৮

১৬ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

১৭ ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে। মন ইত্যন্যে —ব্রঃ সূঃ শাঙ্করভাষ্য ১।১।১ 'প্রাণ এবাত্মা' ইত্যন্যে। —অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি

হউক সকলকে পিষিয়া, সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সে বড় হইবে, সে সুখী হইবে। নিজের ইহ জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই সকলের স্বভাব। বনে সিংহ অন্য পশুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সকলকে দাবাইয়া বড় হয়, সুখী হয়। কুকুরটা তাহার চতুষ্পার্শ্বের অন্যান্য কুকুরকে মারিয়া, ভয় দেখাইয়া নিজে ভোগ করে। সভ্য জাতির মানুষও অসভ্যদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অনার্যগণও সুবিধা পাইলে আর্যজাতিকে পরাজিত করে। নিজেকে বড় করিবার জন্য জীবের এই সংঘর্ষ চিরকাল চলিতেছে। এক জাতি অপর জাতির স্বাধীনতা হরণ করিতেছে। এখনও এই দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে সকলে অনুভব করিতেছে। সবল দুর্বলকে চিরদিন পীড়ন করিয়াছে ও করিতেছে। সকলেই পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইতে চায়। স্বাধীন হইয়া অধিকতর কামকাঞ্চন ভোগ করিবে, ইহাই পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের উদ্দেশ্য। জীবের এইরূপ প্রবৃত্তির মূল হইতেছে স্বভাব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পূর্বপক্ষরূপে এই স্বভাবের কথা আছে।[১৮] কেহ কেহ স্বভাবের অর্থ করেন 'যদৃচ্ছা', কেহ বলেন পদার্থের যথাব্যবস্থিত শক্তি।[১৯] প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ অসিদ্ধ বলিয়া স্বর্গ, দেবতা, ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তি ইত্যাদি বেদবাদিগণের স্বীকৃত পদার্থ অলীক। বেদেরও প্রামাণ্য নাই। কারণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র পরস্পরবিরোধী। কতকগুলি ধূর্তব্যক্তি ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়া মানুষের উন্নতির মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। শাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকায় জাতিভেদ বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ও যাগাদিক্রিয়ার ফল অসিদ্ধ। দেহের সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সুখ ছাড়িয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপবাস, সংযম, ভিক্ষাচরণ প্রভৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইবে?

যদি বল কামকাঞ্চনজনিত কিছু সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা বহুতর দুঃখের সহিত মিশ্রিত বলিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহাতে কখনও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। নিদাঘতপ্ত কোন্ অমূঢ় ব্যক্তি কুপিত সর্পের ফণার ছায়ায় বিশ্রাম করে? ইহার উত্তরে বলিব—এইরূপ আপত্তি মূর্খেরই আপত্তি। উত্তম শ্বেততণ্ডুলের অন্নভোজন করিতে হইলে ধান্য হইতে তুষ বিমোচন, পাকাদি দুঃখ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া কোন্ ব্যক্তি অনশনে অবস্থান করে? মৎস্য হইতে কণ্টক নিষ্কাশন করিতে হইবে বলিয়া কি মৎস্যভোজন পরিত্যাগ করিতে হইবে? গৃহনির্মাণে দুঃখ আছে বলিয়া কি কেহ গৃহনির্মাণ-কার্য হইতে বিরত হইয়া মুক্ত অম্বরতলে বাস করে? যে পরিমাণ দুঃখ স্বীকার না করিলে সুখভোগ করা যায় না, মানুষ সেইটুকু দুঃখ স্বীকার করিয়া সুখভোগ করে। তদতিরিক্ত দুঃখের কারণ পরিত্যাগ করে। অতএব এই কামকাঞ্চনজনিত সুখ ত্যাজ্য নহে। দুঃখসংযুক্ত বলিয়া কামকাঞ্চনজনিত সুখ হেয়, এই কথা মূর্খেরই প্রলাপ।[২০]

কণ্টকাদিজনিত দুঃখই নরক। কামকাঞ্চনজনিত সুখই স্বর্গ।[২১] লোকপ্রসিদ্ধ রাজা প্রভৃতিই ঈশ্বর।[২২]

১৮ 'কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ' ইত্যাদি—শ্বেতাঃ উঃ ১।২

১৯ স্বভাব হইল 'পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ' চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী

২০, ২১ সর্বদর্শনসংগ্রহ।

২২ লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্বাকাঃ। [ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ১ম স্তবক] লোকব্যবহারসিদ্ধঃ—রাজাদির্দৃশ্যমানঃ [বোধনী টীকা]

যে প্রকারেই হউক নিজের দেহেন্দ্রিয়ের সুখ সাধন করিতে হইবে। ধর্ম ও অধর্ম কিছু নাই। চৌর্যাদি অধর্ম নহে। যাগাদিও ধর্ম নয়। স্বভাবের পথে চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, রাজাদির তোষামোদ করিয়া নিজের ভোগ সাধন করিতে হইবে.—ইহা অতি স্থূলবুদ্ধি চার্বাকের কথা।

পূর্বোক্ত চার্বাক ভিন্ন তাহাদের পর আর একদল চার্বাক আসিল। ইহারা উন্নততর; স্থূলতম শারীরিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখকে পরম পুরুষার্থ মনে করিত। অবশ্য ঐ মানসিক সুখ ঈশ্বর, দেহাদি অতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, পরলোকাদি সম্বন্ধজনিত নয়। শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি জনিত সুখকে ইহারা শারীরিক সুখ হইতে উৎকৃষ্ট স্বীকার করিত। ইহারা কেবলমাত্র নিজের সুখে তৃপ্ত থাকিত না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গ্রাম এমন কি নিজদেশের সকলের সম্মিলিত সুখের প্রাধান্য দিত। কিন্তু স্বর্গ, দেবতা, পরলোক, পুনর্জন্ম, ঈশ্বর বা দেহেন্দ্রিয়াদি ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। যদিও ইহারা অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিত, তথাপি ইহলোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যতটুকু অনুমান স্বীকার করা প্রয়োজন, ততটুকু অনুমানের প্রামাণ্য মানিত। ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম প্রভৃতির সাধক অনুমানে বিশ্বাস করিত না।[২৩] ইহাদেরই কেহ কেহ ইন্দ্রিয়কে, কেহ বা প্রাণকে, কেহ বা মনকে আত্মা বলিত। এই সকল চার্বাক কামকাঞ্চন ভোগের সহায়ক এবং শিল্প, কলা, সঙ্গীতাদির পরিপোষক শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিত। সেই জন্য ইহারা আয়ুর্বেদ ও অথর্ববেদের প্রামাণ্য দিত।[২৪] ইহাদের কথা এই যে, স্বভাবই সমস্ত জগতের কারণ। সুতরাং স্বভাবের পথে নিজের এবং নিজ দেশের উন্নতি সাধন কর। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতদূর এই জগৎ দেখা যায়, তাহার বাহিরেও অনুমানের সাহায্যে ঐহিক জীবনের সাধক পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই মতে আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকৃত নয়। ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমানকে ইহারা মানিত। এই প্রকার অনুমান স্বীকার না করিলে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে। অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে কিরূপে দেশের উন্নতি সাধিত হইবে? বিজ্ঞান-শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—এইসব শাস্ত্র মানুষের উন্নতি বিধায়ক; কিন্তু, বেদ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্র ঐহিক সুখের প্রাধান্য না দিয়া পরলোকাদি লইয়া ব্যস্ত—সেগুলি বর্জনীয়, অপ্রমাণ। ঐ সকল শাস্ত্র মানুষের অগ্রগতিকে বাধা দেয়; দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের উন্নতির পরিপন্থী। ঈশ্বরাদির প্রতিপাদক অনুমানের প্রামাণ্য নাই। সুতরাং ইহজীবনের, দেশের, সমাজের, রাষ্ট্রের যাহা কিছু সহায়ক, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা কিছু পরিপন্থী তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। চৌর্যাদি সমাজের ক্ষতিকারক—অতএব উহা বর্জনীয়। রাজা প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দের সম্মান দিতে হইবে; তাঁহারাই ঈশ্বর। ইহাই উন্নততর চার্বাকের মত।[২৫]

অধিকাংশ চার্বাকের মত এই যে কতকগুলি ভণ্ড, ধূর্ত, নিশাচর নিজেদের মনঃকল্পিত বেদ নামক গ্রন্থ সৃষ্টি করিয়াছে।[২৬] একে তো ঐগুলি পরস্পরবিরোধী। আবার বেদে 'জর্ভরী তুর্ফরী' ইত্যাদি কতকগুলি মন্ত্র আছে যাহার কোন অর্থ হয় না। যজ্ঞে মাংসভক্ষণ এবং নানাপ্রকার লজ্জাজনক অশ্লীল ব্যাপারের কথাও বেদে আছে। সুতরাং ঐ বেদকে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রামাণিক বলিবে? পৌরুষহীন ব্যক্তিরা নিজেদের জীবিকার জন্য সাধারণ

২৩, ২৪ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

২৫ চার্বাক দর্শন—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী।

২৬, ২৭ সর্বদর্শন সংগ্রহে—চার্বাকদর্শন।

লোককে ভুলাইয়া এইভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিপূর্বক অপরের সর্বনাশ করিয়া দেশের দুর্দশা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

যদি বল ঐহিক সুখ ছাড়াও স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখ আছে, জন্মান্তর আছে; নতুবা বহুলোক-পূজিত জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিরা প্রচুর অর্থব্যয়, নিদারুণ শারীরিক কষ্ট, শীত, আতপ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি সহ্য করিয়া পরলোকের জন্য যাগ, দান, হোম, তত্ত্ববিচার প্রভৃতি করিতেন না; তাহা হইলে বলিব, ইহা অতি অযৌক্তিক কথা। জ্ঞানবৃদ্ধদের নিজেদেরই পরস্পর মতভেদ দেখা যায়। *তাহাদের প্রবর্তিত বেদের তো কথাই* নাই। ঐ সকল বেদ মিথ্যা, ব্যাঘাত, পুনরুক্তি প্রভৃতি বহু দোষদুষ্ট বলিয়া অপ্রমাণ।[২৭]

অতএব দৃষ্ট সুখ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা দুশ্চর তপস্যা, জপ, ধ্যান, হোম প্রভৃতির দ্বারা জন্মান্তরীয় সুখের জন্য লোককে প্রবৃত্ত করায়, তাহারা মহা প্রতারক। আর যাহারা তাহাদের কথায় প্রবৃত্ত হয় তাহারা অতি মূঢ়।[২৮] জীব মরিয়া গেলে তাহার দেহরূপ আত্মা নষ্ট হইয়া যায়। অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলে কোন মানুষকে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না; দেহের ধ্বংস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র প্রমাণ, তখন প্রত্যক্ষের দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে কেহ কোন দিন জানিতে পারে না। অতএব দেহাতিরিক্ত আত্মা অসিদ্ধ। যদি জন্মান্তর, পরলোক থাকিত, তাহা হইলে মানুষের আত্মা মৃত্যুর সময় দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গিয়া কখন না কখন আত্মীয় স্বজনের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিত;[২৯] কিন্তু তাহা কোন দিন কেহ দেখে না। সুতরাং পরলোক, জন্মান্তর অলীক পদার্থ।* (ক্রমশঃ)

২৮ তস্মাদদৃষ্ট পরিত্যাগদৃষ্টে চ প্রবর্তনম্।
লোকস্য তদ্‌বিমূঢত্বং চার্বাকাঃ প্রতিপেদিরে॥
ষড় দর্শনসমুচ্চয়—হরিভদ্রসূরি

২৯ যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
সর্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত শ্লোক

* লক্ষণীয়ঃ গত আশ্বিন সংখ্যায় লেখক প্রশ্নোত্তরে জন্মান্তরের পক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করিয়াছেন, বর্তমান প্রবন্ধে জন্মান্তরের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। (উঃ সঃ)

ত্রিকাল

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

কালকে আমি ছিলাম বেঁচে
　　সে তো শুধুই সান্ত্বনা,
মরণ ছিল দাঁড়িয়ে পাশে
　　ছিল না সে চেতনা।

আজকে আমি আছি বেঁচে
　　সে তো শুধুই গঞ্জনা,
কালের বোঝা আনছি টেনে
　　যাচ্ছি কোথায় নাই জানা।

কালকে আমি থাকবো বেঁচে
　　সে তো শুধুই কল্পনা,
কাল আর আজ বেঁচে থাকার
　　নয় কি সেটা জের টানা?

ইংলণ্ডে এক বৎসর

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

এপ্রিলের মাঝামাঝি শনি-রবি দুদিনে বৃটিশ কাউন্সিল ৩০।৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ইংলণ্ডের উত্তর-পশ্চিমের বিখ্যাত Lake District (হ্রদ অঞ্চল) ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। আমি এই দলে ছিলাম। ১৪০ মাইল কোচে ভ্রমণ এতই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, সারাদিনের পরেও শ্রান্তি-বোধ ছিল না। আমাদের গাড়ী সবুজ পাহাড়ের গা দিয়ে, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর পাশ দিয়ে চলল; মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনপদ, প্রত্যেকটিই নিখুঁতভাবে পরিষ্কার—দোকান-পাট সুসজ্জিত। কোন কোন শহরে রাস্তা এত সরু যে, বড় বাস চলা শক্ত। পথে এক জায়গায় যে, যার লাঞ্চ-প্যাকেটের সদ্ব্যবহার ক'রে নিল। Settle Kendal পেরিয়ে যখন আমাদের গাড়ী উইণ্ডার হ্রদ (Winder Lake)-এর ধারে বাউন্স (Bounes)-এ এসে হাজির হ'ল, আমরা সকলেই ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাড়ী দেখার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। হ্রদটি প্রায় ২০ মাইল লম্বা; ধারে ধারে গাড়ী চলল—দুপাশে পপ্‌লার, পাইন, ফার প্রভৃতি নানা বৃক্ষের সারি। হ্রদে নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা আছে। শেষ প্রান্তে Ambleside শহর। এর খানিক পরেই গ্র্যাসমিয়ার হ্রদ (Lake Grasmere)-এর ধারেই কবির ২০০ বৎসরের পুরানো বাড়ী ডাভ কটেজ (Dove Cottage)। কবির জীবনের বিশেষ আট বছর (১৭৯৯—১৮০৮) এইখানেই কেটেছে বাড়ীটার মেঝে পাথরের—এবড়োখেবড়ো। জানলাগুলিও ছোট নিচু নিচু, সেকালে জানলা পিছু নাকি ট্যাক্স দিতে হ'ত। পুরানো কাঠের আসবাব ও চুল্লির সরঞ্জামগুলি এখনও রয়েছে। কবির আত্মীয়া একটি বৃদ্ধা সব দেখালেন। ছোট্ট বাগানে কিছু ড্যাফোডিল ফুটে আছে বটে, কিন্তু কবি যে 'a host of golden daffodils' দেখেছিলেন, সে আরও উত্তরে আলস্‌ওয়াটার হ্রদ (Ullswater Lake)-এ; আর বেশী দেরী করা গেল না। গাড়ী ছুটল Rydal হ্রদের পাশ দিয়ে। Darwent water হ্রদের ধারে Keswick শহরে এসে আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল। অনেক লোক বেড়াতে এসেছে; অনেক হোটেল, অনেক দোকান পৃথিবীর নানা দেশের দ্রব্য সামগ্রী কেনাবেচা হয়, এই এখান-কার জীবিকা। আমরা তিনটা হোটেলে ছড়িয়ে রইলাম। খাওয়ার পর ভারতীয়, পাকিস্থানী, নাইজেরীয়, উগাণ্ডী, সুডানী, কিউবান, গ্রীক ইটালীয়, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ—সকলে মিলে জটলা, সবাইকে কিছু বলতে হবে। সকালে একটু হ্রদে স্টীমারে ভ্রমণ হ'ল। স্থির জল, চার ধারে পাহাড়—শীতে সেজন্য এখানে বেশী বরফ পড়ে না। চার ধারে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মনে হয়, এটা সত্যই কবি-প্রতিভা বিকাশের অনুকূল স্থান। দুপুরে ফেরার পালা শুরু হ'ল। এবার কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেরই চোখ বুজে এল, পথেই সন্ধ্যা পার হ'ল। রাত্রি দশটায় লীডস্ পৌছলাম।

গরমের সময়ই এখানে যত রকম সম্মেলন আহূত হয় ভাল ভাল জায়গায়। তন্তুবিজ্ঞানীদের সম্মেলন এবারে ছিল লীডস্ থেকে ৬০মাইল

পূর্বে সমুদ্রের ধারে। তিন চার দিনের জন্য আমাকে ওখানে যেতে হয়েছিল মে মাসের মাঝামাঝি। তখন সূর্য ডোবে সন্ধ্যা ৯টায়। বাসেই রওনা হলাম। সারা পথটাই সমতল—সবুজ ট্রাক্টর (Tractor)-এর সাহায্যে যব ও গম চাষ চলেছে। সমুদ্রের ধারটা বোম্বাই বা ওয়ালটেয়ারের মতো। একটা পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গেছে, তার ওপর একটা পুরানো দুর্গ-প্রাকার—Cromwellএর তোপ এককালে এর ওপর পড়েছিল। পাহাড়ে দুপাশে দুটি বিস্তৃত বালুচর—পুরীর মতো, তার ধারে ধারে সমুদ্র-স্নান ও রৌদ্র-স্নানের ব্যবস্থা, প্রমোদ-কানন, থিয়েটার। এই Spa Theatreই ছিল আমাদের সম্মেলনের কেন্দ্র। সম্মেলনে ইওরোপের সকল দেশ থেকেই লোক এসেছিল—পূর্বে ছাপানো প্রবন্ধের ওপর আলোচনাই এইসব সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য, তা ছাড়া—পরস্পরের সঙ্গে আলাপ।

সেদিন প্রতিপদ, জোয়ারের উত্তাল তরঙ্গ, তাই জলে নামা বারণ ছিল। Rescue boat সব সময়ে সতর্ক আছে। এখানকার স্থায়ী জনসাধারণ হ'ল মৎস্যজীবী। বিকেলে তাদের দু এক জনের সঙ্গে আলাপ করলাম; বেশ মন-খোলা লোক—শহরের লোকের বিপরীত। একজন Marine Drive (সমুদ্রধারের রাস্তা) এ রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে নাইলনের সুতার ছিপে একটা দু-সেরা কড মাছ ধ'রল। ছোট পোতা-শ্রয়, সকালে মোটর বোটগুলি বেরিয়ে যায়—বিকালে মাছ নিয়ে ফিরে আসে। এখানে টাটকা মাছ খাবার সুযোগ হ'ল। একদিন সেই পুরানো দুর্গে বেড়াতে গেলাম। প্রায় চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র, তার মধ্যে বসে কোথা দিয়ে যে দু-ঘণ্টা সময় চলে গেল, খেয়াল নেই—ফিরতে গিয়ে দেখি, আমি প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। অনেক কষ্টে বেরুবার ব্যবস্থা করি।

গরমের সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা পত্রপুষ্পে ভরে উঠেছে—ছেলেরা মাঠে খালি পায়ে ফুটবল খেলছে—আর মেয়েরা সব রঙবেরঙএর স্থতি ঘাঘরা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্র-সৈকতে। রোদে ও সমুদ্রের হাওয়ায় গাত্র-চর্ম যথাসম্ভব উন্মুক্ত রাখবার চেষ্টা সকলের। এ দেশে এ এক বিচিত্র দৃশ্য দেখা হ'ল। আবার বাসেই ফিরলাম।

Whit Mondayর দিন এখানকার বিমান-কেন্দ্রে বিমান-প্রদর্শনী হ'ল। Javelin, Vampire, Spitfire, Voodoo, Supersonic plane দেখলাম, আবার ১৯১২ খৃঃ তৈরী প্লেনের ওড়াও দেখতে পেলাম।

মে মাসের শেষের দিকে শনি-রবিবারে আবার বৃটিশ কাউন্সিলের একটি দলের সঙ্গে কোচে ক'রে স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-আপঅন-এভন (Stratford-upon-Avon) গেলাম। এটা শেক্‌স্‌পীয়রের (Shakespeare) এর জন্মস্থান। ১৩০ মাইল পথ, ৬ ঘণ্টা লাগল। অনেকটা পথ ট্রেণ্ট (Trent) নদীর উপত্যকা দিয়ে, চারিদিক কচি ঘাসে ভরা। তার উপর রদ্দুর পড়ে অতি মনোরম দৃশ্য হয়েছিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেউ আর ঘরে বসে নেই। রাস্তায় অসংখ্য গাড়ী, অনেক গাড়ীই পেছনে একটা ক'রে ক্যারাভ্যান টেনে নিয়ে যাচ্ছে; এতেই রাত্রে শোয়া, রান্না খাওয়া, প্রাতরাশ—সব হয়।

শেক্‌স্‌পীয়রের বাড়ী পুরানো মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ী,—তাঁর স্ত্রী অ্যান্ হ্যাথওয়ের বাড়ীর এখনও খড়ের চাল। এ অঞ্চলে অনেকগুলি খড়ের বাড়ী দেখলাম। ১৫৬৪ খৃঃ শেক্‌স্‌পীয়রের জন্ম। অনেক গবেষণার পর এখন জন্মস্থান

সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। এই শহরে এভন নদীর তীরে শেক্স্‌পীয়রের মর্মর মূর্তি ও তাঁর নামে এক বিরাট রঙ্গমঞ্চ হয়েছে। এখানে সন্ধ্যায় ওথেলো (Othello) নাটক দেখলাম। পল্ রবসন নাম-ভূমিকায় ছিলেন। সাজ-সজ্জা, পট, পট-পরিবর্তনের পদ্ধতি সব কিছুই নিখুঁত ও অভিনব। আর দর্শকবৃন্দের মধ্যে পৃথিবীর সব দেশের লোকই ছিলেন।

পরদিন ছোট্ট সুন্দর শহরটিকে প্রদক্ষিণ ক'রে, আর এভন নদীতে একটু নৌকা চালনা ক'রে ফেরা হ'ল অন্য পথে,—নতুন দৃশ্য। বিস্তীর্ণ মোটর রাস্তা তৈরী হচ্ছে। ওয়ারউইক (Warwick) দুর্গ, গতযুদ্ধে বোমা-বিধ্বস্ত বিরাট কভেন্ট্রি (Coventry) ক্যাথিড্র্যাল, মাইলের পর মাইল তৃণহীন প্রান্তর, আবার খানিক পরে শ্যামল-তৃণাচ্ছাদিত গোচারণ ভূমি ও ম্যাটলকের (Matlock) প্রস্রবণ-ঘেরা পাহাড়ে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র দেখে লীডস্ ফিরতে রাত্রি হ'ল।

এদিকে ইউনিভারসিটির বছর শেষ হ'য়ে এল; সব ছেলে এবার পড়ায় মেতেছে। সকলে ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত লাইব্রেরীতে; এক হাজার সীটের মধ্যে একটিও খালি পাওয়া যায় না। ইউনিয়নের সব উৎসব-আড্ডা বন্ধ। সর্বত্র গরমঘরে—ছেলেরা পরীক্ষার পাঠ তৈরী করতে ব্যস্ত। পরীক্ষার পরেই লম্বা ছুটি—তিন মাস সকলেই বেড়িয়ে বেড়ায় আজকাল। ছাত্রদের সস্তায় থাকা খাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা আছে। অনেকেই এই সময়ে কিছু কাজ ক'রে অর্থ রোজগার ক'রে নেয়। গবেষণারত ছাত্র এবং শিক্ষকেরা অবশ্য তিন চার সপ্তাহের বেশী ছুটি নেয় না। তাও একের পর এক।—কোন সময়েই লেবরেটরী বন্ধ হয় না।

আমাকেও এবার লীডস্ ইউনিভারসিটির কাজ গুটিয়ে নিতে হ'ল। এর পর ইংলণ্ডের তন্তু (textile) গবেষণা- ও শিল্প-কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে বেরুতে হবে।

তার পূর্বে তিন সপ্তাহের ছুটিতে ইওরোপের ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, সুইটজারল্যাণ্ড ও ইতালী ঘুরে আসবার সুযোগ হয়েছিল। সে কথা এখন থাক।

ফিরে এসে লীডসে অবস্থিত পশম গবেষণা-কেন্দ্রটি দেখলাম। একটি বাগানবাড়ীতে ৪০ বৎসর পূর্বে এর গোড়া পত্তন। কৃত্রিম ফাইবারের (artificial fibre) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই কেন্দ্র এখন বিরাট আকার ধারণ করেছে। তারপর ম্যাঞ্চেষ্টারে তুলা ও রেয়ন গবেষণা-কেন্দ্রগুলি দেখলাম। যে কয়দিন ছিলাম, কাজেই কেটেছে। শহরটি বিস্তীর্ণ সমতলের ওপর বলেই বোধ হয় ভাল লেগেছিল, আর মনে হয় রাস্তায় একটু আধটু কাগজ পড়ে থাকতে দেখে এখানকার লোকেদের প্রাণ-স্পন্দনে আত্মীয়তা অনুভব করেছিলাম। আধুনিক শিল্প-প্রধান শহরের সব কিছুই এখানে আছে। চারিদিকেই কারখানা। বিরাট বন্দর, অবশ্য সমুদ্র এখান থেকে ৩৫ মাইল। জু, মিউজিয়াম চিত্রশিল্প-প্রদর্শনী বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। ইউনিভারসিটির শিক্ষকেরা অনেকেই ভারতের সঙ্গে সুপরিচিত। এখান থেকে একদিন শেফিল্ড কলেজ (অব্ টেকনলজি) গেলাম। পাহাড়ে জায়গা। পরিচ্ছন্নতার চেয়ে কর্মমুখরতাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। জুলাইএর মাঝামাঝি ডাণ্ডী (Dundee) যেতে হ'ল। লীডস্ থেকে নিউ কাস্‌ল্-আপঅন-টাইন (New Castle upon-Tyne), বারউইক-আপঅন-টুইড (Berwick upon Tweed) হ'য়ে বরাবর ইংলণ্ডের পূর্ব-

উপকূল দিয়ে প্রায় সমুদ্রের ধারে ধারে এসে এডিনবার্গে পৌছলাম। এখানে ট্রেন পাল্টে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ বিখ্যাত ফার্থ সেতু ও টে সেতু পার হ'য়ে ডাণ্ডীতে প্রবেশ করলাম। প্রায় ৭০।৮০ বছর পূর্বে টে সেতু ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। টে নদীর মোহানা প্রায় সমুদ্রের মতো। তারই পাড়ে উঁচু জায়গায় শহরটি। পাটশিল্পের এত বড় কেন্দ্র যে এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে, নৈহাটি-কামারহাটির লোক তা ভাবতে পারে না। অসংখ্য কয়লার চিমনি থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারই এর কারণ। চটকলগুলির ভেতরের অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য। তারও কারণ নতুন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়—কুলি-ব্যারাক নেই, এখানে তারা জনসাধারণের থেকে আলাদা কোন প্রাণী নয়।

এখানে আমার একটি পুরাতন স্কচ্ সহ-কর্মীর ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাহচর্যে অনেক কিছু দেখার ও অনেকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়েছিল। স্থানীয় দৈনিক পত্রে আমার আগমন-বার্তাও ঘোষিত হয়েছে, দেখলাম। এদের পাট গবেষণা-কেন্দ্র দেখে নিজেদের ছোট মনে হয়নি—মনে হয়েছে আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভাবের কথা। সাধারণতঃ স্কচ্ লোকেরা ইংলিশম্যানদের অপেক্ষা বেশী মিশুক—এবং এরা ওদের প্রশংসা শুনতে পারে না। স্কট্ল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত জন-বিরল, কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক রূপ আরও সুন্দর। কয়দিন নিরবচ্ছিন্ন কার্য-সূচীর পর একদিন ৫০ মাইল দূরে বৈচিত্র্যময় তরু-গুল্ম-সুশোভিত উচ্চ প্রান্তরময় পথ দিয়ে কিলেক্র্যাঙ্কি (Killecrankie) গিরিপথ ও পিট্লোক্রী (Pitlochry) বাঁধ দেখে এলাম। এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ১৫।২০ মাইল দূরে সমুদ্রের তীরে পুরাতন সেণ্ট এনড্রুজ (St. Andrews) শহর; ৪০০ বছরের পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা গ্রানাইটের বাড়ীগুলি যেন তাদের শুদ্ধ মনের পরিচয় দিচ্ছিল। এই রকম শুভ্র সমুজ্জ্বল বাড়ী ২৫ মাইল উত্তরে আরব্রোথ (Arbroath) শহরেও দেখেছি ও এবার্ডিন (Aberdeen) শহরেও প্রচুর আছে শুনেছি। একদিন চ্যারিটি থিয়েটার দেখলাম—একশ বছরের পুরানো নাটক, পুরানো ঢঙেই হ'ল। মাঠে গ্রাম্য নৃত্য দেখার সুযোগও হয়েছিল।

ফেরার পথে এডিনবার্গে আর গ্লাস্গোতে দুদিন ক'রে ছিলাম। এডিনবার্গে দুর্গ ও হলিরুড (Holyrood) প্যালেস্ স্কট্ল্যাণ্ডের রাণী মেরীর স্মৃতি-বিজড়িত। খুঁটিনাটি ইতিহাস শুনে অবশ্য মনে আঘাতই পেলাম। ইউনি-ভারসিটি ও চিকিৎসা-বিদ্যালয়টি অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। মিউজিয়ামে আলো ঢোকাবার জন্য কাঁচের ছাদ। সর্বোপরি মনে পড়ে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত (অবশ্য তখনও দিনের আলো শেষ হয়নি) সুদীর্ঘ স্ট্র্যাণ্ডে (রাস্তায়) ভ্রমণকালে একটি স্কচ্ সরকারী অফিসারের সঙ্গে অমায়িক আলাপন। পরদিন বাসেই রওনা হলাম পশ্চিম দিকে।

গ্লাসগোতে পৌছেই বৃষ্টি নামলো। এটা যে স্কট্ল্যাণ্ডের বৃহত্তম শহর ও শিল্পকেন্দ্র, তা বিরাট অট্টালিকাগুলি আর তাদের কালো রং দেখলেই বোঝা যায়। এখানকার রয়েল ইন্সটিটিউট্ অফ টেকনলজি (Royal Institute of Technology) ম্যানচেস্টারের মতোই। শহরে একটু ঘুরে জাহাজের কারখানাগুলি দেখবার জন্য ক্লাইড্ নদীর মোহনায় ছোট ছোট দ্বীপগুলি কাইল অব্ বিউট (Kyles of Bute) পর্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল স্টীমার ভ্রমণ করলাম। ছুটির সময়, বেশ ভিড়; বসবার স্থানাভাব।

খাওয়া, গল্প ও মাঝে মাঝে গানবাজনায় সকলে সময় কাটাচ্ছে। যেতে নদীর দুধারে অন্ততঃ ৪০।৫০টি জাহাজ-নির্মাণকেন্দ্র নজরে পড়ল। এ কাজটা এদের স্বভাবজ হ'য়ে গেছে।

YMCA হোস্টেলে ছিলাম। খুব ভাল ব্যবস্থা। এক ছাত্র-বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গল্প করতে করতে খাওয়া হয়নি; রাত ১২টায় রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে খুঁজে মাছ ও আলু ভাজা (Fish chips) কিনে এনে খাওয়া হ'ল।

পরদিন আরও দুজন জুটল। আমরা চার-জন বাঙালী স্কটিশ হ্রদ-মালার সৌন্দর্য দেখতে বেরুলাম। সারাদিনে প্রায় দেড়শ মাইল কোচ ভ্রমণ হ'ল। এরা লেককে বলে লখ্ (Loch), লোমণ্ড (Loch Lomond) ক্যাট্রিন (Loch Katrine) প্রভৃতি পাহাড়-ঘেরা বৃক্ষ-পুষ্প-পরিশোভিত হ্রদগুলি সত্যই তৃপ্তিদায়ক। অবশ্য আমাদের নৈনিতাল বা কাশ্মীর কম যায় না। লোমণ্ডে ষ্টীমার সার্ভিস দেখলাম। আরও উত্তরে যে বড় হ্রদ লখ্‌নেস্ (Loch Ness) সেখানে যাওয়া হয়নি। তার ভেতরে নাকি মারমেড (Mermaid) অর্ধমৎস্যাকৃতি মানবী আছে—কেউ কেউ দেখেছে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এ নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রাজী নয়। অবশ্য যাত্রীর মন ঐদিকে আকর্ষণ করবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। রাত্রে লীড্‌স্ ফিরলাম।

এবার আয়ার্লণ্ডে বেলফাস্ট (Belfast) শহরে এক কারখানায় আমার প্রথম কর্ম-কেন্দ্র। লীড্‌স্ থেকে হেশ্যাম (Heysham) হ'য়ে এক রাত্রে প্রায় ২০০ মাইল আইরিশ সাগর পার হ'য়ে বেলফাস্ট পৌছলাম। জাহাজে ১৫ দিন আগে থেকেই সব কেবিন ভাড়া হ'য়ে যায়। অগত্যা ডেকেই যেতে হ'ল। বেশ ভিড়—বসবার সীট ভর্তি, প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও পরে ডেক-চেয়ারে রাত কাটালাম। অনেকেই অবশ্য মাটিতে ওভারকোটের ওপর শুয়ে পড়ল। ফেরবার সময় শোবার বার্থ (berth) পেয়েও গরমে কষ্ট হয়েছিল।

লীড্‌সের চেয়ে বেলফাস্ট শহর আমার ভাল লেগেছিল। এখানে চুনকাম-করা বাড়ী দেখলাম—সাদা বা এলা রং, আর লীড্‌সে সব কালো, ধোঁয়ার জন্য। সমুদ্রপারে অবস্থিত। তাই এখানে ধোঁয়া নেই। আগস্ট মাসটা এখানেই কেটেছে। কারখানার জীবন মন্দ লাগল না। এখানে তখন ভারতীয় (বাঙালী, বিহারী, গুজরাটী), পাকিস্থানী, জাপানী, ফিনিস্, পোর্তুগীজ, অস্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি নানা জাতের ১২।১৪টি শিক্ষানবিশ ছিল। খাবার টেবিলে সকলে জড় হতাম। খাবার ব্যবস্থা বিনা খরচেই। বেশীর ভাগ ছাত্রই ক্রেতার তরফ থেকে এসেছে। তা না হ'লে এ সব কারখানায় ভারতীয়দের ঢোকা শক্ত। চোখ চেয়ে থাকলে শেখবার অনেক কিছু আছে—প্রশ্নের উত্তর—মালিক থেকে আরম্ভ ক'রে মজুর-সর্দার পর্যন্ত বেশ আগ্রহ-সহকারে দেয়। তবে নতুন যন্ত্র বা পদ্ধতিগুলি বাজারে ছাড়বার আগে পর্যন্ত একটু লুকিয়ে রাখে। এই রকম একটি যন্ত্র দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল, কেন না মালিকের ছেলের সঙ্গে আলাপ হতেই সে বললে, 'তোমার প্রবন্ধ মারফৎ আমি তোমায় চিনি এবং তোমার গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই আমরা একটি যন্ত্র তৈরী করতে প্রবৃত্ত হই—এটি সেই যন্ত্র।'

কারখানাটি খুব পরিষ্কার, ফাঁকি নজরে পড়ল না, অযথা ব্যস্ততাও নেই। কর্মীদের মুখে সর্বদাই হাসি, তাদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ

করলে আর ছাড়তে চায় না। সকলের গায়ে ওভার-অল (over-all) কিন্তু বেরুবার সময় সকলেই যে যার পোষাকে ফিট্‌ফাট্‌ হ'য়ে পাঁচটা বাজলেই দৌড়ে গিয়ে গেটে লাইন দেয়। এই সময়ে কয়েকটি বিশেষ পাবলিক বাসও ওদের জন্য থাকে। সুতাকল নির্মাণ ছাড়া এখানে কয়েকটি বড় বড় জাহাজ এবং উড়ো-জাহাজের কারখানাও আছে।

কিছু দূরে লাম্‌বেগ (Linen Research Institute)-এ তিসি গাছের আঁশ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে দেখি—ছোট একটি বাগান-বাড়ীতে গত ৪০ বছরে বেশ কাজ করেছে।

একদিন কুড়ি মাইল দূরে পূর্ব দিকে সমতল সমুদ্র-সৈকতে অবসর কাটাবার আনন্দ-মুখর ব্যবস্থা দেখে এলাম। অন্য এক শনিবার পঞ্চাশ মাইল দূরে উত্তরসীমানায় প্রস্তরসঙ্কুল সমুদ্র-তীরে ব্যালিণ্টয় (Ballintoy) নামে একটি ছোট গ্রামে আমাদের কলিকাতার জুট-লেবরেটরীর ভূতপূর্ব ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম। এঁর বৃদ্ধা স্ত্রী আমাকে সিদ্ধ ভাত আর দুধে মাছসিদ্ধ—যত্ন ক'রে খাওয়ালেন। একেবারে সমুদ্রের ওপর ছোট বাড়ী—একটু লাইব্রেরী ও পাথরের ওপর একটু বাগান করেছেন, আর একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র জোগাড় করেছেন, তা দিয়ে দূরে জাহাজের নাম দেখে টুকে রাখেন। বললেন, শেষ জীবন এর বেশী কিছু চাইনি। পথে—আলু, ওট, তিসি প্রভৃতির চাষ আর পশুপালন দেখলাম, চতুর্দিকেই শ্যামল শোভা। তরঙ্গায়িত ভূপৃষ্ঠে আবার নতুন ক'রে মোচাকৃতি (Coniferous) গাছ লাগাচ্ছেন এখানকার সরকার বাহাদুর। কাছেই এক পাহাড়ের ওপরে বেড়াতে যেতাম, সে যায়গাটা চারণ-ভূমি। মেষপালকের জীর্ণবাস ও পর্ণ-কুটীর দুঃস্থ অবস্থার পরিচায়ক ; কিন্তু আলাপে তাদের মনের দৃঢ়তা ও উদ্যম লক্ষ্য করলাম। অবশ্য ইংলণ্ডের তুলনায় এদেশ গরীব।

দুদিনের ছুটিতে ডি-ভ্যালেরার দেশও দেখে এলাম। সেটা বৃটিশ এলাকার বাইরে—তাই কাস্টম-চেকিং (Custom's checking) হ'ল। ডিজেলের রেলগাড়ী বেলফাস্ট ছেড়ে দুঘণ্টায় ১২০ মাইল পেরিয়ে একেবারে ডাবলিনে এসে থামল। আয়ার যে সমতল কৃষি-প্রধান দেশ, পথে তার প্রমাণ পেলাম ; ডাবলিনের কাছেই কিছু কলকারখানা। সে জন্য এদেশ উত্তর আয়ার্লণ্ডের তুলনায় গরীবও বটে। বেশ-ভূষা, আহার-বিহার ও বাসস্থানের নমুনায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। ডাবলিন বড় শহর—নেলসন্‌ স্তম্ভ এর প্রধান কেন্দ্র। কতকগুলি বিরাট বিরাট বাড়ী এখনও অতীত বৃটিশ রাজত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বর্তমান পার্লামেণ্ট কিন্তু সেই সব বাড়ী ছেড়ে একটি ছোট বাড়ীতে বসে। উচ্চ-সভা (Upper house) ও নিম্ন-সভা (Lower house) সব মিলে দেড়শ সদস্য। তথাপি এটা সত্যকারের বিধান-সভা। কিন্তু বেলফাস্টে দেখেছি—অতি চমৎকার পরিবেশে সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত এক পার্লামেণ্ট-গৃহ আছে, তাতে কেবল লণ্ডন পার্লামেণ্টের উচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণ করা হয়।

যদিও কেম্ব্রিজের ধরনের পুরানো কলেজ ডাবলিনে আছে এবং আন্তর্জাতিক আবহাওয়া সেখানে বর্তমান, তবু স্বাধীনতার পর এখানে নতুন ক'রে এক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। উগ্র স্বাধীনতা বোধের দরুন গভর্ণমেণ্ট জোর ক'রে এ দেশের আদিম ভাষা (গেলিক্‌) চালাবার চেষ্টা করছে—প্রাইমারি স্কুল থেকে; কিন্তু বেশীর ভাগ লোক নাকি তা পছন্দ করে না। রাস্তার নাম সব ঐ ভাষায়, অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীও আছে। ডাবলিনের

বিখ্যাত Horse Show (ঘোড়দৌড়) দেখাও হ'ল, কারণ ঐ সময়ে আগা খাঁ ট্রফি খেলা হচ্ছিল। অশ্বচালনার দক্ষতা নিয়ে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

কিছু দূরে সমুদ্রবক্ষে প্রসারিত হাউথ (Howth) নামে একটি ছোট পাহাড়, একদিন সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথে সেখানে একা চলেছি, দু-পাশেই দৃষ্টি দিগন্ত-প্রসারিত, হঠাৎ ভীষণ কিচির-কিচির শব্দে চমক ভাঙতে দেখি অসংখ্য পাখী (sea-gull) ও তাদের ছানাপোনা আমাকে দেখে চিৎকার ক'রে আপত্তি জানাচ্ছে। একটু বসে ফেরবার পথে দুটি রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে দেখা, তাঁদের সঙ্গে আলাপে জানলাম—এটাকে বলে 'Sanctuary of birds'—পাখীদের স্থান। পরদিন বেলফাস্ট ফিরলাম।

কয়েকদিন বেলফাস্টে থেকে আয়ার্লণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মানবদ্বীপ (Isle of Man) এর পাশ দিয়েই জাহাজ যায়। ও দেশের লোকেরা বলে এক দৈত্য আয়ার্লণ্ডের খানিকটা মাটি তুলে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তাই থেকেই এই দ্বীপের এবং আয়ার্লণ্ডের ভিতরে নীঘ (Neagh) হ্রদের উৎপত্তি।

এ-রকম দৈত্যের কাহিনী আয়ার্লণ্ডে আরও অনেক শুনেছি। যখন ব্যালিণ্টয় গেছলাম, উত্তর সমুদ্রতীরে জ্যামিতিক আকার-বিশিষ্ট কতকগুলি লাভা-স্তম্ভ (pillars of lava) দেখেছিলাম। তার নাম দেওয়া হয়েছে Giant's causeway (দৈত্যের সেতু)।

এবার কেবিন রিজার্ভ থাকায় রাত্রে শুয়ে এলাম, কিন্তু আগস্ট মাস ব'লে গরমে কষ্ট হয়েছিল। সকালে ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ ক'রে কাছেই এখানকার পশ্চিম উপকূলের নামকরা অবসর কাটাবার স্থান 'মোর কাম্বে' দেখে নিলাম। অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপকূলে এক জায়গায় সমুদ্রের এক মাইল ভিতর পর্যন্ত যাবতীয় আমোদের ব্যবস্থা। রাত্রের আলোকসজ্জা অবশ্য আমার দেখা হয়নি—তা নাকি অবর্ণনীয়। বিকালের দিকে লীড্‌সে আমার বাসায় ফিরলাম।

(ক্রমশঃ)

পথিক

শ্রীমতী গীতা হাজরা

জীবন-পথের পথিক আমি
নেই যে পথের শেষ,
আমার ব'লে নেইকো কিছুই
নেই যে আমার দেশ।

সবার মাঝে পাইগো আমি
তোমার দেখা জগৎস্বামী
পথ চলতেই পাই যে আমি
তোমারি নির্দেশ।

কভু যদি চলার পথে
আঁধার আসে ঘিরে,
না পাই আমি পথের দিশা
ভাসি আঁখি-নীরে,

জানি আমি জানি মনে
দেখা হবে তোমার সনে,
প্রাণের বীণা উঠবে বেজে
সেদিন প্রাণেশ!

তুমি আমার প্রাণের মাঝে
ঘুমিয়ে আছো ব্যথায় লাজে
জীবন-পথে সাথে সাথে
চলেছ অশেষ!

বৈরাগ্যশতকম্

অনুবাদ ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

মনঃসংবোধননিয়মনম্

মনোনিয়মনে দক্ষ পুরুষেরই যতিত্ব সহজলভ্য; সুতরাং মনকে সম্বোধন করিয়া তাহাকে সংযত করিবার উপায় কথিত হইতেছে :

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহুধা
প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি হৃদয় ক্লেশকলিতম্ ।
প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিতচিন্তামণিগণো
বিবিক্তঃ সঙ্কল্পঃ কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে ॥৬১॥

হে চিত্ত! প্রতিদিন অনুবর্তনাদি বিবিধ উপায়ে অপরের চিত্ত তোষণ করিয়া বহু আয়াস-লভ্য তাহার প্রসন্নতার জন্য তুমি কেন প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি সর্বসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া অন্তরে সমাহিত হইলে বিনা প্রযত্নেই সর্বাভীষ্টদায়ী সাত্বিক চিন্তারত্নসমূহ আবির্ভূত হইবে—অর্থাৎ তোমাতে দৈবী সম্পদ্ প্রকটিত হইবে। সর্বসঙ্কল্পরহিতাবস্থা তোমার কোন্ বাঞ্ছা পূরণ করিবে না? অর্থাৎ সবই পূরণ করিবে। অতএব অপরের প্রসন্নতা উৎপাদনের চেষ্টা পরিত্যাগ করত আত্মচিন্তনে সমাহিত হওয়াই কল্যাণার্থীর একমাত্র কর্তব্য।৬১

পরিভ্রমসি কিং মুধা ক্বচন চিত্ত বিশ্রাম্যতাং
স্বয়ং ভবতি যদ্ যথা ভবতি তত্তথা নান্যথা।
অতীতমননুস্মরন্নপি চ ভাব্যসঙ্কল্পয়-
ন্নতর্কিত-সমাগমাননুভবামি ভোগানহম্ ॥৬২॥

প্রারব্ধই যাবতীয় সুখদুঃখের নিয়ন্তা। অতএব অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করত পরমেশ্বরে মন সমাহিত করাই কর্তব্য, তাই কথিত হইতেছে :

হে চিত্ত, কেন তুমি বৃথা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছ? কোথাও (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) বিশ্রাম লও। যাহা যেরূপে হইবার তাহা বিনা প্রযত্নেই সেরূপ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা কখনও হয় না। (তুমি শান্ত হইলে) অতীতের অনুচিন্তন ও ভবিষ্যতের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আমি দৈববশে প্রাপ্ত বিষয়সমূহই ভোগ করিব। অর্থাৎ প্রারব্ধপ্রেরিত বিষয়সমূহই আমরা ভোগ করিয়া থাকি; অতএব হে চিত্ত, তুমি শান্ত হও, আমার জন্য তোমার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।৬২

এতস্মাদ্বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকাদাশ্রয়
শ্রেয়োমার্গমশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ।
স্বাত্মীভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাং গতিং
মা ভূয়ো ভজ ভঙ্গুরাং ভবরতিং চেতঃ প্রসীদাধুনা ॥৬৩॥

হে চিত্ত! সর্বদুঃখের মূল এই রূপরসাদি বিষয়ের ঘোর অরণ্য হইতে উপরত হও, অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখপ্রদ বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ কর; নিখিল সন্তাপনাশে সমর্থ শ্রেয়োমার্গ (জ্ঞানমার্গ) অনুসরণ কর; জলতরঙ্গের ন্যায় চঞ্চল স্বীয় ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ করত আত্মভাব-লাভে তৎপর হও; ক্ষণস্থায়ী সংসারভোগে আর চঞ্চল হইও না; এখন শান্ত হও, চিত্তের প্রশান্তি বিনা শত পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারাও শ্রেয়ঃ বা পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না।৬৩

মোহং মার্জয় তামুপার্জয় রতিং চন্দ্রার্ধচূড়ামণৌ
চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবামাসঙ্গমঙ্গীকুরু।
কো বা বীচিষু বুদ্বুদেষু চ তড়িল্লেখাসু চ শ্রীষু চ
জ্বালাগ্রেষু চ পন্নগেষু চ সুহৃদ্‌বর্গেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥৬৪॥

বিষয়সুখ-ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করত শ্রীভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইবার জন্য স্বচিত্তকে সম্বোধন করিয়া সাধক কবি বলিতেছেন: হে চিত্ত! পুত্রমিত্রাদিতে আসক্তিজনক মোহ পরিত্যাগ কর; যাঁহার শিরে চন্দ্রার্ধ শোভা পাইতেছে তাঁহার প্রতি অনুরাগ-পরায়ণ হও; সুরনদী মন্দাকিনী বা ভাগীরথীর পবিত্রতীরে বাস করিবার জন্য একান্তভাবে ইচ্ছুক হও; ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। অন্য কোন বস্তুতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। জলের তরঙ্গে বা বুদ্বুদে, চঞ্চল বিদ্যুতে বা সম্পদে, অগ্নিশিখায়, বিষধর সর্পে বা কপট বন্ধুবর্গে বিশ্বাস কি?৬৪

চেতশ্চিন্তয় মা রমাং সকৃদিমামস্থায়িনীমাস্থয়া
ভূপালভ্রুকুটীকুটীবিহরণ-ব্যাপারপণ্যাঙ্গনাম্।
কন্থাকঞ্চুকিনঃ প্রবিশ্য ভবন-দ্বারাণি বারাণসী-
রথ্যাপঙ্‌ক্তিষু পাণিপাত্রপতিতাং ভিক্ষামপেক্ষামহে ॥৬৫॥

কবি প্রকারান্তরে চিত্তকে সম্বোধন করিতেছেন: হে চিত্ত! রাজন্যবর্গের ভ্রুকুটীরূপ কুটীর-বিহারিণী চঞ্চল বারবিলাসিনী তুল্যা অস্থিরপ্রকৃতি এই লক্ষ্মীকে তুমি কখন সাদরে আকাঙ্ক্ষা করিও না। বরং আমরা কন্থাবৃতগাত্রে পবিত্র বারাণসী-ক্ষেত্রে পথিপার্শ্বস্থ গৃহদ্বারে ভিক্ষালাভার্থ প্রবেশ করিয়া পাণিপাত্রে যদৃচ্ছালব্ধ ভিক্ষামাত্রেই পরিতৃপ্ত থাকিব।৬৫

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বয়োর্দাক্ষিণাত্যাঃ
পশ্চাল্লীলাবলয়রণিতং চামরগ্রাহিণীনাম্।
যদ্যস্ত্যেবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং
নো চেচ্চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্বিকল্পে সমাধৌ ॥৬৬॥

সংসার হইতে বিরত হইবার জন্য স্বচিত্তকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন: সম্মুখে প্রবীণ গায়কবৃন্দের সুমধুর সঙ্গীত, উভয় পার্শ্বে দক্ষিণদেশীয় সরস কবিগণের স্তুতি এবং পশ্চাতে চামরধারিণী রমণীগণের বীজন-জনিত হস্তস্থিত মণিকঙ্কণের ঝঙ্কার—যদি এই সমস্ত ভোগ-সামগ্রী তোমার বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে হে চিত্ত! সংসার-ভোগাস্বাদনে লোলুপ হও; নতুবা অবিলম্বে বিকল্পরহিত গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হও।৬৬

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥৬৭॥

বিচারদৃষ্টিতে ঐশ্বর্যলাভ বা শত্রুজয়াদি—এ সমস্তই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, ইহা হৃদয়ঙ্গম করত শ্রদ্ধা সহকারে বৈরাগ্যই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাই বলা হইতেছে: হে চিত্ত! নিখিলকামনা-পূরণকারক ঐশ্বর্যাদি লাভ হইলেই বা মনুষ্যের কি সার্থকতা? শত্রুমস্তকোপরি পদস্থাপনে অর্থাৎ অশেষ শত্রু বশীকরণেই বা প্রয়োজন কি? অর্থাদি দ্বারা সুহৃদ্বর্গের মনস্তুষ্টি সাধিত হইলেই বা কি ফল? এবং যোগাভ্যাসদ্বারা এককল্পস্থায়ী শরীর-লাভেই বা কি সার্থকতা?৬৭

ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তা
বৈরাগ্যমস্তি কিমিতঃ পরমর্থনীয়ম্ ॥৬৮॥

তাহা হইলে শ্রেয় সাধন কি, তাহাই বলা হইতেছে: হে চিত্ত! শ্রীসদাশিবের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হও, জন্ম ও মৃত্যুভীতি সদা স্মরণ কর, স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিতে মমতা পরিত্যাগ কর, কামপ্রযুক্ত হইয়া স্ত্রী-পারবশ্যাদি বিকারসমূহ অন্তরে স্থান দিও না, সঙ্গদোষরহিত নির্জন বন-প্রদেশে বাস কর—ইহাই বৈরাগ্য; এই বৈরাগ্য ভিন্ন প্রার্থনার যোগ্য আর কি থাকিতে পারে? অর্থাৎ বৈরাগ্যই একমাত্র পরম শ্রেয়ের সাধন।৬৮

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাসি
তদ্‌ব্রহ্ম চিন্তয় কিমেভিরসদ্বিকল্পৈঃ।
যস্যানুষঙ্গিণ ইমে ভুবনাধিপত্য-
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতা ভবন্তি ॥৬৯॥

যেহেতু বৈরাগ্যই একমাত্র প্রার্থনীয় বস্তু, অতএব হে চিত্ত! অনিত্য বিকল্প অর্থাৎ বিষয়-ভোগপ্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি বিষয়ক ব্যর্থ বিচারে কি প্রয়োজন? ব্রহ্মবিচারপরায়ণ হইলে ত্রিভুবনের আধিপত্যরূপ ভোগাদি দাসের ন্যায় অনুসরণ করে; কিন্তু ঐগুলি মূর্খ অজ্ঞানী জনগণেরই পরম আদরণীয়, বিদ্বান্‌গণের ঘৃণার বস্তু; অতএব সেই অনন্ত, জরামরণরহিত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বব্যাপী, প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হও।৬৯

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য
দিঙ্‌মণ্ডলং ভ্রমসি মানস চাপলেন।
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং
ন ব্রহ্ম সংস্মরসি নির্বৃতিমেষি যেন ॥৭০॥

বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিয়া কবি বলিতেছেন: হে চিত্ত! তুমি বিষয়াসক্তিজনিত চপলতা বশতঃ কখন রসাতলে অতি নিম্নে প্রবেশ করিতেছ, কখন আকাশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অতি উর্ধ্বে যাইতেছ, কখন বা দিক্‌চক্রবালে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু যাঁহার স্মরণে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, হৃদয়স্থিত বিমল সেই ব্রহ্মের চিন্তা কখন ভুলিয়াও করিতেছ না।৭০

নিত্যানিত্য-বস্তুবিচার ঃ

বেদাধ্যয়ন, স্মৃতিশাস্ত্র পর্যালোচনা, শাস্ত্রপঠন ও পুরাণশ্রবণাদির দ্বারা স্থায়ী লাভ কিছুই হয় না; কিন্তু বিচার অর্থাৎ আত্মবিষয়ক শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি সহায়ে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার দ্বারাই সেই নিত্য মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে—কবি মুমুক্ষুগণকে ইহাই উপদেশ দিতেছেন:

কিং বেদৈঃ স্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈর্মহাবিস্তরৈঃ
স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ।
মুক্ত্বৈকং ভবদুঃখভাররচনাবিধ্বংসকালানলং
স্বাত্মানন্দপদপ্রবেশকলনং শেষৈর্বণিগ্‌বৃত্তিভিঃ ॥৭১॥

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও অপরাপর অতি বিস্তৃত শাস্ত্রসমূহের পঠন দ্বারা কি লাভ? স্বর্গরূপ গ্রামস্থ কুটীরে নিবাসই যাহার ফল—এইরূপ স্বর্গফলদায়ী স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, যাগাদি কর্মানুষ্ঠান-বিভ্রমেরই বা কি প্রয়োজন? এই মহাসংসারদুঃখ-রচনাসমূহের বিনাশকারী প্রলয়াগ্নিসদৃশ একমাত্র ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি সম্পাদন বিনা আর সব কিছুই জীবিকাসাধনরূপ বণিগ্‌বৃত্তিমাত্র।৭১

যতো মেরুঃ শ্রীমান্নিপততি যুগান্তাগ্নিবলিতঃ
সমুদ্রাঃ শুষ্যন্তি প্রচুরতরমকরগ্রাহনিলয়াঃ।
ধরা গচ্ছত্যন্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃতা
শরীরে কা বার্তা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে ॥৭২॥

যখন প্রলয়াগ্নিকবলিত হইয়া অতুল সমৃদ্ধিমান্ সুমেরু পর্বতও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অগণিত গ্রাহ-মকরাদির আবাসস্থান অগাধ সমুদ্রসকলও শুষ্ক হইয়া যায়, ভীমকায় পর্বতপ্রান্তদেশ দ্বারা ধৃত ও সুরক্ষিত এই পৃথিবীও যখন কালবশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন হস্তিশাবকের কর্ণাগ্র-ভাগের ন্যায় চঞ্চল এই মানবদেহের অবশ্যম্ভাবী ভঙ্গুরত্বের আর কি কথা!৭২

গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলি-
র্দৃষ্টির্নশ্যতি বর্ধতে বধিরতা বক্ত্রং চ লালায়তে।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্যা ন শুশ্রূষতে
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোঽপ্যমিত্রায়তে ॥৭৩॥

জরাকবলিত মানুষের দুর্দশা বর্ণিত হইতেছে: হায়! জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ মানবের কি দুরবস্থাই না হইয়া থাকে! তাহার শরীর সঙ্কুচিত, চলচ্ছক্তি নষ্ট, দন্তপঙ্‌ক্তি পতিত ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়। কর্ণের বধিরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, মুখগহ্বর হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, বন্ধু

জনেরাও তাহার কথার কোন সমাদর করে না, আপন স্ত্রী পর্যন্ত তাহার সেবা করিতে অনিচ্ছুক হয় এবং প্রিয় পুত্রও অনাত্মীয়বৎ প্রতিকূল আচরণে তৎপর হইয়া থাকে।৭৩

বর্ণং সিতং ঝটিতি বীক্ষ্য শিরোরুহাণাং
স্থানং জরাপরিভবস্য তদা পুমাংসম্।
আরোপিতাস্থিশতকং পরিহৃত্য যান্তি
চণ্ডালকূপমিব দূরতরং তরুণ্যঃ॥৭৪॥

বৃদ্ধের ধবলকেশরাশি দর্শন করত জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে শত অস্থিখণ্ড-বেষ্টিত ঘৃণ্য চণ্ডাল-কূপ-সদৃশ হেয়-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া যুবতীগণ অতি শীঘ্রই দূরদেশে গমন করিয়া থাকে।৭৪

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্যঃ প্রযত্নো মহান্
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥৭৫॥

শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকিতে থাকিতে, জরাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বেই, ইন্দ্রিয়সমূহ সবল সমর্থ থাকাকালে এবং আয়ু নাশ না হইতেই বিবেকিগণের আপন কল্যাণের অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যাদি উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য। নতুবা গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে কূপ খনন করিবার উদ্যম বৃথা। গৃহদাহকালে কূপ-খনন যেরূপ নিষ্ফল, বৃদ্ধাবস্থায় রোগজীর্ণ শরীরে সাধন-ভজন সেইরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শরীর সুস্থ থাকিতেই জ্ঞানলাভের জন্য তৎপর হইবেন।৭৫

তপস্যন্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং
গুণোদারান্ দারানুত পরিচরামঃ সবিনয়ম্।
পিবামঃ শাস্ত্রৌঘানুত বিবিধকাব্যামৃতরসান্
ন বিদ্মঃ কিং কুর্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে॥৭৬॥

মানবজীবন কতিপয় নিমেষমাত্রস্থায়ী। এই অল্পকালের মধ্যে আমরা কোন্‌টি যে করিব তাহা বুঝিতে পারি না। তপশ্চর্যায় নিরত হইয়া ভাগীরথী-তটে নিবাস করিব? অথবা গুণবতী রম্যা পত্নীগণের সপ্রেম পরিচর্যা করিব? কীর্তি প্রতিষ্ঠাদি লাভের নিমিত্ত সাংখ্য-বেদান্তাদি শাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইব? অথবা বিবিধ কাব্যালঙ্কারাদির রসপানেই তৎপর হইব? ৭৬

দুরারাধ্যাশ্চামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভুজো
বয়ং চ স্থূলেচ্ছাঃ সুমহতি ফলে বদ্ধমনসঃ।
জরা দেহং মৃত্যুর্হরতি দয়িতং জীবিতমিদং
সখে নান্যচ্ছ্রেয়ো জগতি বিদুষোঽন্যত্র তপসঃ॥৭৭॥

তুরগ সদৃশ চঞ্চলচিত্ত ভূপতিগণের প্রসন্নতা সম্পাদন করা বড়ই কঠিন, আর বহুধনাকাঙ্ক্ষী আমাদের আশাও বিরাট; এদিকে জরাবস্থা ধীরে ধীরে দেহকে ও কাল পরম প্রিয় জীবনকে কবলিত করিতে সমুদ্যত। হে সখে! বিবেকিগণের নিকট এ সংসারে একমাত্র তপশ্চর্যা ব্যতীত আর কিছুই কল্যাণপ্রদ নাই।৭৭

মানে ম্লায়িনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যর্থে প্রযাতেঽর্থিনি
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈর্যৌবনে।
যুক্তং কেবলমেতদেব সুধিয়াং যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ-
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরতটীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্বচিৎ ॥৭৮॥

যখন প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়, ধনসম্পত্তি বিগত হয়, যাচকবৃন্দ গৃহদ্বারে আসিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায়, পুত্রমিত্রাদি বন্ধুজন অন্নভাবে কৃশতা প্রাপ্ত হয়, বেতনাদি না পাইয়া ভৃত্য-পরিজনবর্গ প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় ও যৌবন ধীরে ধীরে নাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন গঙ্গাবারিপূত পাষাণময় হিমগিরিগুহা-সমীপস্থ লতামণ্ডপাদিতে কোথাও নিবাস করাই বুদ্ধিমান্ পুরুষের একমাত্র কর্তব্য।৭৮

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসমাগমাগতসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
সর্বং রম্যমনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎ পুনঃ॥৭৯॥

বিমল চন্দ্রকিরণ বড়ই মনোহর—সন্দেহ নাই, তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল বনমধ্য ভূমিও নয়নানন্দদায়ক. বিদ্বজ্জনসমাগমজনিত আনন্দও কাম্য ও চিত্তের শান্তিবিধায়ক বটে, কাব্যনাটকাদির বিচিত্র উপাখ্যানাদিও তৃপ্তিদায়ক, প্রণয়কলহজনিত ক্রোধবশতঃ উৎপন্ন অশ্রুবিন্দু দ্বারা শোভমান প্রেয়সীর মুখপঙ্কজও বড়ই মনোরম, সন্দেহ নাই—কিন্তু নিত্যানিত্যবস্তুবিচার জাগ্রত হইলে এ সকল রম্য পদার্থই নিতান্ত তুচ্ছ ও অসার বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।৭৯

রম্যং হর্ম্যতলং ন কিং বসতয়ে শ্রব্যং ন গেয়াদিকং
কিং বা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকপ্রীতয়ে।
কিংতু ভ্রান্তপতঙ্গপক্ষপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্য সকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ॥৮০॥

প্রাসাদোপরি সুরম্য প্রদেশ কি নিবাসার্থ সুখপ্রদ নহে? সুমধুর গীতবাদ্যাদিও কি শ্রবণসুখ সম্পাদন করে না? প্রাণসমা প্রিয়তমার সমাগমও কি অতি সুখাবহ নহে? সাংসারিক দৃষ্টিতে এ সমস্তই সুখদায়ক বলিয়া প্রতীত হয়, তথাপি বস্তুবিচার-কুশল বিবেকী পুরুষগণ এ সকলই—অগ্নির রূপে মুগ্ধ পতঙ্গের পক্ষকম্পনোদ্ভূত বায়ু দ্বারা আন্দোলিত দীপশিখার চঞ্চল ছায়ার ন্যায় নশ্বর জানিয়া (শাশ্বত ব্রহ্মানন্দের সাধন তপশ্চর্যা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত) বনেই গমন করিয়া থাকেন।৮০

রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-প্রতিভার আবির্ভাব ভারতেই সম্ভব, অন্যত্র নহে, একথা শুধু যাহা ঘটিয়াছে তাহারই পুনরুক্তি মাত্র, সুতরাং নিতান্ত মামুলি মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে, ইহা স্বতঃ-সিদ্ধ-প্রমাণের প্রয়াসের মতো। কিন্তু এই মহাদেশের বিরাট আত্মার, অসীম মহিমার, অতুল বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি তাঁহার মনের মুকুরে কিরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল—তাহা সমগ্রভাবে জানা অনাবশ্যক বা বাহুল্য নহে। বিশেষতঃ বর্তমানে, যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলিবার বা মুছিয়া ফেলার দিকে নানা শক্তি, নানা মতবাদ ভিতরে ও বাহিরে চেষ্টা করিতেছে।

ভারতীয় ভাবসম্পদের সন্তান

রবীন্দ্র-মনীষা ভারতবর্ষের যুগ-যুগায়ত মানস-সরোবরের পূর্ণ প্রস্ফুট শতদল। তাঁহার লেখমালার সহিত নিবিড় পরিচয়ের সাথে ইহা সুস্পষ্ট বোধ হয়। তাঁহার আসন্ন জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সেই ঘনিষ্ঠতার সূচনা ও সুযোগ। রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যান্য দিক্—তাঁহার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, কাব্যকলা, রসতত্ত্ব, নৃত্য-গীত নাট্যে অবদান, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও জীবনদর্শন সাধারণতঃ সংক্ষেপে বা সবিস্তারে আলোচিত হইলেও ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁহার অন্তরের প্রকাশ এখনও লোকলোচনের অনেকখানি অন্তরালে রহিয়াছে। অথচ ইহাই ছিল যুগে যুগে ভারতের প্রাণের কথা—পরম আগ্রহের বস্তু। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনন-সম্পদও বিপুল ও বহুমুখী। বিষয়ানুসারে বিন্যাস করিয়া এই সমগ্র ভাবধারার অনুশীলন এখনও সমর্থ আলোচকের অপেক্ষা করিতেছে। উপস্থিত আলোচনা তাহারই একটি প্রস্থ। শাশ্বত ভারতের কোন্ চিত্র তাঁহার মানস-পটে অঙ্কিত হইয়াছে? তাঁহার বিশাল গ্রন্থরাজি নানাজাতীয় সুরভি কুসুমের কানন-প্রায়। ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে তাঁহার অনুভব ও চিন্তা এখানে স্বাভাবিক শোভায় বিকশিত। ভাবের ঐক্য, বিষয়ের মিল অনুসারে সেগুলিকে এই প্রবন্ধে চয়ন ও একত্র করিয়া স্তবকের মত সাজানো হইয়াছে—অনেক স্থলে বিনা মন্তব্যে। রবির প্রভা স্ব-প্রকাশ ও বর্ণচ্ছটায় অনুপম। সেই আলোকে উক্তিগুলির যোগসূত্রও স্বতঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর মুখবন্ধে আছে—'দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত।'

কবি বলিতেছেন, 'আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা।'

অন্যত্র তিনি আক্ষেপ করিয়াছেন, 'আমরা ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব, একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না।'

ভারতের অসামান্যতা

সকল জাতি সমান—এই মতবাদের প্রতিবাদে তাঁহার অভিমত, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই—এ কুসংস্কার বর্জন না করিলেই নয়।' 'আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে, তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে

পারে।' ভারতের একটা আন্তর জীবন, মানস ইতিবৃত্ত আছে—ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধারণা। 'রাজনৈতিক ঘটনার দুঃস্বপ্নের অন্তরালে প্রকৃত দেশ।' 'পাঠ্য গ্রন্থের বহির্ভূত সেই ভারতবর্ষের সঙ্গেই আমাদের যোগ—বহুশত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে।'

অমর অতীত

শান্তিনিকেতনে নববর্ষের ভাষণে কবির উক্তি —'আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চির-নবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার।' 'নূতনত্বের মধ্যে চির-পুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমিয় যৌবন-সমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়।' 'জটিল ব্যাখ্যার দ্বারা যাচু করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের রসে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রকৃতি আপনার কাজ আপনি করিতে থাকিবে।' 'কথা'র উপক্রমে তিনি লিখিয়াছেন :

'হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার
কথা কও কথা কও,
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী
অচেতন তুমি নও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া,
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।'

ব্যাপক বিষয়বস্তু

সাময়িক, পরিবর্তনশীল ঘটনার অন্তরালে চিরন্তন ভারতের তিনি দ্রষ্টা। 'আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন'—তাহাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে রবীন্দ্রনাথের লেখনী কতখানি ও কতভাবে নিরত ছিল, তাহার শুধু উল্লেখেই একটা বৃহৎ তালিকা হইয়া যায়। 'ভারততীর্থ' সঙ্গীতে উদাত্ত ছন্দে যে' অখণ্ড শাশ্বত দেশ-জননীর স্তুতি-মন্ত্র উদীরিত, আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম, সঞ্চয়, পরিচয়, কালান্তরের সংযোজন, 'পথের সঞ্চয়' নামে গ্রথিত প্রবন্ধরাজিতে তাহার অনুধ্যান ও আলোচনা। কথা ও কাহিনীতে, বাল্মীকি-প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, অচলায়তন, নটীর পূজা, প্রভৃতি কাব্য-নাটকে তাহার রূপারোপ। শান্তিনিকেতন-ভাষণ-পরম্পরায় নানাস্থলে তাহারই মর্মকথা ধর্মতত্ত্ব-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

এ সকল হইতে আহরণ করিলে চিরন্তন ভারতের অধ্যাত্ম মূর্তি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অনুভূতিতে যেরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহার একটি সমগ্র বিবরণ সঙ্কলিত হইতে পারে; এবং ধর্মপ্রসঙ্গে তাঁহার চিন্তার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে পরিস্ফুট হইতে পারে।

আরণ্য সভ্যতা

শান্তিনিকেতনের মূলে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দিব্য প্রেরণা। কিন্তু শাখা-স্কন্ধ পুষ্পপল্লবে ইহার প্রসার রবীন্দ্রনাথের সাধনা। ইহার ভাব-বীজ তপোবন ও আশ্রম। ভারতের আরণ্যক সংস্কৃতির মর্ম-প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের নিপুণতা ও অন্তর্দৃষ্টি অপূর্ব ও অনুপম। বিশ্বভারতীর আদর্শের সূচনায় তাঁহার কথা : 'শান্তিনিকেতনের বীজ আশ্রম-বনস্পতিতে অমর।'

কবি লিখিয়াছেন—'এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করিয়াছে।' 'প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবন-দৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করেনি। বিরলবসন তপস্বীদেরই

আপনাদের আদিপুরুষ ব'লে জেনে রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন।' 'তপোবনের বিশেষ রস শান্তরস—পরিপূর্ণতার রস। সাতটা রঙ মিলে যেমন সাদা চিত্রের নানা বিভক্ত প্রবাহ নিখিলের সহিত সামঞ্জস্যে কানায় কানায় ভরে শান্ত রসের উদ্ভব।'

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পুণ্যতীর্থ

প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য ও মহিমার আবির্ভাবে ভারতের তীর্থস্থান। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ পবিত্র, বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গঙ্গা যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। 'জগৎকে ভারত পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, উপভোগের দ্বারা খর্ব করেনি।' চৈতালির 'বন' 'তপোবন', 'সভ্যতার প্রতি' প্রভৃতি চূর্ণক কবিতায় এই সকল ভাব ছন্দিত, 'প্রাচীন সাহিত্যে'র নানা স্থলে উহা প্রতিধ্বনিত। 'অন্য দেশ (যথা আমেরিকা) অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, ভোগের বস্তু করেছে, যোগের আশ্রম করেনি।' ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্য স্থান হ'য়ে ওঠেনি। তপোবনই ছিল ভারত-সভ্যতার চরম নিদর্শন, 'নিখিল প্রকৃতির সাথে আত্মার মিলনকে শান্ত সমাহিত উপলব্ধি ভারতের একমাত্র সাধনা।' 'জবরদস্তি দ্বারা য়ুরোপীয় আদর্শের অনুকরণ করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—'আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে। মনের তপস্যা—জ্ঞানের তপস্যায় নয়, কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষায় নয়, বোধের তপস্যায়।'

সর্বময়ী প্রকৃতি

রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতির সাথে যোগ একটি মূল সূত্র, বিরাট আলোচ্য বস্তু। প্রেমিকের চক্ষে প্রেমাস্পদের মত, 'সা প্রাসাদে দিশি দিশি চ সা, পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা।' তাঁহার কথায় 'রাম-বনবাসে আরণ্য প্রকৃতি সজীব ও সরস হইয়াছে মানুষের প্রেমের স্পর্শে।' ভারত-সভ্যতার যেরূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতির প্রভাবে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু 'প্রকৃতির সহিত ইহার সংযোগ পূর্ণতার জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য নয়।'

প্রকৃতির সাধনায় স্পর্ধা না বিনম্রতা ?

শান্তিনিকেতন (৩৬ পর্যায়)এ আছে—'প্রকৃতির সাধনায় অন্নপূর্ণার বরলাভ। কিন্তু মঙ্গলের নিয়ম ধর্মনীতি। ধর্মনীতি মানুষের শেষ সম্বল। নিয়ম-শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল।' 'সর্বশক্তিমানের আসন দখল করা আজ সভ্যতার অভিমান।' কবি বলেন, 'শক্তির ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে প্রতি-যোগিতা—অর্জুনের কিরাত-বেশী মহাদেবকে বাণ মারা—তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর সঙ্গে স্পর্ধা ক'রে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে, ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।' 'শক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের দুই মূর্তি। এক অন্নপূর্ণা—ঐশ্বর্যের শক্তিকে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। আর এক করালী কালী—আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ ক'রে নেয়। পাওয়ার মূর্তি খুব উজ্জ্বল সুন্দর, কিন্তু যাওয়ার মূর্তি বিষাদে পরিপূর্ণ, ভয়ঙ্কর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান। এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়।' 'পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগ, এই যোগে অহংকারকে দূর ক'রে বিনম্র হয়। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি।' 'যেমন বায়ুর নিত্য প্রবাহ। শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশী। ঝড় সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্য-কাল বেষ্টন ক'রে থাকে।'

বাস্তবে পরিণত আদর্শ

এই মহাদেশের প্রকৃতি-নির্ণয়ে তিনি বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষ কোন বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসারযাত্রার সহিত অসংগত বোধে কোন দিন ভীরুতাবশতঃ কথার কথা করিয়া রাখে নাই!' 'ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী, কর্মে যোগ-সাধনা।' নিখিলের সাথে যোগ, ভূমার উপলব্ধি, সর্বজীবের ঐক্য, একান্ত অহিংসা, সর্বত্যাগ—শুধু চিন্তার বস্তু হয় নাই, সাধনার সামগ্রী—বাস্তব আদর্শ এদেশেই হইয়াছিল। 'প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য ক'রে তোলবার জন্য অনুশাসন ছিল।' জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা ছিল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ লক্ষ্য এবং ধর্মাচরণের ভিত্তি। তিনিই উদাহরণ দিয়াছেন: 'এক সময়ে যে ভারত মাংসাশী ছিল—সেই ভারত আজ প্রায় সর্বত্র নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।' 'এই হিংসা ত্যাগ না করিলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগ-সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ-ব্যাপ্ত ক'রে দিতে থাকে।' ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত: 'অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে ও সমস্ত মনে গ্রহণ করিতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র ব'লে মনে করি। এই নদীর ভিতর দিয়া পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন।' 'স্নানের জল, আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা, সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়। অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন—এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভব।'

উপনিষদের প্রেরণা

শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায় উপনিষদের মন্ত্রগুলির নানা ব্যঞ্জনা সর্বত্র অনুস্যূত। উপনিষদের ভিতর দিয়া প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এ-দেশের সকল অধ্যাত্মদর্শনের ইহা উপজীব্য—শ্রুতি-প্রস্থানরূপে শিরোধার্য। উপনিষৎ—কবির ভাষায়—ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। ইহার মধ্যে 'ঈশা বাস্যমিদং' সর্বাধিক সমাদৃত—এই একটি মন্ত্র ভারতীয় জীবনদর্শনের বীজস্বরূপ। ইহা নানাস্থলে তিনি দেখাইয়াছেন। উপনিষদের অপর মন্ত্র: 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্'—ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যার উৎসস্বরূপ—ইহার তাৎপর্য নানাস্থলে তিনি বিস্তারিত করিয়াছেন। উপনিষদের সূক্তিগুলি কনক-কিঙ্কিণীর মতো শান্তিনিকেতন-ভাষণমালায় ঝঙ্কৃত। ভুবনেশ্বর-মন্দির দর্শনে কবিচিত্ত উদ্বুদ্ধ হয় বুদ্ধোত্তর নব হিন্দুধর্মের মর্মকথায়: 'উহা ছিল সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা—আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার—দেবতায় অখিলের একাত্মতা।' রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন, 'ঈশ্বর সর্বত্র, ইহা অতি পুরাতন কথা—মহাপুরুষগণের কার্য পৃথিবীর প্রাচীনতম কথা নূতন করিয়া তোলা।'

গীতা ও ব্রহ্মসূত্র বিশ্বের আলোক

ভগবদ্গীতাকে কবি 'ভারত-ইতিহাসের চরম তত্ত্ব—মহাভারতের সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি' বলিয়াছেন। 'জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়ে ইহা সকল পথের চৌমাথায় চরম লক্ষ্যের আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।' 'ভারত-চিত্তের সকল প্রয়াস এক মূল সত্য—পরিপূর্ণ মানব-জীবনের যিনি পরমা গতি—সকল তত্ত্বের কেন্দ্রস্থল—তাহাতে মিলিত হইয়াছে।' 'ব্রহ্মসূত্র

কেবল আর্যধর্ম কেন, সমস্ত মানবের ধর্মের এক আলোক।'

পুরাণ-মহাকাব্যে জাতির প্রাণ

ভারতের পুরাণেতিহাস ও বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্যের আলোচনায়, রবীন্দ্রনাথ মনে হয়, যেন উদ্ভিদ্-মানযন্ত্র বা crescographএর মত হৃৎস্পন্দনের আলোকচিত্র তুলিয়া ধরিতেছেন। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন: 'নিশীথে দেবর্ষি নারদের বীণায় ভক্তির সুর আজও কম্পিত। তাঁহার সূক্ষ্ম ও সরস অনুভূতি এদেশের প্রাণ-গুহায় যুগযুগ-নিহিত রহস্য যেন ভাস্বর করিয়াছে।' 'রামায়ণে পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।' 'রামায়ণ ও মহাভারতের সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।' এগুলির শিক্ষা 'পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি।' 'উহাদের এই উপদেশ বিস্মৃত হইলে, পরিচয় বিলুপ্ত হইলে মানব-সভ্যতা কারখানা ঘরের জনতা মধ্যে নিশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে।'

মহাভারতে সূক্ষ্ম নির্মম অপক্ষপাত বিচার কাহাকেও রেহাই দেয় নাই। প্রত্যেক চরিত্রকে নিক্তির ওজনে যাচাই করিয়াছে—যথোচিত নিন্দা-প্রশংসা, মূল্যনিরূপণ করিয়াছে, কর্মফলের অধীন দেখাইয়াছে। যেখানে শ্রোতা বৈরাগী, লৌকিক শৌর্যবীর্য মহত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্মরণ করিয়া অনাসক্ত, সেখানে কবিও নির্মম। কৃষ্ণসখা পার্থের বীর্য ও কীর্তির জয়স্তম্ভ সমগ্র মহাভারত, কুরুক্ষেত্রে তাহার গৌরব-চূড়া। কিন্তু শেষে 'শ্রীকৃষ্ণের রমণীগণ দস্যুদলে আক্রান্ত হইলে গাণ্ডীব তুলিতে তাঁহার হস্ত অবশ।' এই ভাবে মনুষ্যেতিহাসের নিয়তি ও জীবনের পরিণতিকে মহাভারতকার বাস্তব চিত্রমালায় উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

শুচি ও উদাত্ত দৃষ্টি

'প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মহান্ ভাবের আনন্দে আমাদের মুক্তহৃদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন' রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সরস লেখনীমুখে রূপ দিয়াছেন অশ্রান্ত সৃষ্টিতে। সাহিত্য-শাস্ত্রের নবরস-নির্ঝরের মধ্যে মুখ্যতঃ শান্ত, করুণ ও মধুরে তাঁহার স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। কিন্তু এগুলিতেই হউক বা বীর, হাস্য ও অদ্ভুতেই হউক, সর্বত্র একটি উদাত্ত, গম্ভীর সুর, শোভন অঙ্গীকার, সুকুমার স্পর্শ তাঁহার রচনার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব। ইহা তাঁহার প্রতিভার স্বধর্ম, চিন্তার রীতি, রচনার পরিবেশ।

রবীন্দ্র-রচনার বৈশিষ্ট্য শুচিতা, সংযম ও শোভনতা। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে শালীনতার মর্যাদা সর্বত্র নিপুণ কুশলতার সহিত রক্ষিত। ইহা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ মনে হয়। ব্যক্তি ও সমাজের স্বাধীনতা তাঁহার বাণী—হীন ও পতিত, ক্রূর ও কুটিল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ তাঁহার লেখায় মনোরম হইয়া উঠে নাই। রমণীর আকর্ষণ সত্ত্বেও সন্ন্যাসীর অটল স্থৈর্য ও ব্রহ্মচারীর অনন্য দৃঢ়তা তাঁহার কল্পনায় মহনীয় হইয়াছে নানা স্থলে। বৈরাগ্য ও অবিচলিত নিষ্ঠার মধ্যে যে মানব-মহত্ত্ব তাহা নিপুণ রেখাপাতে সর্বত্র উজ্জ্বল। ত্যাগের তেজোদীপ্ত বল, ঐকান্তিক ভক্তি ও গভীর ধর্মবিশ্বাসের সর্বসহিষ্ণুতা, সতীর অনায়াসে মৃত্যু-বরণ—এ সকলের উদাত্ত কাহিনীতে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিপূর্ণ। তিনি লিখিয়াছেন—'সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ বলিষ্ঠ-ভীষণ, দারুণ-

সহিষ্ণু, উপবাসব্রতী কৌপীনধারী, নদীতীরে রৌদ্ররুদ্র ধূসর প্রান্তরে তৃণাসনে আসীন, সঙ্গহীন নিভৃতবাসী। যদি কখনো ঝড় আসে, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিম সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর পিঙ্গল জটাজুটের মধ্যে দীপ্ত চক্ষু জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার লৌহবলয় ও লৌহদণ্ডের ঘর্ষণ-ঝঙ্কার মেঘমন্দ্রের উপর শব্দিত হইবে।'—ইহা রবীন্দ্র প্রতিভায় ভারতীয় প্রেরণারই অভিব্যক্তি।

সভ্যতার বিভিন্ন ধারণা

তিনি বলিতেছেন—'প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্রের গ্রন্থে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এমনই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়।' ভারতের সভ্যতা ও প্রাণধারার রহস্য উন্মোচিত করিতে রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠ ও অশ্রান্ত। মনীষা ও কল্পনা এই প্রকাশ-ভঙ্গিমার নিপুণ কিঙ্করী অন্তরের শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস নিত্য সহচর। 'পরিষ্কৃত বুদ্ধি, পক্ষপাত-শূন্য বিচার, নিঃস্বার্থ ও নির্মল উৎসাহ'—এই মর্মোদ্ভেদের বিপুল প্রয়াসের সহায়ক। তিনি বলিতেছেন—'বস্তু-প্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্মপ্রধান, মঙ্গলপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' 'ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং মানুষের চিত্ত হইতে কর্মের নানা পাশ শিথিল করিয়া একদিকে সংসার-ব্রত-পরায়ণ, অন্যদিকে মুক্তির অধিকারী করা উন্নততম ও ভারতবর্ষের আদর্শ।' 'ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তুর দ্বারা স্ফীত করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে নিজের কাছে প্রত্যক্ষ গোচর করিতে পারি না বলিয়া, উহা আমরা ঠিক বুঝিতেছি না, উহা আমাদের বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিতেছে না। অন্যান্য সভ্যতার সহিত মিলাইয়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ত্ব, একটা ধ্রুবত্ব উপলব্ধি করিতেছি না।' এই অক্ষমতার নিদান আধুনিক সদাব্যস্ত বিরামহীন উত্তেজনা-ময় জীবন-প্রণালী—যাহার ঘূর্ণিপাকে চিন্তার অবসর মিলে না। 'ঘূর্ণাগতির মধ্যে কেহ কখনো নিজেকে ও জগৎকে ঠিকভাবে দেখিতে পায় না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপসা দেখে। যাহারা ভোগী তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনায় ক্লান্ত। কারখানাগুলার ভিতরে বাহিরে চারিদিকে মানুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে শ্রমজীবীদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, একাকিত্বের আবরু থাকে না।'

কর্মময়তা ও ধ্যানের অবকাশ

জীবনের ছন্দকে এই অতিক্রত সদাব্যগ্র বিক্ষিপ্ত গতিবেগ হইতে মুক্ত রাখা ভারতীয় পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য ছিল। 'ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে। লাগামপরা অবস্থায় মরা য়ুরোপের আদর্শ, জিন-লাগামপরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ—আমরাও একথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি। আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই জন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়। করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শ খুব বড়ো জিনিষ।' 'সংসারের কাজ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল, তাহার পর আত্মার অবাধ, অনন্ত গতি, তাহা নিশ্চেষ্টতা নহে।'—ইহা এদেশের শেষ আশ্রম-ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব। 'বানপ্রস্থ ধনহীন উপকরণহীন জীবন-যাত্রার, প্রশস্ত পথে বাহির হওয়া।' 'কর্মের উত্তেজনাই পাছে কর্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত করিয়া দেয়, ভারতবর্ষের এই আশঙ্কা ছিল।' 'সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্য করা হয়। ভারতবর্ষ তাহা করিতে চায় নাই, সেই জন্য তাহার বন্ধন যেমন দৃঢ়, তাহার ত্যাগও সেইরূপ সম্পূর্ণ।' (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (প্রথম ষট্‌ক—শ্রীধর-টীকাসহ): স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত; প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড়। পৃঃ ৩৩৪ +৫৬+৷৵০; মূল্য পাঁচ টাকা।

'উদ্বোধন' হইতে প্রকাশিত স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত গীতার অনুবাদক হিসাবে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের নাম পাঠক-সমাজে সুপরিচিত। পূর্বরচিত গ্রন্থখানি প্রধানতঃ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে মূল অন্বয় এবং অনুবাদের পর শ্রীধরের সুবোধিনী-টীকা ও তাহার অনুবাদ রহিয়াছে। শ্রীধরী টীকাও 'ভাষ্যকারমতং সম্যক্' 'যথামতি সমালোচ্য' জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া সহজ সুবোধ্য ভাষায় লিখিত; শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীধরস্বামীর টীকার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। যাঁহাদের নিকট শঙ্করভাষ্য দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা যাহাতে শ্রীধরী টীকার রসাস্বাদন করিয়া গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, অনুবাদক সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই খণ্ডে আচার্য শ্রীধর স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গীতামাহাত্ম্য সহ প্রথম ছয় অধ্যায়ের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি শীঘ্রই ইহার বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থের আদিতে 'অলৌকিক গীতাপাঠ' ও পরিশিষ্টে 'শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী' এবং 'শিবপূজা ও শিবরাত্রি' প্রভৃতি সংযোজনগুলি নিষ্প্রয়োজন, যুক্তিবাদী পাঠকের নিকট এগুলি আদৃত হইবে না। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলিতে এরূপ প্রচারমূলক নিবন্ধ থাকিবে না।

শ্রীশ্রীচণ্ডীচিন্তন—শ্রীমদনগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত, ১৭।১, বিন্দুবাসিনী রোড, ভাটপাড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৯০; মূল্য টাকা ১'৫০।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শক্তিবাদ বিষয়ে যে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে বিচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তার গভীরতা ও নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর সাত শত শ্লোকের সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। চণ্ডীতে উক্ত 'রাজোবাচ', 'ঋষিরুবাচ', 'দেব্যুবাচ' বা 'নমস্তস্যৈ' প্রভৃতিকে এক একটি মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিলে তবে চণ্ডীর 'সপ্তসতী' নাম সার্থক হয়, কিন্তু এইগুলি ছন্দ হিসাবে কিভাবে এক একটি শ্লোক হইতে পারে—লেখকের ইহাই সংশয়। লেখকের মন্তব্য: চণ্ডীর কোন শ্লোকই গায়ত্রী বা উষ্ণিক ছন্দে রচিত নয়, অধিকাংশই অনুষ্টুপ ছন্দে বিরচিত, কয়েকটি উপজাতি বা বসন্ততিলক ছন্দে; অথচ পাঠকালে ঋষিছন্দে পূর্বোক্ত ছন্দগুলির নাম করা হয়। এরূপ আরও সংশয় তিনি পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

দেবীভাগবত ও মহাভাগবতে শক্তিই যে পরব্রহ্মরূপিণী, লেখক ইহা প্রমাণসহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুর্গা জগদীশ্বরী, জগতের সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারিণী—শক্তিতত্ত্বের এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পর আর কোন 'পরিচিতি'র প্রয়োজন ছিল না।

এরূপ গ্রন্থে অত্যধিক বানান ভুল বা মুদ্রণ-প্রমাদ চক্ষুর পীড়াদায়ক।

তুহিন মেরু অন্তরালে—বসুধারা গুপ্ত। প্রকাশক: রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র-বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। পৃষ্ঠা—১২৭; দাম তিন টাকা।

ধর্মপিপাসু হিন্দুমাত্রেরই মনপ্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে হিমালয়ের পবিত্র তীর্থগুলি দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। আলোচ্য পুস্তকে লেখিকা তাঁর বদ্রীনাথ ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ছ-মাস তুষার-শয্যায় শয়ান থাকেন বদ্রীনাথ—তাই বোধ হয় বইখানির এই নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু 'মেরু' বলতে কি ঐ অঞ্চলকে বোঝায়?

ট্রেনে বাসে ও হাঁটা পথে লেখিকা যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা সহজ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তীর্থে তীর্থে অবস্থানের সময় যে সব সাধুসন্ত সাধকসাধিকা ও পর্যটকের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের কথাও তিনি বিবৃত করেছেন। পথের দুঃখ কষ্ট আনন্দ ও মাধুর্যের বর্ণনায় ভাষার স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে; তবে তীর্থস্থানগুলির বিবরণ ও মাহাত্ম্যের দিকটা কম ক'রে সঙ্গীদের বর্ণনাই করেছেন বেশী। স্থানে স্থানে সংস্কৃত শ্লোক, গান ও কবিতার উদ্ধৃতি থাকায় বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৬৬) সম্পাদক শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৬।

মহাপুরুষ-বাণী, কবিতা, প্রবন্ধাবলী সমন্বিত হ'য়ে পূর্ব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছে কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা: মধু-পরিক্রমার একদিক, নূতন-ভারত গঠনে ছাত্রসমাজ, স এর সাম্রাজ্য (রস-রচনা)। **—জীবানন্দ**

সুরে কথামৃত—ছন্দরূপ: অজাতশত্রু, সুরসৃষ্টি: শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীত যাদুকর, কল্পতরু প্রকাশনী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশের ছায়া অবলম্বনে এগারোটি সঙ্গীতের স্বরলিপি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে মূল উপদেশগুলি 'কথামৃত' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। লেখকের প্রচেষ্টা অভিনব ও প্রশংসনীয়। সুরগুলি সুন্দর। উচ্চভাব সুরসংযুক্ত হইলে সহজেই মর্মস্পর্শী হয়। গানগুলির মধ্যে মূল উপদেশের তাৎপর্য রক্ষিত হইলেও কোন কোন স্থলে ভাষার আবরণে ভাব অস্পষ্ট হইয়াছে।

চিরকালের গল্প (প্রথম ভাগ)—লেখক: প্রণবরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশক: লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

ইহাতে বুদ্ধ, যীশু ও রামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি উপদেশপূর্ণ গল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হইয়াছে। মহৎ ভাব উদ্দীপনের জন্য এ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ছাপার অক্ষর সুস্পষ্ট 'গ্রেট' টাইপ হইলে নবস্বাক্ষরদের পড়িবার সুবিধা হইত।

—য. কা. রা.

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২৩শে অক্টোবর বেলুড় মঠে স্বামী ওঁকারানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৫৯ খৃঃ বার্ষিক বিবরণী উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে।

নূতন নির্মাণ-কার্য

রহড়া আশ্রমে গত ৩১শে জানুআরি আশ্রমের ছাত্র ও কর্মীদিগের জন্য একটি আরোগ্য-নিকেতন খোলা হইয়াছে। মেদিনীপুর আশ্রমে বহুমুখী বিদ্যালয়-ভবনের নির্মাণকার্য শেষ হওয়ায় গত ২১শে ফেব্রুআরি সাধারণভাবে উহার উদ্বোধন হয়। এপ্রিল মাসে পাথুরিয়া-ঘাটা আশ্রম নরেন্দ্রপুরে স্থানান্তরিত হয়। গত ২৩শে এপ্রিল নরেন্দ্রপুরে বিদ্যালয়-ছাত্রদের জন্য নূতন ছাত্রাবাসের এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর সাধুকর্মীদের বাসভবন উদ্বোধন করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ। নরেন্দ্রপুরে স্কুল ও কলেজ ভবনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর।

পাটনা আশ্রমে ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করেন ভারত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ৬ই অক্টোবর; ঐদিন তিরুচিরাপল্লী জেলায় তপোবন আশ্রমে সম্প্রসারিত বিদ্যার্থী-ভবনের উদ্বোধন হয়। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে নার্সেস্ কোয়ার্টার্স সম্প্রসারণের জন্য ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৪ই অক্টোবর, ইহাতে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, ভারত সরকার একলক্ষ টাকা দিয়াছেন।

রহড়া আশ্রমে প্রার্থনালয় সহ নির্মিত মর্মরমূর্তি-সমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ১৬ই অক্টোবর; ঐ দিন রহড়া আশ্রমে অতিথি-ভবনেরও উদ্বোধন হয়।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের কর্মী-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন স্বামী প্রভবানন্দ গত ৮ই নভেম্বর। বেলঘরিয়া স্টুডেণ্টস্ হোমে 'শিল্প-পীঠে'র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৩ই ডিসেম্বর। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে বহুমুখী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ২০শে ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মাসে ইনস্টিটিউট অব্ কালচার গোলপার্কে স্থানান্তরিত হয়। ভবন-নির্মাণকার্য এখনও চলিতেছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর নাদিতে বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৬ই ফেব্রুআরি। সিঙ্গাপুরে ছাত্রাবাসের সম্প্রসারিত অংশের উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ৬ই জুন। কলম্বো আশ্রমে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় ভারতের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক ১৭ই জুন।

নূতন কেন্দ্র

ক্ষেত্রীর যে ভবনে স্বামী বিবেকানন্দ রাজ-অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি

এবং অন্য একটি গৃহ গত ডিসেম্বরে রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত শাখাকেন্দ্রটির কার্যভার একটি ম্যানেজিং কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে।

সদস্য-সংখ্যা

১৯৫৯ খৃঃ মিশন গভর্নিং বডির দুইজন সদস্য হারাইয়াছে, তাঁহাদের নাম: স্বামী প্রবোধানন্দ ও স্বামী আত্মবোধানন্দ। বর্ষশেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৩৬ (সাধু ৩২৫, ভক্ত ৩১১)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া ডিসেম্বর মাসে মিশনের মোট কেন্দ্র-সংখ্যা ছিল ৭৪ ; তন্মধ্যে পূর্বপাকিস্তানে ৮, ব্রহ্মদেশে ২ ; ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া ; বাকী ৬০টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৫, মাদ্রাজে ৯, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২ ; দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরালায় ১টি করিয়া। [মঠ-কেন্দ্রগুলি ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।]

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ পাঁচটি বিভাগ: (১) রিলিফ (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা (৪) সাহায্য ৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: ১৯৫৯ খৃঃ অসময়ে প্রচুর বারি-বর্ষণের ফলে কয়েকটি প্রদেশ বন্যাপ্লাবিত হইয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই-এ মিশন হইতে ব্যাপকভাবে রিলিফ করা হয়।

আসামে শিলং-কেন্দ্র কামরূপে এবং করিমগঞ্জ ও শিলচর-কেন্দ্র স্ব স্ব অঞ্চলে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বন্যার্তদিগকে প্রদান করেন। আসাম-রিলিফে মোট খরচ হয় ৩২,১০৩ টাকা, তন্মধ্যে বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতে ১৫,০০০ টাকা প্রেরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় বন্যার্ত-সেবাকার্য পরিচালিত হয় বেলুড় সারদাপীঠ, নরেন্দ্রপুর, রহড়া, বেলঘরিয়া ও আসানসোল কেন্দ্র দ্বারা। এই সেবাকার্যে ৫১০ মণ চাল, ২৭৩ মণ আটা, ২০০ মণ ডাল, ১৪,৯৪৪ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ১,০৬৫ পাউণ্ড রুটি, ৩০০ মণ আলুর বীজ, ৬,১৪০ ধুতি ও শাড়ী, ৬,৬৯৩ কম্বল, ৪১৩ চাদর ও লেপ, ৫,০৭৭ জামা এবং অগণিত পুরাতন কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদত্ত হয়।

রহড়ায় ২১১ জনকে ৬দিন ধরিয়া এবং বেলঘরিয়ায় ১৩১ জনকে এক সপ্তাহ যাবৎ ভাত খাওয়ানো হয়। এই রিলিফে ৯১,০০০ টাকা ব্যয় হয়; বেলুড় প্রধান কেন্দ্র হইতে ৫৫,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া কেন্দ্র হইতে একটি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা হয়।

বোম্বাই ও রাজকোট কেন্দ্র একযোগে কচ্ছে চারটি তালুকে রিলিফ করেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীগুলি মেরামত করিয়া দেওয়া হয়। ভুজ-নগরে ১০০ পরিবারের বাসোপযোগী তিনলক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি কলোনী নির্মিত হয়।

গত সেপ্টেম্বরে সুরাটে শত শত গ্রাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোম্বাই আশ্রম ব্যাপকভাবে রিলিফ পরিচালনা করেন। ৬৫৫টি গৃহ পুনর্নির্মিত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ৫,৮৬০ গৃহ সারাইয়া দেওয়া হয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩,৮০,০০০ টাকা। হরিজন ও ভাঙ্গীদিগের জন্য কলোনী-নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

(২) চিকিৎসা : ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অধিকাংশ কেন্দ্রেই জাতি-ধর্মনির্বিশেষে রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল, রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং দক্ষিণ কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ক্যান্সার-চিকিৎসাও হইতেছে।

১৯৫৯ খৃঃ মিশনের তত্ত্বাবধানে ৮টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ৮৫৯ ; ১৯,৩৯২ রোগী ভরতি হয়। ৫০টি বহির্বিভাগীয় হাসপাতালে ২৩,৬২,৬৫২ (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

(৩) শিক্ষা : মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ ও	১,৭৭৪	
„ (আবাসিক)	বেলুড়		
বি.টি. কলেজ	বেলুড়, তিরুপ্পারাইতুরাই ও কোয়েম্বাতুর	১৫৫	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ	৩	৭৩	২৩৪
জুনিয়র „ „ „	২	২০০	
শারীর শিক্ষা „	কোয়েম্বাতুর	৬৯	
গ্রামীণ „ „	„	১৭৪	
কৃষি-শিক্ষণ বিদ্যালয়	„	২৯	
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	„ ও বেলুড়	১৩৭	
ইঞ্জিনিয়রিং স্কুল	৪	১,২৯৬	
জুনিয়র শিল্পবিদ্যালয়	৭	২৮৬	১২৭
ছাত্রনিবাস (অনাথাশ্রম সহ)	৭২	৪,৯৩১	৪৯০
চতুষ্পাঠী	২	২৮	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১২	৩,২২৫	৭১৭
মাধ্যমিক „	২৪	৯,১৪২	৪,২৮৯
সিনিয়র বেসিক „	৭	৬৯৬	৯৬৯
জুনিয়র „ „	১৯	২,২০২	৭৪১
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়	১০১	১২,২৮৩	৮,৬৮৭

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের (Nurses' Training Centre) ব্যবস্থা আছে, আলোচ্য বর্ষে ১২১ শিক্ষার্থিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে মোট ৩৬,৬৭৫ ছাত্র ও ১৬,৩২৬ ছাত্রী শিক্ষা পাইতেছে। বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, বেলুড়, সরিষা, রহড়া, মেদিনীপুর, চেরাপুঞ্জি, কলিকাতা, জামসেদপুর, আসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, কানপুর, মাদ্রাজ, কোয়েম্বাতুর, তিরুপ্পারাইতুরাই, কালিকট এবং সিংহলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছাত্রাবাস, স্কুল বা কলেজ মিশনের শিক্ষা বিভাগীয় কার্যের নিদর্শন।

(৪) সাহায্য : প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য :

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	৯১	২০৮	১
সাময়িক :	২৬০	৩১	

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৭,১৯১ টাকা। কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ছাত্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার পরিমাণ ৭,৫৫৬ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি : পূর্বের মতো মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেন, এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির সহিত সংযোগ স্থাপিত হয় ; গ্রন্থাগার পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Insti-

tute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

* * *

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি স্বামী ওঁকারানন্দ মহারাজ বলেন:

পূজা, উপাসনা, জপ, ধ্যান প্রভৃতি ধর্মজীবন গঠনের অঙ্গ হিসাবে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সকল কর্মই উপাসনা—ইহাই এ যুগের ভাবাদর্শের মূলে। রামকৃষ্ণ মিশনের সকল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে যাহাতে এই আদর্শ যথাযথ রূপায়িত হয় এবং জীবনের সর্বস্তরে ও সকল ক্ষেত্রে যাহাতে ইহা সার্থক হইয়া উঠে—তদ্বিষয়ে সকলকে সর্বদা অবহিত থাকিতে হইবে।

স্বামী নির্বিকারানন্দের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ১৪ই অক্টোবর স্বামী নির্বিকারানন্দ ৬৬ বৎসর বয়সে সকাল ৬-১০ মিনিটে থম্বোসিস রোগে ত্রিবান্দ্রম্ আশ্রমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গত ১২ই ও ১৩ই অক্টোবর রাত্রে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন, যথাসাধ্য চিকিৎসা সত্ত্বেও ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হইতে থাকে।

স্বামী নির্বিকারানন্দ ১৯২০ খৃঃ তিরুভল্লা আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রত্যেক কার্যে তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হইত। সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা চির শান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

আমেরিকায় বেদান্ত

সিএট্‌ল্ঃ রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের বার্ষিক (অক্টোবর '৬৯—অক্টো '৭০) কার্যবিবরণী আমরা সানন্দে প্রকাশ করিতেছি:

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দ প্রতি রবিবার সকালে বেদান্তের বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা দেন এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মূল বেদান্ত গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই বৎসর শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা শুরু হইয়াছে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ধ্যান ও ভজনে যাপিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও খৃষ্টকে কেন্দ্র করিয়া প্রচলিত উৎসবগুলি যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের সময় স্বামী অশেষানন্দ এই কেন্দ্রে আসেন, রবিবারের সভায় বক্তৃতা দেন এবং একটি বিশেষ আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন, আলোচ্য বিষয় ছিল: সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধর্ম। বিভিন্ন ধর্মের প্রচারকগণ আলোচনায় যোগ দেন।

আলোচ্য বর্ষে স্বামী বিবিদিষানন্দকে বহু শিক্ষা ও ধর্মের প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে হয়। তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হিন্দু ধর্ম' সম্বন্ধে এবং লেক-সাইড বালক বিদ্যালয়ে 'ভারতীয় চিন্তা ও বর্তমান পৃথিবী' সম্বন্ধে বক্তৃতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রীষ্মাবকাশে স্বামী বিবিদিষানন্দ হাওয়াই দ্বীপে হনলুলু যান, সেখানে বেদান্তানুরাগী ছাত্রগণের জন্য তাঁহাকে বক্তৃতা ও আলোচনায় সারাটি মাস ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

আশ্রমের প্রার্থনা-কক্ষটি সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যায়, স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সময় প্রার্থনা-গৃহ পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিবে।

গ্রন্থাগার-উদ্বোধন

নরেন্দ্রপুর ঃ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না গত ১৩ই নভেম্বর নরেন্দ্রপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে পাঠাগার-ভবনের উদ্বোধন করেন। নবনির্মিত দ্বিতল পাঠাগার-ভবনে দুই শতাধিক ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা আছে।

পাঠাগার-উদ্বোধনের পরে আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীখান্না সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী খান্না পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর ইংরেজীতে 'রন্তিদেব' নাটক অভিনীত হয় ও ছায়াচিত্রে 'পথের পাঁচালী' দেখানো হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা

সারদাপীঠ (বেলুড়) ঃ গত ২৮শে অক্টোবর প্রতিমায় শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে সারা দিবসব্যাপী পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়; পূজান্তে হোম হয়; কীর্তন ও ভজন সারাদিন ধরিয়া চলে। পূর্বদিন সন্ধ্যায় অধিবাসের পর 'সতী-লীলা কীর্তন' (কথকতা) করেন ভারতী-সংসদ; শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই কথকতা শ্রবণ করেন। উৎসব-দিনে প্রায় ৬,০০০ নরনারী প্রসাদগ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। শনিবার সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের ঘাটে প্রতিমার নিরঞ্জন হয়। শত শত ভক্ত নরনারী ইহা দেখিবার জন্য সমবেত হন। রবিবার সন্ধ্যায় 'ভিখারী শঙ্কর' যাত্রাভিনয় দর্শন করিতেও কয়েক সহস্র দর্শকের সমাবেশ হইয়াছিল।

নিবেদিতা-জন্মবার্ষিকী

গত ২৮শে অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে নিবেদিতা-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য যাপিত ভগিনী নিবেদিতার সেবাময় জীবন আলোচিত হয়। এই উপলক্ষে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন বক্তা ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগপূত জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে নিবেদিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া বলেন: পাশ্চাত্যের এই মহীয়সী মহিলা ভারতের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরু স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে তিনি এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন—ভারতের দুর্গতির জন্য ধর্ম দায়ী নয়, ধর্ম হইতে বিচ্যুতিই সর্ববিধ অবনতির মূল কারণ। সর্বস্তরে ধর্মভাব সঞ্চারিত হইলেই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। স্বামীজীর আদেশে নিবেদিতা মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নিবেদিতার প্রভা ছিল সূর্যের মতো উজ্জ্বল, অথচ চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ। ভারতমাতার সেবায় নিবেদিতা নিজেকে তিল তিল করিয়া উৎসর্গ করিয়া গুরুদত্ত নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১০৮তম শুভ জন্মতিথি আগামী ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১০ই ডিসেম্বর, শনিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

সংবাদ-পরিবেষণ-যন্ত্র

বিভিন্ন দেশের সরকারী ও অভিজ্ঞ মহল হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া UNESCO কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন, যে-দেশে শতজন প্রতি ১০ খানি সংবাদপত্র, ৫টি রেডিও রিসিভার, ২টি সিনেমা-সীট নাই—সে দেশে সাধারণ জ্ঞান পরিবেষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই ভিত্তিতে (দেড়শ কোটি অর্থাৎ পৃথিবী লোকসংখ্যার ৬০% অধ্যুষিত) এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ১০০টি রাষ্ট্রে উক্ত ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নয়।

পৃথিবীতে প্রতিবৎসর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেছে, তথাপি দারিদ্র্য ও তাহার সহচরী নিরক্ষরতা পৃথিবীর অর্ধাংশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে। অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলি বুঝিয়াছে, শিক্ষার মান উন্নত না করিয়া জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিতরণের সব যন্ত্রগুলি একযোগে কাজে লাগাইবার প্রয়াস সর্বত্র লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ আফ্রিকা-এশিয়ায় নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে জ্ঞান-স্পৃহা যে বাড়িতেছে, তাহার প্রমাণ সংবাদপত্র, সস্তা বই, রেডিও প্রভৃতির চাহিদা-বৃদ্ধি। যাহারা পড়িতে পারে না, তাহাদের রেডিও শুনিবার আগ্রহ খুব।

৪০টি রাষ্ট্রের নিজস্ব সংবাদ সংগ্রহ-সংস্থা নাই। তাহারা নিজ দেশের সংবাদের জন্যও বিদেশীদের উপর নির্ভর করে। নিম্নে সংবাদ-পরিবেষণ-যন্ত্রের একটি তুলনামূলক তালিকা প্রদত্ত হইল :

	সারা পৃথিবীতে	ইওরোপে	উঃ আমেরিকায়	আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতিতে
সংবাদ পত্র	২৫,৬০,০০,০০০	৩৫%	২৭%	...
রেডিও রিসিভার	৩৭,০০,০০,০০০	২৫%	৫০%	১৩%
টেলিভিসন	৮,৪০,০০,০০০	২৩%	৬৬%	৪%
সিনেমা গৃহ	১,৩০ ০০০	৮০%		২০%

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনের' নূতন (৬৩ তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা সহ বার্ষিক ৫৲ (পাঁচ টাকা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-ব্যয় বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। **কুপনে গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

উদ্বোধন

হিন্দু ও খৃষ্টান

স্বামী বিবেকানন্দ

বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে দেখা যায়, হিন্দুদর্শনের প্রবণতা ধ্বংস করা নয়, বরং প্রত্যেক বিষয়ে সমন্বয় করা। যদি ভারতে নতুন কোন ভাব আসে, আমরা তার বিরোধিতা করি না, বরং তাকে আত্মসাৎ ক'রে নিই, অন্যান্য ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, কারণ আমাদের দেশের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ, ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণই প্রথম এই পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। শ্রীভগবান এই অবতারেই প্রথম প্রচার ক'রে গেছেন, 'আমি ঈশ্বরের অবতার, আমিই বেদাদি গ্রন্থের প্রেরয়িতা, আমিই সকল ধর্মের উৎস।' তাই আমরা কোন ধর্ম বা ধর্ম-গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

খৃষ্টানদের সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে বড়ই *পার্থক্য, এটি* আমাদের কেউ কোন দিন শেখায়নি। সেটি হচ্ছে যীশুর রক্ত দিয়ে মুক্তি, অথবা একজনের রক্তদ্বারা নিজেকে শুদ্ধ হ'তে হবে। ইহুদীদের মতো বলিদান-প্রথা আমাদেরও আছে। আমাদের এই বলি বা উৎসর্গ-প্রথার সহজ অর্থ: আমি কিছু খেতে যাচ্ছি, কিছু অংশ ঈশ্বরকে নিবেদন না করাটা ভাল নয়। তাই আমি আমার খাদ্য ঈশ্বরকে নিবেদন করি; সহজে সংক্ষেপে এই হ'ল ভাবটি। তবে ইহুদীর ধারণা উৎসর্গীকৃত মেষটির উপর তার পাপরাশি চলে যাবে, আর সে পাপমুক্ত হবে। এই 'সুন্দর' ভাবটি আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করেনি, তার জন্যে আমি আনন্দিত। অন্যের কথা বলতে পারি না, তবে আমি কখনও এই ধরনের বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ চাই না। যদি কেউ এসে আমাকে বলে, 'আমার রক্তের বিনিময়ে মুক্ত হও', তাকে আমি ব'লব, 'ভাই, চলে যাও, আমি নরকে যাব। আমি এমন কাপুরুষ নই যে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির রক্ত নিয়ে স্বর্গে যাব। আমি নরকে যাবার জন্য প্রস্তুত।' ঐ ধরনের বিশ্বাস আমাদের দেশে উদ্ভূত হয়নি। আমাদের দেশের অবতার বলেছেন, যখনই পৃথিবীতে অসদ্ভাব ও দুর্নীতি প্রবল হবে, তখনই তিনি আসবেন তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতে, এবং তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে এই কাজ ক'রে আসছেন। পৃথিবীর যেখানেই দেখবে অসাধারণ কোন পবিত্র মানব মানুষের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন, জেনো তাঁর মধ্যে ভগবানই রয়েছেন।

অতএব বুঝতে পারছ, কেন আমরা কোন ধর্মের সঙ্গে লড়াই করি না। আমরা কখনও বলি না, আমাদের ধর্মই মুক্তির একমাত্র রাস্তা। যে কোন মানুষ সিদ্ধাবস্থা লাভ করতে পারে; তার প্রমাণ? প্রত্যেক দেশেই দেখি পবিত্র সাধু পুরুষ রয়েছেন, আমার ধর্মে জন্মগ্রহণ করুন বা না করুন—সর্বত্র সদ্ভাবাপন্ন নরনারী দেখা যায়। অতএব বলা যায় না, আমার ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ। 'অসংখ্য নদী যেমন

বিভিন্ন পর্বত থেকে বেরিয়ে একই সমুদ্রে তাদের জলধারা মিশিয়ে দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত হ'য়ে তোমারই কাছে আসে'—এটি ভারতে ছোট ছেলেদের প্রতিদিনের একটি প্রার্থনার অংশ। যারা প্রতিদিন এই ধরনের প্রার্থনা করে, তাদের পক্ষে ধর্মের বিভিন্নতা নিয়ে মারামারি করা একেবারেই অসম্ভব। এ তো গেল দার্শনিকদের কথা, এঁদের প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধা, বিশেষ ক'রে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তার কারণ, তাঁর অপূর্ব উদারতা দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সকল দর্শনের সমন্বয় করেছেন।

ঐ যে মানুষটি মূর্তির সামনে প্রণাম করছে, ও কিন্তু তোমরা যে ব্যাবিলন বা রোমের পৌত্তলিকতার কথা শুনেছ, তার মতো নয়। এ হিন্দুর এক বিশেষত্ব। মূর্তির সামনে মানুষটি চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করে, 'সোঽহম্, তিনিই আমার স্বরূপ; আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; আমার পিতা নেই, মাতা নেই; আমি দেশকালে সীমাবদ্ধ নই; আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সোঽহম্, সোঽহম্, আমি কোন পুস্তকের বাঁধনে বাঁধা পড়িনি! কোন তীর্থের বা কোন কিছুর বন্ধন আমার নেই! আমি সৎস্বরূপ, আমি আনন্দস্বরূপ, সোঽহম্, সোঽহম্।' বার বার এই কথা উচ্চারণ ক'রে সে বলে, 'হে ঈশ্বর, আমার মধ্যে তোমাকে আমি অনুভব করতে পারছি না, বড় হতভাগ্য আমি।'

ধর্ম বই-পড়া জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে না। ধর্ম আত্মাই, ধর্ম ঈশ্বর, শুধু বই-পড়া জ্ঞান বা বক্তৃতা-শক্তির দ্বারা ধর্ম লাভ হয় না। সব চেয়ে বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বলো, আত্মাকে আত্মা-রূপে চিন্তা করতে, তিনি পারবেন না। আত্মার সম্বন্ধে তুমি একটা কল্পনা করতে পারো, তিনিও পারেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত আত্মস্বরূপে চিন্তা অসম্ভব। ঈশ্বরতত্ত্ব যতই শেখ না কেন—তুমি একজন বড় দার্শনিক, আরো বড় ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞ হ'তে পারো—তবু একটি হিন্দু বালক বলবে 'ওর সঙ্গে ধর্মের কিছু সম্বন্ধ নেই। আত্মাকে আত্মস্বরূপে চিন্তা করতে পারো?' তাহলে সকল সংশয়ের শেষ, তাহলেই মনের সব বাঁকা-চোরা সোজা হ'য়ে যাবে। জীবাত্মা (মানুষ) যখন পরমাত্মার (ঈশ্বরের) সম্মুখীন হয়, তখনই সব ভয় শূন্যে মিলিয়ে যায়, সব সন্দিগ্ধ চিন্তা চিরতরে স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

পাশ্চাত্যের বিচারে একজন অদ্ভুত বিদ্বান্ হ'তে পারেন, তবু তিনি হয় তো ধর্ম বিষয়ে অ, আ, ক, খ না জানতে পারেন। আমি তাঁকে তাই ব'লব। জিজ্ঞেস ক'রব, 'আপনি কি আত্মাকে আত্মা ব'লে ভাবতে পারেন? আপনি কি আত্ম বিষয়ক বিজ্ঞানে পারদর্শী? আপনি জড়ের উর্ধ্বে নিজ আত্মাকে বিকশিত করেছেন? যদি তা না ক'রে থাকেন তাহলে তাঁকে ব'লব, 'ধর্ম আপনার লাভ হয়নি, যা হয়েছে তা শুধু কথা, শুধু বই, শুধু বৃথা গর্ব!'

আর ঐ 'হতভাগ্য' হিন্দুটি মূর্তির সামনে বসে দেবতার সঙ্গে তাদাত্ম্য চিন্তা করবার চেষ্টা ক'রে শেষে বলে, 'হে ঈশ্বর, পারলাম না তোমায় আত্মস্বরূপে ধারণা করতে, অতএব এই সাকার মূর্তিতেই তোমায় চিন্তা করি।' তখন সে চোখ খোলে, ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ করে, প্রণাম ক'রে বার বার প্রার্থনা করে। প্রার্থনার শেষে আবার বলে, 'হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমা করো, তোমার এই অসম্পূর্ণ পূজার জন্যে।'

তোমরা কেবলই শুনে আসছ, হিন্দুরা পাথর পূজো করে। তাদের অন্তরের প্রকৃতি

সম্বন্ধে তোমরা কি ভাবো! এই দেখ, আমি হচ্ছি ইতিহাসে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসী যে সমুদ্র পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে এসেছে। এসে অবধি শুনছি, তোমাদের সমালোচনা, তোমাদের ঐ সব কথা। তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা কি? তারা হাসে আর বলে, 'ওরা শিশু; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওরা বড় হ'তে পারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিনিস ওরা তৈরী করতে পারে, কিন্তু ধর্মব্যাপারে ওরা একেবারে শিশু।' এই হ'ল তোমাদের সম্বন্ধে আমার দেশের লোকের ধারণা।

একটি কথা তোমাদের ব'লব, কোন নিষ্ঠুর সমালোচনা করছি না। তোমরা কতকগুলি মানুষকে শিক্ষিত কর, খেতে দাও, পরতে দাও, মাইনে দাও—কি কাজের জন্যে? তারা আমার দেশে এসে আমার পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাত করে, আমার ধর্মকে গাল দেয়, আমার দেশের সব কিছুকে মন্দ বলে। তারা মন্দিরের ধার দিয়ে যেতে যেতে বলে, 'এই পৌত্তলিকের দল, তোরা নরকে যাবি!' তারা কিন্তু মুসলমানদের একটি কথা বলতে সাহস করে না, জানে—এখনি খাপ থেকে তলোয়ার বেরিয়ে পড়বে! হিন্দু বড় নিরীহ, সে একটু হাসে, চলে যাবার সময় ব'লে যায়, 'মূর্খেরা যা বলবার বলুক।' এই হ'ল তাদের ভাব। তোমরা, যারা গালাগাল দেবার জন্যে মানুষকে শিক্ষিত করো, তারা আমার সামান্য সমালোচনায় আঁতকে উঠে চীৎকার করো, 'সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত আমাদের ছুঁয়োনা, আমরা আমেরিকান। আমরা দুনিয়া শুদ্ধ লোকের সমালোচনা ক'রব, গাল দেব, শাপ দেব, যা খুশি ব'লব, কিন্তু আমাদের ছুঁয়োনা, আমরা বড় স্পর্শকাতর—লজ্জাবতী লতা।'

তোমরা যা খুশি করতে পার; আমরাও যে ভাবে আছি, সে ভাবেই সন্তুষ্ট আছি। একটা বিষয়ে আমরা তোমাদের থেকে ভাল আছি, আমরা আমাদের ছেলেদের এই অদ্ভুত তথ্য গেলাই না যে পৃথিবীতে সব পবিত্র, শুধু মানুষই খারাপ! তোমাদের ধর্মপ্রচারকেরা যখনই আমাদের সমালোচনা করে, তারা যেন মনে রাখে—সমস্ত ভারতবাসী যদি দাঁড়িয়ে ওঠে এবং ভারত সমুদ্রের তলায় যত মাটি আছে সব যদি পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতি ছুঁড়তে থাকে, তা হলেও তোমরা আমাদের প্রতি যা করে থাকো, তার কোটি ভাগের এক ভাগও করা হবে না। কেন, কি জন্য? আমরা কি কোন দিন কোথাও ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছি—কাউকে ধর্মান্তরিত করবার জন্যে? আমরা তোমাদের বলি, 'তোমার ধর্মকে স্বাগত জানাচ্ছি, কিন্তু আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে থাকতে দাও।' তোমরা ব'লে থাকো তোমাদের ধর্ম-প্রসারশীল, তোমরা আক্রমণ-ধর্মী। কিন্তু কতজনকে নিতে পেরেছ তোমার মতে? পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ চীনা, তারা বৌদ্ধ; তার পর আছে জাপান, তিব্বত, রাশিয়া, সাইবেরিয়া, বর্মা, শ্যাম। শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু জেনে রেখো—এই যে খৃষ্টনীতি, এই ক্যাথলিক চার্চ, সবই বৌদ্ধধর্ম থেকে নেওয়া। কি ভাবে এটা হয়েছিল? এক ফোঁটা রক্তপাত না ক'রে। এত দম্ভাই তোমাদের, কিন্তু বল তো—তলোয়ার ছাড়া খৃষ্টান ধর্ম কোথায় সফল হয়েছে? সারা পৃথিবীর মধ্যে একটি জায়গা দেখাও তো! খৃষ্টধর্মের ইতিহাস মন্থন ক'রে আমাকে একটি দৃষ্টান্ত দাও, আমি দুটি চাই না। আমি জানি—তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কি ক'রে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের সম্মুখে দুটি বিকল্প ছিল, হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় মৃত্যু—এই তো! যতই গর্ব কর, মুসলমানদের থেকে তোমরা কি ভাল করতে পার? 'আমরাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ!'

কেন? 'কারণ আমরা অপরকে হত্যা করতে পারি!' আরবরা তাই বলেছিল, তারাও ঐ বড়াই করেছিল, কোথায় তারা আজ? আজও তারা বেদুইন! রোমানরাও ঐ কথা ব'লত, কোথায় তারা?

'শান্তিস্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে।' আর ঐ সব অহঙ্কারের নীতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। ওগুলি বালির ওপর নির্মিত। বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, তা আজ নয় কাল ধ্বংস হবেই। এ জিনিস মরবেই।

ভ্রাতৃবৃন্দ, যদি বাঁচতে চাও, যদি চাও তোমাদের জাতি বেঁচে থাকুক, তবে বলি শোন—খৃষ্টের কাছে ফিরে যাও। তোমরা খৃষ্টান নও; জাতি হিসাবে তোমরা খৃষ্টান নও। ফিরে চল খৃষ্টের কাছে। ফিরে চল তাঁর কাছে—যাঁর মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও ছিল না, 'পাখীদেরও বাসা আছে, পশুদেরও গর্ত আছে, কিন্তু মানব-পুত্রের (যীশুর) এমন একটি জায়গা ছিল না—যেখানে তিনি মাথা রেখে বিশ্রাম করেন।' তোমাদের ধর্ম প্রচারিত হচ্ছে বিলাসের নামে। কি দুর্দৈব! উলটে ফেলো এ নীতি, যদি বাঁচতে চাও! (ধর্ম-ব্যাপারে) এ দেশে যা কিছু শুনেছি সব কপটতা। যদি এই জাতি বাঁচতে চায়, তবে একে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ঈশ্বর এবং ধন-দেবতা (ম্যামন)-কে একই সঙ্গে সেবা করতে পারবে না। এই সব সম্পদ—সব খৃষ্ট থেকে? খৃষ্ট এ-সব অশাস্ত্রীয় কথা অস্বীকার করতেন। ধন-দৌলত থেকে যে সম্পদ-উন্নতি আসে, তা অনিত্য—ক্ষণস্থায়ী! প্রকৃত নিত্যত্ব রয়েছে ঈশ্বরে! যদি পার এই দুটি—এই সম্পদের সঙ্গে খৃষ্টের আদর্শ—মেলাতে, তবে খুবই ভাল। যদি না পার, তবে বরং সম্পদ ছেড়ে দাও, খৃষ্টের কাছেই ফিরে চল। খৃষ্টশূন্য প্রাসাদে বাস করা অপেক্ষা ছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে খৃষ্টের সঙ্গে বাস করার জন্য প্রস্তুত হও।

[১৮৯৪ খৃঃ ২১শে ফেব্রুআরি ডেট্রয়েটে প্রদত্ত 'Hindus and Christians' বক্তৃতার অনুবাদ।
দ্রষ্টব্য: C. W. VIII, Pp. 209–213]

অভিলাষ

'অনিরুদ্ধ'

অভিলাষ শুধু এক অভিলাষে জাগিয়া থাকি
সকল মর্ম একটি আশায় মুখর রাখি।
বারিধারা ছুটে মহাসাগরের লক্ষ্য পানে
অখিল কর্ম পরম-শান্তে যেন রে মানে।

জীবন-মরণ যেথায় মিলেছে স্তব্ধ পারা
সকল বিচার সহজে যেথায় বাক্যহারা—
গহন সত্যে মিটি যায় যথা প্রশ্ন সব
অভিলাষ সেথা একক বিরাজি স্বয়ংপ্রভ।

একটি পাওয়ায় অশেষ পাওয়ার সার্থকতা
একটি মিলনে বহুল সঙ্গ হউক গাঁথা।
এক ভালবাসা ছেয়ে রয় যেন সকল প্রীতি
একটি সুরেতে ধ্বনিয়া উঠুক নিখিল গীতি।

ধর্মাধর্ম স্বর্গ-নরক স্বচ্ছ কালো
যতেক দ্বন্দ্ব ঘুচাক আজিকে একটি আলো।
বহু পরিচয় বহু জানাজানি কিছুই নহে
অভিলাষ যদি আত্মসত্যে অচল রহে।

কথা প্রসঙ্গে

সন্ন্যাসের আদর্শ : পুরাতন ও নূতন

যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন, 'আমি ভাঙিতে আসি নাই, পরিপূর্ণ করিতে আসিয়াছি।' প্রত্যেক দেশে যুগপ্রবর্তকগণের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। একটি জাতির যা নিজস্ব আদর্শ, তাহাকে ভুলিয়া নয়—তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া আচরণ করার মধ্যেই সেই জাতির উন্নতি নির্ভর করে। 'ভারতের জাতীয় আদর্শ' স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'ত্যাগ ও সেবা'; ভারতবাসীকে ঐ যুগ্ম-আদর্শে উদ্বোধিত করিতে পারিলে ভারতের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী! এই ত্যাগের আদর্শ সন্ন্যাস-জীবনেই সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হইয়াছে,—তাই চরম অবনতির পূতিগন্ধ পঙ্ক হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বামীজী চাহিয়াছিলেন—এ যুগের সন্ন্যাসিসংঘে ত্যাগের আদর্শের সহিত সেবার আদর্শের সমন্বয় ঘটাইতে। এই চেষ্টা যে বহুলাংশে ফলবতী হইয়াছে, বর্তমান ভারতে ক্রমোন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

তথাপি দেখা যায়, সেবার আদর্শ না হউক, ত্যাগের আদর্শ, বিশেষত সংসার-ত্যাগের আদর্শ —বহু সাহিত্যিক, কবি, বক্তা ও প্রবন্ধ-লেখকের বিরুদ্ধ সমালোচনার বস্তু। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়—তাঁহারা হয়তো কোন সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহার অনুসৃত জীবন-নীতিকে শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, স্বকপোল-কল্পিত যুক্তি সহায়ে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার আলোচ্য মহাপুরুষের ঐ জীবননীতি ছিল না। ইহার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত : ঐ মহৎ ব্যক্তির মন মুখ এক ছিল না। 'এরূপ কপটাচার ব্যক্তিকে কেন আপনি শ্রদ্ধা করেন? কেন তাঁহার সম্বন্ধে এমন সুন্দর নিবন্ধ লিখিতে বসিলেন?'—শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নই করিতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের 'শতবার্ষিকী' আসিতেছে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু আলোচনা বক্তৃতা অবশ্যই হইবে, প্রবন্ধ লেখা এখন হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছে। স্বামীজীর সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু বলিবেন বা লিখিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য, তাঁহারা যেন প্রধানত স্বামীজীর লেখা ও বক্তৃতাবলী হইতেই স্বামীজীকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করেন। 'শালগ্রাম লইয়া ফুটবল খেলিলেই তোমরা স্বর্গে যাইবে'—স্বামীজীর মুখে তাঁহারা যেন এরূপ কথা না বসাইয়া দেন। 'স্বামীজী গৈরিক বস্ত্র পরিতেন, কিন্তু সন্ন্যাসব্রতে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না'—এই জাতীয় অজ্ঞতার পরিচায়ক বাক্য যেন তাঁহারা না লিখিয়া বসেন। ঐ বাক্য বিশ্লেষণ করিলে এই অর্থই পাওয়া যায় যে, লেখক স্বামীজীকে ভালবাসেন, কিন্তু সন্ন্যাস (সংসারত্যাগ) তাঁহার পছন্দ নয়। অতএব তাঁহার প্রবন্ধে স্বামীজীকে গৈরিক ধারণ করিয়াও সন্ন্যাসে অবিশ্বাসী হইতে হইবে, অর্থাৎ লেখকের খাতিরে তাঁহাকে 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতে হইবে।

যাক প্রকৃত কথা এই যে বহু লেখক ও বক্তা আজকাল পড়িবার বা চিন্তা করিবার সময় পান না; কিন্তু সভায় তাঁহাদের কিছু বলিতেই হইবে, পত্রিকাতেও কিছু লিখিতে হইবে। স্বামীজীর গ্রন্থরাজি মন্থন করিয়া আমরা কিন্তু দেখি, যুগযুগব্যাপী সন্ন্যাস-সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক চেতনা যথেষ্ট ছিল, ধর্মের নূতন পুরাতন ও চিরন্তন রূপ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁহার অতি স্পষ্ট। নিজেকে তিনি একজন সন্ন্যাসীই মনে করিতেন।

এটুকু বলিয়া রাখা ভাল যে, এ সংসারে সন্ন্যাসীরা চিরদিনই সংখ্যাল্প, রাজনীতির ভাষায় 'সংখ্যালঘু'! যে কোন কারণেই হউক, তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। অধিকাংশ মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারে আছে, তাঁহাদের জীবনে মাঝে মাঝে রোগ শোক দুঃখ বিফলতা আসে বটে, কিন্তু সুখে দুঃখেই তাঁহাদের দিন কাটিয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা এই মিশ্রিত ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি লাভের আশায় সংসার-চক্র হইতে বাহিরে চলিয়া যান, তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে সংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান ব্যক্তিদের ঈর্ষার পাত্র, তাই বোধ হয় তাঁহারা বলিয়া থাকেন, 'ওরা ভীরু, পলাতক, কাপুরুষ।' ব্যাপারটা যে ঠিক তাহার বিপরীত, এ কথা বলিলেই বা বুঝিবে কে?

সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা আজ নূতন নয়। ইসলাম বলিয়াছেন, 'ইহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত', প্রটেস্টাণ্টরা বলেন, 'সন্ন্যাসীদের জীবন অসম্পূর্ণ', তাঁহাদের প্রতিধ্বনি করিয়া আমাদের দেশের ইংরেজী-শিক্ষিত সংস্কারকগণ অনুরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন ও বলিতেছেন। কবি ও সাহিত্যিকেরা বলেন, 'সন্ন্যাস আত্মপ্রবঞ্চনা,' মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'সন্ন্যাস পলায়নী মনোবৃত্তি', ক্ষীণদৃষ্টি রাজনীতিকরা বলেন, 'সাধুরা অলস ভবঘুরে', সমাজবিজ্ঞানীরা বলিবেন, 'প্যারাসাইট'।

সব শুনিয়া বা না শুনিয়া যথার্থ সন্ন্যাসী উদাসীনভাবেই থাকেন, এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া তিনি নিজ ব্রতে অচল অটল থাকিয়া শান্তভাবে জ্ঞানের সাধনায় জীবন যাপন করিয়া যান। রোগ-শোকে কাতর মানুষের মনে যথাসাধ্য শান্তির বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে সাধনার পথ ধরাইয়া দেন, যাহাতে তাহারা দেহ-কেন্দ্রিক জীবন হইতে ধীরে ধীরে উর্ধ্বস্তরে অভিযান শুরু করিতে পারে।

এ জীবনে যদি কোন চরম অনিবার্য সত্য থাকে তো তাহা মৃত্যু! এক হিসাবে বলা যায়, জীবনের সকল সাধনা সেই মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুতি! মৃত্যুকে ভয় করিয়া নয়, ভালবাসিয়া তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। বৈদিক যুগে আর্যদের জীবন-পরিকল্পনায় চতুর্থ আশ্রম ছিল এই 'সন্ন্যাস'! কেন? মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার জন্য। মৃত্যু আসিবেই, অনিচ্ছুকভাবে তাহার অনুগমন করিব—না, শান্ত ভাবে যথাসময়ে তাহাকে গ্রহণ করিব? ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—পূর্বেরটি পরেরটির প্রস্তুতি! চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস সজ্ঞানে সপ্রেমে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা! দেহভাবশূন্য হইয়া 'আমি অমর আত্মা, আমি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম,' এই ভাবনায় বিভোর হইয়া দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি।

প্রাগ্‌বুদ্ধ যুগে গৃহস্থ ও সন্ন্যাস—উভয়বিধ জীবন-ধারাই ছিল আদর্শ; পরে হয়তো কালক্রমে উপনিষদের জ্ঞানের সাধনায় ভাঁটা পড়ে, এবং যাগযজ্ঞাদির প্রাবল্য দেখা দেয়। তখন কঠোর সাধনার জীবনাদর্শ সহায়ে বুদ্ধ যে বাণী প্রচার করিলেন, তাহাতে বৈদিক জীবন-ধারার অভ্যুদয়ের (ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির) শাখাটি মজিয়া গেল, নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ বা মুক্তি)-আদর্শের উপর এত জোর পড়িল যে সকলের ধারণা হইল—সন্ন্যাসী না হইলে জীবন বৃথা! বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতে ইহুদীধর্ম হইতে যে খৃষ্টধর্ম উদ্ভূত হইল, সেখানেও দেখা যায় সন্ন্যাস-ভাবের উপর অত্যধিক ঝোঁক! কিন্তু ইওরোপে গ্রীকো-রোমান ধাতে এত ত্যাগ-তপস্যা সহ্য হইল না! শুরু হইল প্রতিক্রিয়া।

মোটের উপর দেখা যায়, সকল ধর্মই ঈশ্বরার্থে সংসারত্যাগে বিশ্বাসী, সকল ধর্মেই ত্যাগী সাধক আছে, ইসলামেও আছে। সন্ন্যাসী-শূন্য ধর্ম সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত, সন্ন্যাস উদার জ্ঞানের সাধনা, সর্বদা ঈশ্বর-সান্নিধ্য অনুভব করাই ত্যাগী সাধকের একমাত্র কাম্য। ধর্ম তাহার নিকট কথার কথা নয়—তিথি-নক্ষত্রের ব্যাপার নয়।

যুগে যুগে, দেশে দেশে, যখন যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সেখানে একজন শক্তিশালী সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়া দেশের ইতিহাস পরিবর্তিত করিয়া গিয়াছেন! এক কথায় বলা যায়—উচ্চতম কৃষ্টির ইতিহাস বুদ্ধ খৃষ্ট শঙ্কর চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকজন ত্যাগী সন্ন্যাসীরই জীবনকাহিনী! সন্ন্যাসীরাই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সামান্য অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে ভারত চীন জাপান মালয় ব্রহ্ম সিংহলে উচ্চতর জীবন-নীতি প্রচার করিয়াছেন; এই সন্ন্যাসীরাই ইওরোপের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বন্য বর্বর যুদ্ধ-বিলাসী হিংস্র জাতিগুলিকে মনুষ্যপদবাচ্য করিয়াছেন, বাইবেল পড়াইবার জন্য প্রাণপণে তাহাদের অক্ষর পরিচয় করাইয়াছেন।

সন্ন্যাসের পুরাতন আদর্শ একমুখী উর্ধ্বমুখী—নির্বাণমুখী সমাধিমুখী ভগবন্মুখী ছিল, নিশ্চয়ই উহা ভাল ছিল, কিন্তু একদিক দিয়া উহাতে সংসারের ক্ষতিও হইয়াছে।

বৈদিক যুগের জীবনাদর্শে সংসারের সহিত সন্ন্যাসের যে সামঞ্জস্য ছিল, বৌদ্ধ ও খৃষ্ট যুগে তাহা ছিল না। বৈদিক বা বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সংসারকে ঘৃণা করেন না; তিনি জানেন, প্রত্যেকটির আপেক্ষিক মূল্য আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে সন্ন্যাস শেষ আশ্রম এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রম। সন্ন্যাসের উপর অত্যধিক জোর দিয়া কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য একদিন ঐহিক উন্নতিকে অবহেলা করিয়াছে, আজ তাহারই প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছে, ঐহিক উন্নতির জন্য আজ আধ্যাত্মিক জীবনই অস্বীকৃত। প্রকৃত উন্নতি কিন্তু উভয়ের সামাঞ্জস্য-বিধানে।

তাই তো দেখা যায় বর্তমান যুগে নবতম সন্ন্যাসের উদ্বোধক স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বব্যাপী মানুষের নবজাগরণের জন্য তাঁহার প্রবর্তিত সন্ন্যাসি-সংঘের সম্মুখে যুগ্ম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন: 'আত্মনো মোক্ষার্থং, জগদ্ধিতায় চ'। বলিয়াছেন, 'শুধু নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করা, সেও স্বার্থপরতা'; সকল মানুষের যথার্থ হিতসাধন সম্ভব একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা। অজ্ঞতার জন্যই মানুষ দুঃখ ভোগ করে। জ্ঞানই মানুষকে সর্ববিধ অজ্ঞতার বন্ধন হইতে, ভোগবাসনার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত করে। জ্ঞানের অভাবেই মানুষ তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পশুবৎ জীবন যাপন করে। বর্তমান যুগে তাই স্বামীজীর নির্দেশ: সন্ন্যাসীকে 'আত্মনো মোক্ষার্থং' সত্ত্বগুণের সাধনায় শুধু ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিলে চলিবে না, 'জগদ্ধিতায়' তাহাকে রজোগুণের মধ্যেও আসিতে হইবে। তবেই সম্ভব বিশ্বব্যাপী মানুষের মহাজাগরণ! শুধু মায়িক সংসার ত্যাগ করিলেই চলিবে না, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নির্জন-বাসের সুখ-শান্তিও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

সংক্ষেপে ত্যাগের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন, 'ত্যাগ মৃত্যুকে ভালবাসা।' 'সাংসারিক ব্যক্তিগণ বাঁচিতে ভালবাসে। সন্ন্যাসীকে মৃত্যু ভালবাসিতে হইবে।' তবে কি আত্মহত্যা করিতে হইবে? —না। মৃত্যুকে ভালবাসার প্রকৃত অর্থ তিনি বলিয়াছেন, পরার্থে আত্মনিয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে মরিতে হইবে।

নবযুগের সন্ন্যাসের আদর্শ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিয়াছেন:

'আমাদের দেশের প্রাচীন ভাব ছিল কোন গুহায় বসিয়া ধ্যান করিতে করিতে মরিয়া যাওয়া। কিন্তু এখন এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে আমি অমুকের চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ করিব—এ ভাবটিও ভুল। তোমাদের জীবনে যাহাতে প্রবল ভাব-পরায়ণতার সহিত প্রবল কার্যকরিতা সংযুক্ত থাকে তাহাই করিতে হইবে।'

প্রকৃত সন্ন্যাসীর কোন শত্রু নাই, বন্ধুও নাই; তাঁহার দেশ নাই, জাতি নাই; সন্ন্যাসী সত্যই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন মানব। সন্ন্যাসীর কাহারও প্রতি তাঁহার রাগ (অনুরাগ) নাই, কাহারও প্রতি দ্বেষ (বিরাগ) নাই; তাঁহার নিজস্ব কোন বাসনা কামনা নাই, ভেদদৃষ্টি নাই। তাঁহার কোন কর্তব্য নাই, তথাপি তিনি অনলসভাবে কাজ করিয়া যান, ঈশ্বরে সমর্পিত কর্ম তাঁহার নূতন বন্ধনের কারণ হয় না, কারণ তাঁহার কর্তৃত্ববুদ্ধি নাই, মমত্ববুদ্ধি নাই; তিনি ঈশ্বরের দাস, সমাজের সেবক।

ঈশ্বরের আকর্ষণে সাধক একদিন সংসার ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছিল, অনন্ত অসীম সত্তার অনুভবে পূর্ণ হইয়া সাধক আবার সমাজের বুকে ফিরিয়া আসে নূতন ভাবে, নূতন রূপে। এ যেন সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র হইতে জলবিন্দুর অদৃশ্য বাষ্পাকারে উত্থান, পরে অসীম আকাশে বায়ু-সঞ্চালিত সঞ্চরণের পর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন! সেই বৃষ্টিধারা দাবদগ্ধ পৃথিবীকে শীতল করে, শান্ত করে, উর্বর করে। সমাজের দিক দিয়া ইহাই সন্ন্যাস-জীবনের সার্থকতা।

অন্তর্নিহিত রহস্য না বুঝিয়া বৃথা সমালোচনা নিরর্থক। সংসার-চক্রের প্রকৃত তথ্য জানিলে তবেই সন্ন্যাস-জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে। উভয় দিক লইয়া বৃত্তটি সম্পূর্ণ; সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ—উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধাই সমাজের উন্নতির উপাদান, অগ্রগতির উপায়। অশ্রদ্ধা আত্মবিধ্বংসী।

সকলকেই যে সন্ন্যাসী হইতে হইবে, হিন্দু জীবন-বিজ্ঞান একথা বলে না। সন্ন্যাস মানব-মনের ক্রমবিকাশের চরম পরিণতি। সন্ন্যাসী ব্যক্ত যোগী, গৃহস্থকে গুপ্ত যোগী হইতে হইবে। প্রথমটি কঠিন, দ্বিতীয়টি কঠিনতর।

যথার্থ সন্ন্যাসীর মতো অনাসক্ত গৃহস্থও সংসারের ও সমাজের উন্নতির জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাস শ্রবণ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা চালিত হইয়া শক্তি সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে মানুষ জীবনের পথ বাছিয়া লইবে। নির্বাচিত পথে—এই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে যে যথাসময়ে নিশ্চয় আমি লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইব।

ভগবান যীশু

শ্রীঅমলকুমার দত্ত

প্রেম-করুণার দীপ জেলে নিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
তুমি এসেছিলে কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্টের অবতারে।
চরণে তোমার পাপী পায় স্থান,
তুমি করুণার সিন্ধু মহান্!
সবার হৃদয় জিনিয়া তুমি যে জগৎ করিলে জয়,
তুমি জীবনের শাশ্বত জ্যোতি, তুমি চিরপ্রেমময়।

চলার পথে

'যাত্রী'

স্পন্দন বা গতিময়তাই জীবন। কথাটার একটা ব্যাবহারিক সত্তা আছে ঠিকই। কিন্তু এই গতি যেমন আমাদের জীবনকে প্রাণশক্তি দিয়ে জাগিয়ে রেখেছে—তেমনি তাকে যথার্থ জ্ঞানশক্তি থেকে করেছে বঞ্চিত। কথাটা আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—এক তরুণ তার পূর্ণ উদ্যম নিয়ে ভূমির ওপরে উঁচুদিকে লাফালো। সে ঐ জন্য যতখানি শক্তি প্রয়োগ ক'রল, তাতে তার বহু দূরে উঠে যাবার কথা। কিন্তু পারল না। বড় জোর সাত ফুট উঠেই পড়ে গেল। কেন? আর একটা বিরুদ্ধ শক্তি বাধা দিল, তরুণকে পৃথিবী ত্যাগ করতে দিল না। আমরা দেখলাম, সে সাত ফুট উঁচুতে উঠেছিল মাত্র; কিন্তু তার শক্তি প্রয়োগের যে পূর্ণ ফল, তা হয়েছে ব্যাহত। সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হয়েছে সঙ্কুচিত।

আবার কেহ হয়তো, সকালের আকাশে নবারুণকে হাসতে হাসতে উঠতে দেখে, কাছের ছোট ছেলেটিকে আদর ক'রে তা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ দেখ সূর্য উঠছে।' ছেলেটিও তাই দেখে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। 'সূর্য উঠছে' বলাটা কি ঠিক হ'ল? তা তো নয়। বরং পৃথিবী তার নিজের গতির রথে আমাদের সকলকে চড়িয়ে, সূর্যকে একটা বিপরীত আপেক্ষিক গতি দিয়ে, ঐ সূর্য-ওঠা-রূপ ভুল অনুভূতি আমাদের করিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর তুলনায় সূর্য স্থির আছে, আর পৃথিবী লাটিমের মতো তার নিজের চারিদিকে ঘুরছে। আমরা সেই গতিশীল পৃথিবীতে চড়ে, পৃথিবীর গতির কথা ভুলে, সূর্য ওঠার মতো ভুল অনুভূতি নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। এই ভাবের সব ভুল খবর দেওয়াই তো 'মায়া'র খেলা। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে তাই বিশ্বপ্রকৃতিকেই 'মায়া' বলেছে।

আর একটি উদাহরণ দিই—আপনি হয় তো 'সিনেমা' দেখতে গেছেন। ছবিতে প্রাণীকে সব সময়েই চলমান বা গতিময় ব'লে মনে করছেন। আসলে কিন্তু 'ফিল্ম'-এর ছবিগুলি স্থির। আর ঐ স্থির ছবিগুলিকে আপনার চোখের সুমুখ দিয়ে একটা গতিতে চালিয়ে আপনার চোখে ঐ গতির ধাঁধাঁ লাগানো হচ্ছে মাত্র। শুধু তাই নয়, সিনেমার সাদা পর্দায় এতক্ষণ ধরে যে প্রাণের খেলা, হাসি-কান্নার লীলা দেখলেন, সেও তো এক প্রতীয়মান সত্য আলোছায়ার চঞ্চল লীলা সাদা পর্দায় ফেলে ঐ রকম দেখানো হ'ল। ওধারে কিন্তু সাদা পর্দা সাদাই আছে। এই রকমের উদাহরণ আর বেশী টেনে লাভ নেই। তবে গতির মধ্যে থাকার দরুন যে আমাদের ভুল জ্ঞান হয়, তার নমুনা আমরা এই দুটিতেই পেলাম।

এই ভাবে বুঝতে গিয়ে দেখব যে এই গতিময় বা স্পন্দিত জগতের সব কিছুর মধ্যে স্থির বস্তুকে—তথা ধ্রুবকে আমরা ধরতে পারছি না। আর এই যে পারছি না, তার কারণই হ'ল—চারিদিকের অবিচ্ছিন্ন গতিময়তা! এই সর্বব্যাপী প্রতীয়মান গতিকেই বেদান্তে 'মায়া' বলেছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লণ্ডনে প্রদত্ত 'মায়া' বক্তৃতায় বলেছেন: 'বেদান্তের মায়া আদর্শবাদ বা বাস্তববাদ নয়, এটা একটা তথ্যও নয়, এ কেবল ঘটনার যথাযথ বিবৃতি—' যে চিরন্তন ঘটনার মধ্যে আমরা ও আমাদের দৃষ্ট এবং অনুভূত সকল বস্তু ধৃত হ'য়ে রয়েছে।

এইবার এই জাগতিক ব্যাপারকে একটু অন্যভাবে বিচার করা যাক্। আমরা জানি, আমাদের হৃদয় স্পন্দিত হয়, আমাদের দেহ নড়ে, সেই সঙ্গে আমাদের দেহের কোটি কোটি কোষ, আমাদের চিরচঞ্চল মনও গতিময়তায় অস্থির হ'য়ে থাকে। এই অস্থির মন ও চিন্তার গতিময়তার মধ্যে আমরা স্থির বস্তুকে আর কি ক'রে যথার্থরূপে দেখতে পাব? পাব না। আর পাব না বলেই তো আমাদের জগৎ সম্বন্ধে সর্বদা ভুল ধারণা হচ্ছে। রেলগাড়ী চড়ে যাবার সময় মনে হয়—ঐ স্থির বাড়ী-ঘর, গাছপালা যেন ছুটে চলেছে; তেমনি আমাদের প্রাণের, আমাদের মনের গতি আরোপিত হয়েই তো এই জগৎকে প্রাণবন্ত ও স্পন্দনশীল ক'রে তুলেছে। যদি কোন এক সময় আমাদের ভেতরে সকল চিত্তবৃত্তির স্পন্দন থেমে যায়, অথচ আমাদের অনুভবের শক্তি থাকে, তখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে আমাদের-দেওয়া গতি বা স্পন্দনও থেমে যাবে। তখন দেখব জগৎ ব'লে কিছুই নেই—আমাদের মনের স্পন্দনে, আমাদের চিত্তের আলোড়নে, এক কথায় আমাদের কল্পনায় —জগৎটা ঐ রকম একটা প্রাণবন্ত রূপ নিয়ে ছায়া বা ভোজবাজির মতো, আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র। আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হ'লে বলতে হয়—আমার চিত্তবৃত্তি স্থির হ'লে আমার সুমুখের এই মায়ার লীলাতরঙ্গও যাবে থেমে। আর তখনই আমি বিশ্বের যথার্থ রূপ (অরূপ ?) দেখতে পাব। এই অরূপকে দেখবার জন্যই সাধক তাঁর অন্তরের গতিকে থামিয়ে ফেলতে চান; বাইরের ভ্রমময় দৃশ্য থেকে নিজেকে 'আবৃতচক্ষু' ক'রে নিজের ভেতরকার গতি থামিয়ে যথার্থ জ্ঞানের সন্ধানে ছোটেন। এই সন্ধানের প্রচেষ্টাই তো সাধনা।

তাই বলি, চল পথিক, তোমার চিত্তবৃত্তিকে নিস্পন্দিত করার তপস্যায় ডুবে যাবে চল। চল তোমার যথার্থ জ্ঞানান্বেষণের সাধনায়। যে সাধনার সিদ্ধিতে তুমিও ঋগ্বেদের (৫।৬২।১) ঋষির মতো বলতে পারবে—'দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষমপশ্যাম্ (দেবতাদের সকল বপুর শ্রেষ্ঠ বপু দেখলাম আমি)।' চল, চল সেই শ্রেষ্ঠ বপুর দর্শনের পথে—যেখানে তোমার জীবনের স্পন্দিত তালকে নিজেরই লয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে সাধতে পারবে অপূর্ব এক সঙ্গীত-মূর্ছনা। চল, চল আর দেরী নয়। **শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।**

'মা আমায় ঘুরাবি কত?'*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

'মা আমায় ঘুরাবি কত?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত—
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা
পাক দিতেছ অবিরত।'

ভক্ত রামপ্রসাদ প্রাণের বেদনা সকরুণভাবে মাকে জানাচ্ছেন। এর মূলে রয়েছে বিষাদ। ভোগবাসনা না গেলে এরূপ ব্যাকুলতা আসে না। এই গানের ভেতর দিয়েই সব পাই। শাস্ত্রপাঠের আর দরকার হয় না। সংসার ঘানি, মায়া ঠুলি, মন-রূপ বলদকে মা বেঁধে রেখেছেন, আর ঘোরাচ্ছেন। বলদটার দিকে তাকিয়ে দেখ—কেবলই ঘুরে চলেছে। গীতায়ও ভগবান বলেছেন:

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮।৬১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রে একটি প্রাণের কথা শোনাচ্ছেন। ভগবান অযাচিতভাবে বলছেন: উপদেশ তোমায় যা দেবার দিয়েছি, এখন তোমায় একটি গুহ্যতম কথা বলছি, কারণ তোমায় বড় ভালবাসি। জিজ্ঞাসা করোনি, তবু তোমায় বলছি—তোমার হিতের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে এসেছিলেন প্রথমে সারথিরূপে, তারপর হলেন গুরু। অর্জুনের মনের অবস্থা চিন্তা করো; শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'এই দুই দলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন করো। যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছেন দেখব।' তখন অর্জুনের মনের অবস্থা কি! অর্জুন বললেন, 'এ কি দেখছি! সব আত্মীয় স্বজন। এদেরই রক্তমাখানো যে বিষয়—সেই বিষয় ভোগ ক'রব?' শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'এ মোহ কোথা থেকে এল? দাঁড়াও, নিজেকে সামলাও।' অর্জুন বললেন, 'এদের বধ ক'রে রাজ্য চাই না। আমায় ক্ষমা করো।' তখন কোথায় তাঁর সে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য, বীর্য! মনের এ একটা অবস্থা হয়। সকলেরই হয়। এ অবস্থায় অর্জুন বলছেন, 'কার্পণ্যদোষে আমার ক্ষত্রিয়-ভাবটি নষ্ট হয়েছে।' কার্পণ্যদোষ কেন বলছেন? কৃপণের সব আছে, অথচ কিছুই ভোগে আসে না। ছেঁড়া কাপড় পরছে। অর্জুনের ঠিক তাই হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'তুমি ঠিক ক'রে ব'লে দাও, কিসে আমার মঙ্গল হবে।' এ থেকে একটা বড় জিনিস শিক্ষা করি। আমরা কেবল বই পড়ে রেখেছি। এই অবস্থা হ'লে সকলেই একজনকে খোঁজে, যে ব'লে দেবে কিসে তার ভাল হবে। সেই গুরু। অর্জুন ভগবানকেই গুরুরূপে বরণ করলেন, তাঁর হলেন শিষ্য। পূর্বের সম্বন্ধ ভুলে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ আগে ছিলেন সারথি। যখন গুরু হলেন তখন অর্জুনের মনের রাশ ধরলেন। দু হাতই বাঁধা পড়ল—এক হাতে মনের রাশ আর এক হাতে ঘোড়ার রাশ। বিষাদই হ'ল আসল জিনিস—সত্যবস্তুকে লাভ করার, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবার।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, 'তোমায় কত কথা বলেছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয়নি। এখন তোমায় যা ব'লব, তা অতি গুহ্যতম। গুহ্য, গুহ্যতর আবার গুহ্যতম আছে। কর্মের বিষয়, জ্ঞানের বিষয়, যোগের বিষয় শিক্ষা দিয়েছি।'

* লখনৌ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজের ২০.৯.৫৬ তারিখে প্রদত্ত একটি ধর্মপ্রসঙ্গ। জনৈক ভক্ত কর্তৃক শ্রুত-লিখিত।

ভগবান অহেতুক কৃপাসিন্ধু। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দিলেন, তারপর বিশ্বরূপ ধরে বললেন, দেখ ভবিষ্যতে কি হবে। আমরা জানি না, এক সেকেণ্ড পরে কি হবে। ভগবানের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সব জানা। বললেন, দেখ কত বৎসরের সাধন, কত জন্মের সংস্কার নিয়ে এসেছ এদের বধ করবার জন্য। তারপর বলছেন, 'নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্' নিজের পুরুষকারের ওপর নির্ভর করতে হবে। তার পর চাই কৃপা। এই দুটি এক সঙ্গে মিলিত হলেই সব হ'ল। অর্জুনের অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। ভগবান বললেন, 'তুমি বধ করবে? দেখ, আমি সব বধ ক'রে রেখেছি। তুমি আমার যন্ত্র হ'য়ে কাজ করো।'

ঠাকুরের মুখে এ বিষয়ে কত কথাই না বেরিয়েছে। মাকে বলছেন, 'মা, আমি রথ, তুমি রথী; আমি ঘর, তুমি ঘরনী; আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী।' ঠাকুর যন্ত্র হ'য়ে মায়ের কাজ করেছেন। এই যন্ত্র হওয়াই আসল কথা।

ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে গেছেন। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত এসেছেন। ঠাকুর যেখানে যা বলতেন, তা কি আগে থেকে মাথায় পুঁজি ক'রে নিয়ে যেতেন! তিনি তো কিছু পড়েননি। তাঁর ছিল মায়ের জ্ঞানেই অফুরন্ত ভাণ্ডার। অর্থাৎ মা-ই তাঁর ভেতর দিয়ে বলতেন। কত বড় বড় পণ্ডিত দেখেছি, বসে ধর্মপ্রসঙ্গ শুনছেন, কথামৃতের দু-একটি কথা শুনে—যাবার সময় বলছেন, মহারাজ আর উঠতে ইচ্ছা করছে না। ঠাকুরের বাণীর এমনি শক্তি!

বেণীপালের বাগানে ঠাকুর বেড়াতে গেছেন। বেণীপাল ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলছেন, আজ আমাদের কত আনন্দ দিলেন! ঠাকুর বললেন, 'ওগো, ও কি বলছো, আমি কি জানি! মা-ই সব বলেছেন।' স্বামী বিবেকানন্দের কত বড় মস্তিষ্ক ছিল, তিনি তো ঠাকুরের যন্ত্রস্বরূপ হয়েই কাজ করলেন। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, 'অর্জুন আমি সব মেরে রেখেছি।'

গুরু কে? স্বয়ং ভগবান। আমার আমিত্বের কোন মূল্য নেই। তাঁকে নিয়েই সব কাজ করতে হবে। ভগবান বলছেন, আমাকে আশ্রয় ক'রে সব করো। তাঁকে ছেড়ে কিছু নয়। ঠাকুর আর এক ভাবে বলেন, খোঁটা ধরে ঘুরতে হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য ক'রে সমস্ত জগৎকে বলছেন, যন্ত্রারূঢ় ক'রে সকলকে ঘোরাচ্ছি। রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। ঈশ্বর সকলকে ধরে আছেন, ভবের গাছে বেঁধে পাক দিয়ে ঘোরাচ্ছেন। সকলের পিছনে তিনি রয়েছেন। আমরা অজ্ঞান, আমাদের অহঙ্কারের মূল্য কি? আসল জিনিস—ভগবানের কাছে মাথা নোয়ানো। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে 'বড় হবি তো ছোট হ'। তিনি যাকে বড় করেন, সেই বড় হয়।

এখন কি ক'রে ঘানি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? 'খুলে দে মা চোখের ঠুলি'—রামপ্রসাদ মাকে কি ভাবে বলছেন দেখ, জোর করছেন; বলছেন, 'তুই যে আপন মা। তুই তো পর নয়। কত লোক দুর্গা দুর্গা ব'লে তরে গেল, আর আমি পড়ে থাকবো?'—

আর কারে ডাকিব শ্যামা?
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে।
মারিলে ছাওয়ালে ডাকে মা মা ব'লে,
আর কারে ডাকিব শ্যামা?
মা যদি সন্তানে মারে তবুও সে মা মা করে।
আর কারে ডাকিব শ্যামা?

মা ছেলেকে ফেলে দিচ্ছেন, মারছেন, তবুও সে মাকে ছাড়ছে না। আমরা যেই দুঃখ পেলাম, অমনি ভগবানকে ভুলে গেলাম। ওই একটা গান চিন্তা করলেই কত কথা মনে আসে। গীতায় ভগবান ঠিক তাই বলেছেন, 'ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া'। তিনি যদি সংসারে রেখে ঘোরাচ্ছেন, তা আমরা ক'রব কি? আমরা অসহায়, আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? গীতাতেই ভগবান উপায় বলেছেন ঃ

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাংশান্তিং স্থানংপ্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

তাঁর পায়ে একেবারে জড়িয়ে পড়—কায়-মনোবাক্যে, ভাবের ঘরে চুরি না ক'রে। তোমার দিক দিয়ে চাই পুরুষকার। আর তিনি কি করবেন? তিনি পরা শান্তি দেবেন। তুমি তো চারিদিকে ছড়িয়ে আছ। ছটা রিপু টেনে রেখেছে, যেতেই দেবে না। ভেতরে যেতে হবে। বিষয়গুলো যেতে দেয় না। দেখ না—মন কেমন তেজী ঘোড়ার (ইন্দ্রিয়ের) পেছনে ছুটছে। সেই জন্য অর্জুনকে বলছেন, 'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।' (গীতা ২।৬১) ঘোড়াগুলোকে সংযত করো, ঘোড়াগুলোর বশীভূত হ'য়ো না। ইন্দ্রিয়ের দাস হ'য়ো না। ঠাকুরও দেখ মনকে কেমন গড়ছেন, ভাঙছেন। স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি করালেন।

ভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' তুমি আর এই সব ক্রিয়াকলাপের ভেতর থেকো না; ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য—এ সবেরও পারে যাও। আমার শরণাগত হও। আর ভগবান কি করবেন? 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' সকল ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্য রূপ বন্ধন হ'তে আমি তোমায় মুক্ত ক'রব। ধর্মাধর্মের পারে গেলে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থা হয়। একদিন ঠাকুর মাকে বলছেন, 'এই নে মা তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম। এই নে মা তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য। এই নে মা তোর শুচি, এই নে তোর অশুচি।' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কাছে বসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, কি রইল তাহলে?' ঠাকুর বললেন, 'কেন—শুদ্ধা ভক্তি'। এই ভক্তি লাভ হ'লে রাস্তা সোজা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কেমন বোঝাতেন—জলের আর স্থলের। বন্যা হ'লে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল, তখন আর নদীতে এঁকে বেঁকে যেতে হবে না। ধান কাটা হ'য়ে গেলে সোজা চলে যাও, আর আল দিয়ে যেতে হবে না। ভগবানের প্রতি অনুরাগ হ'লে একেবারে সোজা চলে যাবে।

কৃপা লাভ করতে গেলেও আগে পুরুষকার চাই। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।' ভগবান বলছেন, এই চারটি গুহ্যতম কথা। এখানে উপবাস নেই, নাক-টেপা নেই। সরল চারটি কথা। তারপর প্রতিজ্ঞা করছেন, 'মামে-বৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।' —তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি আমাকে এইরূপে পাবে। অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে জগদ্বাসীকে তিনি বলছেন, 'আমার ভক্ত হও, আমাতে মন দাও, আমার ভজন কর, আমায় নমস্কার করো।' এই চারটি করা চাই-ই।

উপায় তো জেনে নিলে, এখন সাধন কর। এ তাঁর বাণী; কিন্তু বিশ্বাস কোথায়! বিশ্বাসই দুর্লভ জিনিস।

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের স্মৃতি

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় •

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য কথা মনে হ'লে আনন্দে প্রাণ ভরে যায়। বস্তুতঃ সেই সব পুণ্য দিনের কথা মনে হ'লে মন যেন একটা স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হ'য়ে যায়। সেই অপার করুণার মূর্ত প্রতীক মহাপুরুষকে দর্শন করবার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে, তিনিই ধন্য। ১৯২৮ খৃঃ আমি প্রথম মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন লাভ করি, তখন আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর মাত্র।

মহাপুরুষ মহারাজের সান্নিধ্যে আসবার পূর্বে--আমার বাল্যের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩।৪ বৎসর বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই অবধি কি অসহায় অবস্থায় যে আমাদের দিনগুলি কাটিত, তা স্মরণ করলে এখনও ভয়ে শিউরে উঠি। অনাহারে, অর্ধাহারে, মাথায় তেল নেই, পায়ে জুতা নেই, পরনে কাপড় নেই, এই ভাবে শৈশবকাল অতিবাহিত হ'তে লাগল। ভাবতাম এমন কি কেউ নেই, যিনি আমাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। শুনেছিলাম, উপেন মুখোপাধ্যায় নিদারুণ দুঃখকষ্টে এই রকম অসহায় অবস্থায় ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর অপার করুণার ফলে পরবর্তী কালে তাঁর আর কোন অভাব ছিল না। এই ঘটনাটি শিশুকালে আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল যে অনেক সময় ভাবতাম, আমিও যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমার দুঃখ-কষ্টের কথা জানাতে পারি, তাহলে তিনি আমারও একটা সুরাহা ক'রে দেবেন। এক দিন না খেয়ে স্কুলে যাচ্ছি—রাস্তায় ক্ষুধার জ্বালায় ও দুঃখে কান্না এসে গেল। নিজেকে যেন আর সামলাতে পারি না। রাস্তার ধারে মাঠের ভেতরে চলে গেলাম এবং ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলাম, 'হে ঠাকুর, তুমি কত দুঃখী দরিদ্র অনাথ অসহায়ের জন্য কত কি কর, আমার এই দুঃখের কি কিছু লাঘব তুমি করতে পারো না?'

আমার এখন মনে হয়—শ্রীশ্রীঠাকুর আমার সেই আবেদন শুনেছিলেন, এবং সেই কারণেই অভাবনীয় ভাবে আমার তাঁর শ্রীশ্রীপাদপদ্মে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য হয়। এত শৈশবে পিতৃহীন হয়েছিলাম যে আমার পিতার কথা কিংবা তাঁর চেহারার কথা কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু অপার করুণায় শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে এমন পিতার কাছে এনে দিলেন, যাঁকে পেয়ে আমার ইহকাল পরকাল চিরকালের পিতা লাভ হ'ল।

বেলুড় মঠে মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য সান্নিধ্যে আসা আমার জীবনে একটা অভাবনীয় ঘটনা। তখন আমি বেলগেছিয়া পশুচিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ রায় সাহেব দিবাকর দে মহাশয় মঠের একনিষ্ঠ ভক্ত, মঠের গোশালার গরু-বাছুরের চিকিৎসা করতেন। একবার অসুস্থ থাকায় প্রয়োজনমত তিনি মঠে যেতে পারলেন না, আমাকে পাঠালেন। আমি দেখে এসে সব কথা বললে তিনি সেই মত ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা করলেন। এইরূপ চলতে লাগল। যখনই মঠে যেতাম, তখনই পূজনীয় 'প্রিয়' মহারাজ আমাকে আসা-যাওয়ার পাথেয় দিতেন। আমি লজ্জা পেতাম। বলতাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজের জন্য পয়সা দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। প্রিয় মহারাজ

আমার অবস্থা বুঝতেন, বলতেন, 'এখন তোমার এই অবস্থা, তাই তোমাকে দিচ্ছি; শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তোমাকে দেবেন, তখন আবার তুমি ঠাকুরকে দিও।'

এই ভাবে মঠে প্রায়ই যাতায়াতের ফলে সাধুদের স্নেহভাজন হ'য়ে পড়লাম। মঠে তখন মহাপুরুষ মহারাজ রয়েছেন; দূর থেকে তাঁকে দর্শন করেছি, কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের ধ্যানময় গম্ভীর ভাবাবস্থায় তাঁর কাছে যেতে আমার ভয় ক'রত। এক দিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর ঘরের দরজায় প্রণাম করতে গেছি, দেখি মহাপুরুষ মহারাজ আত্মভোলা ভাবে হাত জোড় ক'রে তাঁর ঘরের পূর্ব দিকের বারাণ্ডায় পাদচারণ করছেন। সে দিকে আর বেশিক্ষণ না তাকিয়ে আমি স্বামীজীর উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের দরজায় মস্তক নত ক'রে প্রণাম করছি, এমন সময় দেখি মহাপুরুষ মহারাজ সেবকদের ডাকাডাকি করছেন। সেবকেরা তখন আরতির জন্য মন্দিরে ছিলেন। আমি তখনও প্রণাম করছি—আমার ভয় হ'ল, মনে হ'ল—আমার এই সময়ে এখানে প্রণাম করা দেখে মহাপুরুষ মহারাজ বোধ হয় আমাকেই বকাবকি করছেন। ভীত মনে উঠে দেখি, মহাপুরুষ মহারাজ যখন ভাবে বিভোর, সেই সময় একটি মহিলা তাঁকে প্রণাম করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেবকেরা আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সময় এই মহিলাটিকে কেন এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে। এইভাব দেখে মহিলাটি নিচে চলে গেলেন, আমিও ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি চলে এলাম।

এই ঘটনাটির মাত্র কয়েক দিন পরে সকাল বেলা আবার গরু দেখবার জন্যে মঠে আমার ডাক পড়েছে। আমি স্বামীজীর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি, পাশের ঘরে তিন জন সাধু বসে আছেন। বলা বাহুল্য পূর্ব হতেই আমি এঁদের বিশেষ স্নেহের পাত্র। তাঁরা আমাকে দেখে বললেন, 'আজ এসেছ, ভালই করেছ। মহাপুরুষ মহারাজ ঘরে বসে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাও, যাতে তিনি কৃপা ক'রে তোমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দেন।' আমি বললাম, 'দীক্ষা কি, আমি জানি না, তার পর তাঁর কাছে যেতে আমার ভয় করে। উপরন্তু সে দিন যে দৃশ্য দেখেছি, এর পর তাঁর কাছে যেতে আমার মোটেই সাহস হয় না।' কিন্তু তাঁরা এত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে আমি বললাম, 'আপনাদের যখন আমার দীক্ষার সম্বন্ধে এত আগ্রহ, তখন আপনারাই আমার দীক্ষার সম্বন্ধে তাঁর কাছে প্রস্তাব করুন, তিনি যদি সম্মত হন, তখন আমি তাঁর কাছে যাব।' তখন তাঁরা বললেন, 'নিজের দীক্ষার জন্য নিজেকেই প্রার্থনা জানাতে হয়।' তখন আমি নিরুপায় হ'য়ে মহাপুরুষ মহারাজের পদপ্রান্তে যাবার জন্য অগ্রসর হলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, দেবাদিদেব মহাদেব যেন প্রসন্ন ও প্রশান্ত মনে বসে আছেন। মনে হ'ল—তিনি যেন সব কথা শুনতে পেয়েছেন, এবং আমাকে তাঁর অভয় পদে আশ্রয় দেবার জন্য যেন অপেক্ষা করছেন। আমি যখন নতজানু হ'য়ে করজোড়ে প্রার্থনা জানালাম, তখন তিনি হো হো ক'রে হেসে বললেন, 'বেশ বাবা বেশ, ২।৩ দিন পরে স্নানযাত্রা, পুণ্য দিন, ঐ দিন রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ঐ দিন সকালে এসো, তোমাকে দীক্ষা দেবো।'

তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার পর আমার সেই শৈশবের প্রার্থনার কথা মনে পড়ল। তাঁর কাছে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, সাধু লম্পট, কোন কিছুর পার্থক্য ছিল না, সবাইকে তিনি একই করুণার দৃষ্টিতে দেখতেন, এমন কি

গরুবাছুর পশুপক্ষীকেও সেই একই দৃষ্টিতে দেখতেন। এক দিনের ঘটনা—বেলুড় মঠে একটি গরুর বাছুর হয়েছে; গাভীটি অসুস্থ, এ খবর মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেছে। গরুটি অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে, এই খবর শুনে তিনি যেন গরুটির যন্ত্রণা নিজেই অনুভব ক'রে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'গৌরী-শঙ্করকে এখনই ডেকে পাঠাও।' আমি গিয়ে যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করলে গরুটির যেন সমস্ত কষ্ট নিমেষে দূর হ'য়ে গেল। পূঃ অনঙ্গ মহারাজ তখন গোশালার তত্ত্বাবধান করতেন, তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে গিয়ে খবরটি দিতে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে সমস্ত বিষয় জানালাম। গরুটি সুস্থ হয়েছে জেনে তিনিও যেন সুস্থ হলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ গৌরীশঙ্কর, তুমি মঠের গরুর সেবা কর, এতে তোমার শ্রীশ্রীঠাকুর-সেবাই করা হচ্ছে, মঠের যা কিছু দেখ, সবই ঠাকুরের।' তিনি এত খুশী হয়েছিলেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁর ব্যবহৃত ধুতি গেঞ্জি চাদর প্রভৃতি আমাকে দেবার জন্য তাঁর সেবককে বললেন। তাঁর সেই স্নেহ-জড়িত স্মৃতিটুকু আজ আমার পূজার সামগ্রী।

প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম না ক'রে যদি কেউ আগে তাঁকে দর্শন করতে যেত, তাতে তিনি বিরক্ত হতেন। তিনি আন্তরিক ভাবে অহর্নিশি অনুভব করতেন যে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মঠে বিরাজ করছেন; আর বলতেন, আশ্রিতেরা যদি কোন রকমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে একটি প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, তাহলে তাদের আর কল্যাণের অবধি থাকবে না। নিজেও তিনি অহর্নিশি ঠাকুরের ভাবে ঠাকুরময় হ'য়ে থাকতেন।

তাঁর তিনটি প্রিয় কুকুর ছিল: কেলো, ভুলো ও লালু। তারা তাঁর এত শরণাগত ছিল যে তাঁকে দেখতে পেলেই তারা তাঁর শ্রীচরণে লুটোপুটি খেত। মহাপুরুষ মহারাজ তাদের কাছে বসিয়ে খাওয়াতেন। মাঝে মাঝে মনে হ'ত, কেলো ভুলো লালুর কি সৌভাগ্য! আমাকেও তিনি কত দিন খাইয়েছেন, কত স্নেহ করেছেন। আমাকে তিনি কেবল একটি কথা ব'লে গেছেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধরে থেকো, শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভালোবেসো, তিনিই তোমার সর্বস্ব, এইটুকু জেনে তাঁর পাদপদ্মে শরণাগত হ'য়ে পড়ে থেকো।' আজ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহা-রাজের পাদপদ্মে সর্বক্ষণ জানাতে ইচ্ছা করে, 'তুমি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর: যেন তোমার ঐ আদেশ, ঐ উপদেশ সার্থক হয়। আমার জীবনে তোমার ঐ উপদেশ যেন আশীর্বাদ রূপে বর্ণে বর্ণে সত্য হ'য়ে ফুটে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু-লীলা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার শ্রীগুরু-বন্দনামুখে পরম ভক্তিভরে গেয়েছেন :

জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছা-কল্পতরু।
জয় জয় ভগবান জগতের গুরু॥

বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমগ্র জীবন-লীলাই অহেতুক প্রেম ও অযাচিত কৃপার মূর্ত প্রকাশ। অপার করুণায় আত্মহারা হ'য়ে কত ভক্ত-অভক্তকে যে তিনি দিব্য শক্তির পূত স্পর্শ দ্বারা অভয় আশ্রয় দানে কৃতার্থ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এই লোকোত্তর বিরাট পুরুষের আদি ও মধ্যলীলায় ঐরূপ কৃপা বিতরণ বিশেষ বিশেষ পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও অন্ত্যলীলায় তা সকল সীমারেখাকে অতিক্রম করে। ফলে তা ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান্-মূর্খ, ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে সকলের প্রতি স্বতই অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়।

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন।—পুঁথি

১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিনব লীলায় এক মহা স্মরণীয় দিবস। এই দিনটি নির্বিচারে সর্বসাধারণকে তাঁর আত্মপ্রকাশে অভয় আশ্রয় দানের অতুল মহিমায় চির-সমুজ্জ্বল। তাঁর ঐ অভিনব আত্মপ্রকাশ সমগ্র জীব-জগতের প্রতি অহেতুক প্রেম ও অযাচিত কৃপা-প্রকাশেরই পরম লীলা। এই জন্যই এই পুণ্য দিনটি আপামর সাধারণের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' বা অভয় আশ্রয় দানের দিবসরূপে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর ঐ অপূর্ব লীলার বিবরণী 'লীলা-প্রসঙ্গ' (দিব্যভাব) ও পুঁথিতে সবিস্তার বর্ণিত রয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন চিকিৎসার্থ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে রয়েছেন। ঐ লীলাপ্রকাশের প্রায় সপ্তাহ তিনেক পূর্বে (১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার) তিনি শ্যামপুকুর হ'তে তথায় শুভাগমন করেছেন। স্থান পরিবর্তনের ফলে তিনি তখন অনেকটা সুস্থ। ভক্ত সেবকগণ এই কারণে পরম আশান্বিত ও মহা আহ্লাদিত।

১লা জানুআরি ইংরেজী নববর্ষ উৎসব। এই উপলক্ষে সাধারণ অবকাশ থাকায় ভক্তগণ অনেকেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য দর্শন ও কুশল শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় সেদিন উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ নিম্নের হল ঘরে, কেহ কেহ বা উদ্যানস্থ বৃক্ষ-রাজির সুশীতল ছায়াতলে বিশ্রামে ও সদালাপে রত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে কতিপয় ভক্তসেবকসহ বিরাজমান।

নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ।
ভবনে বিরাজমান কল্পতরু বেশ॥ —পুঁথি

ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের মামা শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মুস্তফী শ্রীশ্রীঠাকুরের কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। অহেতুক করুণাভরে ঠাকুর ঐ দিবস সর্বপ্রথম তাঁকেই অপার কৃপাদানে পরম কৃতার্থ করলেন। প্রভুর ঐ দিব্য করুণাস্পর্শ লাভের সঙ্গেই এক আশ্চর্য পুলকভরে হরিশের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তাঁর হৃদয়ের প্রেম বিগলিত হ'য়ে অশ্রুধারায় নেত্রদ্বয় প্লাবিত হ'ল। অদ্ভুত আনন্দের উদ্দাম বেগে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠল, বাকশক্তি রুদ্ধ হ'ল। তিনি একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে চিত্রার্পিতের ন্যায়

দণ্ডায়মান রইলেন এবং অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

হরিষে হরিশচন্দ্র মুখে মাত্র স্বরে।
কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে॥—পুঁথি

হরিশকে ঐ ভাবে অভয় আশ্রয় দানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের করুণাসিন্ধু যেন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নিম্নের হল-ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরের আহ্বানে দেবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তথায় করযোড়ে উপস্থিত হলেন। হরিশের ঐরূপ অভূতপূর্ব দিব্য ভাবাবস্থা দর্শনে তিনি অতিশয় বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রেমগদ্‌গদ-স্বরে সহাস্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: রাম, গিরিশ প্রভৃতি আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে কেন?

স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে।
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে॥—পুঁথি

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ নিগূঢ় কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করলেও কেন তিনি হঠাৎ তা জিজ্ঞাসা করছেন, তার রহস্য দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন না, তাই নির্বাক্ হ'য়ে তিনি প্রভুর শয্যাপার্শ্বে যুক্তকরে দণ্ডায়মান রইলেন, তার ফলে ঠাকুরের হৃদয়স্থ করুণা-পারাবার আরও অধিকতর উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। উদ্যান-মধ্যে দীন-হীন কাঙাল-আতুর, ভক্ত-অভক্ত—যে যেখানে ছিল সকলের জন্যই দীনবন্ধু করুণাসাগর প্রভু অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। নির্বিচারে সকলকে অভয় আশ্রয় দানের জন্য হৃদয়ের সুতীব্র ব্যাকুলতায় তিনি অধীর হ'য়ে পড়লেন।

তখন বেলা প্রায় তিন ঘটিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর আর উপরে থাকতে পারলেন না। দেবেন্দ্র-প্রমুখ কয়েকজন ভক্তসহ ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলেন। তাঁর পরিধানে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বনাতের সবুজ রঙের জামা, মাথায় কর্ণমূল-ঢাকা বনাতের সবুজ টুপি এবং পায়ে মোজা ও লতাপাতা-আঁকা সবুজ চটিজুতা।

শ্রীঅঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমণ্ডল।
কান্তিরূপে লাবণ্যেতে করে ঝলমল॥
দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর।
কিন্তু বয়ানেতে কান্তি বহে নিরন্তর॥—পুঁথি

শ্রীশ্রীঠাকুরের আজ অতি অপরূপ দক্ষিণা-মূর্তি। নির্বিশেষে সকলকে অভয় দানের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও আত্মহারা।

নিম্নতলে নেমে আসতেই প্রথমে হল-ঘরের ভক্তগণের উপর তাঁর কৃপাদৃষ্টি পতিত হ'ল। ভক্তগণ তাঁকে সহসা অবতরণ করতে দেখে যেরূপ আহ্লাদিত, সেইরূপ বিস্মিত হলেন। কারণ এই বাটীতে এসে মাত্র একদিন তিনি উদ্যানে ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে ক্লান্তি বোধের ফলে তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। সেই কারণে তিনি আর উদ্যানে ভ্রমণ করেননি। প্রয়োজনবোধে দ্বিতলে স্বীয় কক্ষে এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণের ছাদে তিনি কখন কখন পাদচারণ করতেন। যা হোক, হল-ঘরে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনমাত্রই ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে তাঁর শ্রীচরণ উদ্দেশে সভক্তি প্রণিপাত জানালেন।

ভবন হইতে পরে উদ্যানের পথে।
সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু সাথে॥
বাগানে ভ্রমেন প্রভু শুনিয়া বারতা।
নিকটে জুটিল সবে যেবা ছিল যেথা॥—পুঁথি

ঐ হল-ঘরের পশ্চিম দ্বার দিয়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে বহির্গত হলেন। উদ্যান-পথে নেমেই চারিদিকে সকলের উপর সপ্রেম দৃষ্টিপাত করলেন। ছায়াতলে যাঁরা বিশ্রাম করছিলেন, আলাপাদিতে রত ছিলেন, তাঁরাও ঠাকুরকে হঠাৎ দর্শন ক'রে পরম পুলকিত ও বিস্মিত হলেন। যিনি যেখানে ছিলেন তিনি সেই স্থান হতেই তৎক্ষণাৎ শ্রীপ্রভুর চরণকমল

উদ্দেশে আনত শিরে প্রণতি নিবেদন করলেন। ক্রমে সকলে একে একে তাঁর কাছে সমবেত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণমুখে ক্রমশঃ ফটকের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। ভক্তগণ সসম্ভ্রমে তাঁর পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থেকে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চললেন। বসতবাটী ও দক্ষিণের ফটকের ঠিক মধ্যপথে উপনীত হ'য়ে তিনি শ্রীযুক্ত গিরিশ, রাম, অতুল প্রমুখ ভক্তগণকে পশ্চিমের এক বৃক্ষতলায় দেখতে পেলেন। তাঁরাও সহসা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্যানে ঠাকুরকে ভ্রমণ করতে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁরা তখন ভক্তিনম্র হ'য়ে তাঁকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করতে লাগলেন। ঐ অবসরে ঠাকুর তাঁর অভয় হস্ত প্রসারিত ক'রে তাঁদের আহ্বান করলেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ পরম উল্লাসে তাঁর সমীপে উপস্থিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণাঘন মূর্তিতে হঠাৎ দণ্ডায়মান হলেন। প্রায় ত্রিশ জনেরও অধিক ভক্ত তথায় সমবেত। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নাই, সকলেই নীরব নিস্তব্ধ। ঠাকুর তখন প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে গিরিশচন্দ্রকে সম্বোধন ক'রে বললেন—'গিরিশ! তুমি যে সকলকে আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে এত কথা ব'লে বেড়াও, তুমি আমার মধ্যে কি দেখেছ এবং আমার সম্বন্ধে কি বুঝেছ?'

হঠাৎ দাঁড়াইয়া পথে শ্রীগিরিশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে কিবা লয় মন ॥—পুঁথি

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মমূলে নতজানু হলেন এবং করযোড়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁর শ্রীমুখকমল পানে চেয়ে ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে বললেন—'প্রভু! শুক-ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর মহিমা সম্বন্ধে কি আর অধিক বলতে পারি!' গিরিশের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস'। তাঁর ঐ উক্তি শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ এক অপূর্ব দিব্য ভাবে শিউরে উঠল এবং পথের উপরেই তিনি গম্ভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর ॥—পুঁথি

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ অপলক নেত্রে শ্রীপ্রভুর ঐ দিব্য অবস্থা দর্শন করছেন। তাঁর হাস্যোৎফুল্ল মুখশ্রী, প্রেমাশ্রুরঞ্জিত নয়ন, জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল নিস্পন্দ নিথর দেহ, সুমনোহর পরিচ্ছদ—সমস্ত মিলে এক অপূর্ব নয়নাভিরাম রূপ। ভাগ্যবান্ ভক্ত-সেবকগণ শ্রীপ্রভুর অভিনব কল্পতরু-মহাভাবের অপরূপ প্রিয়দর্শন মূর্তি অবলোকন ক'রে বিমোহিত ও আত্মহারা।

ভক্ত অক্ষয় (পুঁথিকার) শ্রীশ্রীঠাকুরের ও-রূপ সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁর শ্রীচরণযুগলে দুটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণচাঁপা অঞ্জলি দিলেন! কয়েকজন বন্ধুসহ ঐ উদ্যানে তিনি একটি চাঁপাফুলের গাছে বানর-বানর খেলছিলেন। সেই সময়ই তিনি ঐ চাঁপা দুটি সংগ্রহ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিম্নতলে সহসা অবতীর্ণ দেখেই তাঁরা খেলা-ধূলা বন্ধ ক'রে আনন্দে ছুটে আসেন এবং তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে ঐ দিব্যলীলা দর্শনে মগ্ন হন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ ভাব কতকটা প্রশমিত হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধীরে ধীরে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হলেন। ঐরূপ অবস্থায় তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক সকলকে শুভাশীর্বাদ ক'রে গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন, 'আমি তোমাদের কি আর ব'লব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক!'

কিছু পরে বাহ্য চেঠা* উদিলে শ্রীগায়।
ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায় ॥
তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হউক আর কি বলিব আমি ॥—পুঁথি

* চেঠা বা চৈতন্য।

অতঃপর ঠাকুর অহেতুক প্রেম ও অযাচিত করুণায় আত্মহারা হ'য়ে ঐরূপ অর্ধবাহ্যদশায় সকলকেই কৃপাদানে প্রবৃত্ত হলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কে 'কি গো' ব'লে সস্নেহে সম্ভাষণ ক'রে তাঁর বক্ষঃস্থলে তিনি অভয় হস্ত বুলিয়ে দিলেন। এইরূপে তাঁর মধ্যে দিব্যশক্তি সঞ্চারপূর্বক তিনি তাঁর কর্ণমূলে 'মহামন্ত্র' প্রদান করলেন। শ্রীযুক্ত নবগোপাল, উপেন্দ্র মজুমদার, রামলাল, অতুল, হরমোহন, গিরিশ, রাম, দেবেন্দ্র, হারান, বৈকুণ্ঠ, কিশোরী প্রভৃতিকেও তিনি অতঃপর একে একে অভয় আশ্রয় দানে কৃতার্থ করলেন। অভিনব হেমকল্পতরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অযাচিত করুণা ও অভয় আশ্রয় লাভে তাঁদের হৃদয় মহানন্দে পরিপূর্ণ হ'ল। তাঁরা পরম পুলকে আত্মহারা হলেন, আনন্দের আতিশয্যে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

পরম পুলকে খালি ঝুরে দু'নয়ন।
প্রভুর কৃপার এই বাহ্যিক লক্ষণ॥
কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর।
আপনি বিরাজমান কৃপার ভিতর॥

* * *

কৃপা নহে কড়ি-পাতি নহে রাজ্যধন।
কিংবা নহে মনোহর কামিনী-কাঞ্চন॥
সুস্বাদু ভোজন নয়, নয় গাঁজা সুরা।
নহে মাদকীয় কিছু ক্ষণানন্দধারা॥
তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে।
তুলনায় যাবতীয় রাজ্যধন মিছে॥—পুঁথি

নানাজনের স্পর্শে শ্রীপ্রভুর ব্যাধির উপশম হচ্ছে না, মনে ক'রে ভক্তগণ স্থির করেছিলেন, তিনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে তাঁকে কেহ প্রণাম করবেন না। কিন্তু আজ কল্পতরুর পূত স্পর্শলাভে তাঁদের দেহ, হৃদয় ও মন এক অতুল আনন্দস্পন্দনে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। তাঁরা নিজেদের সঙ্কল্পের কথা ভুলে গিয়ে ভক্তি ও ভাবের আতিশয্যে আত্মহারা হ'য়ে শ্রীপ্রভুর অভয় পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হলেন। রামচন্দ্র-প্রমুখ ভক্তগণ উদ্যান হ'তে তাড়াতাড়ি পুষ্প চয়ন ক'রে মন্ত্রপাঠপূর্বক তাঁর শ্রীচরণে মুঠা মুঠা অঞ্জলি দিতে লাগলেন। কেহ কেহ ভক্তি গদ্গদস্বরে স্তব-বন্দনা আরম্ভ ক'রে দিলেন। আবার কেহ কেহ বা উদ্যান মুখর ক'রে মুহুর্মুহুঃ প্রভুর জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন।

এখানে গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক।
কে কোথা খুঁজিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক।—পুঁথি

মহাবিশ্বাসী গিরিশ ও রাম অপার প্রেমানন্দভরে উন্মত্তপ্রায় হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা এখানে সেখানে যাকেই দেখেন, তাকেই ধরে এনে শ্রীপ্রভুর অভয় চরণে উপস্থিত করলেন। অবশেষে তাঁরা দীন-দুঃখী, আর্ত-অধম কে কোথায় আছে, তাদের খুঁজে খুঁজে ধরে আনতে লাগলেন। রান্নাঘরে পাচক ব্রাহ্মণ (গাঙ্গুলী) রুটি বেলতে বসেছিল। গিরিশ তাকেও টানাটানি ক'রে ধরে এনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করলেন। সকলেই অযাচিতভাবে তাঁর অপার কৃপালাভে ধন্য হ'ল।

প্রবাদ আছে—'কল্পতরু'র নিকট যা কামনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণকমলে ভক্তগণের আজ কামনার কোন অপেক্ষা নাই, প্রার্থনার কোন দীনতা নাই। সুতরাং তিনি কি আজ 'কল্পতরু'? বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলাই সমীচীন: তিনি 'অভিনব হেমকল্পতরু'।

শ্রীযুক্ত রামলাল স্বীয় ইষ্টমূর্তির পরিপূর্ণ অবয়ব কিছুতেই ধ্যান করতে পারতেন না। তিনি ধ্যানকালে হৃদয়ে ঐ মূর্তির খানিকটা অংশমাত্র চিন্তা করতে পারতেন। কখন মুখশ্রী হ'তে কটিদেশ, কখন বা পাদপদ্ম হ'তে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত তাঁর ধ্যানে উদিত হ'ত। ইষ্টের সমগ্র

অবয়বটি-কোনক্রমেই একসঙ্গে তাঁর ধ্যানে আসত না। এইজন্য তাঁর হৃদয়ে এক নিদারুণ অস্বস্তির ভাব বিরাজ ক'রত। কিন্তু আজ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যশক্তির পূত স্পর্শমাত্রই তাঁর হৃদয়পদ্মে সম্পূর্ণ ইষ্টমূর্তি জল্‌জল্‌ করতে লাগল। ঐ মূর্তি যেন জীবন্তরূপে তাঁর হৃদয়-কন্দর সমুদ্ভাসিত ক'রে তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠের বক্ষঃস্থল স্পর্শমাত্রই তাঁর অন্তরে এক অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হয়। আকাশ-বাড়ী, গাছ-পালা—যেদিকে যা কিছু দেখেন, সমস্ত কিছুর মধ্যেই শ্রীপ্রভুর সুপ্রসন্ন হাস্যদীপ্ত করুণাঘন মূর্তি দেখতে থাকেন। ঐরূপ দিব্যদর্শনজনিত অপার আনন্দ উল্লাসের প্রচণ্ড বেগ হৃদয়ে ধারণে সক্ষম না হওয়ায় তিনি ভাবে অধীর হ'য়ে উঠেন এবং 'কে কোথায় আছিস্‌, এই বেলা চলে আয়' ব'লে সকলকে শ্রীপ্রভুর চরণে বারংবার আহ্বান করতে থাকেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'কার শ্রীযুক্ত অক্ষয়ের অনুভূতির বিবরণী তাঁরই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় উদ্ধৃত হ'ল :

দূর থেকে সম্ভাষিয়া 'কি গো' বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিল বক্ষের উপরে॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥—পুঁথি

যা হোক, দিব্য কল্পতরু-মহাভাবের আবেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ টলমল করতে লাগল। ঐরূপে তিনি নির্বিচারে সকলের উপর অযাচিতে অজস্র কৃপারাশি বর্ষণ ক'রে দ্বিতলে নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হলেন। ভক্ত সেবকগণ তখন সযত্নে তাঁকে ধরাধরি ক'রে ধীরে ধীরে তাঁর কক্ষে নিয়ে গেলেন। নিম্নতলে ভক্তদের মধ্যে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত। এদিকে দ্বিতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে নিদারুণ জ্বালা উপস্থিত হ'ল। ঠাকুরের আজ্ঞায় রামলাল তাঁর সর্বাঙ্গ গঙ্গাজলে মুছিয়ে দিলেন; তবে তাঁর ঐ অসহ্য গাত্রজ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হ'ল।

শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপীদের আজি কবিলা মোচন॥
তে সবার জীবনের যত পাপ-ভার।
সকল লইলা প্রভু অঙ্গে আপনার॥

*　　*　　*

গলার দারুণ ব্যাধি অন্য কিছু নয়।
জীবের মোচন-কর্মে পাপের সঞ্চয়॥
জগতের পাপরাশি লইয়া গোসাই।
আপনার শ্রীঅঙ্গের মধ্যে দিলা ঠাই॥
করুণানিদান হেন কোথা কেবা আর।
জপ-তপ রামকৃষ্ণপদ কর সার॥—পুঁথি

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র হাজরা উদ্যান-বাটীতে দিবারাত্র থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে শ্রীপ্রভুর 'কল্পতরু-লীলা'-কালে অন্যত্র গিয়েছিলেন। ঐ লীলা সাঙ্গ হওয়ামাত্রই তিনি উদ্যানে ফিরে আসেন। ঠাকুরের অযাচিত কৃপাদানের বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে তিনি 'হায় হায়' করতে থাকেন। কারণ ঐ সময়ে উপস্থিত থাকলে তিনিও শ্রীপ্রভুর অপার কৃপা ও অভয় আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হতেন। যা হোক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের সঙ্গে হাজরার খুবই প্রীতির সম্পর্ক ছিল। হাজরাকে 'হায় হায়' করতে দেখে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে তাড়াতাড়ি দ্বিতলে শ্রীপ্রভুর নিকটে নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে কৃপাদানের জন্য ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করলেন। উত্তরে ঠাকুর বললেন—'এখন হবে না। সময়সাপেক্ষ। শেষেতে ও পাবে।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), তারক (শিবানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), লাটু

(অদ্ভুতানন্দ) এবং আরও কেহ কেহ কল্পতরু-লীলার সময় উদ্যানবাটীতে ছিলেন, কিন্তু ঐ সকল ত্যাগী শিষ্যগণের কেহই লীলাস্থলে উপস্থিত হন নাই। নরেন্দ্র, তারক প্রভৃতি পূর্বরাত্রে শ্রীপ্রভুর সেবা এবং সাধন-ভজন ক'রে ক্লান্ত ছিলেন। তাই তাঁরা ঐ সময়ে নিম্নে হল-ঘরের পার্শ্বে ছোট ঘরটিতে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎ ও লাটু দূর হ'তে শ্রীপ্রভুর ঐ অভিনব লীলা প্রত্যক্ষ করছিলেন। গিরিশপ্রমুখ ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও তাঁরা তথায় উপস্থিত হননি। দ্বিতলে ঠাকুরের কক্ষসংলগ্ন দক্ষিণের ছাদে তাঁরা ঐ অবসরে ঠাকুরের শয্যাদি রোদে দিচ্ছিলেন এবং তাঁর কক্ষখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছ-গাছ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কর্তব্য কর্ম অর্ধনিষ্পন্ন রেখে ঐ লীলাস্থলে গমন করবার ইচ্ছা তাঁদের হয়নি। কারণ শ্রীপ্রভুর সেবা ও সন্তুষ্টি বিধানই ছিল তাঁদের জপ-তপ ও সাধন ভজন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি ত্যাগী ভক্তগণের জন্য নয়, গৃহস্থ ভক্তগণের নিকটই তাঁর এই অভিনব লীলা প্রকাশ।

বিষয়-মদিরা পানে অচৈতন্য জীবের প্রতি এদিন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পরম আশীর্বাদ : 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' শ্রীপ্রভুর অভয় আশ্রয় ও পরম করুণাপূর্ণ আশীর্বাদই আমাদের ভরসা, সমগ্র বিশ্ব-মানবের মুক্তির পরম পাথেয়।

প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায়।
'রামকৃষ্ণ' নাম গেয়ে দিন যেন যায়॥—পুঁথি

চরৈবেতি

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভয় ভাবনা করিস্ মিছে
হবি সদাই অগ্রগামী,
ভুলিস্ কেন নিয়ন্তা তোর
সাথে আছেন দিবস-যামী!

চোখ আছে তাঁর সবার 'পরে
সবই যে তাঁর ইচ্ছাধীন,
সৃষ্টি করেন সবই তিনি
তাঁতেই সকল হয় যে লীন।

নিজের মালিক তুই কি নিজে
কতটুকু সাধ্য তোর ?
মরীচিকার পিছে পিছে
ছুটিস্ মিছে জীবন ভোর।

আঘাত যখন আসে নেমে
ঝরে যখন চোখের জল,
জানবি তখন এলেন তিনি
কান্না সে তোর নয় বিফল।

আপন হাতে চোখ মুছিয়ে
বসিয়ে তিনি দেন আবার—
লুটিয়ে পড়ে কাঁদে যে জন
প্রার্থী হ'য়ে তাঁর কৃপার।

তিনিই আছেন সবার মাঝে
আসন যে তাঁর বিশ্বময়,
কে-ই বা মারে, কে-ই বা রাখে
কার কাছে তোর কিসের ভয় ?

সাগর-কূলে বসে তবে
ভাববি কেন নিরন্তর ?
ঢেউয়ের দোলায় দুলবি যদি
সাগর-বুকে ঝাঁপিয়ে পড়।

জপ-যোগ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

'কেমন আছেন মশাই ?' এই প্রশ্ন করিলে 'সুখে দুঃখে এক রকম কেটে যাচ্ছে' বলিয়া আমরা উত্তর দিয়া থাকি ; কিন্তু মায়ার মোহে উপলব্ধি করি না যে এ উত্তর ঠিক হইল না। এ সংসারে একটুও সুখ নাই। এখানে যদি একটুও সুখ থাকিত, তাহা হইলে শ্রীভগবান গীতায় শ্রীঅর্জুনকে 'অনিত্যমসুখং লোকং' 'দুঃখালয়মশাশ্বতম্' ইত্যাদি বাক্য কখনও বলিতেন না। এখানে সুখের লেশ নাই এবং দুঃখেরও অন্ত নাই।

এই কারণে পরম কারুণিক শ্রীভগবান সন্তপ্ত জীবের দুঃখ-নিবারণের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। উপায় হইতেছে—'ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।' শ্রীভগবানকে ভজনা করিবার নানা পথ আছে, তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগই প্রধান। এই সকল পথের মধ্যে জ্ঞানমার্গ অত্যন্ত কঠিন। 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে ভক্তিমার্গই ভগবান-লাভের সহজ উপায়— 'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' নাম-জপ নিষ্কাম কর্মযোগের অন্তর্গত, নাম-জপ হইতে শুদ্ধাভক্তি হয় ; শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান একই বস্তু। দ্বৈতবাদী ইষ্টমন্ত্র ও অদ্বৈতবাদী 'সোঽহং' মন্ত্র জপিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

ভগবান-লাভ অর্থে বুঝিতে হইবে সর্বদুঃখনিবৃত্তি ও পরমানন্দ-প্রাপ্তি। শ্রীভগবানের নামজপ করিতে করিতে তাঁহাতে ভক্তি হয় এবং ভক্তি হইলেই এই সন্তাপজনক সংসারে বার বার আসা-যাওয়ার শেষ হয়।

জপের সাধারণ নিয়মগুলি প্রথমে অর্থাৎ দীক্ষার পরই সাধকগণ প্রায় ধরিতে পারেন না। সিদ্ধ গুরু দুর্লভ ও দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গলাভ অধিকতর দুর্লভ। সেজন্য সহজভাবে সাধারণের অবগতির জন্য গুরুমুখে শ্রুত ও শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত জপ-সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়ম এখানে আলোচিত হইল।

(১) **মন্ত্রজপের প্রারম্ভে**—প্রথমে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে। যতই সাধন-ভজন করা যাক, তাঁহার কৃপা না হইলে কিছুই সম্ভব নহে। শ্রীভগবানই কৃপা করিয়া তাঁহার নাম করাইয়া লইতেছেন ও ইহার ফল তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদিত হইতেছে, এই ভাব লইতে হইবে। অহংভাব বা নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহার দাস—এই ভাব আশ্রয় করিয়া জপ করিলে জপ নিষ্কাম কর্মে পরিণত হইবে এবং তাহার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, তখন শ্রীভগবানের কৃপা লাভ হইবে। 'নাম নামী অভেদ'—নাম করিতে করিতে নামী আকৃষ্ট হন ও কৃপা করেন।

(২) **শ্রীগুরু**—ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ব্যতিরেকে সাধন-ভজনে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর বিশেষ প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যদি কেহ আন্তরিকভাবে শ্রীভগবানে বিশ্বাস করিয়া গুরুলাভের জন্য প্রার্থনা করে, শ্রীভগবানই তখন মনুষ্যমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কৃপা করেন, দীক্ষার্থীর সংস্কার, প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া জপের জন্য উপযুক্ত মন্ত্র দেন। পুস্তকে অনেক মন্ত্রই লেখা আছে, কিন্তু সেগুলি পড়িয়া কোন কাজ হয় না। এই মন্ত্রগুলি শ্রীগুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি সহ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে

নির্গত হইয়া শিষ্যের কর্ণে প্রবেশ করিলে তবে ঐ শক্তিসাহায্যে জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করা যায়।

(৩) **জপমালা**—প্রবর্তকের পক্ষে জপ-মালার সাহায্য লইয়া জপ করিবার সুবিধা। জপ করিবার পূর্বে মালা শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক অর্থাৎ গুরু মালা স্পর্শ করিয়া ও পরমাত্মাকে নিবেদন করিয়া উহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবেন। অতঃপর তাঁহার উপদেশমত মালা জপিতে হইবে। মালা অনেক প্রকার দানার হইয়া থাকে, যেমন রুদ্রাক্ষের, তুলসীর, পদ্ম-বীজের। কাহার কোন্ মালা উপযুক্ত হইবে গুরুই শিষ্যের প্রকৃতি, ইষ্ট ইত্যাদি বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিবেন। যে সকল দ্রব্যের মালার বিষয় লিখিত হইল, সেইগুলি শরীরকে স্পর্শ করিলে মন ভগবন্মুখী হয়। এই কারণে এগুলি ব্যবহৃত হয়। যেমন ডাক্তার দেখিলে রোগের কথা, উকিল দেখিলে মকদ্দমার কথা মনে পড়ে, সেইরূপ বিশেষ মালা দেখিলেই ভগবানের বিশেষ রূপের কথা মনে পড়িবে। মালা পবিত্র স্থানে রাখা একান্ত কর্তব্য।

(৪) **জপের আসন**—স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া কুশ, কম্বল বা মৃগচর্মের আসনে সোজা (শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে) হইয়া বসিয়া জপ করিতে হয়। আসনের উপর উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া বসিতে হয়। হিমালয় উত্তর দিকে, সেখানে সিদ্ধ পুরুষগণ ধ্যান জপ ও সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তি চতুর্দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সেই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইবার উদ্দেশ্যেই উত্তরদিকে বসিবার প্রথা হইয়াছে। পূর্বদিকে জ্ঞানের প্রতীক জ্যোতির্ময় সূর্যদেব উদিত হন, জ্ঞানপ্রার্থী অন্তরে ঐরূপ জ্ঞানজ্যোতি উদিত হইবে বলিয়া পূর্বমুখ করিয়া বসিয়া জপ করেন।

(৫) **জপের সময়**—সন্ধিক্ষণই জপের প্রকৃত সময়। রাত্রি বিদায় লইতেছে, দিবা আসিতেছে বা দিবার অবসান হইতেছে ও রাত্রি আসিতেছে—এই সময় প্রকৃতি শান্ত হন, এই শান্তি ও নিস্তব্ধতার পরিবেশে মন সহজেই সমতা লাভ করে। ব্রাহ্মমুহূর্ত (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ২॥ দণ্ড বা ১ ঘণ্টা পূর্বে) ঈশ্বর-চিন্তার বিশেষ অনুকূল সময়।

জপ যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ করা উচিত। আধ ঘণ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত নিয়মিত করিতে পারিলে শীঘ্রই সুফল পাওয়া যায়।

(৬) **জপে বসিবার স্থান**—মনের উপর পরিবেশেরও বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। ঠাকুরপূজার নির্দিষ্ট ঘরে, দেবতার মন্দিরে, পুণ্য-সলিলা নদীতীরে, সুদৃশ্য পুষ্পশোভিত পর্বতের নিকটে বা তীর্থে বসিয়া মালা জপ করিলে মন শীঘ্র ভগবন্মুখী হয়। গীতায় আছে, পবিত্র নিরাপদ শব্দ- ও বাত্যা-শূন্য স্থানে বসিয়া জপ-ধ্যান করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছবিতে যেভাবে বসিয়া আছেন, সেই ভাবে বা যে আসনে অনেকক্ষণ বসিবার সুবিধা হয়, সেই আসনে বসিয়া জপ করাই প্রশস্ত।

(৭) **জপ**—অপরে শুনিতে পায় এরূপ করিয়া জপ করাকে বাচিক, শব্দ না করিয়া ধীরে ধীরে নিজে শুনিতে পাওয়া যায় এরূপ জপকে উপাংশু ও নিঃশব্দে মনে মনে জপ করাকে মানস জপ কহে। মানস জপই শ্রেষ্ঠ জপ।

মালা ছাড়া 'করে'ও জপ করা চলে। করে জপকালে কর বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখাই বিধি।

আর একপ্রকার জপ আছে: অজপা জপ; শ্বাসে শ্বাসে এই জপ করিতে হয়,—'হংসঃ সোঽহং' জপ, নিশ্বাস লইবার সময় 'হং', ত্যাগ

করিবার সময় 'সঃ'। পতঞ্জলির মতে মন্ত্রের অর্থ-ভাবনাই জপ ; দেবতার চিন্তাও জপ।

মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন যে সব সময়ই জপ করিতে পারা যায়—'চলতে, ফিরতে, খেতে শুতে জপ করতে পারলেই ভাল হয়।' তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, ধ্যান-জপের পরই আসন ছাড়িয়া উঠিতে নাই, কিছুক্ষণ আসনে বসিয়া চিন্তা করিলে ভাব গাঢ় হয়, এবং উঠিয়াও কিছুক্ষণ মৌন থাকিলে ভাব গাঢ়তর হইবে।

জপে ডুবিয়া যাইলে সংখ্যা রাখিবার প্রয়োজন নাই। অনেক সময় সংখ্যা রাখিতে গেলে concentration-এর (তন্ময়তার) ব্যাঘাত জন্মে, স্বামী শিবানন্দ বলিতেন, 'প্রেমের সহিত একবার জপ ভাসা ভাসা লক্ষবার জপের চেয়েও ভাল, একি বাজারের জিনিস গা, এত দিলুম আর এত পেলুম!' সর্বদা প্রেমের সহিত জপ করাই বিশেষ। তবে প্রবর্তকের পক্ষে নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে মন বসুক আর না বসুক, ধ্যানজপে বসা এবং মনকে টানিয়া আনিয়া জপে লাগানো বিশেষ আবশ্যক।

প্রথমে সাধককে এরূপ সংগ্রাম করিতেই হইবে। ধীরে ধীরে জপ করা বিধি হইলেও কোন কোন মহাত্মা বলেন, যখন মন বসিতেছে না, তখন নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ বা দ্রুত জপ করিলে মন বসিয়া যায়। শরীর যেমন খাদ্য-বৈচিত্র্য চায়, মনও চায়। কাজেই মানসিক জপ খানিকক্ষণ করিয়া ভাল না লাগিলে উপাংশু জপে মন বসে। 'জপশ্রান্তো ইষ্টং ধ্যায়েৎ ধ্যানশ্রান্তে পুনর্জপেৎ'। জপ করিতে করিতে নানারূপ অনুভূতি হইতে থাকে। জপ করিতে করিতে ইষ্টদেবতার দর্শন হইয়া থাকে।

(৮) ইষ্ট—ইষ্ট অর্থে ঈপ্সিত, প্রিয়। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ, কালী বা দুর্গা ইত্যাদি ভজনার ফলে ইহজন্মে ঐ অর্চিত মূর্তিই প্রিয় বা ইষ্ট হয়। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, দুঃখ-কষ্টের সময় যে দেবতার কথা অধিক মনে পড়ে সেইটিই ইষ্ট,—ঐ ইষ্টমূর্তি হৃদয়ে অর্থাৎ নাভি হইতে ১০ আঙ্গুল উপরে হৃদয়ে কল্পনা করিয়া জপ করিতে হয়। জপের সময় বাহ্য বস্তু হইতে চক্ষুকে সরাইয়া অর্থাৎ চোখ বুজিয়া জপ করিলে মনঃসংযোগে সাহায্য করে।

স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছেন, 'ইষ্ট নাম শুনিতেছেন ও কৃপা করিবার জন্য তোমার দিকে চাহিয়া আছেন এবং তুমিও তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছ—এই ভাব লইয়া জপ করিতে হয়।' প্রথমে তাহা না পারিলে ইষ্টদেবতার প্রতিকৃতির সামনে বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া জপ করিলেও অগ্রসর হওয়া যায়। ক্রমশঃ মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্ট এক বোধ হয় এবং জপ করিতে করিতে ইষ্টদর্শন হয়।

(৯) **জপ-সমর্পণ**—জপ করিয়া তাহার ফল ইষ্টকে সমর্পণ করিতে হয়। তাহা হইলে আর শুভাশুভ কর্মফল ভোগ করিতে হয় না। কোন উত্তম জিনিস পাইলে শিশুপুত্র যেমন পিতার নিকট সংরক্ষণের জন্য রাখিয়া দেয়, এ যেন সেইরূপ।

(১০) উপসংহার—শাস্ত্রে আছে 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। নাম জপ করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ হয়। জপ ও ধ্যানের অতি নিকট সম্বন্ধ। স্বামী শিবানন্দ বলিতেন—'জপ করতে করতে আপনি ধ্যান হ'য়ে যায়।' জপধ্যানে মন একাগ্র হইলেই উদ্দিষ্ট বস্তু আপনি প্রকাশিত হয়। তখন সাধক সিদ্ধ হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা ও মুক্তি

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও জীবনের চৌদিকে প্রশস্ত অবকাশ রক্ষা—ভারতীয় সমাজ-সংস্থার এই দুইটি কল্পসূত্রস্বরূপ। জনবহুল আধুনিক পৃথিবীতে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার চাপে দুইটিই সঙ্কুচিত ও খর্ব হইতেছে। চীনাম্যানের পত্র-উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—'যে জাতি গবর্মেণ্টকে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, তাহার অবস্থা তোমরা কল্পনাই করিতে পার না।' অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন—'ভারতবর্ষের সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মধ্যে, সুখশান্তি সন্তোষের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে।' 'ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর, বিশালতর যে মুক্তি তাহা ভারতবর্ষের তপস্যার ধন।' 'গৃহকর্মের কল্যাণ-বন্ধন, নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী।' 'ভারতের অসামান্যতা অরণ্য হ'তে সভ্যতা সৃষ্টি—বিশ্বাসে বন্ধনহীন, আচারে শাস্ত্রানুগত।'

ভারতের স্বতন্ত্র আদর্শ

ভারতবর্ষের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে নিপুণ রেখাপাতে ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি সর্বত্র উন্মুখ।

'আত্মশক্তি'-প্রবন্ধরাজি জাতির অন্তরে অধ্যাত্ম বল ও প্রত্যয় সন্দীপিত করার প্রয়াস। তাহাতে কবি বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কি [সে] উদ্ভাবন করিতেছে, ইহার সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে'।

বাণিজ্য ও সমর-বাহিনীর নিরন্তর অভিযানই ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু 'ভারতবর্ষ সৈন্য ও পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই, সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে।'

'রাজ্যেশ্বরত্ব কোন কালেই আমাদের দেশে চরম সম্পদ্ রূপে ছিল না।' 'ব্রাহ্মণত্বের অধিকার অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্যার অধিকার আমাদের সমাজের প্রাণের আধার ছিল।' 'ব্রাহ্মণেরাই যথার্থ স্বাধীন--ইহাদের এই মুক্তি সমাজেরই মুক্তি। যথার্থ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজন আছে।'

'শান্তিনিকেতনে' আছে, 'ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। পশুপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত মানুষ এখনো প্রবৃত্তির নাড়ী দিয়ে প্রকৃতি থেকে রস শুষে জড়ভাবে পুষ্ট হয়।' কবি বলিয়াছেন, 'স্বার্থবদ্ধ দুর্বলতা মানবাত্মা হ'তে সত্য নয়।'

বিবর্ত নয়, সীমার মাঝে আত্মলাভ

বর্তমান জগৎ এই প্রশ্নেই আজ উচ্চকিত—মানব-প্রকৃতির বিবর্তে যে রূপ গত অযুত বর্ষের ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাই শেষ পর্যায় কি না। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবের ভিত্তিতে, অতীতের সাক্ষ্যে, ইতিহাসের দৃষ্টান্তে ভারতের পক্ষে ইহার উত্তর দিয়াছেন মানবমহত্ত্বের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, অনিশ্চিত ভাবী সম্ভাবনার মুখাপেক্ষা না করিয়া।

এ ক্ষেত্রে কল্পনা তাঁহার নির্ভর নহে—ইতিবৃত্ত তাঁহার সম্পদ্।

'পথের সঞ্চয়ে' কবির অভিমত এইভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 'আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব—এই আমাদের সাধনা। অসীম যিনি, তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর।' এই জন্যই 'আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি, তবে সেই অসীমের প্রকাশে বাধা দিব।' 'শরীরের মধ্যে শরীরকে অতিক্রম ক'রে আত্মার মহত্ত্ব'! বিবর্তের ভাবী পর্যায়ের সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'মানুষের অভিব্যক্তির গতি অন্তরের দিকে।' আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনের মতেও দেহের দিকে মানুষের উৎকর্ষ নয়, মনের দিকে উন্নতিই তাহার বিবর্তের আগামী পর্যায়।

আত্মস্ফীতি নয়, আত্মসমাহৃতি

'আমাদের দেশের যাঁহারা সাধুপুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়-ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।' এই অন্তর্জগতে ভারতের সাধনা যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী—'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন', 'ভারতবর্ষ' পরিপূর্ণ, উচ্ছল। 'এদেশে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য চরম [সন্ন্যাস] আশ্রমে, আত্মবোধের ক্ষেত্রে—সমাজ ও সংসারের প্রতি দায়িত্বের শেষে।' উহা আত্মস্ফীতির বা আত্মন্তরিতার জন্য নয়, আত্মলাভের ও আত্ম-সমাহৃতির জন্য। 'ভিতরে বাহিরে নানা বিচ্ছেদ, বিক্ষিপ্ততা মিটাতে অন্তঃসামঞ্জস্যের সাধনা।' আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ—শাস্ত্রে আছে; ইহার অর্থ—ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন আত্মাতে ভূমার উপলব্ধির জন্য।

'চিত্রা'র ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন, 'জীবনের দুই ভিন্ন মহলে ভিন্ন কথা—জগতে বিচিত্ররূপিণী, অন্তরে একাকিনী।'

'শান্তিনিকেতনে' রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে। সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন'। 'স্রষ্টার এই আত্মোৎসর্গই মানবের তপস্যার আদর্শ। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয়, তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য। আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ, তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।' 'সত্যের সঙ্গে অনন্তের বিরোধ ঘটিয়েছে আমাদের অহং।' 'য়ুরোপের ধারণা—জিগীষার অভাবই মৃত্যু। ইহা অত্যাকাঙ্ক্ষার বিকৃতি। সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'উৎকট স্বাতন্ত্র্য হ'তে বিপ্লব—অহংস্ফীতি।' 'রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই প্যোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতর যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, (উহা) তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এই জন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।'

বিচ্ছেদের মাঝে ঐক্য

'ভারতবর্ষ বিসদৃশকে সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—পৃথক্ অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, যদি

ধর্মই মানব-সভ্যতার চরম আদর্শ স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।' 'এই কথাটিকেই খুব জোর ক'রে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে : 'অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।' 'প্রভেদকে মুছিয়া ফেলিয়া এক করা নহে, প্রভেদকে রাখিয়া একতা—ইহাই আজিকার সমস্যা—শুধু এদেশের নহে, সারা বিশ্বের।' 'এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা নহে যে কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইবে—কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে।'

'ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। 'অন্যকে আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল—প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের চিরদিন একই চেষ্টা—প্রভেদের মধ্যে ঐক্য, নানা পথকে এক লক্ষ্যের অভিমুখীন করা, বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি—নিগূঢ় যোগকে অধিকার।' 'বৃহৎ সমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য থাকে না।' এই সত্যের মর্মান্তিক নিদর্শন—পৃথিবী আজ দুই শিবিরে বিভক্ত এবং দুয়েরই অটুট বিশ্বাস, বিশ্বকল্যাণ স্বমতের প্রসারে সম্ভব—অন্যমতে 'মহতী বিনষ্টিঃ'। বিশ্বরাষ্ট্রে যে অস্ত্রের আস্ফালন ও বিবেকবর্জিত প্রচার-কৌশল আজ সর্বব্যাপী, ইহা তাহারই পরিণাম। 'শান্তিনিকেতনে' 'বিশ্ববোধ'-শীর্ষক ভাষণে কবির উক্তি, 'আমিত্বের ক্রমিক প্রসার সাম্রাজ্যিকতা-বোধে পৌছয় য়ুরোপে। ভারতের বিশ্ববোধ—অনন্তকে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট করা। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাইরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি, সে পর্যন্ত যে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার'। 'বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধন ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্যদেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস ক'রে ততদূরে যেতে পারেন না।'

ভূমার সাধনা

'মন্ত্র' জিনিষটি একটি বাঁধবার উপায়। একটা কোনো বিশেষ সুরে বাজাতে হবে।' গায়ত্রী-মন্ত্রকে কবি 'ব্রহ্মবোধের সরল উদ্বোধন মন্ত্র'রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ব্যাহৃতি অংশ দ্বারা বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া বিশ্বলোকেশ্বরের যে সৃজনী শক্তি প্রত্যক্ষ—ইহা তাহার ধ্যান। তাঁহারই দান ধীশক্তির দ্বারা তাঁহার অনুভব।' অন্যত্র আছে—'গায়ত্রী জীবনের মন্ত্র—ভক্তের হৃদয়ানন্দ।'

নিষ্ঠাকে তিনি মরুপথে উটের মত বলিয়াছেন। ইহার কাজ নিত্য সতর্কতা। নিষ্ঠা সাধনার প্রতি অচল ভক্তি। 'অগণ্য ঘটনার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হ'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে দেখার ধ্যান-মন্ত্র গায়ত্রী। ওঁ অর্থ স্বীকার, পরিপূর্ণতার স্বীকার ওঁকার।'

ইতিহাসের ব্যতিক্রম

'সঞ্চয়' ও 'পরিচয়ে' রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের মূর্তি কি ও তাহার গতির ছন্দ কিরূপ ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন; তিনি বলেন :

'সজীব হৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো (উহা) একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে, একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে। একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে, একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বস্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজস্বকে ছাড়িতেছে, আবার সে

দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বকেই হারানো হয়, সর্বত্বকে পাওয়া যায় না।'

'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে বাহ্য সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য-গরিমান্বিত প্রাচীন ভারতের স্বরূপও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেনঃ 'পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায়, আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, এবং ব্রত-উপবাসে কৃশ হইয়া জগতে সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে ও নিয়াছে। সেই বৃহৎ, বিচিত্র জীবনের বেগে চঞ্চল সমাজ ভুলের ভিতব দিয়া সত্যে চলিয়াছিল, পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল।'

'হিন্দু সমাজের ধর্ম প্রাণের ধর্ম, বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, নিয়ত গ্রহণ-বর্জনের ধর্ম।'

শাশ্বত ধর্মনীতি

'ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে। যেটা সাময়িক, সেটা অন্য সময়ে শোভা পায় না। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।'

'প্রকৃতিতে কর্মের সীমা নাই, কিন্তু সেই কর্মটাকে অন্তরালে রাখিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে।'

'ইণ্ডিভিজুয়ালকে যে সমাজ পঙ্গু ও প্রতিহত করে, সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়।'

ব্যক্তি ও সমাজ

ভারতবর্ষের আর একটি ভাব তাহার একাকিত্ব। 'ভারতবর্ষীয় একাকী আত্ম-সমাহিত, সে নিজের চারিদিকে একটা চির-স্থায়ী নির্জনতা বহন করিয়া চলে। বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোনো কথা বলে না।'

'ধন-জন-মানের দ্বারা আমি সত্য নই। ধন-মান জমিয়ে যোগ নষ্ট করি। ভাবতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ঋষিরা, ধনী ভোগী নন। মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে।'

'আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা বেতনের'। 'ভৃতিনিবপেক্ষ স্বার্থত্যাগপর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-নিবত নিষ্ঠাবান্ গুরু'—ভারতের শিক্ষারীতির অঙ্গ ও গৌরব। 'এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে – একথা আমাদের কাছে চলিবে না'। 'দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড়ো বলি না। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশী, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি, যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে, সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তু-কুয়াসার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে।

ভারতবর্ষের সভ্যতার যে চিত্র রবীন্দ্র-লেখনীতে পূর্ণাবয়ব হইয়াছে, তাহা তাঁহার বহুবিস্তৃত রচনাবলীর নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত জীব

নের পূর্ণতা ও সার্থকতা। হিন্দু জাতির গতি-প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ-সংস্থানের নীতি ও ইতিহাসের ধারা—এ তিন দিকই আলোকিত, উদ্দীপিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতি ও সমাজবন্ধন

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।' 'আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে'। 'মানুষ যে সকল সম্বন্ধের মধ্যে জন্মলাভ করে, চিরজীবন তাহার মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিবে।'

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবি আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। পরস্পরের দাবিতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি।'

'আমরা ভাগ করিয়া ভোগ করি, কর্ম করি একাকী, স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল।'

'য়ুরোপীয় সভ্যতার এক দিকে স্বাতন্ত্র্যের দুরন্ত তৃষ্ণা, অন্য দিকে একান্ত বাধ্যতা-শক্তি। স্বাতন্ত্র্যের অর্থ—সমস্ত শৃঙ্খল মোচনপূর্বক বিশ্বের আর কাহারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া একাকী নিজের স্বেচ্ছামত চলিবার উদ্ধত বাসনা।'

'নেশনই যে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। তাহা অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠুরতা আছে।

'নেশন ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ য়ুরোপীয় সভ্যতার সংহতির সূত্র ও লক্ষ্য। যে ধর্মনীতি ব্যক্তি-বিশেষের নিকট বরণীয়, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়—একথা এক প্রকার সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে। এ হিসাবে য়ুরোপীয় সভ্যতাই আজ বিশ্বতন্ত্রের প্রতিবিম্ব।'

ভারত আবিষ্কার

'শেষ সপ্তকে' কবি প্রশ্ন করিয়াছেন: 'বহু বিচিত্র কারুকলায় চিত্রিত এই আমার সমগ্র সত্তা তার সমস্ত সঞ্চয়, সমস্ত পরিচয় নিয়ে কোনো যুগে কি কোনো দিব্য দৃষ্টির সম্মুখে পরিপূর্ণ অবারিত হবে?

—তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে গোচর-তাকে, বলেছে—যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা, বলেছে—যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস, এস প্রকাশ এস।' 'আমি আলোর প্রেমিক' এই তাঁহার নিজ-পরিচয়। সেই প্রেমের আলোকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ তাঁহার দৃষ্টিতে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে—তাহা নিপুণ মর্মোদ্ভেদে অতীতনিষ্ঠ সম্প্রদায়েও সুদুর্লভ। তাহা নিখিল ভারতের প্রাণের কথা, গৌরবের বস্তু। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতার যে বিবরণ তাঁহার বিরাট রচনাবলীর মধ্যে, তাহা কি সমগ্র ও সমঞ্জসভাবে উন্মোচিত হইতে পারে? হইলেও তাহা কি ইহার পরি-পূর্ণ পরিচয় হইবে? ভারতের আবিষ্কার একটি 'অসমাপিকা ক্রিয়া' মনে হয়। এখনও সন্ধানীর ও মনীষীর বীক্ষণ ও সমীক্ষায় ইহা অনিঃ-শেষিত বস্তু। 'বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচি-ত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষের এই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট নিয়োগটি যদি স্মরণ করি, আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা নিবারণ হইবে।'

ভারত-আত্মার যে মর্যাদা ও সম্ভ্রম বুদ্ধি সর্বত্র তাঁহার লেখনীমুখে প্রস্ফুট, বর্তমান যুগের শ্রদ্ধা-সঙ্কটে এবং স্বার্থসজ্ঘাতে তাহা এই মহাদেশের ও ইহার জাতিসজ্ঘের অবিস্মরণীয়

রক্ষাকবচ হইবে কি? 'দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য' ভারতের মূলমন্ত্র, তাহা উচ্ছ্বসিত শ্রদ্ধার বস্তু হইয়াছে তাঁহার অবদান-কল্পলতায়।

শাশ্বত ভারত কি কল্পনা?

সম্প্রতি ফরাসী মনীষী M. Pierre Amado (—Director, French Cultural Centre of Calcutta), ভারত সম্পর্কে প্রতীচীর ধারণা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন: এখনও পাশ্চাত্ত্য জগতে বহুজন ভারতের সেই কল্পলোকের দিকে সাগ্রহে তাকায়, যেখানে মূঢ়তা এবং এমন কি যুক্তি-বিচার অপেক্ষাও প্রজ্ঞা অধিক সম্মানিত এবং জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গণ্য। যে ভারত—মাতার মত নিরন্তর বিগ্রহরত প্রতীচী হইতে নিষ্কৃতি ও শান্তি দেন এবং যে সত্যে শান্তি লাভ হয়, সেই একতার সত্যকে ধরিয়া আছেন। Metaphysics বা তত্ত্বজ্ঞানের নিকট—জগৎ ও মানবের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যাই প্রশ্ন। সে প্রশ্নের সমাধানে গুরুপদে ভারতকে না দেখিলে ইস্পাত, কয়লা, আণবিক কারখানা এবং কৃত্রিম উপগ্রহের প্রাচুর্যে অতিতৃপ্ত ও ক্লান্ত প্রতীচী আশাহত বোধ করে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—'ভারতের জরা-বিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃত-লোকে যাহার অনন্ত অধিকার। আঘাতের পর আঘাত, বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি'—আপনাকে জানো।

ভাবাদর্শে ভারতের ঐক্য

স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে, শক্তির সংগ্রামে গত ত্রয়োদশ বৎসরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে ও সম্প্রতি ঘটিতেছে, তাহাতে শাশ্বত ভারতের দিব্য রূপের, মানস বিগ্রহের পরিচয় academic বা বিদ্বৎসভোচিত আলোচনা, বা চিত্তবিনোদনের একটা প্রসঙ্গমাত্র নহে। কর্ম-জগতের, লোকচরিত্রের, সমাজব্যবহারের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজেই ধরা পড়ে। অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়ের একান্ত প্রয়োজন—ইহা দেশের নেতৃগণের লেখায় ও ভাষণে প্রায়ই স্বীকৃত ও উদ্‌ঘোষিত হইয়া থাকে। নিজ নিজ প্রয়োজনমত ইঁহাদের কল্পনায় ভারতাত্মার প্রতিকৃতিও আবিষ্কৃত বা রচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিরাট ও যুগযুগ-পরিব্যাপ্ত সংস্কৃতির মর্মগ্রহ ব্যাস-বাল্মীকি-বুদ্ধ-কুমারিল-শঙ্কর-মাধবা-চার্যের মত মনীষার অধিকারী, ভারত-প্রতিভার যোগ্য সন্তানেই সম্ভব। আকাশের প্রতিবিম্ব স্থির সাগর-সলিলেই পাওয়া সম্ভব—পুষ্করিণী বা পল্বলে নহে; 'প্রভবতি শুচিবিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাংচয়ঃ'। ইহার দ্বিতীয় প্রয়োজন—দেশের অন্তর-পরীক্ষা, অন্তঃশুদ্ধি ও আত্মলাভের জন্য। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'একদিকে প্রত্যক্ষ য়ুরোপ, আর একদিকে শাস্ত্রের কথা, পুঁথির প্রমাণ। একদিকে প্রবল শক্তি আর একদিকে আমাদের দোদুল্যমান বিশ্বাস মাত্র—এ অবস্থায় অসহায় ভক্তিকে ভারতবর্ষের অভিমুখে স্থির করিয়া রাখাই কঠিন। সকলের মূলে শ্রদ্ধা ও অন্তর্দৃষ্টি—'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। আজ নানা প্রয়োজনে দেশের সেবক বহু হইলেও শ্রদ্ধা, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন বিরল। যাঁহারা মনুষ্যজাতিকে মনে করেন এক ও নির্বিশেষ, যাঁহারা বিদেশের সভ্যতা ও মতবাদ হইতে সকল প্রেরণা পান

ও চীন—তাঁহারা ভারত-সভ্যতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবেন—ইহা প্রত্যাশার বিকৃতি, এককালে মহর্ষি মনুর পক্ষে বলা সম্ভব হইয়াছিল—'এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ'। ইহা হয়তো আত্মগরিমার প্রকাশ। কিন্তু ভারতীয় মানবতার একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যতদিন হইতে বৈদেশিক পর্যটকের বিবরণ পাওয়া যায়, সেই দীর্ঘ সময়ে লক্ষ্যের বস্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'আমাদের সমাজতন্ত্র সমস্ত দেশকে নিয়মিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছে—লোক-ব্যবহার শিথিল হয় নাই, আদান-প্রদানে সততা রক্ষিত হইত, ঋণী উত্তমর্ণকে ফাঁকি দিত না এবং সাধারণ ধর্মের বিধানগুলিকে সকলে সরল বিশ্বাসে সম্মান করিত।'

সঙ্কটে আত্মবোধ

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ভারতের আত্মা ও সংহতি বলিয়া কিছু ছিল বলিয়া কেহ কেহ এমন কি কোন কোন ইতিহাস-পারদর্শীও স্বীকার করেন না। ইঁহাদের মতে ভারতীয়তা ইংরেজী শিক্ষা ও ব্রিটিশ সম্পর্কের পর জন্মলাভ করিয়াছে। মহাভারত ও দ্বীপময় ভারত' বা বৃহত্তর ভারত এককালে না থাকিলে—পাশ্চাত্য শিক্ষার সৃষ্টি বলিয়া যাহা ধরা হয়- -সেই অখণ্ড বা অধুনা-খণ্ডিত ভারত কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ বীজে, কোন্ ধাত্রীবক্ষে উদ্ভূত বা পুষ্ট হইত, তাহা চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। 'শান্তিনিকেতনে' 'বর্তমান যুগ'-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন, 'সবাই আজ জাগ্রত। Politics বাইরের জিনিস, আত্মাকে প্রকৃত জাগ্রত করে ধর্ম। ধর্মের নাড়ী—বিংশ শতাব্দীর বার্তা, তাপসের সাধনার অনুকূল'।

সে যাহা হউক, ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—যে চরিত্রে বিশ্বকবির ভাষায় কোন বড় কথাই কথা মাত্র হয় নাই, এবং সত্য সংযম মৈত্রী অহিংসা করুণা—সর্বজনের পালনীয় ছিল, এবং সভ্যতার উচ্চতম ধারণা ছিল ধর্ম—সামাজিক ও বিশ্বজাগতিক; সেই চরিত্র আজ ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রে যদি বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হয়, এবং এ দেশের নিজস্ব অধিবাসিগণের পরস্পরের প্রতি আচরণে দলিত ও উৎখাত হয়—তাহা হইলে অন্য কোন সভ্যতার আদর্শ ও অনুশাসন যে এদেশে গৃহশান্তি ও লোককল্যাণ রক্ষা করিতে পারিবে না—ইহা অসঙ্কোচে বলা যায়। 'রবীন্দ্রনাথে চিরন্তন ভারত' তাই শুধু সংস্কৃতির দিঙ্‌নির্দেশ নয়, যুগযুগ-আলোচিত ধর্মের প্রসঙ্গ মাত্র নহে, আধুনিক ভারতের বিভ্রান্ত জনতার পক্ষে 'পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ'।

বৈরাগ্যশতকম্

মনুবাদ : স্বামী ধীরেশানন্দ

শিবার্চনম্

তপশ্চর্যার অত্যাবশ্যকতা পূর্বে কথিত হইয়াছে; 'শিবার্চন'ই প্রকৃষ্ট তপস্যা। 'শিবার্চন' দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তর; তন্মধ্যে 'বাহ্য শিবার্চন' বহু উপকরণসাধ্য ও গৌণ, অতএব তাহা উপেক্ষা করত কবি আন্তর পূজন-রূপ 'মুখ্য শিবার্চন' বর্ণন করিতেছেন। মনোনিয়মনে সমর্থ সাধকই এই পূজার অধিকারী, এরূপ পুরুষ সংসারে একান্ত দুর্লভ, তাই পাঠককে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন :

আসংসারাৎ ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাত তাদৃঙ্
নৈবাস্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রমার্গং গতো বা।
যোঽয়ং ধত্তে বিষয়করিণী-গাঢ়গূঢ়াভিমান-
ক্ষীবস্যান্তঃকরণকরিণঃ সংযমানায়লীলাম্ ॥৮১॥

হে প্রিয়! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ত্রিভুবন অন্বেষণ করিয়াও এমন একজন পুরুষও আমাদের চোখে পড়ে নাই বা তাঁহার কথা আমরা শুনি নাই, যিনি বিষয়-লিপ্সারূপ হস্তিনীর মোহময় আকর্ষণে উন্মত্ত চিত্ত-হস্তীকে সংযমরূপ রজ্জু-নির্মিত জালে অতি সহজে ধরিতে পারিয়াছেন,—অর্থাৎ বিষয়াভিমুখী মনকে সহজে সংযত করা যায় না।৮১

যদেতৎস্বচ্ছন্দং বিহরণমকার্পণ্যমশনং
সহার্যৈঃ সংবাসঃ শ্রুতমুপশমৈকব্রতফলম্।
মনো মন্দস্পন্দং বহিরপি চিরস্যাপি বিমৃশন্
ন জানে কস্যৈষা পরিণতিরুদারস্য তপসঃ ॥৮২॥

যথেচ্ছ বিহরণ, দীনতা রহিত ভিক্ষাশন, সজ্জন সঙ্গ, বেদান্ত-শ্রবণে শান্ত চিত্ত এবং বাহ্য বিষয় হইতে উপরত অন্তর্মুখ মন—কোন্ মহৎ তপশ্চরণের ফলে মানুষ এই পরিণতি লাভ করে, সুদীর্ঘকাল বিচার করিয়াও আমি তাহা জানিতে পারি নাই।—শিবার্চনরূপ মহাতপস্যার ফলে সাধক এই শান্ত স্বচ্ছন্দ অবস্থায় উপনীত হন, ইহাই কবির ইঙ্গিত।৮২

জীর্ণা এব মনোরথাশ্চ হৃদয়ে যাতং তদ্‌যৌবনং
হন্তাঙ্গেষু গুণাশ্চ বন্ধ্যফলতাং যাতা গুণজ্ঞৈর্বিনা।
কিং যুক্তং সহসাভ্যুপৈতি বলবান্ কালঃ কৃতান্তোঽক্ষমী
হা জ্ঞাতং মদনান্তকাঙ্ঘ্রিযুগলং মুক্ত্বাস্তি নান্যা গতিঃ ॥৮৩॥

অতএব বাহ্যবিষয় সম্বন্ধীয় মনোরথাদি পরিত্যাগপূর্বক মুক্তির সাধন শ্রীসদাশিবের চরণকমল ধ্যান করাই সর্বদা কর্তব্য—তাই কবি বলিতেছেন :

অনন্ত বিষয়-বাসনা আমার হৃদয়েই অঙ্কুরিত হইয়া বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে, আমার ভোগবাসনা চরিতার্থ হয় নাই। বিষয়-ভোগক্ষম অঙ্গসমূহ হইতে যৌবন তিরোহিত হইয়াছে, গুণগ্রাহকের অভাবে সদ্‌গুণসমূহ নিষ্ফল হইয়াছে, দুর্জয় সর্ববিনাশক ও ক্ষমাহীন কাল প্রাণহরণার্থ ত্বরিতপদে অগ্রসর, অহো কি কষ্ট! এখন কি করা কর্তব্য? জানিয়াছি, মদনান্তক শিবের চরণযুগলে আশ্রয় বিনা এখন আর অন্য কোন গতি নাই।৮৩

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥৮৪॥

জগতের অধিপতি মহেশ্বর অর্থাৎ শিব ও জগদন্তর্যামী জনার্দন অর্থাৎ বিষ্ণু—এই উভয়ে বস্তুগত কোন ভেদবুদ্ধি আমার নাই, তথাপি আমার ভালবাসা ও ভক্তি তাঁহারই প্রতি, যাঁহার ললাটে তরুণ শশিকলা শোভা পাইতেছে। [ভগবান্ বিষ্ণুই মুমুক্ষুর একমাত্র আশ্রয়, ইহা প্রসিদ্ধ; বিষ্ণুপাদোদক গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব মহাদেব হইয়াছেন, তবে মুক্তির জন্য শিবার্চনার কথা বলা হইল কেন? এই শংকার উত্তরে কবির বক্তব্য: সাধকগণের রুচিবৈচিত্র্যবশতঃ দেবতাবিশেষে ভক্তি হইলেও তত্ত্বতঃ উপাস্য দেবতাগণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তথাপি সাধনাবস্থায় ইষ্টনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।]৮৪

স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে ক্বাপি পুলিনে
সুখাসীনাঃ শান্তধ্বনিষু রজনীষু দ্যু-সরিতঃ।
ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ শিব শিব শিবেত্যুচ্চবচসঃ
কদা যাস্যামোঽন্তর্গতবহুলবাষ্পাকুলদশাম্ ॥৮৫॥

এখন পাঁচটি শ্লোকে শান্তরসের বাক্যসমূহ কথিত হইতেছে: চিত্ত-বিক্ষেপকর সকল কোলাহল শান্ত হইয়া গিয়াছে, স্তব্ধ নিশীথে, জ্যোৎস্নাধবলিত বিস্তৃত ভাগীরথী-তটে সুখাসনে উপবেশনপূর্বক জন্মমরণরূপ সংসার-দুঃখে উদ্বিগ্ন হইয়া—কবে 'হে শিব! হে শিব! হে শিব!' আর্তভাবে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ আবৃত্তি করিতে থাকিব? অন্তর্নিরুদ্ধ অশ্রুজনিত এই ব্যাকুল অবস্থা কবে প্রাপ্ত হইব?৮৫

বিতীর্ণে সর্বস্বে তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়াঃ
স্মরন্তঃ সংসারে বিগুণপরিণামাং বিধিগতিম্।
বয়ং পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণা-
স্ত্রিযামা নেষ্যামো হরচরণচিন্তৈকশরণাঃ ॥৮৬॥

অতিশয় দুঃখপ্রদ সংসার পরিত্যাগ করত অরণ্যে নিবাসপূর্বক কিভাবে কালাতিপাত করা কর্তব্য, সেই কথাই কবি বলিতেছেন: হায়! অর্থীদিগকে সর্বস্ব দান করত, কোমল করুণাপূর্ণহৃদয়ে সংসারের বিষম পরিণাম নিয়তির কথা স্মরণ করিতে করিতে পবিত্র তপোবন-প্রদেশে চতুর্দিকে শোভার পরাকাষ্ঠা বিমল শরচ্চন্দ্র-কিরণপ্লাবিত রাত্রিগুলি একমাত্র শম্ভুর চরণচিন্তা করিয়া কবে আমরা অতিবাহিত করিব? ৮৬

কদা বারাণস্যামমরতটিনীরোধসি বসন্
বসানঃ কৌপীনং শিরসি নিদধানোঽঞ্জলিপুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥৮৭॥

অহো! পুণ্য বারাণসীধামে ভাগীরথীতটে নিবাস করত কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া শিরোপরি অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় স্থাপনপূর্বক কবে আমি 'হে পার্বতীপতে! হে ত্রিপুরান্তক! হে শম্ভো! হে ত্র্যম্বক! প্রসন্ন হও' এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে নিমেষের মতো দিনগুলি অতিবাহিত করিব! ৮৭

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃ পয়োভিঃ শুচিকুসুমফলৈরর্চয়িত্বা বিভো ত্বাং
ধ্যেয়ে ধ্যানং নিবেশ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবপর্যঙ্কমূলে।
আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে
দুঃখং মোক্ষ্যে কদাহং সমকরচরণে পুংসি সেবাসমুত্থম্॥৮৮॥

হে শম্ভো! হে কামান্তক! নির্মল গঙ্গাজলে স্নান করিয়া শুদ্ধ পুষ্প-ফলাদি সহায়ে তোমার অর্চনা করত গিরিগুহাস্থিত পাষাণ-শয্যামূলে উপবেশনপূর্বক একমাত্র ধ্যানযোগ্য তোমার চরণযুগলে সমাহিতচিত্ত হইয়া আচার্যোপদিষ্ট কর্মানুষ্ঠান-তৎপর এবং শরীর-ধারণার্থ কেবল ফলাশন-মাত্রপ্রার্থী আত্মতৃপ্ত আমি তোমার অনুগ্রহে কবে মকর-চিহ্নিত পাদযুক্ত অসামান্য ধনী পুরুষের পরিচর্যা-সমুৎপন্ন দুঃখ হইতে মুক্ত হইব? ৮৮

একাকী নিঃস্পৃহঃ শান্তঃ পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো ভবিষ্যামি কর্মনির্মূলনক্ষমঃ॥৮৯॥

সংসার-হেতুভূত নানাবিধ কর্ম আচরণ করত তাহাতে খেদযুক্ত বৈরাগ্যবান্ পুরুষের ভাষায় কবি প্রার্থনা করিতেছেন:

নিঃসঙ্গ বিষয়াভিলাষশূন্য শমাদিসম্পন্ন ও দিগম্বর হইয়া এবং হস্তকেই একমাত্র ভিক্ষাপাত্র-রূপে ধারণ করত হে শম্ভো! কবে আমি প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে সঞ্চিত ও আগামী সকল কর্ম সমূলে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইব? ৮৯

পাণিং পাত্রয়তাং নিসর্গশুচিনা ভৈক্ষেণ সন্তুষ্যতাম্
যত্র ক্বাপি নিষীদতাং বহুতৃণং বিশ্বং মুহুঃ পশ্যতাম্।
অত্যাগেঽপি তনোরখণ্ডপরমানন্দাববোধস্পৃশাম্
অধ্বা কোঽপি শিবপ্রসাদসুলভঃ সম্পৎস্যতে যোগিনাম্॥৯০॥

পূর্বশ্লোকোক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের পরমেশ্বর-কৃপায় অবিলম্বেই মোক্ষমার্গ সুলভ হইয়া থাকে, এই কথা বলিয়া শিবার্চন-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন:

করতলই যাঁহাদের একমাত্র ভোজনপাত্র, স্বভাবশুদ্ধ ভিক্ষান্নলাভেই যাঁহারা সন্তুষ্ট, যাঁহারা শ্মশানে বনে বা যত্র তত্র বাস করিয়া থাকেন, বিশ্বপ্রপঞ্চকে যাঁহারা তৃণতুল্য তুচ্ছ বিবেচনা করেন এবং দেহত্যাগের পূর্বেই যাঁহারা অখণ্ড পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন—এইরূপ যোগিগণই মহাদেবের কৃপায় সুলভ সেই অনির্বাচ্য মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। ৯০

অবধূত-চর্যা

নিরন্তর ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ যোগী পুরুষ অবধূতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সদা ব্রহ্মা-ত্মৈক্যানুসন্ধান-তৎপর এবং বিস্মৃত-বহিঃপ্রপঞ্চ জীবন্মুক্ত পুরুষকেই 'অবধূত' বলা হয়। তাহার চর্যা অর্থাৎ আচার এখন দশটি শ্লোকে কথিত হইতেছে :

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী
নৈশ্চিন্ত্যং নিরপেক্ষভৈক্ষমশনং নিদ্রা শ্মশানে বনে।
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশং বিহরণং স্বান্তং সদা
স্থৈর্যং যোগমহোৎসবেঽপি চ যদি ত্রৈলোক্যরাজ্যেন কিম্ ॥৯১॥

শতছিন্ন কৌপীন ও তদ্রূপ জীর্ণ কন্থাতেই যদি সন্তোষ থাকে, চিত্ত যদি বিষয়-চিন্তাবিমুখ হয়, নিরপেক্ষ স্বচ্ছন্দপ্রাপ্ত ভিক্ষান্ন-ভোজনেই যদি তৃপ্তিলাভ হয়, নিদ্রার জন্য পর্যঙ্ক-শয্যাদি-বিহীন প্রেতভূমি শ্মশান ও অরণ্যই যদি পর্যাপ্ত হয়, সদা শান্তচিত্তে স্বচ্ছন্দ নিরঙ্কুশ বিচরণেই যদি রুচি থাকে এবং সমাধি-সুখে যদি চিত্ত মগ্ন থাকে, তাহা হইলে ত্রৈলোক্য-রাজ্যভোগও তুচ্ছ। ৯১

ব্রহ্মাণ্ডং মণ্ডলীমাত্রং কিং লোভায় মনস্বিনঃ।
শফরীস্ফুরিতেনাব্ধিঃ ক্ষুব্ধো ন খলু জায়তে ॥৯২॥

বিচারবান্ পুরুষ কখনও লোভপরবশ হন না, প্রতিবিম্বতুল্য তুচ্ছ এই ব্রহ্মাণ্ড-প্রপঞ্চ কি কখনও ধীর বিবেকী পুরুষের চিত্তে লোভ উৎপাদন করিতে পারে? অতি ক্ষুদ্র শফরী মৎস্যের সঞ্চালনে অপার অগাধ বারিধি কখনও ক্ষুব্ধ হয় না; সমুদ্রবৎ গম্ভীরাত্মা জ্ঞানীর চিত্ত কোন কামনা দ্বারা বিচলিত হয় না। ৯২

মাতর্লক্ষ্মি ভজস্ব কঞ্চিদপরং মৎকাঙ্ক্ষিণী মাস্ম ভূ-
র্ভোগেষু স্পৃহয়ালবস্তব বশে কা নিঃস্পৃহাণামসি।
সদ্যঃ স্যূতপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতৈ
র্ভিক্ষাবস্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে ॥৯৩॥

হে মাতঃ লক্ষ্মি! এখন তুমি অন্য কোন পুরুষের পরিচর্যা কর, আমায় আর আকাঙ্ক্ষা করিও না। বিষয়-ভোগব্যাকুল পুরুষেরাই তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, নিঃস্পৃহ ব্যক্তিগণের নিকট তুমি অতি তুচ্ছ। নিঃস্পৃহ আমাদিগকে তুমি পরিত্যাগ কর, কারণ এখন আমরা পবিত্র পলাশপত্র সহায়ে সদ্যগ্রথিত ভিক্ষাপাত্রে নিক্ষিপ্ত পবিত্র ভিক্ষালব্ধ বস্তু দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করিতে অভিলাষী। অন্য ঐশ্বর্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ৯৩

মহাশয্যা পৃথ্বী বিপুলমুপধানং ভুজলতা
বিতানং চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ।
শরচ্চন্দ্রো দীপো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ
সুখী শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব ॥৯৪॥

বৈরাগ্যবান্ পুরুষের সার্বভৌম নৃপতিতুল্যত্ব বর্ণিত হইতেছে : পৃথ্বীতলই যাহার বিস্তীর্ণ শয্যা, বাহুযুগলই শিরোধান, আকাশই চন্দ্রাতপ, অনুকূল বায়ুই ব্যজন (পাখা), শারদীয় চন্দ্রমাই গৃহ-দীপ, বিরতি-রূপা ভার্যার সহিত যিনি আনন্দমগ্ন, সেই শান্তচিত্ত যোগীশ্বর পুরুষ—অতুল ঐশ্বর্যবান্ নৃপতির ন্যায় সুখে শয়ন করেন।৯৪

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা
হানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃ কশ্চিৎ তপস্বী স্থিতঃ।
রথ্যাকীর্ণবিশীর্ণজীর্ণবসনঃ সংপ্রাপ্তকন্থাসনো
নির্মানো নিরহংকৃতিঃ শমসুখাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ ॥৯৫॥

ভিক্ষালব্ধ অন্নে শরীর-ধারণকারী, জনসঙ্গে আসক্তিরহিত, স্বচ্ছন্দ-বিচরণকারী, ত্যাজ্যগ্রাহ্য-বুদ্ধি-রহিত পথিপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন পুরাতন-বস্ত্রপরিহিত, দৈবপ্রাপ্ত কন্থার উপর উপবিষ্ট, নিরভিমান, দেহাধ্যাস-রহিত, বৈরাগ্যজনিত নিরতিশয় আনন্দাভিলাষী ব্যক্তিই যথার্থ যোগী ও তপস্বী।৯৫

চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽথ কিং তাপসঃ
কিং বা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈরাভাষ্যমাণা জনৈ-
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥৯৬॥

যোগীশ্বর মান অপমান সর্বাবস্থাতেই নির্বিকার থাকেন ও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভাবে ও বলে : এ ব্যক্তি কে? ইনি অস্পৃশ্য চণ্ডাল অথবা দ্বিজ? শূদ্র অথবা তপস্বী? হয়তো ইনি বিচারনিষ্ঠ মহাযোগী!—এই প্রকার বহু বিকল্পকারী বাচাল জনতা কর্তৃক পথমধ্যে সম্ভাষিত হইয়াও যোগিজন ক্রুদ্ধ বা সন্তুষ্ট হন না, স্বচ্ছন্দে আপন পথে চলিয়া যান।৯৬

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং ধাত্রা মরুৎকল্পিতং
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজস্তুষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং
তামন্বেষয়তাং প্রযান্তি সততং সর্বে সমাপ্তিং গুণাঃ ॥৯৭॥

অহিংসাবৃত্তিরই শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শিত হইতেছে : হিংস্র সর্পকুলের জন্যও বিধাতা হিংসা-রহিত অযত্নলভ্য বায়ুকে আহাররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; পশুগণও তৃণ ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ভূমিতে শয়ন করে, ইতর প্রাণীরা কেহই অযথা হিংসা করে না। সংসার-সাগর পার হইতে সমর্থ উৎকৃষ্টবুদ্ধি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণের জন্যও নিশ্চয় তিনি হিংসাশূন্য জীবিকার উপায় করিয়াছেন; যাহারা

ইহার অনুগমন করে, তাহাদের পক্ষে জন্মমরণাদি বন্ধনের কারণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণের কার্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৯৭

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্য
ব্রহ্মধ্যানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিং তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে নির্বিশঙ্কাঃ
কণ্ডূয়ন্তে জরঠহরিণাঃ স্বাঙ্গমঙ্গে মদীয়ে ॥৯৮॥

ব্রহ্মচিন্তনই মুমুক্ষুর একমাত্র করণীয় ইহাই বলিতেছেন : অহো! এমন সুদিন কি আমার জীবনে আসিবে, যেদিন গঙ্গাতীরে হিমালয়-শিলার উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন আমার পাষাণবৎ স্থির অঙ্গে বৃদ্ধ মৃগকুল নির্ভয়ে তাহাদের অঙ্গ কণ্ডূয়ন করত ঘর্ষণ-সুখ অনুভব করিবে?—অর্থাৎ মৃগকৃত কণ্ডূয়নও আমি জানিতে পারিব না, এমন দৃঢ় গভীর সমাধি আমার কবে হইবে? ৯৮

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষমক্ষয্যমন্নং
বিস্তীর্ণং বস্ত্রমাশাদশকমচপলং তল্পমস্বল্পমুর্বী।
যেষাং নিঃসঙ্গতাঙ্গীকরণপরিণতস্বান্তসন্তোষিণস্তে
ধন্যাঃ সংন্যস্তদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কর্ম নির্মূলয়ন্তি ॥৯৯॥

আত্মচিন্তন-পরায়ণ সর্বসঙ্গ-পরিত্যাগী যোগীশ্বরগণই সর্বকর্মবন্ধনরহিত হইয়া মুক্তিভাক্ হন, ইহাই কথিত হইতেছে : যাঁহাদের হস্তই একমাত্র শুদ্ধ ভোজনপাত্র, যদৃচ্ছা ভ্রমণবশে প্রাপ্ত ভিক্ষাই যাঁহাদের অক্ষয় অন্ন, বিস্তীর্ণ দশদিক্‌সমূহই যাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র, ভূতল যাঁহাদের নিশ্চল বিস্তৃত শয্যা, নিঃসঙ্গতাভ্যাস-পরিপক্বতাবশতঃ সন্তুষ্টমনা, দৈন্যরহিত ও সাংসারিক যাবতীয় সম্পর্কপরিত্যাগী সেই পুরুষগণই ধন্য, কারণ তাঁহারাই পরমাত্মজ্ঞানসহায়ে জন্মপরম্পরাপ্রদ যাবতীয় কর্ম সমূলে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৯৯

মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামন্ত্যঃ প্রণামাঞ্জলিঃ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতস্ফারস্ফুরন্নির্মল-
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরব্রহ্মণি ॥১০০॥

সংসার-বন্ধনমুক্ত জ্ঞানী পুরুষ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-কৃত উপকার স্মরণ করত তাহাদিগকে মাতা পিতা বন্ধু প্রভৃতি সম্বোধনে আহ্বান করিয়া শেষ প্রণাম করিতেছেন :

হে মাতঃ বসুন্ধরে! হে পিতঃ বায়ু! সখে অগ্নি! বন্ধু জল! হে ভ্রাতঃ আকাশ! করপুটে তোমাদিগকে আমার এই শেষ প্রণাম। তোমাদের সঙ্গবশতঃ যোগাভ্যাস-জনিত পুণ্যলব্ধ মহান্ নির্মল জ্ঞান সম্পাদন দ্বারা গহন মোহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি এখন পরব্রহ্মে লীন হইতেছি। ব্রহ্মে লীন হইলে তখন ভেদাভাব-বশতঃ কোন প্রণাম সম্ভব নয়, অতএব তাহার পূর্বেই আমার এই শেষ প্রণাম। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্ব-রচিত দেহকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক জানিয়া তৎকৃত উপকার স্মরণ করত তাহাদিগকে এই শেষ প্রণাম করিতেছি, কারণ আর তাহাদের সহিত মিলিত হইব না।

ইতি, 'বৈরাগ্যশতকম্' সম্পূর্ণম্।

ইংলণ্ডে এক বৎসর

[পূর্বানুবৃত্তি]

ডক্টর শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ ইংলণ্ডের দু-চার জায়গায় যা গেছি তার কথা কিছু লিখে এইবার আমার আখ্যায়িকা শেষ করি। সে জন্য একবার জুন মাসে ফিরে যেতে হবে, কেন না সেই সময়েই কয়েকদিনের কার্যসূচী নিয়ে লণ্ডনের কাছাকাছি কয়েকটি গবেষণা-কেন্দ্র পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

বহু জায়গায় যাওয়ার সুবিধা হবে ব'লে এবার মধ্য-লণ্ডনের পশ্চিম-ধারে হাইড্ (Hyde) পার্কের কাছে একটা হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন বৃটিশ কাউন্সিল। সেই সময়ে রাত্রি ১০টায় সন্ধ্যা হ'ত, কাজেই পার্কের মুক্ত বায়ু সেবনের সুযোগ হয়েছিল। পার্কটি আয়তনে প্রায় হাজার বিঘা, মধ্যে সারপেণ্টাইন্ (Serpentine) নামে একটি লম্বা বিল। বড়দিনের সময় যেখানে পত্রহীন ডাল বারকরা গাছ ও কুয়াসায় ঢাকা পথ দেখে গিয়েছিলাম, সেখানে এবার দেখলাম পত্রপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষরাজি, আর জলাশয়টিতে নানা রঙের রাজহংস ভেসে বেড়াচ্ছে। এককালে এটা রাজার হরিণ শিকারের বন ছিল, পরে হয় রেস্ কোর্স। উনবিংশ শতাব্দীতে যে কোন বিষয়ে বক্তৃতার অবারিত ক্ষেত্ররূপে হাইড পার্ক বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু টেলিভিসনের আবির্ভাবে বাগ্মিতার সে যুগ আর নেই, তবুও কলকাতার মনুমেণ্টের মতো মার্‌বল আর্চ (Marble Arch)-এর কাছে বক্তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান (Orators' Corner) আছে—সেখানেই শ্রোতাদের ভিড় হয়। এত বড় বাগান, কিন্তু সুরক্ষিত। কখন জনাকীর্ণ, কখন প্রায় লোকশূন্য অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু অস্বাভাবিক কোন দৃশ্য নজরে পড়েনি। ইংলণ্ডের সব পার্কের মতো হাইড্ পার্কের গেটও রাত্রে বন্ধ থাকে। পাশেই কেনসিংটন (Kensington) রাজপ্রাসাদ ও বাগান। এই বাগানের দক্ষিণে নিখুঁত কারুকার্য-খচিত এলবার্ট স্মৃতিমন্দির (Albert Memorial)—এক স্তরে বিভিন্ন সদ্‌গুণের প্রতিমূর্তি, অন্য স্তরে কৃষি বাণিজ্য শিল্প ও স্থাপত্য এবং তৃতীয় স্তরে ভিক্টোরিয়ার আমলের চার মহাদেশে বৃটিশ রাজত্বের চিহ্নসূচক প্রতিকৃতি। ৭০।৮০ বৎসরেও নিখুঁত আছে। নিকটেই আট হাজার শ্রোতার উপযুক্ত গোলাকার এলবার্ট হল (Albert Hall), কনসার্টের অতি উপযুক্ত স্থান।

আরও দক্ষিণে ইম্পিরিয়াল কলেজ (Imperial College), বিজ্ঞানের সব বিভাগের গবেষণা এখানে হয়। আমার কাজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলি দেখা হ'লে বিখ্যাত বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে (Science Library) গেলাম। সেখানে দু-একটি বিজ্ঞান-পত্রিকা দেখার প্রয়োজন ছিল। এই লাইব্রেরী সাধারণেও ব্যবহার করতে পারে—বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন ছাত্র তো পারেই, আবার অন্য লাইব্রেরী মারফৎ বই ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

কাছেই মরা-চিড়িয়াখানা (Natural History Museum) ও বিজ্ঞান মিউজিয়াম (Science Museum)। একটিতে কোটী বৎসরের প্রকৃতির কীর্তি, অপরটিতে কয়েক শত বৎসরের মানুষের কীর্তি—ইতিহাস বেশ

বুঝিয়ে দেওয়া আছে। ছেলেদের বুঝাবার সুবিধার কথা এরা কোন সময়েই ভোলে না। কমনওয়েল্থ মিউজিয়ামে সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদের কথা পরিষ্কার ভাবে দেখানো আছে। তবে যে সময়ে দেখেছিলাম সে সময় পাকিস্তানের দিকটা যেমন নতুন ক'রে সাজানো ছিল, ভারতের দিকটা তেমন ছিল না। এগুলি অবশ্য বড়দিনের সময় একবার দেখেছিলাম।

দ্বিতীয় দিন সকালেই ৩০।৪০ মাইল পশ্চিমে প্রসিদ্ধ রেয়ন্ প্রস্তুত-কারক কোর্টওল্ডসের (Courtaulds) গবেষণা-কেন্দ্র টেম্‌সের ধারে মেডেনহেড (Maidenhead) গেলাম ট্রেনে। এখানেও একটি বাগানবাড়ী নিয়েই এরা কাজ আরম্ভ করেছে। কৃত্রিম সিল্কের পেছনে এরা যে কত গবেষণা চালিয়েছে, না দেখলে তা ধারণা করা যায় না। চাহিদা অনুযায়ী নতুন গুণাগুণবিশিষ্ট আঁশ তৈরী করবার চেষ্টা চলেছে। প্রায় সারাদিনই সেখানে কাটল। শেষে লণ্ডন ফেরার পথে আমার প্রদর্শকটির কাছে জানলাম, প্রসিদ্ধ উইণ্ডসর দুর্গ (Windsor Castle) এখান থেকে ১০মাইল। আমাকে তিনি তাঁর গাড়ীতে সেখানে পৌছে দিয়ে গেলেন। তখনও ফটক খোলা ছিল। টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম। বর্তমান রানী মাঝে মাঝে এখানে থাকেন। তাঁদের ঘরও দেখলাম। বিভিন্ন দেশের উপঢৌকন, স্বর্ণ, মণি-মাণিক্য, আর্ট, কারপেট, বাদ্যযন্ত্র এক একটি হল-ঘরে সব সাজানো আছে। সর্বোপরি দর্শনীয় হ'ল বিরাট দুর্গটি। সত্যই দুর্গটি সেকালে দুর্ভেদ্যই ছিল। একটু উঁচু জায়গায় অবস্থিত। বহুদূর পর্যন্ত শ্যামল বৃক্ষ, তৃণ, কৃষিক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গের নীচে দিয়েই চলেছে ক্ষীণকায়া টেম্‌স্ নদী, বিশ গজের বেশী চওড়া নয়, আশে-পাশে সরু রাস্তা—ভিড়ও যথেষ্ট। একটা মনোহারী দোকানে ঢুকে আর বেরুতে পারি না, দোকানী ভারতের গল্পে মশগুল, ছাড়তে চায় না।

দুর্গটিকে ঘিরে একটু এগিয়ে নদী পেরুতেই এসে পড়লাম জগদ্বিখ্যাত ইটন্ (Eton) বিদ্যালয়ের এলাকায়। ১২।১৪ বছরের অনেকগুলি ছেলে দ্রুত গতিতে রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভেঙে কোথা যেন চলেছে। তখন বিকেল ৭॥৮ টা হবে, বেশ রৌদ্র। সব ছেলের মুখেই—বৈশিষ্ট্য ও অভিজাত্যের পরিচায়ক একটা উজ্জ্বল ভাব। অনেকের গায়ে একই ধরনের কালো কোট। একজনের একটু মন্থর গতি দেখে তার সঙ্গেই আলাপ জমালাম। তাদের গন্তব্য স্থল টেম্‌সের ধারে,—নৌকা-চালনা এদের একটা প্রধান খেলা। সরু নদী হলেও সারা বছর এতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়।

আর একটু যেতেই একটি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ দেখলাম। রাস্তার দুধারেই পুরাতন বাড়ীগুলি তাদের স্থবিরত্বের মাধ্যমেই পূর্ব গৌরব ঘোষণা করছে। এখানেও একটি ছেলেকে পেলাম, একটু ঘুরিয়ে দেখাল ও বেশ সপ্রতিভ পরিষ্কার ভাষায় ব'লল, বাড়ীগুলি ছাত্রাবাস, ক্লাস বিভিন্ন জায়গায় হয়, ত্রৈমাসিক পরীক্ষাতেও ছোটখাটো প্রমোশন হয়। বিরাট মাঠে ছেলেদের ক্রিকেট, ফুটবল, ভলি প্রভৃতি খেলা চলেছে। ট্রেনের সময় ব'লে তাড়াতাড়ি ফিরতে হ'ল। খানিকটা ডিজেল ও খানিকটা বাষ্প চালিত ট্রেনে লণ্ডনে ফিরলাম।

কাজের সূত্রেই পরের দিন গেলাম টেম্‌সের উপত্যকা ধরে আরও খানিক এগিয়ে হেনলি-অন্-টেম্‌সে (Henley-on-Thames)। টেম্‌সের উপর বরাবর যে বোট-রেস (Boat-race) হয়, তা এখান থেকে আরম্ভ হয়,—এটিই এখানকার বৈশিষ্ট্য।

সরু টেম্‌স্‌, কিন্তু নদীর ধারে ব্যবস্থা প্রচুর। ছোট শহর—কেবল বাগান। জনবিরল পথে দু-চার জনকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমায় খুঁজে বার করতে হ'ল একটি লেবরেটরী,—ক্রেতাদের সুবিধার জন্য কাপড়ের ব্যাবহারিক গুণাগুণ বিশ্লেষণ করবার একটি সমিতির দ্বারা এটি পরিচালিত।

লাঞ্চের পূর্বেই এখানকার কাজ সেরে এক বাস ধরলাম অক্সফোর্ড যাব ব'লে; লণ্ডন থেকে সোজা গেলে প্রায় ৬০ মাইল পশ্চিম-উত্তরে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। পথে চারিদিকে চাষ-আবাদ চমৎকার, গাছপালা এবং ফুলে-ভরা বাগান-শোভিত অক্সফোর্ড শায়ার (Oxfordshire)-এর মধ্য দিয়ে যখন বাস চলেছে, মন তখন আপনা হতেই আনমনা হ'য়ে আসছিল—সূর্যদেবেরও সেদিন অশেষ কৃপা ছিল। ক্রমেই টেম্‌সের শেষ প্রান্তে তার এক উপনদী আইসিস্‌ (Isis)-এর ধারে আসতেই শহরের সু-উচ্চ গির্জার চূড়াগুলি চোখে পড়ল। এখানকার নামকরা রাস্তা 'দি হাই' (The High)-এর মধ্যে যখন গাড়ী ঢুকল, তখন আমার পাশের যাত্রীটি আর স্থির থাকতে পারলেন না; আমাকে দেখাতে লাগলেন: কুইন্স কলেজ (Queen's College), অল্‌ সোল্‌স্‌ কলেজ (All souls' College), ইউনিভারসিটি কলেজ (University College) ইত্যাদি।

বাস থেকে নেমে মাটিতে পদার্পণ ক'রে সত্যই অনুভব করলাম, শতাব্দীর পর শতাব্দী মনীষী ও বিদ্যার্থীদের সমবেত চেষ্টার একটা জমাট ভাব। এখানকার স্থান-মাহাত্ম্যের কথা অস্বীকার করা যায় না। একটু হেঁটে ক্রাইষ্ট চার্চ (Christ Church), জিসাস্‌ কলেজ Jesus College), ট্রিনিটি কলেজ (Trinity College) দেখলাম। প্রায় সব কলেজই চার-পাঁচ-শ' বছরের, দু-তিনটির গোড়া পত্তন শুনলাম ছ-সাত শ' বছর আগে।

কলেজগুলির বেশীর ভাগই হ'ল ছাত্রাবাস। ভিতরের পরিবেশ খুবই শান্ত—উঠানে 'শাইলক্‌ দি জু' (Shylock the Jew) থিয়েটার, ছেলেরা সাজ পরছে দেখলাম। এরা পুরাতনের পূজারী, শত শত বছরের টেবিল বেঞ্চি—আবার রীতি-নীতিও এরা বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে বদলাতে চায় না। শুধু স্থবিরত্বে নয়, সৌন্দর্যেও বাড়ীগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। বাহির দেওয়ালের কারুকার্য এক দর্শনীয় বস্তু—ছোট ছোট চূড়া; গেটের মাথায় প্রায়ই নহবতের মতো ঘর। ক্রীস্টফার রেন (Christopher Wren)-এর স্থাপত্য-কীর্তি অনেক জায়গাতেই বিদ্যমান, বিশেষ ক'রে শেল্‌ডোনিয়ান থিয়েটারে (Sheldonian Theatre)—এটি দু-হাজার দর্শকের স্থান সংকুলানে উপযুক্ত একটি গম্বুজ। পাশেই Indian Institute—লাইব্রেরী ও চিত্রপটের মাধ্যমে ভারতীয় জীবনের আভাস দেবার চেষ্টা হয়েছে। কাছেই আর একটি মিউজিয়াম; বিজ্ঞানযুগের শুরুতে পদার্থ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যায় যে যন্ত্র সব ব্যবহৃত হয়েছিল, তা এখানে সাজানো আছে।

সব থেকে ভাল লেগেছিল—প্রত্যেক কলেজের সঙ্গে একটি ক'রে উপাসনা-স্থল (Chapel)-এর ব্যবস্থা দেখে। এরা কোন দিনই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেয়নি। 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' (Necessity of Atheism) প্রকাশনের জন্যই কবি শেলী (Shelley) ইউনিভারসিটি কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন,—সেইখানেই দেখলাম তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এমন মনোরম স্থানেও কিন্তু শিক্ষাবীজ সহজে উপ্ত হয়নি। বহুদিন পর্যন্ত 'টাউন ও গাউন' (Town and Gown)-এর বিরোধ চলেছিল, এজন্য আইন প্রণয়নও করতে হয়েছিল, যার মেয়াদ গত শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বহুদিন গাউনের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও গত ত্রিশ বৎসরে আশেপাশে মটর-গাড়ীর কারখানার মতো বড় কারখানাও গজিয়ে উঠেছে। অবশ্য বিদ্যায়তনের প্রভাব তাতে কিছু ম্লান হয়নি। অল্প সময়ে এর বেশী আর কিছু দেখা সম্ভব হয়নি। ট্রেনেই লণ্ডনে ফিরলাম—রাত তখন ১১॥ টা।

একদিন বাদে শিক্ষাজগতের আর এক তীর্থক্ষেত্র কেম্ব্রিজ (Cambridge) দেখতে রওনা হলাম; লণ্ডন থেকে ৬০ মাইল উত্তরে। বাসেই চললাম এসেক্স-এর সমতল ভূমি দিয়ে। মাঝ পথে চা খাবার জন্য গাড়ী থামল। পুরাকালের পান্থশালাটি একালের রেস্টুরেণ্টে রূপান্তরিত, কিন্তু সেকেলে গেট ও লণ্ঠনটি সাজানো আছে,—কারণ লোকেরা পুরাতন ধারাই পছন্দ করে। গাড়ী আবার চলল, দ্বিপ্রহরে কেম্ব্রিজে ঢুকলাম। অক্সফোর্ডের মতো কোন উঁচু গির্জা দূর থেকে চোখে পড়ে না—বাস থেকে নেমে বিভিন্ন দোকান-পসার-বিশিষ্ট কয়েকটা রাস্তা পার হ'য়ে কিংস্ কলেজের (King's College) সামনে এসে পড়লাম। চমৎকার বাড়ীগুলি, অনেকটা অক্সফোর্ডেরই মতো। কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডে পাল্লা চলে সব বিষয়েই—এমনকি কে বেশী পুরাতন, তার প্রমাণ নিয়েও। অবশ্য অক্সফোর্ডকেই বেশী পুরানো মনে হয়। আর একটু এগিয়ে মোড় ঘুরে কর্পাস্ ক্রাইষ্ট কলেজের (Corpus Christ College) পেছনে একটা সরু গলির ভেতর ঢুকে বিশ্ববিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ (Cavendish) ল্যাবরেটরী খুঁজে পেলাম। পুরাতন বাড়ীর সঙ্গে নতুন সংযোজন মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে প্রফেসর ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপনের পর তাঁদের গবেষণা-প্রসূত বিভিন্ন ধরনের অণু-বীক্ষণ যন্ত্রের প্রক্রিয়া দেখালেন; বিজ্ঞানগুরু ম্যাক্সওয়েল (Maxwell), র‍্যালে (Rayleigh), রাদারফোর্ডের (Rutherford) স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলিও দেখালেন। এইখানেই প্রথম ক্লাসে এক্সপেরিমেণ্ট (experiment) দেখিয়ে পদার্থবিদ্যা পড়াবার জন্য উপযুক্ত গ্যালারি প্রভৃতির ব্যবস্থা হয় একশ' বছর আগে। আরও দু-একটি সুপরিচিত যন্ত্র দেখে প্রফেসর ও এই বিদ্যাকেন্দ্রটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বিদায় নিলাম।

বড় রাস্তায় বেরিয়ে আবার কিংস্ কলেজে ঢুকলাম। এখানেও পাশেই উপাসনা মন্দির (Chapel)—সামনে ও পিছনে দুটি বড় উঠান ও চারিদিকে ছাত্রাবাস। একটু পরেই ট্রিনিটি (Trinity) কলেজ—একই ধরনের; খাবার হল-ঘরে লম্বা পুরাতন টেবিল, পুরাতন প্রথাই চালু আছে, কাপড় পাতবার ব্যবস্থা নাই—বসবার ব্যবস্থাও সরু বেঞ্চিতে। চারিদিকে খ্যাতনামা প্রাক্তন ছাত্রদের ছবি। পেছনে উঠানে দেখি মঞ্চ তৈরী হচ্ছে—নাটক হবে। আরও পেছনে বাগান, একেবারে ক্যাম (Cam) নদীর ধারে। এই ক্যাম নদী থেকেই কেম্ব্রিজ (Cam-bridge) নামের উৎপত্তি। নদী বিশ হাতের বেশী চওড়া নয়—দুধারেই কলেজের বাড়ীগুলি বিস্তৃত—মাঝে মাঝে সেতু বা ব্রিজ দিয়ে এপার ওপার সংযুক্ত। এই নদীতেই ছেলেদের নৌকা নিয়ে খেলা ও প্রতিযোগিতা। বাগানে ফুলের বাহার। একটু বসে এগিয়ে চলি। এবার সেণ্ট জন্‌স্ কলেজ (St John's College)। আরও একটি শান্ত সুন্দর পরিবেশ ও বিস্তৃত অঙ্গন। এইখানেই আটশ' বৎসরের পুরাতন

হাসপাতালটি রয়েছে। এখানে ক্যামের ওপর সেতুটিও বিচিত্র জাফ্রি-করা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা; ভিনিসের একটি সেতুর অনুকরণে এর নাম 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' (Bridge of sighs) অক্সফোর্ডের মত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেকগুলি কলেজের সমষ্টি—কলেজগুলি আসলে ছাত্রাবাস, ক্লাস অন্যত্র। শেষ বাসেই সীট্ রিজার্ভ করা ছিল—গোধূলির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে লণ্ডনে ফিরলাম রাত দশটায়।

মধ্যে একদিন বিকেলে সময় পেয়ে রাজনীতিবিদ্ উইন্‌ষ্টন চার্চিলের (Winston Churchill) অবসর সময়ে আঁকা ছবির (water-colour painting) এক বিরাট প্রদর্শনী দেখলাম বার্লিংটন হাউসে। কয়েকখানি ছবি নাকি উচ্চস্তরের। এই বাড়ীটিতেই রয়েল্ সোসাইটি (Royal Society) প্রভৃতি বড় বড় সাংস্কৃতিক সমিতির অধিবেশন হয়।

সেই দিনই টেম্‌সের বক্ষে স্টীমার-যোগে মাইল পনের গিয়ে কিউ উদ্যানে (Kew Gardens) বেড়িয়ে এলাম। ছেলেবেলাকার কল্পনার বাস্তব রূপ দেখলাম। আমাদের বোটানিকাল গার্ডেনকে এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

এর পরই দিন কুড়ির জন্য ইওরোপ (ফ্রান্স, জার্মানি, সুইটজার্লণ্ড) ঘুরে আমার প্রধান কর্মস্থল লীড্‌স্-এ ফিরে আসি।

*　　　*　　　*

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সাঙ্গ ক'রে, ম্যাঞ্চেস্টার, ডাণ্ডি, বেলফাস্ট প্রভৃতি স্থানের শিক্ষাসূচী (Syllabus) শেষ ক'রে সেপ্টেম্বরের প্রথমে আবার যখন লীড্‌সে ফিরি, তখন বিদায়ের পালা। এক বছর ধরে যাদের সঙ্গে ক্রিয়া-কর্ম, চেনা-জানা, তাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন রাত্রের ট্রেনে লীড্‌স্ ছাড়লাম। অনেকগুলি ছাত্র স্টেশনে এসেছিল, সকলেই বাঙালী। আমার মনে যদিও বিদায়ের ব্যথার চেয়ে যাত্রার অপর প্রান্তে স্বজন-মিলনের আনন্দই তখন প্রবল,—এই সব ছাত্রদের মনে কিন্তু নূতন ক'রে বিচ্ছেদ-ব্যথা জেগে উঠল। প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া মনের আনন্দে যে কেউ সেখানে আছে, তা মনে হয় না। ট্রেন ছাড়বার পর—কেন আসা, কেন যাওয়া, কেন এত লেখাপড়া, এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। তিন ঘণ্টার পথ —রাত্রি ব'লে সাত ঘণ্টায় পার হ'য়ে গাড়ী যখন লণ্ডনে এল, তখন সকাল হ'য়ে গেছে। ভারতীয় ছাত্রাবাসেই উঠেছিলাম—সেই অব্যবস্থা।

পরদিন সন্ধ্যায় প্লেন ছাড়বে। বৃটিশ কাউন্সিল ও বি.ও.এ.সির লেন-দেনের অনুষ্ঠান সেরে যথেষ্ট সময় আছে দেখে ব্রিস্টলে (Bristol) নবভারতের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দিরে একবার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সুযোগ ছাড়লাম না। ট্রেনে ১২০ মাইল পথ যেতে দু ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না। কিছু আগেই বাথ (Bath) শহর, ট্রেন থেকেই দেখলাম—সুন্দর সুন্দর সাদা বাড়ীগুলি রোদে ঝলমল করছে। ব্রিস্টল স্টেশনে পৌঁছে—শহরের বিরাট ম্যাপে সুইচ টিপে আমার গন্তব্য স্থানে যাওয়ার নিশানা ঠিক ক'রে নিলাম। সমাধি-ক্ষেত্রে পৌঁছে কর্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই তিনি বললেন, 'কি রাজার সমাধি দেখতে এসেছেন ?' খুঁজে পেতে একটুও দেরি হ'ল না। বহু ক্রশ ও স্মৃতি-ফলকের মধ্যে ভারতীয় ধরনের মন্দিরাকৃতি গম্বুজ ও চূড়া-বিশিষ্ট আচ্ছাদনটি গেট থেকেই চেনা যায়। ১৮৩৩ খৃঃ ভারতের কাজেই ইংলণ্ড এসে এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। প্রস্তর ফলকে আট-দশটি ছত্রে তাঁর প্রশস্তি লেখা আছে।

যে পুষ্পস্তবকগুলি এনেছিলাম, সেগুলি অঞ্জলি দিয়ে নীরবে চলে এলাম। শহরের অপর পারে এভন্ (Avon) নদীর ওপরে একটি পুরাতন ঝুলানো সেতু দেখতে গিয়ে পর্বত-গাত্রে কয়েকটি গুহা দেখলাম, লেখা আছে: এগুলি বহু পূর্বে রোমান ক্যাথলিক সাধুদের তপস্যার স্থান ছিল। আমার একটি ছাত্র সস্ত্রীক ব্রিস্টলে ছিল, সেখানেই আহারাদি সেরে লণ্ডনে ফিরলাম।

পরদিন সকালে শেষবারের মতো স্বামী ঘনানন্দজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মাইল দশেক উত্তরে ডিউক্স্ এভিনিউএ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারে গেলাম। বড়দিনে যা দেখেছিলাম, তার তুলনায় আশ্রম এখন অনেক সুন্দর—পিছনের বাগানটি নানা ফুলে ভরা। স্বামী মুখ্যানন্দও রয়েছেন। ঠাকুরঘরের সামনে কয়েকজন ইংরেজ মহিলা ও ভদ্রলোক ধ্যানে রত। তার মধ্যে একটী মহিলার সঙ্গে আলাপে লক্ষ্য করলাম তাঁর তেজ—সংসার ত্যাগের ইচ্ছা, লণ্ডন আশ্রমে মেয়েদের কোন ব্যবস্থা নেই ব'লে অনুযোগ করছেন। মহারাজ প্রসাদ না পাইয়ে আমাকে ছাড়লেন না। বেশীর ভাগই ভারতীয় খাদ্য, রান্না অবশ্য একটি ইংরেজ মহিলার।

প্রসাদ ধারণ ক'রে হোস্টেলে ফিরে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিমান-বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ভারী মাল লীড্স্ থেকেই জাহাজে পাঠিয়ে দিয়েছি।

প্লেন ইংলণ্ডের মাটি ছাড়বার পর মনে হ'তে লাগল: 'বিলাত দেশটা' সত্যই তো 'মাটির', আর মানুষও 'রক্তমাংসে'র; তবে কি গুণে আজ এরা এত উন্নত? এক বছরের সংসর্গে নিজের মনেই উত্তর এল: পুরাতন ধারার ওপর শ্রদ্ধা, আবার নব আবিষ্কারের উদ্যোগ, তার পেছনে আছে নিয়ম-মান। স্বভাব আর আজ্ঞাবহতা, সেটাকে এরা অপমানকর মনে করে না। সর্বোপরি এদেশে বহু মনীষী আছেন, যাঁরা 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ' এই নীতি—জেনে হ'ক বা না জেনে হ'ক, মেনে চলেন। আমাদের মতো এঁরা ভাবেন না যে জীবন শুধু দু-দিনের, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এঁরা জানেন।

প্লেন আমায় রোমে নামিয়ে দিল। রোমের পর এথেন্স হ'য়ে কাইরো। সে আর এক কাহিনী। কাইরো থেকে যে প্লেনে উঠি, তা থেকেই নেমে দমদমে ভারতের মাটি স্পর্শ করলাম ঠিক একটি বছর পরে—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯।

Come out of your narrow holes and have a look abroad. See how nations are on the march.

[Letter from Yokohama, 10th July, 1893] **Swami Vivekananda.**